শারদীয়

# পরিচয় ৭৭

১৪১৪

## দুশ বছরের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য ১৮০ টাকা
(দ্বিতীয় খণ্ড)

*সম্পাদনা :* অলোক রায় ■ পবিত্র সরকার ■ অভ্র ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ● দীনেশচন্দ্র সেন ● প্রমথ চৌধুরী ● ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী ● বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ● রাজশেখর বসু ● ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ● ক্ষিতিমোহন সেন ● নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ● চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ● অতুলচন্দ্র গুপ্ত ● মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ● বিনয় সরকার ● সুকুমার রায় ● মোহিতলাল মজুমদার ● নলিনীকান্ত গুপ্ত ● কালিদাস রায় ● সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ● রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ● এস. ওয়াজেদ আলি ● শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ● দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ● জ্যোতির্ময়ী দেবী ● ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ● সত্যেন্দ্রনাথ বসু ● কাজি আবদুল ওদুদ ● নীরেন্দ্রনাথ রায় ● দিলীপকুমার রায় ● মোতাহের হোসেন চৌধুরী ● প্রবোধচন্দ্র সেন ● নীরদচন্দ্র চৌধুরী ● প্রবোধচন্দ্র বাগচি ● জীবনানন্দ দাশ ● সুশোভন সরকার ● সুকুমার সেন ● নির্মলকুমার বসু ● অমিয় চক্রবর্তী ● সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ● রেজাউল করীম ● গোপাল হালদার ● প্রমথনাথ বিশী ● হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ● আবুল ফজল ● নীহাররঞ্জন রায় ● অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ● সৈয়দ মুজতবা আলী ● অতুল সুর ● অন্নদাশঙ্কর রায় ● সরোজ আচার্য ● আবু সয়ীদ আইয়ুব ● হুমায়ুন কবির ● হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ● বুদ্ধদেব বসু ● বিষ্ণু দে ● পরিমল রায় ● অরুণ মিত্র ● সুবোধ ঘোষ ● নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ● ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ● ভবতোষ দত্ত ● নারায়ণ চৌধুরী ● চিন্মোহন সেহানবীশ

সাহিত্য অকাদেমি
আঞ্চলিক দপ্তর (পূর্ব ভারত)
জীবন তারা
২৩/এ ৪৪ এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড
কলকাতা ৭০০ ০৫৩
দূরভাষ : ২৪৭৮ ১৮০৬, ২৪৯৮ ৫২০৩

বিশ্বময় অরাজকতার হাত থেকে বাঁচতে/বাঁচাতে ও সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার প্রসারকল্পে—

# সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ

**SARBABHARATIYA SANGEET-O-SANSKRITI-PARISHAD.**

WESTBENGAL-INDIA

1/A. Jadunath Sen Lane, Kolkata-700 006.

Phone-2351-8691/2360-8306.

শুভেচ্ছাসহ

পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

www.wbut.ac.in

## WISHING "ANANTA JEEVAN" FOR "PARICHAYA" AND

In memory of our Renowned teacher Dr. Subrata Banerjee, FRCS (England), (1916–2006), Ex-Head of Surgical Dept., Medical College, Kolkata, Lived at 37/1, Beadon Street, Kolkata-700 006 (Near Scotish Church College).


***By :*** **Dr. Sandip Mandal,** Md
(General Medicine & Diabetologist).
Mobile : 9836920558

**Dr. Prabhat Kr. Saha,** Bsc, MBBS,
Ex-Medical Superintendent
Kolkata Port Trust.

**Dr. Prabhat Kumar Saha.**
9/1 B, Chintamani Das Lane
Kolkata-700009
Mobile : 9883158834

নির্মাণে

ম্যাকিনটস বার্ণ লিমিটেড
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান

ডি ১/১ গিলেন্ডার হাউস, ৮, নেতাজী সুভাষ রোড
কলকাতা-১

ফোন ঃ ২২২০-৭৮০৫, ২২১০-২১৭৫
ডিডি ১৮/৮, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা-৬৪
২৩৫৮-১৪১৮, ২৩৫৮-১৪২০, ২৩৩৭-১৬৫৪

# পরিচয় ৭৭

সাতাত্তর-এ দেওয়া 'পরিচয়'-এর শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হল। পরিচয়-এর মতো সমস্তরকম প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা-বর্জিত একটি পত্রিকার সাতাত্তর বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহাসিক তাৎপর্যটি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে নিশ্চয় একদা অনুভূত হবে। এটা আমাদের বিচার্য নয়। আমাদের এখনও যথাসাধ্য প্রচেষ্টা যে কোনো ভাবে পুরোনো ঐতিহ্যটি ধরে রাখা। এই সংখ্যাটিকেও সেই বিনীত প্রচেষ্টার নিদর্শন হিসেবেই ধরতে হবে।

পরিচয়-এর চিরকালই খ্যাতি ছিল তার প্রবন্ধের জন্য। এবারের শারদ-সংখ্যাটিও তার ব্যতিক্রম নয়। যথারীতি বেশ কিছু সংখ্যক গল্প-কবিতা তো আছেই তাছাড়াও রয়েছে অন্তত পাঁচ ছটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এগুলি পাঠকমনকে নাড়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। শিল্প বনাম কৃষি বিষয়ক চলতি বিতর্ক থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর নতুন পাঠ, গীতবিতানের ৭৫ বছর সম্পর্কিত ব্যতিক্রমী ভাবনা অথবা আধুনিক দৃষ্টিতে ঠাকুরমার ঝুলির ব্যাখ্যা—এ সবই প্রবন্ধগুলির বিষয়। বলা বাহুল্য মতামতগুলি সম্পূর্ণভাবে লেখকদের নিজস্ব, 'পরিচয়' তার অংশীদার নয়। তবে প্রবন্ধগুলি প্রকাশের ব্যাপারে 'পরিচয়' তার স্বভাবসিদ্ধ নিরপেক্ষ মানসিকতার ঐতিহ্য অনুসরণ করেছে।

আসন্ন উৎসবের দিনগুলি সকলের সুখে ও শান্তিতে কাটুক।

সম্পাদকমণ্ডলী

প্রচ্ছদ
দীপ্ত দাশগুপ্ত



সম্পাদক
অমিতাভ দাশগুপ্ত

যুগ্ম সম্পাদক
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

কর্মাধ্যক্ষ
পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

সম্পাদকমণ্ডলী
কার্তিক লাহিড়ী
শুভ বসু অমিয় ধর

সম্পাদনা সহায়তা
অজয় চট্টোপাধ্যায়

দপ্তর সচিব
দুলাল ঘোষ

উপদেশকমণ্ডলী
সিদ্ধেশ্বর সেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় শঙ্খ ঘোষ

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু কর্তৃক ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯/এইচ/এইচ, গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

# পরিচয়

ভাদ্র-আশ্বিন ১৪১৪
আগস্ট-অক্টোবর ২০০৭
১-২ সংখ্যা ৭৭ বর্ষ

স্মৃতি-আলেখ্য



প্রবন্ধ



গল্প

**কবিতা গুচ্ছ-১**



**অনুবাদ কবিতা**



**কবিতা গুচ্ছ-২**



**কবিতা গুচ্ছ-৩**

# ধুলির আখর

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

নৈহাটির যে তিনজন আমাকে সারাজীবনে গভীরভাবে স্পর্শ করেছেন, প্রভাবিত করেছেন তাঁদের মধ্যে দুজনের কথা আগেই বলেছি—একজন ভাটপাড়ার চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য, অপর জন নৈহাটির সমরেশ বসু। তৃতীয় ব্যক্তির কথা বলা হয়নি। এবার বলব। পরিচয় পাঠকের কাছে এ ব্যক্তির নাম একেবারে অশ্রুত নয়। ইনি অনন্তকুমার চক্রবর্তী। এঁর কথা বলতে গেলেই অনিবার্য হয়ে ওঠে নৈহাটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের কথা। নৈহাটির রূপান্তর ও পরিবর্তনের ইতিহাসে এই কলেজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নৈহাটির একটা কলেজের অভাব অনেকদিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিল। অবশেষে দেশ স্বাধীন হবার পর দেশবিভাগের ধাক্কায় গত শতাব্দের আটচল্লিশ সালে সান্ধ্য বাণিজ্য কলেজ হিসাবে এই কলেজের যাত্রা শুরু হল। সে সময়ের হিসাবে আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ বর্ষের ছাত্র। নৈহাটির মহেন্দ্র স্কুলের নিচের তলার দুটি ঘরের একটি নির্দিষ্ট হল অধ্যক্ষের জন্য, আরেকটি ঘরে গুটি পনের ছাত্র নিয়ে অধ্যাপক পড়াতেন। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতাম দাদা স্থানীয় অধ্যাপক পড়াচ্ছেন টেনিসনের এনক আর্ডেন। বাইরে দাঁড়িয়ে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শুনছে—তার মনে এক আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুর—সে কি কোনোদিন পারবে এই নতুন কলেজে অধ্যাপক হতে? কয়েক মাসের মধ্যে কলেজ ওখান থেকে উঠে চলে গেল তার নিজ নিকেতনে। নিজনিকেতনের তখন কী ছিরি। মেজভ্যান্ড বোসের একটা পরিত্যক্ত কুলিব্যারাক রাতারাতি কলেজে রূপান্তরিত হল। তৎকালীন রাজ্যপাল মাননীয় কৈলাসনাথ কাটজু কলেজ পরিদর্শন কালে ব্যঙ্গাত্মক বিস্ময়ে এই কথাটাই উচ্চারণ করেছিলেন—'এ কুলি ব্যারাক হ্যাজ বিন কনভার্টেড ইনটু এ কলেজ ওভারনাইট।' হ্যাঁচা বেড়ার দেওয়াল, টালির চাল, কলেজের ফটক বা গেট বলে কিছু নেই। বর্ষার দিনে ফুটো চাল দিয়ে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ে আর শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীরা একই সঙ্গে ভিজতে ভিজতে বিদ্যাদান ও গ্রহণ সম্পন্ন করেন। পাশের পল্লীর গরু এবং ছাগল কলেজ প্রাঙ্গণে অবাধে বিচরণ করে। দু একটা সবৎসা ছাগলী অসংকোচে ক্লাসে ঢুকে পড়ে। শিক্ষক মহাশয়কেই হাজিরা খাতা আস্ফালন করে তাদের তাড়াতে হয়। শুধু অধ্যক্ষ মশায়ের ঘর এবং বিজ্ঞান বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট গ্যালারি রুমটি পাকা দালান—সবে তৈরি হয়েছে। তখনো সকালবেলা মহিলা বিভাগ শুরু হয়নি। দুপুরবেলায় সহপাঠ বিজ্ঞান বিভাগ এবং কলা বিভাগের সহাবস্থান। সান্ধ্য বিভাগটি নির্দিষ্ট ছিল কেবলমাত্র বাণিজ্যিক বিষয়ের পড়ানোর জন্য। দেখতে দেখতে সেই হ্যাঁচা বেড়ার দেওয়াল টালির চাল বিদায় নিচ্ছে—মাথা তুলছে প্রাসাদোপম মহাবিদ্যালয়ের পূর্বতন রূপ। পনেরটি ছাত্র নিয়ে যে কলেজ শুরু হয়েছিল তা দেড় হাজার ছাড়িয়ে গেল। অনেক পরে ভারতবর্ষের উপরাষ্ট্রপতি শ্রীসর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ আমাদের অধ্যক্ষ ড. সুধীররঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়ের প্রত্যক্ষ আচার্য, ছাত্রের অনুরোধ

এড়াতে না পেরে কলেজ পরিদর্শনে এসেছিলেন। নৈহাটির সেদিন একটা দিন—এর আগে এত বড় মাপের ব্যক্তিত্ব কলেজে বা নৈহাটিতে পদার্পণ করেননি। শোনা যায় আমাদের অধ্যক্ষ বিধানবাবুকে টপকে সটান দিল্লিতে শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে দেখা করে তাঁর আর্জি পেশ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখেন নি। রাধাকৃষ্ণণকে যখন জানান হল যে কলকাতার বাইরে ছাত্রসংখ্যার দিক দিয়ে এত বড় কলেজ আর নেই, উপরাষ্ট্রপতি মহোদয় নিঃশব্দ গাম্ভীর্যে কিন্তু সকৌতুকে কথাটি গ্রহণ করেছিলেন। তা নইলে আমাদের প্রদত্ত মানপত্রের উত্তরে এ কথা বললেন কেন—কেবল সংখ্যাধিক্য যেন গুণ মর্যাদার বিকল্প না হয়। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক সংখ্যাও আনুপাতিক ভাবে বেড়ে চলেছে। আমরা নৈহাটির অধ্যাপক মাত্র দুজন। বাকি সকলেই তখন কলকাতা থেকে দৈনিক যাতায়াত করতেন। দেশবিভাগের ফলে উদ্বাস্তু অধ্যাপকদের সংখ্যাই বেশি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা উজ্জ্বল ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা নিয়ে উপায়ান্তরবিহীন অবস্থায় এই সবে গড়ে ওঠা মফস্বল কলেজে পড়াতে এসেছেন। সলিমুল্লা কলেজের অধ্যক্ষ এই কলেজে সামান্য লেকচারারের পদ নিয়ে চলে আসতেও বাধ্য হয়েছেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ক্ষতচিহ্ন অঙ্গে নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থানাধিকারী এই কলেজে এসেছেন—মাসিক বেতন দেড়শত টাকা, সাড়ে সতের টাকা সরকারি মহার্ঘ ভাতা, সেটা তিনমাস অন্তর পাওয়া যেত। কারো কারো মনের মধ্যে ক্ষোভ একটা থাকতই—তাঁদের দেদীপ্যমান ছাত্রকীর্তির কোনো সমাদর তাঁরা পাচ্ছেন না। যতদিন তাঁরা এ কলেজে ছিলেন ততদিন আমরা তাঁদের কারো মুখে হাসি দেখিনি। এমন একজন অধ্যাপকের ছেলেরা আড়ালে নামকরণ করেছিল গম্ভীরানন্দ স্বামী। পরে ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজে চলে যান।

এই কলেজ প্রাঙ্গণে একদিন সাড়ে দশটার সময় অনন্তকুমারের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র—দেখা মাত্র আমরা দুজনে দুজনকে মনের মানুষ বলে চিনে নিলাম। তাঁর প্রথম আলাপন সূত্রটি এই—'বিষ্ণুবাবুর কাছে আপনার কথা আমি শুনেছি।' তিনিও বিষ্ণু দের অনুরাগী, আমিও তাই। একটু পরেই জানলাম তিনিও আমার মতোই মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক। তিনি একটু বেশি, তিনি পার্টি সদস্য। কিন্তু এসবই বাইরের কথা। ভিতরের কথা অন্তরঙ্গ মুহূর্তেই জানা গেল—আমরা দুজনে এক কাননের পাখি, একই আকাশে আমাদের ওড়াউড়ি। সে আকাশ রবীন্দ্রনাথের আকাশ। রবীন্দ্রনাথের গান এবং লিরিক আমাদের দুজনের আত্মার আশ্রয়। কলেজের শিক্ষকগৃহে দক্ষিণ পূর্ব কোণে একটি কৌচে আমি অর্ধশয়ান। আমার সামনে একটি চেয়ারে অনন্তকুমার—চলেছে আমাদের রবীন্দ্রচর্চা। দশকের পর দশক চলে যাচ্ছে, আমাদের রবীন্দ্র অন্বেষা অফুরান। তাঁর ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে অধিকার ছিল গভীর। গভীরতর ছিল তাঁর রসবোধ। অল্প বয়সেই তিনি শ্বাসকষ্ট জনিত রোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু সে কষ্ট তাঁকে দমাতে পারেনি কোনোদিক থেকে। যখন পার্টির কাজে মার্কসবাদের ক্লাস নিতেন, তখন একটানা দুঘন্টা ক্লাস নিতেন। জটিল বিষয় সরল হয়ে যেত তাঁর বলার গুণে। অবার গানের বিষয়ে যখন কিছু বলতেন তখন সে 'কিছু' হয়ে উঠত বিস্তারিত এবং সানুপুঙ্খ।

একদিন গানের কোনো একটি লিরিকের বিষয়ে বলতে গিয়ে আমি বললাম, দেখছেন এই লিরিকটির প্রায় প্রত্যেকটি শব্দে কেমন সেকেন্ড সিলেবলে ঝোঁক পড়ছে। এক মিনিট বাদে অনন্তকুমার বললেন, শুধু তাই নয় এই লিরিকের সাংগীতিক রূপেও তাই হয়েছে। গেয়ে শুনিয়ে দিলেন। এই অনন্তকুমারকে চীন ভারত-সীমান্ত হাঙ্গামার সময় সরকার বন্দী করলেন। অনেক পার্টি সদস্যকেই জেলে যেতে হল। নৈহাটি থেকে গ্রেপ্তার হলেন কম্যুনিস্ট নেতা গোপাল বসু, অজিত বসু এবং অনন্তকুমার। এই বাবদে আমি কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়কে চিনলাম আরেক মাত্রায়। কংগ্রেস দেশরক্ষার শ্লোগান তুলে নৈহাটির পুরসভা প্রাঙ্গণে এক সভা ডাকলেন। আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয়ও আমন্ত্রিত হলেন। সেই সভায় কংগ্রেসীদের তরফ থেকে দাবি উঠল এখনি অনন্তকুমারকে কলেজ থেকে তাড়াতে হবে। এইবার দেখা গেল সেই অধ্যক্ষ ড. সুধীররঞ্জন দাশগুপ্তের রুদ্র মূর্তি। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—'অনন্তবাবুকে কলেজে রাখা হবে কি হবে না সে বিচার করবে কলেজ গভর্নিং বডি। এটা কলেজ গভর্নিং বডির সভা নয়। আপনারা যদি বারবারই এই প্রশ্ন তোলেন তবে আমি এই সভার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে সভা পরিহার করতে বাধ্য হব।' সভায় দ্বিতীয়বার আর অনন্তকুমার প্রসঙ্গ ওঠেনি। কেউ তোলেনও নি। অধ্যক্ষ দাশগুপ্ত পরে আমায় বলেছিলেন যে তাঁর এলাকার মধ্যে তিনি কাউকেই মাথা গলাতে দেবেন না—স্বাধীনতা কোনো কারণেই কারো কাছে মর্টগেজ রাখা যায় না। এই ছিল সেদিনের অধ্যক্ষের চেহারা। অধ্যক্ষের ওই দর্পিত চেহারা দেখেই কংগ্রেসী নেতারা থমকে গেলেন। অনন্তকুমার জেল থেকে ছাড়া পাবার পর দিনই কলেজে ঢুকে ক্লাস করতে চলে গেলেন। কেউ কোথাও একটা টুঁ শব্দ করেন নি।

আমাদের কলেজে পড়াতে আসতেন সৌম্যদর্শন গৌরকান্তি এক প্রবীণ, নাম প্রমথনাথ সরকার। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় দুজনের ছিল সর্বোচ্চ স্থান। পিঠোপিঠি। এম.এ-তে ছিল উচ্চাসের ফল। কিন্তু এই অসামান্য মেধাবী ও মনস্বী মানুষটির ভাগ্য ছিল অতীব প্রতিকূল। প্রতি বৎসর সাধারণত শ্রাবণ ভাদ্রে তাঁর সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক বিভ্রান্তি ঘটত। ক্লাসে যেতেন বটে কিন্তু পড়াতে পারতেন না। প্রসঙ্গ বিভ্রম ঘটত পদে পদে। একদিন কোনো একটা মিশ্র ক্লাসে তিনি মীমাংসা করতে বললেন—বর বড়ো না কনে বড়ো। আশ্চর্যের বিষয় এসব সত্ত্বেও শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্ররা তাঁকে নিয়ে কোনোদিন হাসাহাসি করেন নি। সকলেই তাঁকে সমীহ করত, সম্ভ্রম করত। তখন আমার বাসার সামনে দিয়ে ছিল গঙ্গার ঘাটে যাবার পথ। কখনো কখনো জামাকাপড় পরা অবস্থাতেই গঙ্গায় গিয়ে ডুব দিতেন। ফেরার পথে আমার কাছে পনেরটা টাকা ধার নিতেন—সাত দিন বাদে ফিরিয়ে দেবেন কথা দিতেন। কখনো সাত দিনটা আট দিন হয়নি। গভর্নিং বডি তাঁকে সরায় নি। কালের নিয়মেই তাঁকে সরে যেতে হল। আমরা সবাই খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম।

সেইসব দিনগুলির সঙ্গে আজকের অধ্যাপক জীবনের কত প্রভেদ। গরমের ছুটি থাকত টানা দুমাস। এপ্রিলের তিরিশ তারিখে ক্লাস করেই দুমাসের জন্য বিদায়। আবার কলেজ খুলবে জুলাইয়ের দুই বা তিন তারিখে। পূজার ছুটি এক মাস সাত দিন। চন্দননগর চুঁচুড়োয়

কলেজ খুলত আরো পরে জগদ্ধাত্রী পূজার পরে। গুডফ্রাইডের ছুটি দিন চারেক। তখন ইস্টার মনডের ছুটিও দেওয়া হত। বড়দিনের ছুটি সাতদিন। জানুয়ারি মাসে তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ আবার ছুটি— তেইশ তারিখ নেতাজী জন্মদিবস, চব্বিশ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস। মাঝখানে পঁচিশ তারিখটা বাদ যায় কেন। কলেজে একটিও ব্রাহ্ম অধ্যাপক বা ছাত্র নেই—তথাপি ওই তারিখে মাঘোৎসবের ছুটি বলে বিঘোষিত হত। তখন ছুটিকে অধ্যাপনার প্রতিকূল বলে গণ্য করা হত না। বরঞ্চ দেখা যেত প্রতিটি দীর্ঘ ছুটির শেষে অধ্যাপকদের কর্মভার পুনরায় শুরু করার জন্য এক প্রসন্ন উৎসাহ। এক নতুন কর্মোদ্দীপনা তাঁদের প্রাণিত করে তুলত। অধ্যাপকদের পাঁচ ঘণ্টা কলেজে আটকে রাখতে হবে, ছুটি কমিয়ে দিতে হবে—এ সমস্ত নির্দেশ তখন চালু হয়নি। অধ্যাপকরা নিজে থেকেই জানতেন ঠিক সময়ে ক্লাসে যেতে হয়, বছরের নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যতালিকার কাজ শেষ করতে হয়। যাঁদের দরকার পড়ত তাঁরা একসঙ্গে তিন পিরিয়ড ক্লাস একটানা নিতে চাইতেন— নিতেনও বটে। তাঁদের তখন মূল কাজই ছিল পড়ানো, ক্লাস-লেকচার প্রদান। লেকচারার, সিনিয়র লেকচারার, রীডার এইসব পদবিভাগ ছিল না। অধ্যাপনার মানের কোনো হানি তাতে হয় নি। অধ্যাপকেরা করণিকে রূপান্তরিত হন নি। আমরা জানতাম এক একটি কলেজ এক একটি তিনচাকার গাড়ি। তার সামনের চাকাটি হল অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকমণ্ডলী, এ পাশের চাকাটি ছাত্রমণ্ডলী, ও পাশের চাকাটি কলেজের শিক্ষাকর্মী। এই ত্রিচক্রের যে-কোনো একটির ব্যর্থতায় গোটা গাড়িটাই ভূমিকা হারিয়ে ফেলবে। কলেজ গাড্ডায় পড়বে। আমি যে সময়ের চিত্র তুলে ধরছি তা শুধু ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের চিত্রই নয়। তখনো অবশ্য কাঁচড়াপাড়া কলেজ স্থাপিত হয় নি। কিন্তু দেশবিভাগোত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গড়ে উঠছে একের পর এক মফস্বল কলেজ। শান্তিপুর কলেজ, রানাঘাট কলেজ এই রকম আরো নানা কলেজের ইতিহাস এই রকমই। বীজোদ্গম, অঙ্কুরায়ণ, বৃক্ষ পরিণামের কাহিনীতে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। দেখতাম অধ্যাপকদের নানামুখী আগ্রহ। বিজ্ঞানের অধ্যাপকরা সাহিত্য জিজ্ঞাসু। অর্থনীতির অধ্যাপকের ইংরাজি সাহিত্য হতে বাধত না। কলেজের দুজন ইংরাজি-অধ্যাপকের সঙ্গে আমার এবং অনন্তকুমারের রীতিমতো হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। একজন অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অপরজন অশোক মুখোপাধ্যায়। একজন এম.এ.তে হয়েছিলেন রেজিনা গুহ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। সেক্সপীয়ার রসজ্ঞ এই অধ্যাপক ওদিকে ছিলেন রবীন্দ্রসংগীত ভক্ত। সুতরাং অনন্তকুমারের আলোচনা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। আমার সাহিত্যকর্মে তিনি প্রচুর উৎসাহ দিতেন। নিজ উদ্যোগে ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে আমার গ্রন্থের জন্য উপাদান সংগ্রহ করে আনতেন। তিনি বেশিদিন আমাদের কলেজে থাকেন নি। অল্প সময়ের মধ্যে সরকারি কলেজে ডাক পেয়ে চলে গেলেন। কিন্তু তিনি আমাকে ভোলেন নি। আমি বিদ্যাসাগর পুরস্কার পাবার পরের দিন সকালে ফোন করে তিনি আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বয়েসে আমার থেকে ছোট হলে কী হবে সকল দিক থেকে তিনি ছিলেন আমার শ্রদ্ধার পাত্র। আজও তাই আছেন। অশোক মুখোপাধ্যায় একধারে চুপ করে বসে থাকতেন। সব কথাই শুনতেন।

হাসির কথায় হেসে ফেলতেন—মূলত তিনি ছিলেন অপ্রগলভ, বিনম্র ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট। মাঝে মাঝে অনন্তকুমারের দিকে একটুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিতেন। অনন্তকুমার কাগজটি বেশ অভিনিবেশ সহকারে পড়ে আমার দিকে এগিয়ে দিতেন। পড়ে বিস্মিত হয়ে যেতাম। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়গ্রাহী গানের অব্যর্থ ইংরাজি অনুবাদ। তাঁর নীরবতা তখন আমাদের কাছে অর্থবহ হয়ে উঠত। কখনো কখনো তিনি আমাদের পড়তে দিতেন তাঁর নিজের লেখা কবিতা। সে সব কবিতার উদ্দিষ্ট পাঠক ছোট ছেলেরা। মজার মজার সেইসব কবিতায় তিনি যেন একটি আলাদা জগৎ সৃষ্টি করে ফেলতেন। একটি গলিতে সারাদিনে সকালে দুপুরে বিকেলে কত বিচিত্র শব্দ শোনা যায় তা নিয়ে তাঁর একটি সুন্দর কবিতা ছিল। আমি তাঁকে পরামর্শ দিলাম একটি দুটি করে কবিতা সত্যজিৎ রায়ের 'সন্দেশ' পত্রিকায় পাঠিয়ে দিতে। কিছুদিন বাদে হাসি মুখে আমাকে তিনি জানালেন পূজা সংখ্যা 'সন্দেশ'-এ তাঁর কবিতা ছাপা হবে। তারপর প্রায়ই তাঁর কবিতা 'সন্দেশ'-এ ছাপা হতে লাগল। একদিন তিনি দ্য স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার ক্যালকাটা নোটবুক থেকে একটি বিচিত্র বিবরণ পড়ে শোনালেন। একটি বালিকা বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীতে চৌত্রিশটি ছাত্রী পড়ে। তিনতলার খোলা জানালা দিয়ে শেষ বেঞ্চে বসে থাকা একটি মেয়ে পাঁউরুটি বা কলা পিছনের গাছের দিকে ছুঁড়ে দিত। সেই গাছের ডালে অপেক্ষা করত একটি বাঁদর। মেয়েটির প্রদত্ত উপহার সে সাগ্রহে লুফে নিত। মেয়েটির সঙ্গে বাঁদরটির একটা সখ্য জন্মে গিয়েছে দেখে ক্লাসের অন্য মেয়েরা তাকেও একটি রোল নম্বর দিল। বাঁদরটিকে তারা রোল নাম্বার থার্টি ফাইভ বলে চিহ্নিত করে দিল। এখন হয়েছে কি মেয়েটি অঙ্কে বড়ই কাঁচা। হোমটাস্কেও ফাঁকি দিত। ওদিকে গণিতের দিদিমণি খুবই কড়া এবং রুক্ষ স্বভাবা। ক্লাসে কারো গলতি দেখলে তিনি কঠিন বকাবকা তো করতেনই সে রকম ক্ষেত্রে ফাঁকিবাজ ছাত্রীটির বিনুনি ধরে দুচার ঘা দিয়েও দিতেন। সেদিন তাঁর রোষ গিয়ে পড়ল লাস্ট বেঞ্চের চৌত্রিশ নম্বর বালিকাটির উপর। আজও হোমটাস্ক আনো নি? আর সহ্য হল না চেয়ার ছেড়ে প্লাটফর্ম থেকে নেমে এসে ছাত্রীটির চুলের মুঠি ধরলেন। হঠাৎ হৈ হৈ কাণ্ড। খোলা জানলা দিয়ে অদূর বৃক্ষস্থিত সেই বাঁদর ঘরে লাফিয়ে পড়ে দিদিমণিকে দুই চড়। দিদিমণি আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেলেন। ক্লাসের অন্য ছাত্রীদের ভয়মিশ্র কলরব শুনে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ছুটে এলেন। কী হয়েছে? সমস্বরে ছাত্রীরা জানাল, রোলনম্বর থার্টি ফাইভ অঙ্ক দিদিমণিকে চড় মেরেছে। সে আবার কে? ছাত্রীরা অদূরস্থিত গাছের ডালে উপবিষ্ট বাঁদরটিকে দেখিয়ে দিল। এ ঘটনার উপসংহার কী আমি জানি না। তবে এ কথা ঠিক অঙ্ক দিদিমণি এর পরে আর কাউকে প্রহার করেন নি। সে যাই হোক অশোক মুখোপাধ্যায় এই কাহিনী নিয়ে একটি অতীব উপভোগ্য নাতি হ্রস্ব কবিতা লিখে ফেলেছিলেন—আমার যতদূর মনে পড়ছে 'সন্দেশ' এটা ছাপিয়েছিল। এবার আমরা বন্ধুরা পরামর্শ দিলাম—অশোকবাবু একটা বই করে ফেলুন। একটি মনোজ্ঞ কবিতার বই বেরিয়েছিল। আমি একটি সম্ভ্রান্ত লিট্‌ল ম্যাগাজিনে অনন্তকুমারের অনুরোধে বইটির মূল্যায়ন করেছিলাম। লেখক খুসি হয়েছিলেন।

সান্ধ্যবিভাগের দুজন অধ্যাপককে ভুলতে পারি না। একজন বলাই সেন ও অপরজন অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম জন হিসাবশাস্ত্রের অধ্যাপক—দ্বিতীয় জন রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির অধ্যাপক। দুজনেই চিরকুমার। শান্ত গাম্ভীর্যে তাঁরা সমুদয় ছাত্র সমাজের ও সহযোগী শিক্ষকদের সম্মান আকর্ষণ করেছেন বরাবর। দিনের বেলা ছিলেন তরুণ গল্পলেখক সুবন্ধু ভট্টাচার্য। এঁর সঙ্গে আমার প্রায়ই মতভেদ ঘটত সদ্য প্রকাশিত কোনো গল্প প্রসঙ্গে। অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন গল্পবিচারে। কিছুতেই নিজের কোট ছাড়বেন না। তবে মতভেদ ঘটলেও মনান্তর হয়নি কখনো। ভোর সাড়ে ছটায় মহিলা কলেজের প্রথম পাঠ শুরু হত আর দিনের শেষে রাত্রি সাড়ে নটায় কলেজের বিদ্যাদান সমাপ্ত হ'ত—এক এক করে ঘরগুলোর আলো নিভছে, সশব্দে দরজাগুলি বন্ধ হচ্ছে—শূন্য কলেজ ভবন যেন বলছে আবার কালকে। এর মধ্যে এল বাহাত্তরের সেই দুঃসহ দুর্বিবহ দিনগুলি। যাদবপুর ক্যাম্পাসে সেই ভয়াবহ ও শোকাবহ ঘটনার পর সকলেই সর্বত্র একটু ত্রস্ত। কার পরামর্শে জানি না আমাদের তৎকালীন অধ্যক্ষ গোপালদাস রায় মহাশয় একজন কুকরিধারী নেপালী দেহরক্ষী নিয়ে ঘুরতে লাগলেন। আমার চোখে দৃশ্যটা খুবই কটু লাগল। আমি একদিন রায় মশাইকে বলেই ফেললাম, ওই কুকরিধারী শুধু একটা হাস্যকর দৃশ্যের অবতারণা করেছে—ওকে পত্রপাঠ বিদায় দিন। আমি কিন্তু মোটেই বীরপুরুষ ছিলাম না। একদিনের ঘটনা বলবার লোভ সামলাতে পারছি না। একদিন মাঘে মেঘে আচ্ছন্ন বিকেলে ক্লাস শেষ করে সাম্মানিক ছাত্রদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি তিনতলার সুদীর্ঘ করিডোর একেবারে ফাঁকা। যতগুলি ঘর কেউ সেখানে নেই। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। রেলিঙ দিয়ে তাকিয়ে দেখি নিচে কলেজের বিশাল উঠানটিও জনহীন। করিডোরে শেষে ডানদিকে নিচে নামবার সিঁড়ি। আমি দেখছি দূর থেকে সেই সিঁড়ির মুখে এক যুবক দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন কারো জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। তারপর দেখি নিচে আমার দিকেই হাঁটতে শুরু করেছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখি প্যান্টের দুটো পা গুটিয়ে রেখেছে—পায়ে টায়ারের চটি। একটা নস্য রঙের চাদর গায়ে মুড়ি দেওয়া—হাত দুটো চাদরের মধ্যে ঢোকানো। উসকো খুসকো চুল, না দাড়ি কামানো মুখে কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। বুকটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠল। ভাবলাম হয়ে গেল। ভাবলাম ফেলে আসা ক্লাসরুমটায় ফিরে যাই। তারপরে ভাবলাম সেটা কেমন হয়। এদিকে ছেলেটি এগিয়ে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল—আপনার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি। বিশুষ্কতম কণ্ঠে বললাম—হ্যাঁ, বল কী বলবে। আর একবার নিচের উঠোনের দিকে তাকালাম—না কোথাও কোনো ভরসা নেই। চাদরের মধ্যে ছেলেটির ডান হাত একবার খসখস করে উঠল—তাহলে ছোরা বার করছে। ছেলেটি ভ্যাক করে কেঁদে ফেলল। আমার সামনে মেলে ধরল একটি কাগজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলের মার্কশিট। বাংলার নম্বরটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। একশর মধ্যে সতের পেয়েছে। মুহূর্তে আমার মাস্টারি মেজাজ ফিরে এল। তিরস্কার করতে করতে জিজ্ঞাসা করলাম—তা কী করতে চাও তুমি? সে বলল কম্পার্টমেন্টাল দিতে চায়। অত শীতেও তখন আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ছে—

রঙ্গভূতে সর্পভ্রম আর কাকে বলে। পরের দিন আমি আর কাউকে নয়, তৎকালীন অধ্যক্ষ গোপালদাস রায় মহাশয়কে গল্পটি বললাম। তিনি খুব হাসলেন—কেননা সেদিন তাঁর সঙ্গে কুকরিধারী প্রহরী নেপালীটি আর ছিল না। তাকে তিনি বিদায় করেই দিয়েছেন।

এইভাবে কলেজের দিনগুলি কাটছে। এক বসন্ত মিশে যায় আরেক বসন্তে। তিনতলায় পড়াতে পড়াতে দেখি কলেজের উঠানে কৃষ্ণচূড়া গাছ প্রতি বছর চৈত্র ঘোষণা করে চলেছে তার সমস্ত রক্তৈশ্বর্য দিয়ে—কলেজের বাইরে মাদার গাছে—এখন আর গাছটি আছে কিনা জানি না, বছরে বছরে একই সময়ে ফুল ফোটাচ্ছে। প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক হয়ে কলেজে প্রবেশ করছেন। বেরিয়ে যাওয়া ছাত্ররা কেউ মিলিটারি অফিসার, কেউবা কোর্টের জজ। যারা যাতায়াতী অধ্যাপক নন তাঁরা এখানেই বাসা করে থাকেন। আমি তখন যে পাড়ায় থাকতাম সেই পাড়ায় দেখতে দেখতে ছজন অধ্যাপক বাসা বাঁধলেন। কলেজের ছাত্ররা শান্তিনিকেতনের অনুকরণে পাড়াটির নামকরণ করল গুরুপল্লী। বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক, জীববিদ্যার অধ্যাপক, বাংলার অধ্যাপক, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, অর্থনীতির অধ্যাপক জড়ো হলেন কাঁটালপাড়ায়। সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই আমার বৈঠকখানার একটা পুরানো বড়ো তক্তাপোষের উপর ছেঁড়া সতরঞ্চির উপর আড্ডা দিতে বসে যেতেন। যে আড্ডায় কলেজের কথা কমই আলোচিত হত। প্রায়ই হাজির হত সমরেশ। সে এলে মজলিস সরগরম হয়ে উঠত। সমরেশের সঙ্গে কলেজের সম্পর্কটা নিবিড় হয়েছিল এর আগেই। আমরা মাস্টারমশাইরা উপাধ্যক্ষ গোপালবাবুর নেতৃত্বে নেমে পড়েছিলাম বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' অভিনয়ে। নারী চরিত্রের বড়ই অভাব। হেনরিয়েটার ভূমিকায় কাকে পাওয়া যাবে। আমি জানতাম সমরেশ কিশোর বয়সে নারী চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে খুব নাম করেছিল। গোপালবাবুর কানে কথাটি তুলে দিলাম। গোপালবাবু সমরেশকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন—ভাই বাঁচাও। সমরেশ 'না' 'না' করতে করতে নেমে পড়ল। চমৎকার মানিয়েছিল তাকে, চমৎকার অভিনয় করেছিল সে। অধ্যাপকদের অভিনয় তার সঙ্গে সাহিত্যিক সমরেশ বসুও যোগ দিয়েছেন—প্রশস্ত হল ঘরে তিলধারণের স্থান ছিল না। এর পরে অসুবিধা এড়ানোর জন্য নারী ভূমিকা বর্জিত রবীন্দ্রনাথের একটি প্রহসন মঞ্চস্থ করেছিলাম আমরা—'বৈকুণ্ঠের খাতা'। এই বইটি একাধিক বার একাধিক ক্ষেত্রে আমরা মঞ্চস্থ করেছিলাম। গোপালবাবু দশাসই মানুষ তিনিই বৈকুণ্ঠ—কলেজ থেকে ছেলে মেয়েদের বিরাট পৃথুলাকৃতি Result book তথা ফলাফলের খাতাটি নিয়ে গোপালবাবু রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করা মাত্রই প্রেক্ষাগৃহ কলহাস্য মুখরিত হয়ে উঠত। হাসি থামত একেবারে শেষে যখন অবিনাশ (সত্যজিৎ চৌধুরী) কর্তৃক বিপিন (অর্থাৎ আমি) বৈকুণ্ঠ ভবন থেকে বিতাড়িত হতাম এবং কেদার ( শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) তখনো একখানি সেকেন্ড ক্লাস গাড়ির বায়না ধরতেন। ভাল দেখে সেকেন্ড ক্লাস গাড়ি!

কলেজের দৌলতে শহরের এই দিকটা পাল্টে যাচ্ছে। আগে যখন দেশবিভাগ হয়নি তখন এদিকটা ছিল গ্রামভাবাক্রান্ত। ছোটবেলায় বৃক্ষবহুল সেই গ্রামাঞ্চলে আমরা 'চিলকো টিলো' খেলা খেলতাম। ঘন জনবসতির মধ্যে এ খেলা সম্ভব নয়। এখনকার পাঠকেরা

'চিলকো টিলো' খেলা কী অ বুঝতে পারবেন না। উপকরণ কিছু লাগে না—লাগে শুধু দুদল ছেলে। দুই দলে ভাগ হয়ে এক দল হত পলাতক। সেই পলাতক দলটিকে ধরবার জন্য দ্বিতীয় দলটি খুঁজতে ছুটত। পলায়মান দলটি মাঝে মাঝে হদিস জানানোর জন্য একসঙ্গে ডাক ছাড়ত 'চিলকো টিলো'। একসঙ্গে ডাকটা ছেড়েই দ্রুত তারা স্থান পরিবর্তন করত। সেই ডাকের সঙ্কেত শুনে সন্ধানী দ্বিতীয় দলটি ছুটতে থাকত। বলা বাহুল্য জনবহুল অঞ্চলে এ খেলা সম্ভব ছিল না। নির্জন দুপুরে গাছপালার আড়াল আবডাল থাকলে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে এ খেলা চলত। আগে থেকেই দুই দলে বোঝাপড়া থাকত কোন সীমার মধ্যে খেলাটি হবে। সেই সীমা ভাঙা চলত না। কোনো দলই কোথাও দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। দুই দলই ছুটত। একদল অপর দলের যে-কোনো কাউকে দেখতে পেলেই সেই দল ধরা পড়ে গেছে বলে মেনে নেওয়া হত। সাধারণত শীতের দুপুরেই এই খেলাটি পাতা হত। দেশ বিভাগের পর উদ্বাস্তু আগমনের পরে ও কলেজের ছাত্রছাত্রীর দল বাড়তে থাকায় খেলাটি উঠে গেল। এখনকার ছেলেরা এ খেলার নামও জানে না। তাদের বাবারাও জানেন না। আমার বয়সী বৃদ্ধেরা—যদি তাঁরা এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা হন তাহলে তাঁরা কেউ কেউ মনে করতে পারেন। কোনো বিনিদ্র রাতে আজও যেন শুনতে পাই 'চিলকো টিলো'। পলাতকরা পলাতকই থেকে গেল, আর তাদের ধরা যাবে না।

এদিকটা পাল্টাচ্ছে—পাল্টাচ্ছে, দ্রুত পাল্টাচ্ছে। এই তো সেদিনও এদিকটা যখন কিছুটা জঙ্গল ছিল শীতের শেষে বসন্তের মাঝামাঝি সময়ে নদীর ওপার থেকে দূর গ্রামাঞ্চল থেকে আসত সার বেঁধে তির ধনুক নিয়ে আদিবাসী মানুষেরা। এই শহরের পূর্ব দিকে কোথাও তারা শিকার খেলতে যেত। এ বুঝি তাদের বাৎসরিক অবশ্যকৃত্যের মধ্যে পড়ে। কয়েক দিন বাদে তারা আবার দল বেঁধে সারিবদ্ধ হয়ে ফিরে যেত। কোথায় তারা যেত, কী তারা শিকার করত জানি না। এই শহরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্থাপনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা তারা করত না। ফিরে যেত যখন তখন তাদের কারো কারো কাঁধে থাকত নিহত পশুর শব। মনে পড়ে যেত মৃগয়ান্তে কালকেতুর কুটিরের প্রত্যাবর্তন। অনেক দিন হল তারা আর আসে না। উঠে গেল নৈহাটির যাত্রী আশ্রমগুলি। যখন দেশভাগ হয়নি তখন পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের কাছে নৈহাটির একটা আলাদা গুরুত্ব ছিল। এখানকার রেলওয়ে স্টেশন থেকে পশ্চিমমুখো বড় রাস্তাটি ধরে কয়েক মিনিট হাঁটলেই নৈহাটির প্রধান গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে যাওয়া যায়। অর্ধোদয় যোগে গ্রহণে বা এই রকম কোনো তিথিতে পূর্ববঙ্গ থেকে ট্রেনে করে চলে আসতে পুণ্যার্থীরা। সকালবেলার ঢাকা মেল, গোয়ালন্দ প্যাসেঞ্জার বা এই জাতীয় কোনো ট্রেনে এসে পুণ্যার্থীরা আমাদের ইস্টিশনে নেমে পড়তেন। ধুলোপায়ে আগে তাঁরা গঙ্গাস্নান সারতেন। কেউ কেউ সযত্নে রক্ষিত পূর্বপুরুষের চিতাভস্ম গঙ্গায় বিসর্জন দিতেন। তারপর তাঁরা খুঁজে নিতেন একটি পূর্ববঙ্গ যাত্রীনিবাস। যাঁদের অর্থ আছে, অভিপ্রায় আছে তাঁরা এরপর চলে যেতেন কলকাতায় কালীঘাট বা চিড়িয়াখানার উদ্দেশে। তা নইলে রাত্রের আপ ট্রেন ধরে তাঁরা আবার ফিরে যেতেন স্বভূমিতে। দেশভাগের পর অনর্গল পূর্ববঙ্গের মানুষ আসতে লাগল এদেশে। যাত্রীনিবাসগুলির

প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। আর তো তাঁরা চলেই এসেছেন—ফিরে যাবার প্রশ্ন তো আর নেই।

বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে এখানকার পুরানো প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যেতে লাগল। বসতবাড়ির তাগিদে কত বড়ো বড়ো গাছ কাটা পড়ল। পাখপাখালির ডাক কমে যেতে থাকল। চাঁদনি রাতে ডেকে বেড়াত যে পিউ কাঁহা পাখি সে কবে যেন হারিয়ে গেল। মহরমের মিছিল আস্তে আস্তে জুলুস হারিয়ে ফেলল। আগে আগে সন্ধ্যা হলে কাছাকাছি কোথাও শিয়াল ডাকত। অট্টালিকা বহুল গঞ্জ শহরে তারা কেউ কোথাও নেই।

'বাংলা কবিতায় পুরানো রোমান্টিক পালা শেষ হয়ে গেল। এখন আর কেউ লিখবেন না 'নীরব রাত নীরব দিন নীরবে মোর কাটে, হে মেঘলতা বুঝেছ মোরে ভুল'। কে লিখেছিলেন জানি না। 'হায়রে খেয়ালী দিন ভিক্ষুর কান্নার স্বপ্ন' কবির নামও জানি না, কবিতার নামও জানি না।—এই কবিতাতেই পরের দুটি পংক্তি প্রায় বিস্মৃতির অন্ধকারে চকিত আলো ছড়ায়—'আমাদের রক্ত যে বন্যার মেঘে মেঘে মেঘলা/আমাদের রক্তে যে কনকচাঁপার ঘন গন্ধ'। ইনি কি পরে আর কবিতা লিখেছিলেন? জানি না। কে লিখেছিলেন এই অপরূপ পংক্তি দুটি 'ক্লান্ত নিষেধ সেদিন তোমার মুখে ছিল/আসন্ন সেই ধূলিঝড়ে ঘেরা বৈশাখে।' কোনো চিহ্ন মাত্র রাখেন নি একজন কবি 'বিজন ঘরে লাজাঞ্জলি সঁপিয়া দিয়াছিলে/লজ্জারুণ মুখে/মনে কি পড়ে, পড়ে কি মনে'। 'ছায়া হয়ে গেছ বলে তোমাকে এমন অসম্ভ্রম'—এবার যেন মনে হয় একটু একটু চিনি। মাসিক বসুমতী পত্রিকায় বের হয়েছিল একটি কবিতা—কলকাতার দায়িত্বহীন প্রমত্ত প্রগলভতার বর্ণনার পরেই বলা হয়েছিল 'ওদিকে আন্দামানে/সিন্ধুর তীরে সন্ধ্যা ঘনায় দগ্ধ দিবাবসানে।' এবার যে পংক্তি দুটি বলছি তার রচয়িতাকে বোধ হয় চিনি, কিন্তু আন্দাজে নাম বলছি না, যদি ভুল হয়। পংক্তি দুটি হল 'তাকলা মাকান মরুতে উড়েছে রুপালি বালু/কাদের সোনালি চুল উড়ে হল ঝড়ের শিখা'। আরেকটি কবিতার দুটি পংক্তি সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে 'মরেনি কিন্তু কপিলাবস্তু মারণ যন্ত্র কলে/ বেথেলহেমের তারা আছে উজ্জ্বল।' কিন্তু আস্তে আস্তে এসব কবিতার দিন শেষ হয়ে এল। দেশ বিভাগের পর তো বিশেষ করে বিষ্ণু দে-র 'জলদাও' কবিতায় ঘরছাড়া মানুষ কলকাতার শান বাঁধানো পথে অসহায় হয়ে দিশাহারা। বিষ্ণু দে-র একটি কবিতায় কলকাতার পথের মোড়ে উদভ্রান্ত বৃদ্ধের মধ্যে ফুটে উঠতে চাইল রাজ্যহারা লিয়রের রূপক। নরেন্দ্রনাথ মিত্র লিখলেন তাঁর বিখ্যাত গল্প 'পালঙ্ক'। সমরেশ কিন্তু ভুলে যায়নি তাঁর মূলকে। প্রথম দিকে সে লিখল 'সওদাগর'। তার পরে, অনেক পরে লিখল 'খণ্ডিতা'। অসামান্য উপন্যাস। তবু সমগ্রভাবে বলব এ অভিযোগ আমার যায় না যে এমন একটা মর্মান্তিক জাতীয় বিপর্যয় নিয়ে কোনো মহৎ উপন্যাস লেখা হল না। একজন কিন্তু পারতেন। তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসের শেষ খণ্ড 'প্রতিবেশী' পাঠের পরে এই প্রতীতি আমার জন্মেছিল যে গৌরকিশোর ঘোষের হৃদয়ে দেশবিভাগের বেদনা গভীরে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল। আয়ুষ্কাল অনুমতি দিলে এ কাজ গৌরকিশোরেরই করার কথা ছিল। সে সংকল্পও তাঁর ছিল। কিন্তু মৃত্যু এসে সে সংকল্প খণ্ডিত করে দিল। একটা

প্রশ্ন খুব কুণ্ঠিত চিত্তে করছি এদিকের প্রধান লেখকেরা না হয় দেশবিভাগের প্রত্যক্ষ যন্ত্রণার দ্বারা স্পৃষ্ট ছিলেন না। তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণ মানিক বনফুল সতীনাথ কমবেশি সকলকে ধরেই আমি বলছি। পূর্ববাংলার মাটির সঙ্গেও তাঁদের নাড়ীর যোগ ছিল না বললেই হয়। কিন্তু ঢাকার ছেলে বুদ্ধদেব বসু বা বরিশালের ছেলে জীবনানন্দ? তাঁদের লেখায় অতীতবিধুরতার ছায়া যদি বা মেলে, আমি যে কথাটা বলছি সে কথাটা নেই। জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'-য় এ পারের অভিজ্ঞতায় ক্রমশই মন হতে থাকে একটা মনকেমনিয়া ভাব। কিন্তু আমার বক্তব্য তো তা নয়। নতুন যে লেখকের দল উঠলেন তাঁরা এদিকের ঘাত প্রতিঘাত, মধ্যবিত্তের পতন ও অবক্ষয়ের মোকাবিলা করতে ব্যস্ত হলেন। নতুন ইহুদীদের কখনো-কখনো ভেসে উঠেছে বটে, কিন্তু সে ভেসে ওঠাই মাত্র।

'দিন চলে যায় যেন বা স্রোতের জল'। আমি আস্তে আস্তে চাকুরিজীবনের নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে চলেছি। একটি ঘটনা আমার জীবনে ঘটল তা বড় শোকাবহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কালে আমি তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে রয়েছি একটি ঘরে। দেখলাম শেষ বেঞ্চে বসে একটি ছাত্র বই খুলে নকল করে চলেছে। তার পাশে বসে একটি ছাত্র বিমূঢ় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমার এই ছাত্রটি তার পাণ্ডিত্যের জন্য দেশে বিদেশে খ্যাতিমান হয়েছিল। আমি অপরাধী ছাত্রটিকে সতর্ক করে দিলাম। তা সত্ত্বেও আমাকে উপেক্ষা করে সে নকল করে যেতেই লাগল। আর উপায়ান্তর নেই। আমি খাতা কেড়ে নিয়ে তাকে পরীক্ষা কক্ষ থেকে তাড়িয়ে দিলাম। সে কালবিলম্ব না করে আমাদের কলেজের সামনে রেললাইনে গলা দিল। আত্মঘাতীর শেষ চিরকুটে সে লিখে রেখে গেছে—'ভুল মানুষেরই হয়, ক্ষমা করে দেবতায়'। পরে অবশ্য আমি শুনেছিলাম তার ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস। কিন্তু আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারিনি। আজও পারি না।

'ধূলির আখর' লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে এ কথা ভাবি কেন আমি এ লেখা লিখছি। আমার জীবনেতিহাসের গুরুত্ব কী এবং কার কাছে—আত্মকথাই বা কেন? আমার এ লেখা আসলে আমার নিজের সঙ্গে আলাপচারি। স্মরণের পথ বেয়ে হাঁটা চলা করতে করতে এ আমার নিজের সঙ্গেই ডায়ালগ। পাঠক যাঁরা আছেন তাঁরা কেউই এ লেখা পড়ে কখনো 'গদগদ গোদাবরী' (কথাটি আমি বিভূতিভূষণের কাছ থেকে শিখেছি) হবেন এ দুরাশা আমি করি না। প্রশ্ন করতে পারেন আত্মোন্মোচনের জন্য। কতকগুলি ব্যাপার আমার কাছে অব্যাখ্যেয় থেকে গেল। তিনটি মৃত্যু তাদের অন্যতম। চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য, সমরেশ বসু এবং অনন্তকুমার চক্রবর্তী—যে তিনজন ব্যক্তি আমার জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধেই আমার তিনটি জিজ্ঞাসার আমি কোনো উত্তর পেলাম না। চন্দ্রশেখরের স্বেচ্ছামৃত্যুর কয়েক দিন বাদেই খবর পাওয়া গেল বরোদার রাজকীয় গ্রন্থাগারের দায়িত্বশীল সহগ্রন্থাগারিকের পদ চন্দ্রশেখর পেয়েছেন। তিনি যদি আর একটু অপেক্ষা করতেন, আর একটু তাহলেই তাঁর সেন্‌স্ অফ ফ্রাসট্রেশন কেটে যেত। কেন তিনি অপেক্ষা করলেন না? সমরেশ উনিশশো অষ্টআশী সালের মার্চ মাসে মারা গেলেন। সমরেশ এর আগেই হৃদযন্ত্রের অসুখে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তারপরে তাঁকে লিপ্ত হতে

হল রামকিঙ্কর জীবনী সম্পূর্ণ করার প্রাণাতিপাতী কঠিন শ্রমে। রামকিঙ্কর কাহিনী শুরু করতে সমরেশ অত দেরি করল কেন? অনন্তকুমার সেই রাজনৈতিক ভূমিকা পরিহার করলেন, কেন তার আগেই তিনি বুঝলেন না তাঁর স্বভূমি অকর্ষিত পড়ে থাকছে। যখন বুঝলেন তখন দেরি হয়ে গেছে। মৃত্যুর আগে সমরেশ অনুপ্রাণিতের মতো ছুটোছুটি করেছেন। ভারতবর্ষের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন তাঁর বিষয়ের সূত্র। কিছুতেই যেন তাঁর শান্তি নেই। ক্লান্তিহীন অন্বেষায় মৃত্যু এসে যবনিকা ফেলে দিল। নার্সিংহোমে শেষ শয্যায় যখন চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে আসছে তখনো অস্পষ্ট স্বরে তিনি বলে উঠেছেন 'রামকিঙ্কর' 'রামকিঙ্কর'। অনন্তকুমার রোগযন্ত্রণা ভুলে অথবা সহ্য করে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন তাঁর সংগীত সরস্বতীর আরাধনায়। আমি আমার একটা লেখার ফাইল কপি ওঁকে দিতে গিয়ে দেখি অবস্থা আগের রাত্রি থেকে শোচনীয় হয়ে উঠেছে। দুটো ফুসফুসের কোনোটাই আর কাজ করছে না। বেতারে তখন তারের যন্ত্রে কোনো উচ্চাঙ্গ রাগিণী বেজে চলেছে। আমাকে দেখে সেই অবস্থাতেও ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'দেখেছেন ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিকে ক্লাসিকাল সুর কীরকম ফোটে।' নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হল। তখনো তাঁর রসিকতা দুর্মর। সেখানকার খাবার দেখে বললেন, 'প্লেটটা ভাল, খাবারটা প্যালেটেবল নয়।' দুহাজার দুয়ের দোসরা ফেব্রুয়ারি অনন্তকুমার মারা গেলেন। আমাদের একটা দিক অন্ধকার হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত বোধহয় এটাই কথা 'অসমাপ্ত পরিচয় অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি'। ভণ্ডুলমামার বাড়ির মতো আমাদের বাড়ি আর শেষ হয় না। শেষ পর্যন্ত সকল প্রয়াসই পড়ে থাকে কায়াহীন উদ্দেশ্যহীন। তবু এর মধ্যে সান্ত্বনা একটা থাকেই, চেষ্টা তো করেছিলাম। তার দামই বা কম কী।

# উন্নয়ন যখন স্লোগান

সৌরীন ভট্টাচার্য

পুঁজির গতি সূক্ষ্ম অতি
তাকে চালায় পুঁজির পতি।
মার্ক্স নেই তো বুঝবে কে তা
আজকে সবার অন্য কেতা।।

সেদিন বাসববাবুর কথা রাখতে পারিনি। *পরিচয়*-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শতবর্ষপূর্তি সংখ্যায় আমার লেখা হয়নি। বলেছিলাম, রাগ করবেন না। বলেছিলেন, করব না একটা শর্তে। এর পরে যখনই লেখা দরকার হবে দিতে হবে। বাসববাবু আর কথা রাখার সময় দেননি। তাই এবারের অনুরোধ সত্যি বলতে আমার সুযোগ। কথা রাখার চেষ্টাতেও আমি কোনো ত্রুটি করিনি। কিন্তু সমস্যা হয়েছে অন্যত্র। যা নিয়ে লিখতে হবে এবার সেটা ইতিমধ্যে এত কচলানো হয়ে গেছে যে সেখানে আর কিছু বলাই মুশকিল। জানি তবুও আমাদের অনেক ধন্দ কাটছে না, কাটবার নয়। এসবের একটা আন্দাজ পাওয়া নিজেদের কথাবার্তায়। সিঙ্গুর কাণ্ডের শুরু থেকে তো বটেই, তার কিছুটা আগে থেকেও চলছিল নানা কথা। তবে জানুয়ারি মাসের নন্দীগ্রাম কাণ্ডের পরে আলোচনার পর্দা চড়ে। আর ১৪ মার্চ, নন্দীগ্রাম। তারপরে কথাবার্তার ধরণধারণ ও অন্য অনেক কিছুর চেহারা রীতিমতো বদলে যায়। সম্ভবত সেই পর্বই এখনো চলছে। অন্তত আমার ব্যক্তি অভিজ্ঞতা তাই বলে। আমাদের ক্ষোভ আক্ষেপ আপত্তি বিরোধ সবই ঘুরেফিরে কয়েকটা নির্দিষ্ট প্রসঙ্গকেই ছুঁয়েছুঁয়ে যেন থাকছে। আমি ঠিক চলতি রাজনীতির বয়ানের কথা বলছি না। তার বাইরের কথাবার্তা। সেরকম নানা কথা কিন্তু হচ্ছে নানা জায়গায়। আমরা সেসব শোনার জন্য নিজেদের ঠিক গুছিয়ে নিতে পারছি না সব সময়। এসব অনেক কথার চেহারা কোনো অর্থেই ঠিক আনুষ্ঠানিক নয়। এটাই এক অর্থে আমাদের প্রথম অসুবিধা। আমরা এক ধরণের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে না পেলে কথাগুলো ঠিক শুনতে পাই না। ওটা আমাদের চালু অভ্যাস, চালু সংস্কার। আমরা মন্ত্রীদের কথা, রাজনীতিকদের কথা, মিডিয়ার কথা, পণ্ডিত মানুষদের কথা সবই মোটামুটি শুনতে পাই, শুনতে শিখেছি। কিন্তু আরো কথা আছে। সেসব তেমন করে শুনতে শিখিনি।

ওই ১৪ মার্চের ঠিক পরে কোনো একদিন। তখন সবাই খুব তপ্ত। সন্ধ্যাবেলার গড়িয়ার মোড়। যাঁরা জানেন তাঁরা বুঝবেন। গাড়ি আর লোক আর দোকান আর হকার, কে কোথা দিয়ে যাবে, কোথা দিয়ে হাঁটবে, কোথায় দাঁড়াবে, কোথায় কেনাকাটা করবে। সে একটা ব্যাপার বটে। ওরই মধ্যে দেখা চেনা লোক। চেনা, কিন্তু এমন নয় যে নিয়মিত

দেখাশোনা হয়, এমনও নয় যে দেখা হলেই সবসময়ে সাধারণ সৌজন্য ও কুশল বিনিময়ের বাইরেও অনেক কথা হয়। আবার কখনো তা হয় না তাও নয়। ঠিক আমাদের বন্ধুবৃত্তের কেউ নন তিনি। তা ওই যে দেখা সেদিন, তিনি কথা বলার জন্যই দাঁড়িয়ে গেলেন। ইনি কিন্তু আদৌ রাজনীতি করা মানুষ নন। তা বলে যাকে নিতান্ত হাপোষা বলে তাও নন। পাঁচটা ব্যাপারে আগ্রহ আছে। মতামত আছে। সেসব মতামতের মধ্যে সবারই যেমন নানা রকমের ঝোঁক টের পাওয়া যায় ওঁর বেলাতেও তা যায়। কিন্তু আমি এঁর কথা নিয়ে কিছু বলতে চাচ্ছি না এখন। তা আমরা ওই ভিড়ভাট্টার মধ্যেই একটু ধার বেছে নিয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছি। আমাদের পাশেই ওই যে স্ট্যান্ডে ঝোলানো জামাকাপড়ের পসরা বসে আজকাল সেরকম একটা স্ট্যান্ড। কথা বলতে বলতে লক্ষ করলাম যে-ছেলেটি জামাকাপড় নিয়ে বসেছে সে একটু কান পেতে আমাদের কথা শুনছে। আমিও কথা বলছি আর ওর দিকেও একটু খেয়াল করছি। অল্প পরেই ছেলেটি বেশ সহজভাবে আমাদের কথায় জড়িয়ে গেল। এমন নয় যে সে ভয়ানকভাবে উত্তেজিত। সে স্বাভাবিকভাবে আমাদের কথায় যোগ দিয়ে নিজের অবস্থানের প্রকাশ কিন্তু ঘটাল। গুলি চালানোর তার আপত্তি আছে। জমির প্রয়োজন হতেই পারে। তার অন্য কোনো ব্যবস্থা করা উচিত এবং তা, সে মনে করে, করা সম্ভব। ইত্যাদি। এখানে আমি কারো মতামতের কথায় জোর দিচ্ছে না। আমি বলতে চাই এরকম অনেক কথা আমাদের চারপাশে আছে। এসব কথা শুকিয়ে যেতে দিলে আমাদের সমাজবৃত্তের জীবনটাকেই খানিকটা নির্জীব করে তোলা হবে। এরকম কথাবার্তা চায়ের দোকানের আড্ডায় আছে, বাসে ট্রামে অটোতে আছে। আছে আরো নানান কোনায় খাঁজড়ে। আমাদের আনুষ্ঠানিকতার সংস্কারে আমরা সেসব প্রায়শ এড়িয়ে যাই।

গড়িয়ার মোড়ের যুবকের কথা থেকে একটা কথা খেয়ালে এল আমার। আমরা বন্ধুদের সঙ্গে, অন্য পরিচিতদের সঙ্গে যেভাবে যে-উদ্বেগে কথা বলছি ওই যুবকের কথাতেও তার রেশ বেশ পাওয়া গেল। কিন্তু একটা বড়ো তফাত লক্ষ না করে উপায় নেই। আমাদের বন্ধুবৃত্তে রাষ্ট্রলগ্ন সরকারি বামপন্থীদের এই হাল, এতে আমাদের অনেকের বড্ড হাহুতাশ। বিশেষ করে যাঁরা নিজেরা কখনো সেই রাজনীতির শরিক ছিলেন তাঁদের মধ্যে হয়তো সংগত কারণেই এই ক্ষোভ আক্ষেপ অনেক বেশি। শরিক ছিলেন বলে যাঁদের বলছি তাঁরা যে সব সময়ে ঠিক প্রত্যক্ষ রাজনীতির কাজেকর্মে জড়িয়ে ছিলেন তাও হয়তো নয়। মনে মনে কিংবা চিন্তায় আবেগে বা সচেতন রাজনৈতিক আদর্শ নির্বাচনে যাঁরা নিজেদের বামপন্থী রাজনীতির বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেছেন কখনো, তাঁদের অনেকের বেলায় এই সমস্যা খুব বাস্তব। এর মধ্যে খুব অস্বাভাবিক কিছু নেই। বরঞ্চ এর মধ্যে এক ধরনের আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় নিশ্চয় আছে। কিন্তু এই হাহুতাশ, আবার হয়তো সংগত কারণেই, ওই যুবকের কথাবার্তায় ছিল না। ধরে নেওয়া যায় সে হয়তো কোনো রাজনীতিতেই নিজেকে জড়ায়নি কখনো। প্রত্যক্ষ জড়ানোর কথা বলছি। আর বয়সের বিচারে ওই যুবক আমাদের বন্ধুবৃত্তের মতো বামপন্থার আগের পর্ব দেখার সুযোগ

পারেনি। এসবই আমার অনুমান। পথের ধারের খুচরো কথায় অত তো জানা যায় না। কিন্তু তাহলে এই যে আমাদের এত ধিক্কার, তা কি অনেকটাই তাহলে শুধু আত্মধিক্কার? হয়তো। কিন্তু কেন? সমস্যা কি শুধুই আদর্শচ্যুতির? এ কি কেবল বামপন্থার বিপথগামিতার গল্প? না কি আমাদের আত্মমগ্নতার অনেকদিনের অনেক কিছু চোখের পরে ঘটতে দেখেও আমরা ঠিকমতো হিসাব মেলাতে চাইনি, না পারিনি। কে জানে। আমরা অনেকেই কি বামপন্থার ত্রুটিবিচ্যুতি ও আদর্শগত দুর্বলতা নিয়ে বেশি মেতে ছিলাম। না কি নিতান্ত রাষ্ট্র মত্ততাতেই আত্মহারা ছিলাম। পুঁজির শক্তি সঞ্চয়ের দিকে কি আমরা একটু অমনোযোগী হয়ে পড়েছিলাম। নইলে এত বড়ো বেখেয়ালের ব্যাখ্যা পাওয়া শক্ত।

গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের গোড়া থেকে যে-বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় শুরু তার বিষয়ে দুটো কথা আমাদের খেয়াল রাখা উচিত। এক, সময়টা নির্ভুলভাবে তদানীন্তন সোভিয়েতত্তন্ত্রের পতনের সময়। দুই, ওই প্রক্রিয়াটা ছিল বিশ্বজোড়া। কথা দুটো একেবারে খেয়াল করা হয়নি বললে ঠিক বলা হবে না। অনেক সময়ে কোনো কিছু যেমন আমাদের চোখে পড়ে, অথচ ঠিক দেখা হয় না, এও যেন তেমনই। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে তো বটেই, হয়তো আরো একটু আগে থেকেই, সোভিয়েতের দিকথার যেসব খবরাখবর আসছিল সে বিষয়ে সত্যিই কি আমরা তেমন মনোযোগী ছিলাম। পশ্চিমি ধনতন্ত্রের দুর্বলতা, মার্কিন সামরিকতাবাদের আধিপত্য, সি আইয়ের দুষ্ট চক্রান্ত ইত্যাদি গল্পে তখনো আমাদের আগ্রহ বেশ লক্ষণীয় ছিল। এমনকি তিয়ান আন মেনের পরেও আমাদের টনক কি সত্যিই তেমন করে নড়েছিল। তখনো কি মার্কিন অপপ্রভাবের সন্ধানে আমরা বেশি ব্যস্ত থাকিনি। রুমানিয়া কাণ্ডের পরে তৈরি করা উৎপল দত্তের 'লালদুর্গ' নাটকের কথা মনে পড়ে? ওই যেসব সন্ধানে ব্যস্ত থাকার কথা বলছি তার কোনোটা জরুরি ছিল না বা সেখানে আমাদের নজর করার কিছু ছিল না তা বলা কিন্তু আদৌ আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাই ওটুকু যথেষ্ট ছিল না। মনের যে-ঝোঁক থেকে ওই সন্ধান, তা ছিল আগের পর্বের মানসিকতার অলস রেশ। অলস, কেননা যা চোখে পড়ছিল তাতে মন দেবার জন্য নিজেদের জাগিয়ে তোলা হয়নি আর কি। জাগানোর মতো রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক প্রোটোকল তৈরি হয়নি তখনো। তখনো অটুট অস্তিত্বে আস্থা ছিল অনাবিল। মনে হচ্ছিল কত সংকটই তো পেরিয়ে আসতে হয়েছে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের রাষ্ট্রগুলিকে। যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ, নয়া অর্থনৈতিক নীতি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদ ইত্যাদি সংকটমোচনের কথা তখন বারবার স্মরণ করা হয়েছে। পরিপূর্ণ বিশ্বাসের জোর গলায় নিয়ে অনন্যসাধারণ সাফল্যের গল্প একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি, বিজ্ঞান প্রযুক্তি, স্পুটনিক, পশ্চিমের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর, এসবই ছিল। এর কোনোটা অসত্য ছিল না। তা সত্ত্বেও যে অলসতার কথা তুলেছি সে এই কারণে যে, বিকল্পের ঘের নিয়ে যতটা উদ্বিগ্ন মনোযোগের অবকাশ ছিল তখন সেদিকে মন যায়নি আমাদের। সোভিয়েত বিপ্লব তো শেষমেশ পুঁজিতন্ত্রের ঘের কেটে বেরোনোর একটা ছক। সেই বিকল্প ছকের ঘেরটা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারছে বা যেতে চাইছে, এ প্রশ্ন নিয়ে কি তেমন করে মাথা ঘামিয়েছি আমরা কোনোদিন? সেই

তো শিল্প, সেই তো বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, সেই ক্ষমতার ভাষা, সেই চোখ রাঙানো, সেই ত্রাসের আবহাওয়া, সেই যুদ্ধ, সেই সামরিকতা, মারণাস্ত্র ও পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার। সেই সব কিছু। তাহলে বিকল্পের কী হল? শুধু এসব আমাদেরই হাতের মুঠোয়, এইটুকুই। আমিই জিতে যাব, এই ভরসাই সম্বল।

অনি এখানে প্রচুর ভুল বোঝার অবকাশ থেকে যাচ্ছে। ওই যে সফলতার শব্দগুলিকে এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করে গেলাম, মনে হবে হয়তো-বা একটু বুঝি বেঁকিয়ে, তা কি ওই সাফল্যের দাবি অস্বীকার করার জন্য। তা কেন। কিন্তু একথা তো ঠিক যে সাফল্য-অসাফল্যের বিচার লক্ষ্য, প্রেক্ষিত, উদ্দেশ্য, এসব বাদ দিয়ে হয় না। ওই সব নীতি যখন প্রণীত হচ্ছিল বা যাঁরা ওই সব নীতি প্রণয়নের দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের সময়ের সমস্যা সংকট, ভয় ভাবনা ও বস্তু আবেগের শরিক আমরা কখনোই হব না। কাজেই এই ধরণের বিষয়ে কথা বলতে গেলে মেনে নিতেই হয় যে আমরা অন্য সময়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। তাই আমাদের কথায় এক রকমের একটা বিচার অবশ্যই নিহিত থাকছে। সেই জন্যই বিচারের দায়িত্ব আমরা মাথায় তুলে নিচ্ছি কিনা সে কথা খেয়াল রাখা জরুরি। বস্তুত আমরা ওই আলোচ্য সময়ের সংকটের শরিক নই বলেই বিচারের অবকাশ পাওয়া যাচ্ছে। এবং মনে রাখতে হবে যে বিচারের প্রয়োজন আমাদের নিজেদের জন্য, ওই সময়ের জন্য নয়, সেই পুরোনো সময় ইতিহাস আর ফিরিয়ে দেবে না। তাই অতীত সমাধান নয়, বর্তমানের মোকাবিলা। আজ যখন এসব বিষয়ে আমরা কথা বলছি তখন তাহলে তিনটে মুহূর্ত আমাদের হাতে। সোভিয়েতের সেই সাফল্য-অসাফল্যের পর্ব, ভেঙে যাবার দিনে সে বিষয়ে আমাদের মনোভঙ্গি আর এই আজ যখন আলোচনা তুলছি তখন অতিক্রান্ত ওই দুই সময়ের দিকে ফিরে তাকানো।

সেই ভাঙনের দিন। অনেকের কাছেই সে বড়ো ভয়ানক দিন। অবিশ্বাস্য সব কাণ্ড ঘটছে। আভাস হয়তো অনেক দিন ধরেই পাওয়া যাচ্ছিল। তবে সত্যি সত্যি ঘটে যাবার আগে কারো পক্ষে বোধহয় ভাবা খুব সহজ ছিল না তাসের ঘর এমনিভাবেই ভেঙে যাবে। বিস্ময় অবিশ্বাস দোষারোপ পাল্টা দোষারোপ, এসব চলল বেশ কিছুদিন। কিন্তু একথা ওই সময়ে ঠিক খেয়াল করা হল না যে, যেখানে যেখানে মনে হয়েছিল অভূতপূর্ব সাফল্য দেখা গেছে হয়তো সেখানে সেখানেই লুকিয়ে ছিল দুর্বলতার বীজ। বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতার সূত্রে মনোনিবেশ করতে গিয়ে সফলতা-অসফলতার দ্বন্দ্বসম্পর্কে মন দেওয়া যায়নি তখন। অথচ অনেকেরই তখনকার উদ্বেগে কোনো অসত্য ছিল না। ব্যাকুল আগ্রহে তাঁরা অনেকে বুঝতেই চাইছিলেন যা ঘটে গেল তার রহস্য। তখন এমন নজিরও একেবারে বিরল ছিল না যে খুব আগ্রহে আবার ফিরে পড়ে নিতে হল স্তালিনের সমগ্র রচনাবলি। পুরোনো প্রত্যয়কেই আর একবার হয়তো জোর করে বানিয়ে নেওয়া গেল তাতে করে। মনে হল তত্ত্বকাঠামো সব তো ঠিকঠাকই ছিল, বড়ো ভুল হয়ে গেছে প্রয়োগে। কারো-বা মনে হল গেরেস্ত্রৈকা-গ্লাসনস্ত পর্বের বাঁধুনি আলগা করার চিন্তার মধ্যেই নিহিত ছিল সর্বনাশের বীজ। কেউ কেউ ওই পর্বকে টেনে নিয়ে যেতে চাইলেন একেবারে বিংশতি কংগ্রেসের স্তালিন বর্জন পর্যন্ত। অর্থাৎ, মনটা যেন কাজ করছে শুধু প্রশাসনের স্তরে। স্তালিন থেকে, খ্রুশ্চভ থেকে, ব্রেজনেভ থেকে একেবারে গরবাচভ পর্যন্ত একটা বাঁধন আলগা

করার পথ হিসেবে সাজিয়ে অনেকেরই মনে হয়েছিল হয়তো যে এইভাবেই তাহলে গেরো ফসকেছিল। অন্য একটা সম্ভাব্য প্রশ্নে মন কি তেমন করে গেল? একের পর এক এই সব রাষ্ট্রপ্রধানদের এই পথে যেতে হল কেন? সে কি শুধুই খামখেয়াল, নাকি শুধুই উদারতা? নাকি সবটাই শুধু ক্ষমতা দখলে রাখার রাজনৈতিক চাতুরি? এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর কোনোদিন আমরা বুকে হাত দিয়ে জোর করে বলার মতো জানব না। তবুও আমাদের কল্পনা করে করে এগিয়ে যেতেই হয়। বিপ্লবোত্তর সত্তর বছরে সমাজজীবনের বোঁজ তেমন করে নেবার গরজ কি আমরা কোথাও দেখেছি তেমন করে? ভাবলে কি খুব অন্যায় হবে যে সমাজের মধ্যেই এমন চাপ সম্ভবত তৈরি হচ্ছিল যা মাটির ভিতরকার চাপের মতো বেরিয়ে আসবার জন্য জ্বালামুখ খুঁজে ফিরছিল। আলগা ফাঁস তারই প্রশাসনিক প্রকাশ। আগ্নেয়গিরির নীচের দিকটা সত্যিই আমরা কেউ দেখিনি তখন। আসলে আমাদের তত্ত্বদৃষ্টিতে ওই প্রোটোকলটা তৈরিই হয়নি। অথচ গত শতাব্দীর আশির দশকে অন্তত এ বিষয়ে খবরাখবর একেবারে কিছু না তা ঠিক নয়। কথাবার্তার চলও একটু একটু করে দিব্যি হতে আরম্ভ করেছিল। ভেঙে যাবারও বেশ কিছুদিন আগে ও দেশের যে সব বিদ্যার্থী গবেষক এদেশে আসতেন তেমন দু-একজনের কথা আমরাই জানি যাঁরা তখনই অকপটে কুলাক কাহিনী থেকে লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' নামের বইয়ের বাইবেলসদৃশ ব্যবহারের পাঠ পর্যন্ত প্রকাশ্য সেমিনারেই বলতে দ্বিধা করতেন না। আমরা সেসব কথায় কান দিইনি, দিতে চাইনি। আমরা শুধু চেনা সোভিয়েত কুৎসার আদলেই সাজিয়েছি এসব কথা। পাস্তেরনাক, সলঝেনিৎসিনকেই আমরা তাই করেছি। অন্যদেরকে তো করতেই পারি।

আসলে আমাদের মনটা ততদিনে বড্ড বেশি করে দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। আমরা আর ওরা। এ পক্ষ, ও পক্ষ। যারা আমাদের পক্ষে নয় তারাই ও পক্ষের, শত্রু পক্ষের। এ কালের মার্কিন রাষ্ট্রপতির সুবচন কানে ভাসে না? শত্রুপক্ষের চক্রান্ত হিসেবে গল্প সাজাতে অনেক সুবিধে হয়। আর মনটা যদি সেইভাবে তৈরি করে ফেলা যায়, তাহলে বিশ্বাস জন্মানো আর কোনো শক্ত কাজ থাকে না। দলগত আদর্শগত প্রত্যয়ের চাপে আমাদের মন খুব সহজেই ওইভাবে তৈরি হয়ে ওঠে। তাই সেই ভাঙনের দিনে আমরা কিছুতেই সোভিয়েততন্ত্রের সমাজদুর্বলতার দিকে নজর ফেরাতে চাইনি। চোখের পরে সব ধূলিসাৎ হতে দেখেও আমরা কোনো পুনর্বিবেচনার জন্য নিজেদের তখন গুছিয়ে নিতে পারিনি। ওইরকম সময়কার একটা অনানুষ্ঠানিক সভার কথা মনে পড়ে। আজ যেখানে ভূপেশ ভবন গড়ে উঠেছে সেখানে তখনও ছিল সেই আগের পুরোনো বাড়ি ভেঙেচুরে নতুন বাড়ি উঠবে কথা হচ্ছে, হয়নি তখনো। চারিদিকে সোভিয়েত দুনিয়ায় ওই বিপর্যয়। তা সেই আধো অন্ধকার ঘরে একটা সভার আয়োজন করা হয়েছিল একদিন ঠিক কোনো মঞ্চটঞ্চ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডাকা হয়েছিল কিনা তা আর এখন মনে পড়ে না। সম্ভবত না। উদ্যোক্তাদের মধ্যে গৌতমদা ছিলেন বেশ মনে পড়ে। সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন রণেন সেন। ওই বয়সেও আগ্রহভরে সারাক্ষণ বসেছিলেন সেদিনের অন্যতম আলোচক ছিলেন জলি কল। তিনি কিন্তু রীতিমতো নিরাবরণ ভাষায়

বলেছিলেন, অনেক আগেই আরো কিছু শোনা উচিত ছিল আমাদের। সব কিছু অত সহজে সি আই এ বলে উড়িয়ে দেওয়ার অভ্যাসটা ঠিক ছিল না। এখন একটা মুশকিল হল এই যে, যার কথাই আমাদের শুনতে অস্বস্তি, তাকেই ওই কিছু একটা বলে খারিজ করার সংস্কৃতি ততদিনে আমাদের অনেককে পেয়ে বসেছে। ওই সেদিনও জমি কল কী বললেন তাতে অনেকেরই কিছু এসে যায়নি। কেননা ততদিনে উনি আর অনেকের কাছেই তেমন সাচ্চা কমরেড নেই। ফলে ওসব কথা বলেও বেশি কিছু হয়নি। ওই ভাঙনের দিনে দলগত রাজনীতির ভিতরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অকথ্য অস্বস্তির কথা কিছু বলতে পারব না। কিন্তু বাইরে থেকে আমরা যে মনটার আন্দাজ পেতাম তাতে আমাদের অস্বস্তির কোনো জবাব ছিল না। এবারের মতো পুঁজি বোধহয় জিতেই গেল, এরকম কথায় দলীয় বৃত্তের মানুষের শুধু সায় ছিল না তাই না, তাঁরা এসব কথায় বেশ বিরক্তিই বোধ করতেন বলে মনে হয়। তাঁদের চিন্তা পরিধিতে তখনো সমাজতন্ত্র অপরাজেয়, তার জয়যাত্রায় সাময়িক বাধা আসতে পারে, কিন্তু তা কাটিয়ে ওঠার প্রত্যয়ে তাঁরা তখনো অটল বিশ্বাসী। সমাজতন্ত্র শিবিরের আজকের চেহারার সঙ্গে এই মাত্র সেদিনের চেহারাতেই কত না ফারাক। আজ দাপুটে পুঁজিও সেখানে শুধু স্বাগত তাই না, নানা ছলাকলায় সে পুঁজির বয়ান তৈরিতেও তাঁরা অক্লান্ত।

অথচ ভাঙনের দিনে অনেক কিছুতেই কিন্তু মন দেবার অবকাশ ছিল। তথাকথিত সাফল্যের গন্ধে যদি আমরা অত আচ্ছন্ন না হতে দিতাম নিজেদের তাহলে হয়তো-বা ব্যর্থতার দিকেও নজর যেতে পারত। আমাদের অভিজ্ঞতায় অত জিনিস তো সত্যি ছিল। স্তালিন পর্বের ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের অনেক কাহিনী পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসের পর থেকে জানা গেছে। রয় মেদভেদিয়েভের মতো ঐতিহাসিকদের রচনার সঙ্গে ততদিনে আমরা পরিচিত। সাখারভের মতো বৈজ্ঞানিকদের কাজকর্মের খবর আমরা জানতে পেরেছি। বুখারিনের পুনর্বিবেচনার কথা আমাদের কানে এসেছে। তাঁর সাম্প্রতিক যে-সব রচনা আমরা হাতে পাচ্ছি সেসবের কথা তখনো জানা ছিল না। কিন্তু বুখারিনের চিন্তার অন্য আদলের খবর তখনই কিন্তু আমাদের অজানা ছিল না। সোভিয়েত পরিকল্পনার জমাট বাঁধা সমস্যার কথা আমাদের মোটেই অপরিচিত ছিল না তখন। ষাটের দশক থেকেই সেসব সমস্যার কথা উঠেছিল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় সেসব জিনিসের ঠাঁই হয়ে গেছে ততদিনে। শিল্প বিশেষ করে ভারী শিল্পের উপরে জোর দিয়ে সেই ভিত্তিতে অর্থনীতির বুনিয়াদ শক্ত করার আনুষঙ্গিক সমস্যা আমাদের নজরে ততদিনে কিন্তু বেশ ভালোভাবেই আসছিল। আমাদের পরিকল্পিত অর্থনীতির ভিত্তিও সেই আদলে সাজানো হচ্ছিল। কাজেই এ সমস্যা আমাদের কাছে নেহাত আনুষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার সমস্যা ছিল না। তা রীতিমতো আমাদেরও সমস্যা ছিল। এ নিয়ে এখানে বিচার বিতর্কও কিছু কম ছিল না। এই ভারী শিল্পের উপরে জোরের প্রসঙ্গেই উঠে পড়েছিল সমাজের উদ্বৃত্ত আহরণের প্রশ্ন। সেখান থেকে এসে গেল কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্ন। কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ, এসব আপ্ত ধ্বনির উৎস সন্ধান একেবারে

কি অবান্তর। বস্তুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাপাত ততদিনে আমাদের কাছে এত সরল রেখায় সাজানো হয়ে গেছে যে তার কোনো বিকল্প আদল আর আমাদের ছুঁতে পারছে না। পরিকল্পিত অর্থনীতি সমাজতন্ত্র, জোর কদমের শিল্পায়ন, রাষ্ট্রীয় অধিকর্তৃত্ব ইত্যাদি প্রায় যেন এক অনিবার্য ন্যায়সূত্রে আমরা হাতে পেয়ে গেলাম। আমাদের মনে এ আদলের দখল জমে গেল। এটাই প্রগতির কুললক্ষণ বলে মান পেয়ে গেল। সোভিয়েত অর্থনীতি ও তার সমাজের বিকাশপর্ব থেকেই বিতর্ক কিছু কম ছিল না। গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে তা বেশ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ততদিনে মন তো শিবিরে শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে বটেই। তাই ফ্রিডরীশ হায়েকের মতো ভিন্ন ঠাটের ভাবুকের কোলাতেও ওসব উদারনৈতিক চিন্তায় আমাদের গরজ কী বলে পাশ কাটানো সম্ভব হয়েছিল। ভাঙনের দিনেও আমাদের মনটাকে আর তেমন করে উলটে পালটে দেখা হয়নি। তামিল রচনাগুলিতে ফিরে গিয়েই আমরা নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার কথা ভেবেছি। ফলে বিকল্প ভাবনার কাজটা সেদিনও বাকিই পড়ে গেল।

এক অর্থে সমাজতন্ত্রের ভাবনা তো পুঁজিতন্ত্রের বিকল্প হিসেবেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের পথে, শিল্পের পথে, যুদ্ধাস্ত্রের পথে সে দিকে আমরা কতদূর যেতে পারব সেসব ভাবনা খুব বেশি ভাবা হয়নি। পুঁজিতন্ত্রের বড়ো-বেরটা কেটে তাই বেরোনোও ঠিক সম্ভব হয়নি। পুঁজিতন্ত্র পণ্যোৎপাদনে ব্রত। পণ্যোৎপাদনের উৎপাদন সম্পর্কের রহস্য মার্ক্সের হাত ফেরতা আমরা অনেকটাই বুঝেছিলাম। কিন্তু রাষ্ট্রসম্পর্ক, সমাজসম্পর্ক, ক্ষমতাসম্পর্ক, সংস্কৃতিসম্পর্ক ইত্যাদি আরো অনেক সম্পর্কের বয়ানে আমাদের মনোযোগের অবকাশ ছিল। ভাঙনের দিনেও আমাদের খুব মন যায়নি সেদিকে। মনের ঘরে ততদিনে আমরা আর একটা ভাগাভাগির শিকার হয়ে পড়েছি। আধুনিকতার সমালোচন থেকে শুরু করে ততদিনে তত্ত্বভাবনার অন্য এক পরিপ্রেক্ষিত বেশ জেগে উঠেছে। জোরাল তার প্রভাব। আধুনিকতার সমালোচনের নানা ধরনের নজির অনেক আগে থেকেই অবশ্যই ছিল। বস্তুত এরকম অনেক সমালোচনা আধুনিকতারই প্রায় সমসাময়িক। এসব সমালোচনার অনেক অংশ অবশ্যই মার্ক্সীয় চিন্তার অনেক প্রত্যয়কেই ছুঁয়ে গিয়েছিল। মার্ক্সীয় তত্ত্ব বলে প্রচলিত অনেক কিছুকেই তা রীতিমতো আক্রমণাত্মক মেজাজে ছেঁড়াকাটা করেছিল। আর প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রের হালচাল অনেককেই হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। এই অবস্থানের অনেক সমালোচনাকে তখন 'উত্তর-আধুনিক' নামের একটা অভিধার মধ্যে পুরে রাখতে গিয়ে আবারও নানা অকারণ অবিশ্বাসের জঞ্জাল জমিয়ে তোলা হল। এটা ঠিক যে তালি এক হাতে বাজেনি। উত্তর-আধুনিক বলে যাঁরা পরিচিত তাঁদের অনেক ন্যায্য সমালোচনার মধ্যেও এমন অতিরেকের দেখা পাওয়া গেছে কখনো কখনো যা নিতান্ত বাড়াবাড়ি। আর সর্বোপরি অকারণ বাঁধ, বহু ক্ষেত্রেই। ফলে সুস্থ সংলাপের সুযোগ আমরা আবার একবার হারালাম। দু-পক্ষই তখন দু-পক্ষকে দারুণ শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে নিল। পুঁজির সমালোচনার অনেক জরুরি উপকরণ দু-পক্ষের লেখাজোখা থেকেই আমাদের পাবার ছিল। কিন্তু যুযুৎ দেহি মেজাজে সেসবে নজর দেওয়া গেল না। সত্যি কথা বলতে কি, এতে পুঁজিরই পোয়া বারো।

আন্তর্জাতিক স্তরে ওইরকম সময়ে আরো একটা খেয়াল করার মতো জিনিস ঘটছিল। চীনে। চীনের সঙ্গে সোভিয়েত মহলের বিবাদ ও বিরুদ্ধতা ততদিনে রীতিমতো দানা বেঁধে গেছে। সত্তরের দশকের শেষ দিক থেকেও মাও জে-দং পর্ব পেরোনো চীনের মতিগতি বদলাচ্ছিল। অনুমান করা যায় সোভিয়েত মহলের অকসানের দৃশ্যে সেখানে আতঙ্ক তৈরি হল। সংযোগগুলি লক্ষ না করে উপায় নেই। চীনে ওইরকম সময়ে বাজার সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব মাথা চাড়া দিচ্ছে। কে না জানে পুঁজি প্রসারের প্রকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান বাজার। সমাজতন্ত্রের যে-বিকল্প চেহারা আমাদের খানিকটা চেনা হচ্ছিল পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে তা এই বাজার নামের প্রতিষ্ঠানটিতে অনেক রূপান্তর ঘটাচ্ছিল। রূপান্তরের সেই নির্দিষ্ট পথে অনেক বিপদ নিশ্চয় অপেক্ষা করে ছিল। সম্ভবত ভাঙনের দিনে সেই সব বিপদের ঘনীভূত হবার দিন। কমিউনিস্ট শাসনাধীন রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন বাজার, এ ব্যবস্থা পুঁজির পক্ষে খুব সুখের নয়। কিন্তু চীনের বাজার সমাজতন্ত্রের তত্ত্বে পুঁজি দিব্যি মনোমতো একটা হাঁসজারু পেয়ে গেল। রাষ্ট্র যদি নামে কমিউনিস্ট শাসনে থাকেও, কিন্তু তার ধরনধারণে যদি বদল আসে ক্ষতি কী? রাষ্ট্রের সঙ্গে পুঁজির সমঝোতা হতে বাধা কোথায়। সত্যি কথা বলতে কি, যুদ্ধোত্তর জাপান কিংবা অল্প পরবর্তী পর্যায়ের দক্ষিণ কোরিয়ার তথাকথিত অর্থনৈতিক জাগরণে রাষ্ট্রের ভূমিকা কি অবহেলা করার মতো। আধুনিক কালের পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের বিজ্ঞাপন হিসেবে এ দুটো উজ্জ্বল উদাহরণ তুলে ধরা হয়, এ কথা ঠিক। কিন্তু দেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বিদেশি পুঁজির, বিশেষত মার্কিন পুঁজির, গাঁটছড়া ছাড়া উন্নয়নের ওই ইন্দ্রজালের ব্যাখ্যা অসার। এই দুই ক্ষেত্রেই মার্কিন উপস্থিতি ও আধিপত্য অবশ্যই নজর কাড়ার মতো। জাপানের যুদ্ধোত্তর পুনরুত্থানে মার্কিন অভিভাবকত্ব কোনো অলক্ষ্য ব্যাপার ছিল না। অথচ আমাদের এখানে সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় নাগাদ উন্নয়ন বিতর্ক যখন নতুন মোড় নিচ্ছে, তখন বারবার ওই দুই উদাহরণ তুলে ধরা হত পুঁজির ইতিবাচকতায়। বিশেষত কোরিয়ার কথা তখন খুব বলা হচ্ছে। জাপান তবু একটু যেন অন্য কথা। জাপানের এক রকমের শিল্পবিপ্লব তো আগেই সাধিত হয়ে গেছে। সে বিশ্বযুদ্ধ লড়েছে, না হয় পরাজিত। বরঞ্চ পারমাণবিক আক্রমণের এই একমাত্র লক্ষ্য দেশটি তখন যেন খানিকটা আন্তর্জাতিক সহানুভূতির যোগ্য প্রার্থী। তখনকার পৃথিবীতে যুদ্ধক্ষত নিরাময়ে মার্কিন রাষ্ট্র ও পুঁজির উৎসাহ ও আগ্রহ কিছু অজানা তথ্য ছিল না। মার্শাল পরিকল্পনার অন্তর্গত সাহায্য পশ্চিম ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিতে এই নিরাময়ের কাজই করেছিল। জাপানে তা ছিল আরো অধিপত্যময়। কিন্তু কোরিয়া রীতিমতো যেন বিকাশের গল্প। যদিও কোরীয় যুদ্ধের পর থেকে সেখানেও মার্কিন আধিপত্য কি কিছু নগণ্য ব্যাপার ছিল। কোরিয়ার উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন, ভিয়েতনামের উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন, এসব গল্প আমাদের যথেষ্ট চেনা। কাজেই রাষ্ট্রের সঙ্গে পুঁজির আড়াআড়ির গল্পের মধ্যে অনেকদিন ধরেই অন্য আদল ফুটছিল। রাষ্ট্রের সঙ্গে বেসরকারি পুঁজির বিরোধিতার ছকটা আমাদের মনে চেপে বসেছিল সোভিয়েত বিপ্লবের আদিপর্ব থেকে। বেসরকারি পুঁজির উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা, এই ছিল সেদিনের আদল। আর আমরা

ভেবে নিয়েছিলাম পুঁজি তার লড়াইটা বুঝি ছেড়ে দিল। সমাজে বা রাজনীতিতে এত সোজা সরলভাবে সবকিছু ঘটে না। সে কথা তেমন করে খেয়াল না করে বিরোধিতার ছকটা আমরা দিব্যি আমাদের স্বপ্নে গেঁথে নিলাম। তাই চীনের বাজার সমাজতন্ত্রের নতুন স্লোগানের দিনেও আমরা সেই স্বপ্নের মাপেই তাকে মাপতে চাইলাম। মনে হল অত শক্তপোক্ত একটা কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতাসীন থাকতে বাজার থেকে এত দুর্ভাবনার কী আছে।

চীন বিষয়ে ওই বিশ্বাসের স্নিগ্ধতায় সেদিন টোল পড়েনি আদৌ। এ নিয়ে তখন তর্কের কোনো অভাব ছিল না। চীন বিশ্বাসীরা সেদিন ভারতের জন্য বরং খুবই দুর্ভাবনাগ্রস্ত ছিলেন। এখানে তো ওরকম নিটোল ক্ষমতা কোনো কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের হাতে ছিল না। তাই এমনিতে বাজার নিয়ে যাঁরা অস্বস্তি বোধ করেন তাঁরা চীনের সমাজতন্ত্র নিয়ে কোনো দুর্ভাবনার কারণ না দেখলেও ভারতে সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনা বিষয়ে মোটেই কোনো আশ্বাসের অবকাশ খুঁজে পাননি। পশ্চিমবঙ্গের মতো একটা ছোটো রাজ্যে যে বামপন্থী সরকার ততদিনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তার আওতায় সমাজতন্ত্র কতদূর নিরাপদ সে বিষয়ে সকলেই অবশ্যই সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু চীনের কথা আলাদা। সেখানে তো কমিউনিস্ট রাষ্ট্র বাজারকে সামলাবার জন্য অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করবে। এ বিশ্বাসে খাদ ছিল না। হয়তো সে কথা ঠিক। কিন্তু চীনে ওই বাজার সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় আদর্শের সঙ্গে তালে তালে যে আরো দু-একটা কথা চালু হয়েছিল তা আর তেমন করে খেয়াল করা হল না। বড়লোক হতে চাইলে আপত্তির তো কিছু নেই, ইঁদুরের রঙে কী এসে যায়, দেখতে হবে সে বেড়াল ধরে কিনা। এসব কথা তখন রাষ্ট্রীয় মঞ্চ থেকেই উচ্চরিত হচ্ছিল। আগের পর্বের অনেক কিছুর যে খোলনলচে বদলে ফেলা হচ্ছিল তা আর ঠিক মন থেকে মেনে নিতে ইচ্ছে করেনি তখন। আসলে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় তখন এতটাই আশ্বস্ত ছিলাম আমরা। এ স্বস্তির বোধ সম্ভবত এখনো তেমন করে ছেড়ে যায়নি আমাদের। তাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবৃত্তের বাইরে এখনো ভাবতে খুব মন যায় না।

চীনে যখন বাজারলগ্ন মনটা আস্তে আস্তে গড়ে উঠছিল, তখন আমাদের এখানেও কিন্তু গল্পটা তার থেকে খুব আলাদা ছিল না। মনে রাখতে হবে সত্তর দশকের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় সরকার যখন দাপলি কমিশন নিয়োগ করছেন তখনই কিন্তু ওই মন বেশ তৈরি। সরকারি ক্ষেত্র সম্বন্ধে মন তত দিনে বিরূপ হতে আরম্ভ করেছে ভালোভাবেই মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা মানুষকে সেই বোধের দিকে একটু একটু করে পৌঁছে দিয়েছে সরকারি ক্ষেত্রে মানুষের কোনো সমস্যারই তেমন কোনো সমাধান হয় না, এই বিশ্বাস আস্তে আস্তে বেশ সবার মনে জায়গা করে নিচ্ছিল। এ বিশ্বাসের অনুকূল কর্মকাণ্ডের কোনো অভাব ছিল না চারপাশে। হাওয়াতে তখন রীতিমতো বেসরকারি গন্ধ লেগেছে সত্যি কথা বলতে কি, ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের কথা মানুষের চিন্তায় অগোচরে হলেও ছিল। তারপর থেকে ক্রমে ক্রমে হাওয়া বদল হতে শুরু করে আমাদের এখানে স্বাধীনতার পর থেকে কুড়ি বছর মতো সময়। আর পৃথিবীর ইতিহাসেও

P31646

যুদ্ধের পরে মোটামুটি ওই দু-দশক, এই বছর কুড়ি সময় একটু অন্যরকমই কেটেছিল বলতে হবে। বাকি পৃথিবীর মতো আমাদের এখানেও টালমাটাল অবস্থার সূত্রপাত কিন্তু ওই ষাটের দশকের মাঝামাঝির পর থেকে। ওই যে আমাদের পর পর তিন বছর পরিকল্পনার আনুষ্ঠানিক ছুটি গেল, তার পরে আর ঠিক আগের মতো অবস্থায় ফেরা যায়নি। সত্তরের দশক থেকে সংকটের চেহারা বেশ ঘনীভূত হতে থাকে। বাকি পৃথিবীতেও ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসানের পরে আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ, তেলের সংকট, ডলারের অবমূল্যায়ন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দিন বদলাতে থাকে। আজ মনে হয় ওইরকম সময়ে সবাই খুব সেয়ানা হল। এ ধরণের কথার খুব কোনো মানে নেই হয়তো। তবুও। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র এবং আনুষঙ্গিক আরো অনেক ধারণা থেকে ওই সময়ে আস্তে আস্তে বেশ দিব্যি সরে আসার একটা রেওয়াজ তৈরি হল। ক্রমে ক্রমে তা বেশ ন্যায্যতা পেল। আমরা ভাবতে শিখলাম রাষ্ট্রের দায়িত্বে জনকল্যাণের চিন্তার মধ্যে যেন এমন একটা আহ্লাদ আছে যা প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। প্রত্যেককে তার নিজের অন্ন খুঁটে খেতে হবে। নইলে যোগ্যতার মর্যাদা কেন অস্বীকার করা হয়। যোগ্যতমের উদ্বর্তন ধারণা আবার আমাদের উপর চেপে বসতে চাইল। রাষ্ট্র কেন কথায় কথায় ভরতুকি দেবে? যা যেমন হবার তা ঠিক ঠিক মতো বাজারের নিয়মেই হবে। খেয়াল হল না এসব চিন্তা থেকে কোন ঠেকায় একদিন সরে আসতে হয়েছিল। আবার আমরা ফিরে গেলাম সেই যোগ্যতার বুলিতে, দক্ষতার বুলিতে। রাষ্ট্র ভরতুকিও দেবে না বেশি আর করও আদায় করবে না তেমন গায়ের জোরে। তাই কথা উঠল রাষ্ট্রের বাজেট ঘাটতি কমাতে হবে। সরকারের ব্যয়বৃদ্ধি একেবারে কাম্য নয়। সরকারের আয়তন ছোটো করতে হবে। এই সেই রেগানমিক্সের হাওয়া। অতলান্তিকের এক পারে তখন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগান আর আর এক পারে প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার। দুইয়ে মিলে থ্যাচারেগানমিক্সের দাপট। সত্তর-আশির এই সেই নতুন হাওয়া। আন্তর্জাতিক পুঁজি তখন এই হাওয়াতে ভাসছে। আমাদের দাগলি কমিশন ওই হাওয়ার ফসল। সরকারি ক্ষেত্র থেকে ভরকেন্দ্র তখন সরতে শুরু করেছে বেসরকারি ক্ষেত্রের দিকে নিশ্চিতভাবে।

এই পুঁজির উত্থানপর্বের লগ্ন। এরই পরবর্তী ধাপে আসবে বিশ্বায়ন। নতুন করে পুঁজির নখদন্ত বিস্তারের দিন। এখানে একটা কথা একটু বলে নেওয়া যাক। পুঁজি বলে আমরা যা বলতে চাইছি তা ঠিক কী? পুঁজি তো এক অর্থে চিরকালই ছিল। অন্তত অনেক কাল ধরে ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে? নতুন কী ঘটল? পুঁজির কথা ভাবলেই প্রথমে আমাদের যা মনে আসে তা কিছু বস্তুপুঞ্জ, কিছু যন্ত্রপাতি বা টাকাকড়ি। আর একটু অন্যরকম ভাবতে গেলে সঞ্চয়ের কথা মনে আসে, বিনিয়োগের কথা মনে আসে। এর কোনো ভাবনাতেই কোনো ভুল নেই। শুধু খেয়াল রাখতে হবে যে এসবই পুঁজির কায়িক ধারণা। আর এই অর্থে পুঁজির বয়স অনেক, তার গল্প অনেক পুরোনো। সেই জন্যই এসব আলোচনার বেলায় অনেকের মনে হয় কখনো যে পুঁজির কথায় এত জোর দেবার কী আছে। পুঁজি চিরকাল ছিল, আছে, থাকবে। ঠিক। কায়িক অর্থে। কিন্তু

পুঁজি ভাবনার আরো একটা দিক আছে। সে তার সমাজভাবনার কথা। সেই মাত্রায় পুঁজি একটা সামাজিক বর্গ। মানুষ যা কিছু উৎপাদন করে পুঁজি তো তারই একটা অংশমাত্র। উৎপাদনের যে-অংশ আমার ব্যবহারের পরে উদ্বৃত্ত থাকছে তাই আমার পুঁজি। ওই উদ্বৃত্ত দিয়ে আমি আবার উৎপাদনের কাজে লেগে যাব। হয়তো তাতেই আমার আরো উদ্বৃত্ত সঞ্চয় করতে সুবিধা হবে। এইভাবে যত দিন যায় তত পুঁজি পুঞ্জিত হতে থাকে। ওই কারিক অর্থে। এইভাবে বাড়তে বাড়তে একদিন পুঁজির সামাজিক চরিত্রে বদল ঘটে। উৎপাদনের গোটা ব্যাপারটাই তখন এমনভাবে পুঁজির উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যে পুঁজি যার হাতে থাকে সেই ক্রমে উৎপাদনের হর্তাকর্তায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। উৎপাদন ব্যবস্থা এইভাবে পুঁজি মালিকের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। পুঁজিরই জোরে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে। উৎপাদন ব্যবস্থা আরো বেশি করে পুঁজির দিকে ঝুঁকে পড়ে। তা দিনে দিনে জটিল হয়। এই জটিল উৎপাদন ব্যবস্থা কালে কালে একান্তভাবে পুঁজিনির্ভর। সমাজ আস্তে আস্তে দারুণভাবে পুঁজিনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু পুঁজির এই সামাজিক মানচিত্র কোনো মসৃণ সমতলভূমি নয়। নানা ওঠাপড়ার গল্প আছে সেখানে। পুঁজি একদিনে দিগ্বিজয় করেনি। ভূস্বামী শ্রমিক গির্জা পুরোহিততন্ত্র রাষ্ট্র, এরকম নানা সামাজিক বর্গের সঙ্গে ঠোকাঠুকির জটিল ইতিহাসের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে পুঁজির সামাজিক চলন। তার উত্থানপর্বের গল্প কথাটাকে বুঝতে হবে এই সামাজিক বর্গের মাত্রায়। আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের যে-পর্বটাকে বিশ্বায়নের পর্ব বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে তা পুঁজির তরঙ্গে নতুনভাবে মাথায় চড়ার একটা পর্ব। দুই শিবিরে ভাগ হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী। স্নায়ুযুদ্ধ ও পারমাণবিক পাঞ্জা কষা। এতদূর যে তারাযুদ্ধ পর্যন্ত একটা প্রস্তুতি পর্ব রাষ্ট্রীয় কর্মসূচির অন্তর্গত করতে কারো বাধেনি। মাতা বসুমতী ব্যভিচারে আজ মগ্ন। কবিরা এসব কথা অনেক আগেই উচ্চারণ করেছিলেন। তখনো তারাযুদ্ধের মতো ওরকম নিদারুণ চিন্তা রাষ্ট্রশক্তির কল্পনাতেও আসেনি। পৃথিবী নামে এই গ্রহটির অমূল্য সব উপকরণের এই অপব্যয়ের জন্য খেসারত দিতে হবে না। সম্ভবত সেই পালা চলছে। তারাযুদ্ধের মতো ব্যয়বহুল রাষ্ট্রপ্রযুক্তিগত পাগলামি সামলাতে মার্কিন অর্থনীতিরও ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে। আর সোভিয়েতের কথা না তোলাই ভালো। বলছি না যে সোভিয়েতের ভাঙন শুধু এই কারণে। তা হয় না। সে গল্প নিশ্চয় আরো অনেক জটিল। কিন্তু ভাঙন খুব বাস্তব। তার মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতেই হবে। সামাজিক মাত্রায় পুঁজির নখদন্তের যে-কথাটা তুলেছিলাম তার সঙ্গে এই ভাঙনকে মিলিয়ে দেখা কি খুব অযৌক্তিক? এই পর্বেই বিশ্বায়ন, এই পর্বেই পুঁজি লাগামছাড়া হতে শিখল। একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে মানচিত্রের একটা বড়ো অংশ বিশ্বপুঁজির হাতের নাগালের বাইরে ছিল। এখন একটা নতুন সুযোগ এল। পুঁজি এখন শাইলকের ভাষায় নিজের ভাগের এক পাউন্ড মাংসের হিসাব কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে চাইল। এখন তাকে কে ঠেকাবে।

আমরা এখন চারিদিকে উন্নয়নের কথা শুনছি। উন্নয়ন এখন রীতিমতো একটা স্লোগান। এতদূর যে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের লোকেদের মধ্যে এ নিয়ে ঐক্যমত্যের

সম্ভাবনা বেশ প্রত্যাশিত। কথাটা কিছুদিন ধরে জোর দিয়ে বলাও হচ্ছে। এরকম ঐক্যমত্যের অভাব আজ এমনকি তিরস্কৃতও। কথাটা এমনভাবে উঠছে যেন উন্নয়ন ব্যাপারটা রাজনীতির ধুলোময়লার ঊর্ধ্বে অনেক পরিচ্ছন্ন ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় শুদ্ধতর প্রায় ঐশ কোনো বর্গ। যেন উন্নয়নের ধরণধারণের সঙ্গে এর স্বার্থ, ওর স্বার্থের কোনো সংঘাত বিরোধের অবকাশ কোথাও নেই। যেন প্রক্রিয়া হিসেবে উন্নয়ন সবারই জন্য সমান মসৃণ। শুধু উন্নয়নের ঘোড়াটাকে একবার কোনোমতে গাড়ির সঙ্গে জুতে দিতে পারলেই হল। রাজপথ তো এর আগে আমরা তৈরি করে রেখেছি। পরিকাঠামো উন্নয়নের নামে বিদ্যুৎ রাস্তা উড়ালপুলের স্লোগান যে আসলে উন্নয়নেরই স্লোগান ছিল সেকথা তখন তেমন করে খেয়াল করা হয়নি। হয়নি বলেই আমাদের চোখের পরে বাইপাসের ধারের জমি যখন বাহারি হাসপাতাল ও আবাসনের জন্য দু-হাতে বিলি হচ্ছিল তখনো আমরা অন্যমনস্ক ছিলাম। আমের বনে গন্ধ তখনই হয়তো টের পাওয়া যেত, আমরা নিজের নিজের ঘরে সেদিন বোধহয় উদাসীন থেকেছি। উন্নয়ন যখন স্লোগান হিসেবে রাস্তার মোড়ে মোড়ে টহল দিচ্ছে তখনো আমরা সে মুহূর্তকে চিনে নিতে চাইনি। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম যেদিন ঝাঁপিয়ে এল তখন আর মুখ ফিরিয়ে থাকা আমাদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। আর রাজনীতির জল একটু ঘুলিয়ে উঠলে মাছ ধরার লোকের অভাব হবে কেন। কিন্তু উন্নয়ন যখন স্লোগান তখনকার মুহূর্তটাকে চিনে নেবার কাজে আমাদের ফাঁক থেকেই গেল বলে সন্দেহ হয়। তাই আমরা আমাদের চেনা বামপন্থীদের অচেনা চেহারার জন্য এত বিব্রত বোধ করলাম। ঠিক খেয়াল করা হল না যে সরকার পরিচালনার দায়িত্বে থাকা শাসকদলের রাজনৈতিক মতাদর্শ বা তত্ত্ব-অবস্থানের জন্য খুব বেশি জায়গা আর ততদিনে ফাঁকা পড়ে নেই। রাষ্ট্র যদি পুঁজিগ্রস্ত হয়, তাহলে রাষ্ট্রের অধিনায়কেরা কি খুব বেশিদিন পুঁজির ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে পারবেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার আহ্লাদ আর সেই সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট পুঁজির সহাবস্থানে অত বিচলিত হলে চলবে কেন। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে যে-রাজনীতি চিন্তার সিদ্ধি তাকে আজ অনেকদূর পর্যন্ত পুঁজির বার্তা বহন করেই চলতে হবে। তা না করতে চাইলে বিকল্প ভাবনার ঘের অনেক বড়ো করে টেনে নিতে হবে।

বিকল্প ভাবনার দায় যদি আমরা আবার শুধু রাষ্ট্রনায়কদের মাথায় কিংবা যাঁদের আমরা ভাবুক বুদ্ধিজীবী বলে থাকি তাঁদের উপরে চাপাতে চাই, তাহলে আবার সেই ভুলের ফাঁদে পা দেব। আমাদের নিজেদের, মান একেবারে আমাদেরই, নিজেদেরই অনেক বড়ো দায় মাথায় নেবার আছে। নিজেদেরই পায়ে ভর দিয়ে, নিজেদেরই সাহসে আস্থা রেখে, নিজেদের চোখে চোখে তাকিয়ে নিজেদের ভাবনাগুলোকে যাচাই করে নিতে হবে। একটা কথা বলেই ফেলা যাক। যে-উন্নয়ন নিয়ে আমরা এত বিব্রত বোধ করছি তা কি সত্যি আমরাই চাইনি। অত যে দ্রব্যসম্ভার তা আমাদের ভালো লাগেনি? এসব জিনিস উৎপাদন করতে গেলে কোন উপকরণ কোথায় কীভাবে কতটা লাগছে না লাগছে তা নিয়ে কি সত্যি আমরা ভেবেছি কখনো। আমাদের জীবনযাপনের এই ধাঁচের জন্য পরিবেশের কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি কখনো। কিন্তু পরিবেশ

সমস্যাকে আজ আর ঠিক শৌখিন সমস্যা বলে এড়িয়ে যাওয়া শক্ত। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি নিয়ে আজ আশঙ্কার কারণ দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে নিয়মিত গবেষণালব্ধ তথ্য দিয়ে চলেছেন। অবশ্য এসব বিপদ নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনে টপকে যাবার পরামর্শ দেবার বিজ্ঞানীরও অভাব নেই। আর সত্যি কথা বলতে কী তথাকথিত বিজ্ঞানের এসব সমস্যাও কি শুধু নির্দোষ বিজ্ঞানের যুক্তিময়তার স্তরে মীমাংসা হবে। রাজনীতি সমাজনীতির প্রশ্ন এখানেও দেখা দেবে নিশ্চয়। তা এখানে আমাদের মতো সাধারণের মন মেজাজের খবর কিরকম? বিজ্ঞানীদের পরামর্শ গবেষণাকে আমরা নিশ্চয় আমাদের মতো করে আমাদের রাজনীতি সমাজনীতির বিচার দিয়েই গ্রহণ করছি। বাতাসে কী পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড মিশবে তা আমর কীভাবে জীবন যাপন করতে চাই তার উপরে যে নির্ভর করে, এ বোধ কি আমাদের আচারে আচরণে খুব টের পাওয়া যায়। আমাদের এ মন তৈরিতে পুঁজি নিশ্চয় সাহায্য করে, আবার এ মনটাকে পুঁজি জুতসইভাবে ব্যবহারও করে। এসব দিকে নজর না দিয়ে বিকল্প সন্ধানে আমরা কোনদিকে কতদূর যাব। শুরুতে যে একটা দ্বিতীয় কথা তুলে রেখেছিলাম তা এই যে উন্নয়নের বর্তমান মুহূর্ত ছিল বিশ্বপুঁজির মুহূর্ত। তা নিয়ে কিছু ভাবতে গেলে তো বিশ্বমাত্রাতেই ভাবতে হবে। শুধু আমার দেশ, শুধু আমার রাজ্য, শুধু আমার অঞ্চল এদিকেই মাত্র নজর দিলে পুঁজি তার বিশ্বযাত্রা কিন্তু চালিয়েই যাবে। আবার নির্বিচারে বিশ্বলগ্ন হলেও পুঁজিরই অভিপ্রায় হয়তো সিদ্ধ হবে। রাষ্ট্র বা সরকারি মহলই আমার একমাত্র লক্ষ্য কেন হবে। সমাজ এখনো তো শুধু সেটুকুতেই নিজেকে পুরোপুরি বেঁধে ফেলেনি। রাস্তার মোড়ের মানুষদের কথা শোনার জন্য তাই একটা কান খোলা রাখা চাই। বিশ্বপুঁজির চলনবলন এখন যেখানে এসে পৌঁছেছে সেখান সত্যিই উন্নয়নের এই ধরণ বা ওই ধরণ, এটা কি আর খুব বড়ো কথা রইল। ছোটো ঘেরের মধ্যে ধরণ বদলে কি আর স্বস্তির বিকল্পে পৌঁছোবার কোনো জায়গা আছে। ওই কেউ হয়তো আঙুল উঁচিয়ে চড়া গলায় হুমকি দেবেন, আর কেউ হয়তো নরম গলায় ফিসফিস করে পারমাণবিক নবজাগরণের কথা শোনাবেন। কেউ হয়তো একটু তুখোড় ভাষায় যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা বোঝাবেন, আর কেউ-বা মুখ ফসকে ভুলভাল কথা বলতে বলতে কারণে অকারণে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। বিকল্প রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কাঠামো সন্ধানের স্তরে আর এখন নেই এ প্রশ্ন। এ প্রশ্ন এখন সভ্যতার স্তরে এসে পৌঁছেছে। মানুষের সভ্যতাকে কী চেহারায় দেখতে চাই আমরা তার প্রশ্ন।

এবার আমার সত্যি ভয় করছে। প্রশ্ন এত বড়ো করে তুলতে গেলে ভয় পাবারই কথা। তা ছাড়া এসব প্রশ্ন আমাদের কারই-বা কী হক আছে। সভ্যতার প্রশ্ন তো অনেক দূরের, অনেক দিনের কথা। অতদিন কে কার জন্য অপেক্ষা করবে। এখন কুড়ি-কুড়ি ক্রিকেটের যুগ। কুড়ি কুড়ি বছরের পারে জীবনে কী আছে তা কে জানে। আর সেসব কথা কেই-বা কাকে বলে দেবে।

# বিতর্কের জালে কৃষি না শিল্প

## সুরজিৎ দাশগুপ্ত

২০০৬ সালের অগস্টে বেঙ্গালুরুর হাসপাতালে চিকিৎসায় থাকাকালে আরও কয়েকজন বঙ্গভাষীকে সহপীড়িত রূপে পেয়েছিলাম। তাঁদের একজন ছিলেন সিঙ্গুরের অনেক ব্যবসায়ী। নতুন ভর্তি হলেন আলিপুর দুয়ারের এক মাঝবয়সী চিকিৎসক যিনি একজন রোগী হয়েছেন এখন আমাদের সঙ্গে। পরিচয়-পর্বে নবাগত জানতে চাইলেন 'সিঙ্গুর জায়গাটা কোথায়?' তখন সিঙ্গুরের রোগীটি হেসে বললেন, 'জানেন না? ওই সিঙ্গুরের মাঠেই তো ক্ষমতা আর মমতার ম্যাচ হবে বলে শুনে এসেছি।'

মাত্র চোদ্দ-পনেরো মাস আগেকার অখ্যাত সিঙ্গুরের নাম এখন কে নাম জানে? এই বিপুল খ্যাতির মূলে রয়েছে কৃষি, না শিল্প নিয়ে বিতর্ক। আসলে বিতর্কটা দুশো বছরের পুরনো, চলে আসছে ইংল্যাণ্ডের কৃষি জমিতে কল-কারখানা বানাবার পালা শুরু হওয়া থেকে। তর্কটা দারুণ জমে ওঠে এম কে গান্ধী প্রণীত 'হিন্দ্ স্বরাজ' রচনাটির ১৯০৮ সালে প্রকাশের পরে। তাতে তিনি লিখেছিলেন, 'Machinery has begun to desolate Europe. Ruination is now knocking at the English gates. Machinery is the chief symbol of modern civilisation; it represents a great sin.' তেরো বছর পরে তিনি আবার আপন অবস্থানকে ব্যাখ্যা করে লেখেন, 'It was written in 1908. My conviction is deeper today than ever. I feel that if India will discard "modern civilisation", she can only gain by doing so.'

ইতিমধ্যে এম কে গান্ধী প্রসিদ্ধ হয়েছেন মহাত্মা গান্ধী বলে। তাঁর বক্তব্য বহু পণ্ডিত-ব্যক্তির কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তরযোগ্য হয়ে উঠেছে। আর তাঁদের সওয়ালের জবাব দিয়ে মহাত্মাজি ঈষৎ কোণঠাসা হয়ে আবার লিখলেন, 'What I object to is the craze for machinery, not machinery as such. The craze is for. what they call labour-saving machinery. Men go on "saving labour" till thousands are without work and thrown on the open streets to die of starvation.'

তা হলে মহাত্মাজির আসল আপত্তিটা এই জন্য যে যন্ত্র শ্রম বাঁচায় তথা শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তাকে অতএব প্রাসঙ্গিকতাকে খর্ব করে, পরিণামে শ্রমিকের জীবন মূল্যহীন অথবা অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন যে যেসব যন্ত্র কর্ম-সংস্থানের অথবা স্বনির্ভরতার কারণ হয়, যেমন হাতে ঘোরানো ঘরোয়া সেলাইয়ের মেশিন, সেসব যন্ত্র সমাজের প্রগতি ও বিকাশের পক্ষে অর্থপূর্ণ। কিন্তু যখন বলা হল যে তেমন মেশিন বানাতেও তো কারখানা চাই। উত্তরে মহাত্মাজি বলেছেন, 'Yes But I am socialist enough to say that such factories should be nationalised, State-controlled.' অর্থাৎ একটা স্তরে রাষ্ট্রযন্ত্রকেও তিনি স্বীকার করেছেন।

এখন মহাত্মাজির এই বক্তব্যকে, এই যুক্তি-প্রণালীকে আজকের মহাত্মা-ভক্তরা কীভাবে গ্রহণ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করবেন সে অনুমানের মধ্যে যাব না।

তবে এটা তো ঠিকই যে যন্ত্র ব্যবহার করা মানেই শ্রমের গুরুত্ব এবং সময়ের ব্যয় দুটোকেই উল্লেখযোগ্যভাবে কর্তন করা। ট্র্যাক্টর, প্ল্যান্টিং মেশিন, পাওয়ার টিলার, কুয়ো কি ডোবা বা জলা থেকে খেতে জল সেচের জন্য পাম্পিং মেশিন ইত্যাদি কৃষির জন্য ব্যবহারের ফলে নিঃসন্দেহে হাজার হাজার খেতমজুরের কর্মচ্যুতি কিংবা কর্মলাভের বাধা হবে। যেমন এককালে চাকাওয়ালা গাড়ি এনে পালকিবাহকদের এবং এককালে নৌকোর সঙ্গে ভুটভুটি লাগিয়ে মাঝিমাল্লাদের বিশাল অংশকে বেকার করা হচ্ছে। এ বিষয়ে কোনও মিথ্যে আশ্বাস দেওয়ার জায়গা নেই, কলের শিল্প নিশ্চিত ভাবেই কিছু মানুষের কর্মকে বা বৃত্তিকে, কিছু চিরাচরিত জীবিকাকে গ্রাস করবে। এটা তো গেল অসংগঠিত শ্রমজীবীদের উপরে যন্ত্রের কোপের কথা।

এবার দেখা যাক সংগঠিত কর্মীদের কাজের বাজার। আমরা যারা শহরে বছর তিরিশেক বাস করছি তারা ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখেছি, বিশেষত ন্যাশনালাইজড ব্যাঙ্কে, খুব অল্প টাকা তোলারও পদ্ধতি। চেক কেটে প্রথমে ওপারের ব্যক্তিকে দিলে তিনি একটা টোকেন দিতেন আমার হাতে, তারপর তিনি একটা খাতায় আমরা দেওয়া চেকটার পরিচয় লিখে সেই খাতাটি দিতেন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে, এর পরে খাতাটার মধ্যে চেকটাকে রেখে তিনি খাতাটা দিতেন টেবল-চেয়ারে উপবিষ্ট তৃতীয় এক ব্যক্তিকে, এবার এই তৃতীয় ব্যক্তি একটা দেরাজ টেনে আমার চেকের সইটা মেলাতেন আর তার পরে একটা মোটা ভারী খাতা খুলে আমার পৃষ্ঠা বের করে দেখবেন খাতার প্রদেয় টাকাটা আছে কি না, যদি থাকে তা হলে প্রদেয় টাকাটা বাদ দিয়ে আমার জমায় কত টাকা থাকল তা লিখে খাতাটা বন্ধ করে চেকটা ছেড়ে দিতেন, তখন তিনি অথবা আগের সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি কিংবা চতুর্থ এক ব্যক্তি চেক-সহ খাতাটা নিয়ে গিয়ে দিতেন খাঁচার মধ্যে উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে, তিনি আমার টোকেন নম্বর ডাকলে আমি টোকেনটা দিয়ে চেকের উল্টো পিঠে সই করে আমার কাঙ্ক্ষিত টাকাটা হাতে পাব। আমি ব্যাপারটা যতটুকু সময়ে বর্ণনা করলাম বাস্তবে কিন্তু সে সময়ে ঘটত না, পুরো প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হতে আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা সময় লাগত, সাধারণত এক ঘণ্টাই লাগত। আজকাল কাউন্টারে চেক জমা দেওয়ার সময় থেকে হাতে টাকা পেতে পাঁচ মিনিটও সময় লাগে না। এর উপরে এটিএম-এ যে কোনও সময় গিয়েই টাকা পাওয়ার সুবিধার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। তা হলে দেখতে পাচ্ছি যে আগেকার দিনে যে-কাজ ঘণ্টাখানেক ধরে অন্তত চার ব্যক্তি, কখনও কখনও পাঁচজনে, সম্পন্ন করতেন সেই একই কাজ এখন একজনে মাত্র পাঁচ মিনিটে করছেন। এর ফলে অপর তিন-চার ব্যক্তি অতিরিক্ত অর্থাৎ কর্মহীন হয়ে পড়ছেন।

মহাত্মাজির মূল বক্তব্যটা একেবারে ঠিক ছিল। কল-কারখানা, যন্ত্র, প্রযুক্তি ইত্যাদি অবশ্যই পুরনো পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলোকেও ভেঙেচুরে দেবে। এই তো মহাত্মাজির কলের শিল্পের বিরোধিতার বৃত্তান্ত যার মূল লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের কর্মচ্যুতির বিরোধিতা।

কিন্তু কল-কারখানা করতে গেলে দেখা যায় যে অনেক মানুষ শুধু কর্মচ্যুতই হয় না, অনেকে বাস্তুচ্যুতও হয়। ব্রিটিশ সরকার ১৮৯৪ সালে সাধারণ মানুষের স্বার্থে জমি

অধিগ্রহণের এক আইন প্রণয়ন করেছিল। দুঃখের কথা এই যে একশো বছরেরও বেশি পুরনো এই আইনকে আজও আধুনিক অথবা যুগোপযোগী সংশোধিত রূপ দেওয়া হয়নি। এই আইনের দোষত্রুটিগুলো যথাসাধ্য নিরাকরণ করে ১৯৮৭ সালে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনকারীরা একটা খসড়া আইন প্রণয়ন করে সরকারকে বিতর্ক শুরু করার জন্য দিয়েছিল। কিন্তু একবার ১৯৯৮ সালে ও আর একবার ২০০৩ সালে বিষয়টা নিয়ে কিছু নাড়াচাড়া হলেও শেষ পর্যন্ত বাস্তবে কিছুই হয়নি। অথচ ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর। কারণ প্রশ্ন শুধু এই নয় যে জমি অধিগ্রহণ করা হল আর জমির মালিক উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ লাভ করল—ব্যস, মামলা খতম।

জমি অধিগ্রহণ করলে জমির মালিক তাঁর সেই জমি ও সেই নির্দিষ্ট জমির থেকে পাওয়া রোজগার হারান বটে, এবং পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ রূপে অর্থমূল্যও পান বটে, কিন্তু যে-কোনও জমি অধিগ্রহণের পরিণাম আরও দূরপ্রসারীই হয়ে থাকে। কোনও ভূমিখণ্ডের উপরে শুধুমাত্র সেটার স্বত্বাধিকারীর জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারটা নির্ভর করে না, আরও বহু মানুষের জীবনযাপনের অবলম্বন নির্ভর করে, যেমন প্রত্যক্ষভাবে ওই স্বত্বাধিকারীর গৃহকর্মে নিযুক্ত পরিচারক-পরিচারিকা, এবং অবশ্যই তার কৃষিকর্মের সঙ্গে যুক্ত কিষান-কিষানি। তা ছাড়া সিঙ্গুরের মতো এক লপ্তে বিরাট জমির মালিক বা মালিকদের উপর জীবনধারণের জন্য পরোক্ষভাবে নির্ভর করে স্থানীয় ছোটো দোকানি, ছুতোর, চর্মকার, রাজমিস্ত্রি, দরজি, গোয়ালা, গাড়োয়ান, রিকশওয়ালা, রজক, প্রামাণিক, পুরোহিত প্রভৃতি বহুরকম কায়জীবী মানুষ, যাদের জমি নেই অথবা থাকলেও খুব অল্প জমি থাকে, এরকম একটা গোটা নিম্নবিত্ত গ্রাম্য সমাজ। শিল্পের জন্য কৃষিজমি অধিগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এই গোটা সাধারণভাবে জমিহীন সমাজটাই তার প্রচলিত স্বাভাবিক জীবনধারণের উপায় হারিয়ে আর্থিক অর্থে তো বটেই, সামাজিক অর্থেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

সিঙ্গুরের প্রশ্নে বহু ফসলি জমির প্রশ্নও এসে গেছে। অনেকে সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন যে বহু ফসলি জমির বদলে এক ফসলি অথবা না-ফসলি জমিতে টাটার গাড়ি-কারখানা বানানো হোক। আজ যারা কৃষিজমিতে কারখানা বানানোতে আপত্তি জানাচ্ছে তাদেরই কাকা-মামা এককালে উর্বর কৃষিজমিতেই হিন্দ-মোটর গাড়ি-কারখানা স্থাপন করেছিল। যাকগে, গতস্য শোচনা নাস্তি।

এখন এক-ফসলি অথবা না-ফসলি জমিতে শিল্পস্থাপনের প্রস্তাবটার যথার্থতা বিচার করা যাক। এতক্ষণ যা লিখেছি তাতে এটা নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে যে শিল্পায়ন স্বাভাবিক ভাবেই কিছু মানুষের কর্মচ্যুতি, কিছু মানুষের বাস্তুচ্যুতি ঘটাবে, কিছু মানুষের আর্থিক ও সামাজিক বিপর্যয়ও ঘটাবে, কিছু মানুষের কয়েক প্রজন্ম ধরে আচরিত অভিজ্ঞ ও লালিত মূল্যবোধকেও বিধ্বস্ত করে দেবে। তবু আমরা কেউ শিল্পবিরোধী নই এবং পাছে কেউ আমাদের কপালে 'শিল্পবিরোধী' লেখা তকমা সেঁটে দেয় সেই আতঙ্কে সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে আছি। এখন আমাদের কাছে প্রশ্নটা হচ্ছে, শিল্পজনিত সংকটের বিরাট হাঁ-মুখের গহ্বরে কাকে ছুঁড়ে ফেলা হবে? বহু-ফসলি জমির ধনী কৃষককে, না এক-ফসলি বা না-ফসলি জমির দরিদ্র কৃষককে? একক্ষেত্রে কাকে উৎসর্গ করা হবে শিল্পযজ্ঞে?

ধনী কৃষক ও দরিদ্র কৃষকের পার্থক্যটা তো শুধু টাকার নয়, শিক্ষাসংস্কৃতিরও, পরিচিতজনগত প্রভাব ও সামর্থ্যেরও। সাধারণত ধনী কৃষকের সন্তানসন্ততি স্কুলকলেজে শিক্ষার সুবিধা পেয়ে থাকে অর্থাৎ জমি ছাড়াও অন্যান্য সূত্রে তারা উপার্জনে সক্ষম হয়ে থাকে, তার উপরে উপার্জনের জগতে ধনী কৃষকের আত্মীয়-পরিজনের, চেনাশোনা ও বন্ধু-বান্ধবদের যোগাযোগ সাধারণত বহু বিস্তৃতই হয়ে থাকে। ফলে জমি থেকে আয় বন্ধ হলে একজন বহু-ফসলি জমির ধনী কৃষক ততটা অসহায় হয়ে পড়ে না যতটা অসহায় একজন এক-ফসলি জমির দরিদ্র কৃষক অবধারিতভাবে হয়। অবশ্য একজন দরিদ্র কৃষক যতটা সহজভাবে ভিক্ষাকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারে একজন ধনী কৃষক ততটা সহজভাবে পারে না। আর একথা তো সর্বজনবিদিত যে ভিখারিদের সম্বল করে রাজনীতি হয় না, রাজনীতি করার জন্য ধনী কৃষকরাই উপযুক্ত পুঁজি। ফলে রাজনীতি আগে ধনী কৃষকদের স্বার্থই দেখবে, আসলে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই আন্দোলন করবে, সে-আন্দোলনকে সংগ্রামী কৃষকের আন্দোলন বলে গৌরবান্বিত করার ছলে মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের জন্য জরুরি মনের জোরটাকে ভেঙে দেবে, জমি হারানোর প্রাথমিক আবেগ ও বেদনাকে মাইকবাজি করে এমন তুঙ্গে নিয়ে যাবে যাতে অন্তত দু-একজন আত্মহননে উদ্বুদ্ধ হবে এবং ধনী কৃষকদের ভিড়ে দু-একজন গরিব মানুষ যদি সত্যিই আত্মহত্যা করে তবে সে-ঘটনাটাও রূপান্তরিত হবে রাজনীতির বাড়তি পুঁজিতে।

প্রকৃতপক্ষে বহু-ফসলি জমির বদলে এক-ফসলি বা পতিত-জমিতে শিল্প বসানো মানে অর্থনীতির দিক থেকে ঠিক হলেও মানবিকতার দিক থেকে সমান বেঠিক। কারণ এটা সত্য যে শিল্পায়ন মানেই কিছু লোকের কর্মচ্যুতি, কিছু লোকের বাস্তুচ্যুতি, কিছু লোকের অভ্যস্ত জীবনধারার বিনাশ, কিছু লোকের অনুসৃত অর্থনীতির দুর্ঘটন, কিছু লোকের পরম্পরালব্ধ মূল্যবোধের বিপর্যয়। এই সবকিছুকে অনিবার্য ও স্বাভাবিক জেনেও কি শিল্পায়ন চাই? এবার এই প্রশ্নটার উত্তর খোঁজা যাক।

এই একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বেরিয়ে কতকগুলি প্রশ্ন সহজেই সামনে এসে হাজির হয়। প্রথম প্রশ্ন : রাজ্যের উল্লিখিত অর্থনীতি, জীবনধারা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির স্বার্থে কৃষি-জমির ও কৃষি-ব্যবস্থার স্থিতাবস্থাকে রক্ষা করলে ও শিল্পায়নকে প্রতিহত করলে কি তা অধিকাংশ রাজ্যবাসীর তথা সাধারণভাবে রাজ্যের এবং শেষপর্যন্ত প্রতিরোধকারীদের পরবর্তী প্রজন্মের পক্ষে মঙ্গলকর হবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন : একবিংশ শতাব্দীর কোনও রাজ্যের মানুষ অথবা অধিকাংশের সমাজ কি বাইরের সমাজের থেকে নিরপেক্ষ-বিচ্ছিন্ন-সম্পর্কশূন্য হয়ে সম্পূর্ণভাবে আপন সমাজে উৎপন্ন সম্পদের উপর নির্ভর করে থাকতে পারে? তা হলে তৃতীয় প্রশ্নটা এই : রাস্তায় রাস্তায়, পত্রপত্রিকায়, টিভি চ্যানেলে চ্যানেলে ভোগ্য পণ্যের প্রচার-বিজ্ঞাপন, ফ্যাশন, প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র ইত্যাদি প্রভাব তথা যুগের প্রাত্যহিকতা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে আবহমান বাংলার (যদি 'আবহমান বাংলা' বলে কিছু বস্তু সত্যিই থেকে থাকে) কৃষিভিত্তিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারবে? অতঃপর চতুর্থ প্রশ্ন : বাংলার কৃষিভিত্তিক জীবনের অভ্যাস ও গ্রামীণতাকে আর পিতা-

পিতামহের আদর্শ, দৃষ্টান্ত ও শিক্ষাকে মান্য করে কৃষক পরিবারের সদস্যসংখ্যা অর্থাৎ জন্মসংখ্যাকে একই তলে, একই পৃষ্ঠতে, একই মাত্রাতে বেঁধে রাখা কি আদৌ সম্ভব হবে? এবার পঞ্চম ও সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন : ঐতিহ্য অনুসারী জন্মসংখ্যা ও গ্রামের প্রকৃতিদত্ত (আসলে অরণ্য উচ্ছেদ করে উদ্ধারিত) কৃষিজমির পরিমাপ আর কৃষিনির্ভর পরিবারের আকার এবং ওইসব পরিবারের আয়-ব্যয় এই চারটের মধ্যে কোনওরকম সামঞ্জস্য কি আদৌ সম্ভব?

প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার জায়গা নেব না, পাঠক-পাঠিকাকেই খুঁজে নিতে অনুরোধ জানাই।

সিঙ্গুরের প্রশ্নে রাজনীতিতে অভিজ্ঞ অনেক বিদ্বান বড়ো কলকারখানা ও বড়ো পুঁজিকে খারিজ করে ছোটো ছোটো শ্রমনিবিড় শিল্পস্থাপনার পরামর্শ দিয়েছেন। তা হলেই যেন বড়ো লোকের শোষণের হাত থেকে গরিব লোকরা বাঁচবে। কিন্তু এরকম ভাবে গরিবের বাঁচার কোনও দৃষ্টান্ত কি পরামর্শদাতারা দেখাতে পারবেন? বরং একাধিক গবেষক ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুরূপ উদ্যোগের থেকে উদ্ভূত বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে উল্লিখিত পরীক্ষার ফলে ছোটো ধরনের শিল্পের থেকে এক নতুন ধরনের অরক্ষিত, দুর্বল, নিরাপত্তাহীন, সহায়হীন শ্রমিক শ্রেণির বিকাশ হচ্ছে যাদের নির্মম শোষণের থেকে মুনাফা ঘুরেফিরে সেই গ্রামীণ ক্ষমতা-অধিকারীকুলই ভোগ করছে আর তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ শেষ পর্যন্ত চলে যাচ্ছে বৃহৎ পুঁজিরই গর্ভে। কিন্তু এর প্রতিকার কি ভূমি-সংস্কার করে কৃষিতেই সমস্ত উদ্যোগ ও সামর্থ্যকে উন্নয়ন-সূচিতে নিযুক্ত ও নিবদ্ধ করা? আপাত চোখে এটাকেই প্রথমে সমাধান বলে মনে হলেও পরে আরও একটু ভাবলে আরও অনেক প্রশ্ন সামনে এসে পড়বে।

কী ধরনের কৃষিকর্মকে অবলম্বন করলে রাজ্যের ইকোসিস্টেম সার্ভিস অর্থাৎ পরিবেশ পরিসেবা আর ন্যাচারল এনভায়রনমেন্ট মানে নৈসর্গিক পরিপার্শ্ব অক্ষত ও সুরক্ষিত থাকবে? এটা তো দেখাই যাচ্ছে যে আধুনিক কৃষিব্যবস্থার প্রয়োগে বহু কীটপতঙ্গ, পশুপাখি, উদ্ভিদ-ছত্রাক ইত্যাদি নিসর্গজ অস্তিত্ব বিপন্ন বা বিলুপ্ত হচ্ছে এবং পরিবেশ ও পারিপার্শ্বের রূপ ও স্বরূপ এমন সব পরিবর্তনের দিকে এগুচ্ছে যেগুলোকে ঘোর অশুভ ইঙ্গিত বলা যায়। মাটির উপরে কৃষি আর নীচে আর্সেনিকের নিঃশব্দ সঞ্চার একালের পরিবেশবিদদের একটা বড়ো দুশ্চিন্তার কারণ। প্রকৃতপক্ষে নিসর্গ-প্রকৃতির পক্ষে আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর কৃষি ব্যবস্থাটাও যথেষ্ট ক্ষতিকর।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। কৃষিক্ষেত্রে যত সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে, শিল্পক্ষেত্রেও কি তত মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে? এই প্রশ্নের সরাসরি কোনও উত্তর হয় না বলেই মনে করি। এটা তো ঘটনা যে প্রাচীন প্রযুক্তিবিহীন কৃষিক্ষেত্রে যত মানুষকে কাজ করতে হত, আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন কৃষিক্ষেত্রে তত মানুষের কাজ নেই। তাই বলে কি আধুনিক প্রযুক্তিকে বর্জন করে অধিক সংখ্যকের কর্মসংস্থানের দায়দায়িত্ব নিয়ে পূর্বপুরুষদের পালিত কৃষিকর্মে ফিরে যাব?

আরও একটা বড়ো কথা আছে। সেটা নিম্নবিত্ত আর মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মানুষের মানসিকতার কথা। নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ চাষের কাজও করে, একই চাষী মাথায় মুড়ির বোঝা নিয়ে মুড়ি হেঁকে বেচে, জয়নগরের মোয়া-চন্দ্রপুলি বেচে, আবার 'ফোল্ডিং ছাতা সারাই' বলে হেঁকে হেঁকে যায়, সেই একই মানুষ কখনও রাজমিস্ত্রির কখনও কলের মিস্ত্রির জোগানদারির কাজও করে, কখনও রাস্তা বানাবার কাজে কোদাল কাঁধে মজুর বনে যায়, কখনও শহরে এসে রিকশ চালায়, বাবুদের বাড়িতে মালি-চাকরের কাজও করে, বাজারে কখনও মুটেমজুরের কখনও বাজারের মুখে সবজির দোকানির ভূমিকা নেয়। তার রোজগার অনিয়মিত বা অল্প হতে পারে, কিন্তু সে খুবই কম একটানা কর্মহীন বা বেকার বসে থাকে। তার মানসিকতাই এই যে গতর খাটিয়ে যে কাজেই রোজগার হয় সে-কাজ করতেই সে রাজি। যেমন এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি সিঙ্গুরের বহু মানুষ সিঙ্গুরের কারখানা স্থাপনের কাজেই অর্থাৎ কৃষিকাজের বিকল্প কাজে গতর খাটিয়ে রোজগার করছে।

পক্ষান্তরে মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষ আপন মান-মর্যাদার উপযুক্ত কাজ না পেলে বরং বেকার থাকবেন, তবু যে-কোনও কাজে হাত লাগাবেন না, তিনি বেকার হলেও ভদ্রলোক বা বড়োলোক, তাই যাঁরা বাজারের সবজিওয়ালা বা বাজারের বাইরে অপেক্ষমাণ রিকশওয়ালাকে সাধারণত তুই-তোকারি করেন তাঁদের শ্রেণির মানুষই বেকার হন, তাঁরাই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখান, পত্রিকায় কর্মপ্রার্থীর কলমে বিজ্ঞাপন দেন, কারণ তাঁর বা তাঁদেরকাছে শ্রেণিগত অস্মিতা-সম্মত কর্মসংস্থানের প্রশ্নটা অত্যন্ত জরুরি। তাই শিল্পায়নের বা বিশেষভাবে সিঙ্গুরে গাড়ি-কারখানার ফলে কর্মসংস্থান কতটা হবে এই জিজ্ঞাসার জবাবে স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে অনেকগুলি অনুসারী শিল্প গড়ে উঠবে, অনেকগুলি অনুসারী চাকরির সুযোগ হবে এবং প্রচুর বিকল্প জীবিকার সুবিধে হবে।

সুতরাং সাধারণ বুদ্ধিতে ভবিষ্যতের জন্য যে-বাস্তবতা অনুমান করতে পারি তা মোটামুটি এইরকম যে আধুনিক যন্ত্রশিল্প মূল বা প্রধান কর্মক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারবে না, কিন্তু অনুসারী ও আনুষঙ্গিক শিল্পক্ষেত্রগুলিতে এবং সেইসঙ্গে বিকল্প জীবিকার ক্ষেত্রগুলিতে অবশ্যই বহু মানুষের কর্মসংস্থান বা উপার্জনের ব্যাপক ব্যবস্থা হতে পারবে। উপরন্তু শিল্পায়িত ক্ষেত্রে যে-অর্থনীতির আমদানি হবে তা আরও বিপুল সংখ্যক নিম্নবিত্ত মানুষেরও আয়-ব্যয়ের ক্ষমতাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবে। আমি নিজে বেঙ্গালুরু, গুরগাঁও, হায়দ্রাবাদ, মুম্বাই, পুণে প্রভৃতি শহরে লম্বালম্বা থেকে দেখে এসেছি যে ওসব শহরে গৃহকর্মের জন্য ঠিকে লোকের মাইনে কলকাতার চেয়ে অন্তত তিন-চার গুণ বেশি, গুরগাঁওয়ে সাইকেল-রিকশর ভাড়া কলকাতার রিকশর ভাড়ার চেয়ে দশ গুণ বেশি, কলকাতার কলের মিস্ত্রির চেয়ে হায়দ্রাবাদের কলের মিস্ত্রির দর একই কাজের জন্য চারগুণ বেশি, বম্বে-বেঙ্গালুরুর বাসা ভাড়া কলকাতার বাসা ভাড়ার চেয়ে পাঁচ-ছ গুণ বেশি। তা ছাড়া শিল্পায়িত অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-বাজার, ব্যাঙ্ক-বিমা ইত্যাদির তৎপরতা বহুগুণ বাড়বে, এবং এসব ক্ষেত্রেও বিপুল পরিমাণে

কর্মসংস্থানের অবকাশ বাড়বে। এমন কী অঞ্চলের অর্থনীতির উন্নতি-সাধনের পরিণামে পুজোর প্যান্ডেল, সংস্কৃতির বিচিত্র অনুষ্ঠানের মঞ্চ-নির্মাণ সম্পর্কিত কারিগর ও কর্মিবৃন্দ, সংগীতকার, বাদ্যশিল্পী, ডেকোরেটর, মাইকওয়ালা, ট্যাক্সিওয়ালা ইত্যাদিও লাভবান হবেন।

অবশ্য কেউ যদি মনে করেন যে 'ধরণীর এক কোণে রহিব আপন মনে; ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা'-ই তাঁর বহুদিনের 'আশা', তা হলে নিশ্চয়ই তাঁর 'গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা, ঘরে-আনা গোধূলির সন্ধ্যাটির তারা, চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে, ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে' ইত্যাদিকে ঘিরে জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসাকে ভরে তোলবার অধিকার আছে। কিন্তু অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ যদি অন্যরকম আশা করে, যদি বিজলি-বাতি-পাখা-ফ্রিজ-টিভি চায়, যদি পাকা বাড়ি পাকা রাস্তা চায়, কল খুলে জল চায়, শোবার ঘরের পাশে নাবার ঘর চায়, দরজা-জানালায় পর্দা, সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা উন্নত জীবনধারা, ব্যাঙ্কে সঞ্চয়, স্বাস্থ্য-বিমার সুরক্ষা চায়, গ্রীষ্মে কোডাইকানাল কি কুলু-মানালি ভ্রমণের শখ করে তা হলে সেসবগুলো অধিকাংশের সমষ্টিগত কামনা হয়ে ওঠে এবং তখন সেই সমবেত কামনা পূরণের পথে কারও আপন মনের 'আশা' নিয়ে কাঁটা হয়ে থাকাটা কি নৈতিক? ব্যক্তির অবশ্যই কিছু অধিকার যেমন আছে তেমনই নৈতিক দায়-দায়িত্বও আছে। অধিকাংশের তথা সমাজের চাওয়ার সঙ্গে যখন ব্যক্তিবিশেষের চাওয়া মেলে না, উপরন্তু ব্যক্তিবিশেষের চাওয়ার সঙ্গে সমাজের চাওয়ার বিরোধ বাধে তখন সমাধানটা কী হবে? এটা একটা গভীর নৈতিকতার বিতর্ক। এখন সেই বিতর্কের গোলকধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করা উচিত হবে না। প্রকৃতপক্ষে মহাত্মাজিও একটা নৈতিক বিতর্কই তুলেছিলেন। অথচ কোনও নৈতিক বিতর্কেরই চূড়ান্ত কোনও সমাধান হয় না।

তবে অর্থনীতিতে অজ্ঞ হয়েও দেখতে পাই যে জগৎ-সংসারের একটা নিজস্ব অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া আছে, একটা নিজস্ব অর্থনৈতিক দাপট আছে এবং সেগুলোকে বুঝে নিয়ে মানুষের আশাগুলোকে পূরণ করার প্রয়াসটাই বাঞ্ছনীয়। অর্থনীতির একটা অনিবার্য সত্য হচ্ছে যে বাজারে খাবার জিনিস, জামাকাপড়, বাড়ি বানাবার ও মেরামতির মালপত্র ইত্যাদি একান্ত জরুরি জিনিসগুলোর দরদাম ক্রমাগত বেড়ে চলে। সুতরাং কেউ যদি 'একটুকু বাসা' নিয়ে 'ধরণীর এককোণে' আপন মনে পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকতে চান তা হলে নৈতিকতার প্রশ্নে না হলেও অর্থনৈতিকতার প্রশ্নে তাঁর সামান্য অস্তিত্ব অচিরে সাঙ্ঘাতিক সংকটগ্রস্ত হবে—হবেই। এমন কী স্থানীয় অঞ্চলে যেসব খাবার জিনিস ফলানো, যেসব পরবার জিনিস বানানো, বাড়ি বানাবার যেসব ইট পোড়ানো হবে সেসব জিনিসেরও দাম বাইরের বাজারের টানে বছরে বছরে বাড়বে—বাড়বেই। এটা তো গেল স্থানীয় বা ভেতরের বাজারের অর্থনৈতিকতা। এবার বাইরের বাজারের অর্থনীতির কথাটা খোঁজ করে দেখা যাক। শুধু বঙ্গ-বিহারের মানুষের কেনার ক্ষমতা বিচার করে পেট্রল ও পেট্রলজাত পণ্য, লোহা, সিমেন্ট, সর্ষে ও সর্ষের তেল, অড়হর-মুগ-মুসুর ইত্যাদি ডাল, নুন-চিনি ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সারা দেশ জুড়ে নির্ধারিত হবে না,

সমস্ত জিনিসেরই দাম নির্ণীত হবে কর্নাটক-গুজরাট-পাঞ্জাব-হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যবাসীর ক্রয়ক্ষমতাকেও বিবেচনার অন্তর্গত করে, তাছাড়া সাধারণভাবে দেশব্যাপী বাজারেরও একটা নিজস্ব গতিপ্রকৃতি আছে যা পণ্যমূল্যকে নির্দয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সে গতি-প্রকৃতির কাছে কোনও বিশেষ রাজ্যের আর্থিক সামর্থ্যের প্রসঙ্গটা একেবারে অবান্তর। আমার আশঙ্কা, এমন দিন আসবে না তো যখন ভারতের কিছু রাজ্যের অধিবাসীরা ঝনঝন করে টাকা ফেলে বাজার কিনবে আর কিছু রাজ্যের অধিবাসীরা সবুজ ধানখেতের উপর দিয়ে সাদা বকের ঝাঁক উড়ে যাওয়ার শোভার মতো বাজার উড়ে যাওয়ার আশ্চর্য দৃশ্য হাঁ করে দেখবে।

একদল রাজনীতিবিদ বলছেন বটে যে সিঙ্গুরে বা কৃষিজমিতে না করে পশ্চিম রাঢ়ের অনুর্বর জমিতেও তো গাড়ি-কারখানা বানানো যেতে পারে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু সেটা তো শেষপর্যন্ত শিল্পপতির পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। তিনি যদি অন্য রাজ্যেও ওই শিল্পস্থাপনের সহজ সুযোগ পান (এখানে 'সহজ সুযোগ'-এর ব্যাপারটা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়, ব্যাপারটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা সিঙ্গুরের আন্দোলনকারীরাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন), যদি সেখানে তাঁর পছন্দের সময়সীমার মধ্যে উৎপাদন শুরু করতে পারেন, যদি সেখানে জমির স্বত্বলাভ থেকে বাজারে পণ্য বিক্রয় করা পর্যন্ত সমস্ত কাজটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার অধিকতর সম্ভাবনা দেখতে পান তা হলে সেখানেই তিনি শিল্প স্থাপন করবেন। যেভাবে মরাঠি বংশোদ্ভূত মহারাষ্ট্রে, গুজরাটি বংশোদ্ভূত, গুজরাটে; তামিল বংশোদ্ভূত তামিলনাড়ুতে, কন্নাড়ি বংশোদ্ভূত কর্নাটকে শিল্পস্থাপনে আগ্রহ নিয়ে থাকেন সেভাবে পশ্চিমবাংলায় শিল্পস্থাপনে উদ্যোগ নেওয়ার মতো বাঙালি বংশোদ্ভূত শিল্পপতিকে কি দেখতে পাচ্ছি? তেমন কোনও বাঙালি শিল্পপতির যতক্ষণ না নাট্যমঞ্চে প্রবেশ ঘটছে ততক্ষণ অবাঙালি শিল্পপতিদের মন-মর্জি জয় করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে—এটাই হচ্ছে বাস্তব সত্য।

আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি। উনিশশো একাত্তর সালে এম এফ হুসেন হরিয়ানার উপরে যে-তথ্যচিত্র বানান তাতে তাঁকে সাহায্য করতে গিয়ে দেখেছিলাম যে দিল্লির কাছে গুরগাঁও সবুজ কৃষিজমি দিয়ে ঘেরা এক অখ্যাত টিমটিমে শহর যার পথেঘাটে ময়ূর ঘুরে বেড়ায়, যা সবে একটু পরিচিতি পেয়েছে মারুতি গাড়ি বানাবার কারখানা বসানোর দৌলতে। পঁয়তিরিশ বছর পরে গিয়ে দেখি গুরগাঁও হয়ে গেছে রূপকথার এক দেশ। দিল্লি বিমান বন্দর থেকে ফ্লাইওভার দিয়ে সেখানে মাত্র দশ-পনেরো মিনিটে পৌঁছনো যায়। বিশাল বিশাল অট্টালিকা এক-একটা অলকাপুরী। একদা দ্রোণাচার্যকে গুরুদক্ষিণা হিসেবে কুরু-পাণ্ডবদের দেওয়া এই নগণ্য গাঁ, এই গুরু-কা-গাঁওই এখন ভারতে বিক্রেতাদের সর্বাগ্রগণ্য বিপণন-নগর। নগরাঞ্চল ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলে গেলে কৃষকের বাড়ির বিশাল লোহার ফটকের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় উঠোনের মাঝখানে চারপাইয়ের উপর বসে বৃদ্ধ লম্বা নলের হুঁকো টানছেন, উঠোনের এক পাশে কয়েকটা মহিষ, অন্যপাশে দু-তিনটে ছোটো ও বড়ো মোটর গাড়ি। আবার এমন কৃষকের কথাও শুনলাম, যিনি

বংশের প্রথম ম্যাট্রিক পাশ, কিন্তু শিল্পের জন্য কৃষিজমি বেচে দিয়ে ছেলেকে পাথ্‌ওয়েজ ওয়ার্ল্ড স্কুলে পড়াচ্ছেন ভবিষ্যতে সে কেউটকেটা হবে এই প্রত্যাশায়। এই স্কুলে প্রাথমিক স্তরে পড়ার খরচ বছরে তিন লাখ, মাধ্যমিকে বছরে পাঁচ লাখ টাকা। এটাও দেখলাম যে পশ্চিমবঙ্গ থেকেও অল্পশিক্ষিত বা প্রায়-অশিক্ষিত মানুষও গুরগাঁওয়ে গিয়ে হাজির হয়েছে দারোয়ান পরিচালক মালি প্রভৃতির কাজ করে ভালো রোজগারের ধান্দায়।

আমার এই সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বর্ণনার ভেতরে একটা বক্তব্য পাঠকের চোখে পড়েছে আশা করি। সেই বক্তব্যর উপরে কেউ কেউ অবশ্যই মন্তব্য করতে পারেন যে হরিয়ানার মানুষ আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এক নয়, দু রাজ্যের ভূমিব্যবস্থাও দুরকম। এর সঙ্গে এটাও যোগ করতে পারি যে এক রাজ্যের রাজনীতি বাঁকার কাঁকড়ার রাজনীতি, আর-এক রাজ্যের রাজনীতি পাখির ঝাঁকের রাজনীতি। আর এটাও ঠিক যে শিল্পপতিরা যেখানে পছন্দমতো শর্তে ও স্থানে শিল্পস্থাপন করতে পারবেন সেখানেই শিল্প গড়বেন, সেখানেই পুঁজি বিনিয়োগ করবেন। অবাঙালি শিল্পপতির কোনও ভাবাবেগ থাকার কথা নয় যে বাংলাতেই শিল্প প্রতিষ্ঠা করবেন। যে-রাজ্যে তিনি সুবিধে বেশি পাবেন সে-রাজ্যেই যাবেন। তার ফলে জোয়ার আসবে সেসব রাজ্যের অর্থনীতিতে।

আজ থেকে বারো-তেরো বছর পরে দেশে জিনিসপত্রের দরদাম অনিবার্যভাবেই যে-মাত্রায় পৌঁছবে কৃষি-সর্বস্ব শিল্প-শুষ্ক রাজ্যের অধিবাসী বছরে একই জমিতে বহু ফসল ফলিয়েও সে দরদামের মাত্রা স্পর্শ করতে পারবে এমন আশা করার কোনও কারণ নেই। এমনকী আইন-ইঞ্জিনীয়ারিং-ডাক্তারি প্রভৃতি বহুকালের প্রচলিত শিক্ষাগুলির জন্য খরচও এতগুণ বেড়ে যাবে যা খুব কম সংখ্যক কৃষি-নির্ভর পরিবারই পোষাতে পারবে। ইতিমধ্যে তথ্য প্রযুক্তি, জৈব প্রযুক্তি, সুপ্রজনন প্রযুক্তি প্রভৃতি শিক্ষার জন্য অন্যান্য রাজ্যে প্রবর্তিত হচ্ছে নতুন নতুন বিভাগ, নতুন নতুন ব্যবস্থা এবং এসব ক্ষেত্রে কর্ম-সংস্থানের বিশাল সুযোগের দরজা ক্রমশ খুলতে শুরু করেছে।

সময় ছুটে চলেছে সমস্তরকম রক্ষণশীল মানসিকতা ভেঙেচুরে প্রচণ্ডবেগে, আরও বেগে। নতুন নতুন বিদ্যা, নতুন নতুন জীবিকা, নতুন নতুন প্রযুক্তি, নতুন নতুন ক্ষেত্রে কর্ম-সংস্থানের বিশাল জগৎ উন্মুক্ত হচ্ছে মানুষের সামনে। সকলেই এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষই কি শুধু কৃষি না শিল্প নিয়ে বিতর্কের জালে জড়াজড়ি করে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাব?

# উন্নয়ন, প্রকৃতি, জনগোষ্ঠী, পরিবেশ
## —একটি অন্য প্রস্তাবনা

### শুভেন্দু দাশগুপ্ত

এই লেখা এখন এখানে যে উন্নয়ন বিতর্ক চলছে তাতে অংশ নেওয়ায়। বিতর্কে বিষয়টা, যা নিয়ে এই লেখা, আসছে, তবে মাঝখানে নয়, পাশে। বিষয় উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক। লেখার প্রথম সমস্যা এই দুটো কথা 'উন্নয়ন' এবং 'পরিবেশ' এদের একটা বা দুটো মানে নেই। অনেক অনেক মানে। আর এই অনেক অনেক মানে বলেই তর্ক অনেক অনেক ধরনের। সেই তর্কে ঢুকতে গেলে এই লেখা আর শেষ হবে না। তবু বললাম খেয়াল রাখার জন্য। এবং এটাও আমি খেয়াল রাখছি যে মানে নিয়ে লিখব সেটাই যে ঠিক এমন দাবি কিংবা অহংকার আমার নেই। কোনো একটা মানে আমার মাথায় আছে, সেটা বলছি না। বললে তর্কটা সেখানেই থেমে যাবে। যা মাথায় আছে তাই নিয়ে শুরু করবো। লিখতে লিখতে আমার কাছের মানেটা বেরিয়ে আসবে। হয়তো।

এখন এখানে উন্নয়ন বিতর্কে চাষের জমি কারখানার জন্য দিয়ে দেওয়া নিয়ে এই একটা বাক্য নিয়ে, পরিবেশের নানা বিষয় নিয়ে কথা বলে দেওয়া যাবে। আমরা আপাতত সেটা চাইছি না। আমরা প্রথমে উন্নয়ন বিতর্কের বিষয়টাকে বড় করতে চাইছি। আমরা বলতে চাইছি বিতর্কটা প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের পরিবর্তন নিয়ে।

প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে আমরা এই মুহূর্তে ধরছি জমি, জমির উর্বরতা, শস্য, বীজ, জল; মাটির উপরে থাকা এবং মাটির নীচে থাকা জল, অরণ্য, বৃক্ষ, উদ্ভিদ, নদী, সমুদ্র, সমুদ্র উপকূল, বাতাস, জীব বৈচিত্র্য, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের জীব বৈচিত্র্য। এইসব মিলে মিশে প্রাকৃতিক সম্পদ। নিশ্চয়ই আরো কিছু আছে। আর এসব কিছুর সাথে সংযুক্ত আছে পরিবেশ, পরিবেশ উপাদান, আলাদা আলাদা, জড়িয়ে জড়িয়ে।

এখন এখানে তর্কটা এই প্রাকৃতিক সম্পদ, এদের ব্যবহার নিয়ে, ব্যবহারের ধরন নিয়ে, ব্যবহারের পরিবর্তন নিয়ে, উদ্দেশ্য নিয়ে, ব্যবহারকারীর পরিচয় নিয়ে।

এই বড় তর্কটায় আমরা ঢুকছি একটা জায়গা দিয়ে, কোনো একটা জায়গা থেকে শুরু করতে হবে, তাই।

এখন অর্থনীতিতে, এই পর্যায়ে, পুঁজির বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় জায়গা প্রকৃতিক সম্পদ। পুঁজি বলতে আমরা সামনের দিকে রাখছি ব্যক্তি পুঁজি, সংস্থা পুঁজি, ঋণসংস্থা পুঁজি, বিনিয়োগ সংস্থা পুঁজি, পিছনে রাখছি সরকারি পুঁজি।

অর্থনীতির এক একটা পর্যায়ে, বড় করে বললে উন্নয়নের এক একটা স্তরে, ছোট করে বললে শিল্পায়নের এক একটা সময়ে এক একটা জায়গা জোর পায়। এখন তেমনি প্রাকৃতিক সম্পদ। পুঁজি তার বিনিয়োগের জায়গা বদলে বদলে এখন এখানে, প্রাকৃতিক সম্পদে। এমন কথা বললাম কী দিয়ে? একটা চটজলদি উত্তর প্রযুক্তি দিয়ে।

প্রযুক্তি ও পুঁজির মধ্যে এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। এই সম্পর্ক বদলে বদলে গেছে, যাচ্ছে। পুঁজি উৎপাদন করতে চেয়ে বিনিয়োগ করতে চেয়েছে। উৎপাদন করতে চেয়ে প্রযুক্তি চেয়েছে। প্রযুক্তি চেয়েছে পণ্যের, পণ্যের উৎপাদনের কথা মাথায় রেখে। এই বানাতে চাই, এই রকম প্রযুক্তি চাই। প্রযুক্তি তখন পণ্যের উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে মুনাফা। মুনাফার জন্য প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার প্রধান রসদ হয়ে গেছে প্রযুক্তি। যার প্রযুক্তি উন্নত, বাজার তার দখলে, মুনাফা তার দখলে, অতএব প্রযুক্তিতে, প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিনিয়োগ, এবং যা পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগের থেকেও বেশি জরুরি। বেশি জরুরি হয়ে গেল, হয়ে থাকলো। এই যে প্রযুক্তির ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া, প্রযুক্তি পণ্য, উৎপাদনের ওপর তার নির্ভরশীলতা থেকে পণ্যকে, উৎপাদনকে তার ওপর নির্ভরশীল করে দিল।

আগে প্রযুক্তি তারপর তার মতন করে উৎপাদন ব্যবস্থা, পণ্য নির্বাচন এবং বিনিয়োগ। প্রযুক্তি বলে দেয় বিনিয়োগ কোথায় এবং পণ্য কী। বিষয়টা যত সহজে বললাম ততটা নয়। এর জটিলতা আছে, টানাপোড়েন আছে এবং তর্ক আছে। আমরা আপাতত এই তর্ক পেরিয়ে যাবো অন্য তর্কে সময় বেশি দেব বলে।

তর্কটা এড়িয়ে গিয়ে যেটা বলার ছিল সেটা বলে ফেলি। এখন প্রযুক্তির সাম্প্রতিক জায়গা প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে। ইংরেজি নাম এইরকম সব—বায়ো টেকনোলজি, মলিকুলার বায়োলজি, টিস্যু কালচার, ন্যানো টেকনোলজি, জেনেটিক্যাল ইনজিনিয়ারিং, মাইক্রোবায়োলজি এইসব। এইসব প্রযুক্তি প্রয়োগের জায়গা উদ্ভিদ জগৎ, প্রাণী জগৎ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ। অতএব এইসব পুঁজির বিনিয়োগেরও জায়গা।

আর এক দিক দিয়ে বিষয়টা বোঝা যেতে পারে। সরকারের নীতি, প্রকল্প, আইন বদলাচ্ছে। তৈরি হচ্ছে কোন দিকে সেটা বুঝে নিয়ে। আমরা দুটো একটা উদাহরণ নিয়ে আমাদের কথা সাজাবো। একটা উদাহরণ বীজ বিল। পার্লামেন্টে জমা পড়েছে। আইন হয়ে যাবে। বীজ বিলে বলা আছে ছোট করে বললে এইরকম—আমাদের দেশের চাষিরা যে বীজ ব্যবহার করেন তা অদক্ষ, অউন্নত, তাছাড়া সেই বীজের গুণাগুণের তথ্য সরকারের কাছে নেই। সরকার মনে করছে তার কাছে থাকা দরকার। অন্যদিকে বীজ কোম্পানিরা যে বীজ বানিয়েছে তা দক্ষ, উন্নত এবং তার বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া যায়। সরকার বললো দুটো মূল কথা। এক, বীজ কোম্পানির বীজ দিয়ে চাষির বীজ সরিয়ে দেওয়া হবে। দুই, চাষিকে তার বীজের তথ্য নথিভুক্ত করতে হবে। যা একজন সাধারণ চাষির পক্ষে করা সম্ভব নয়। আর বীজ সরকারের কাছে নথিভুক্ত না করতে পারলে সেই বীজ, তার নিজের বীজ, চাষি ব্যবহার করতে পারবেন না। মোদ্দা কথা হলো প্রাকৃতিক সম্পদ, বীজ, চাষির নিজের বীজ তাকে বাতিল করো আর বীজ নিয়ে প্রযুক্তি, বিনিয়োগ, পণ্য উৎপাদন, মুনাফা নিয়ে পুঁজির যে সাম্প্রতিক জায়গা, তাকে সুযোগ করে দেওয়া, মেনে নেওয়া। প্রাকৃতিক সম্পদ বীজের ওপর পুঁজির আধিপত্য স্বীকার করে নেওয়া।

দ্বিতীয় উদাহরণ, মেধাস্বত্ব অধিকার আইন। নতুন এই আইনে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর উদ্ভাবকের মেধাস্বত্বের অধিকার মনে নেওয়া হলো যা পুরনো ব্যবস্থায় ছিল না।

এখন পুঁজি, পুঁজির আওতায় থাকা উদ্ভাবন, সেই উদ্ভাবনের আধিপত্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর, তা আইনি স্বীকৃতি পেল।

এইসব কথা বলে, উদাহরণ দিয়ে, আমরা বলতে চাইছি পুঁজির বিনিয়োগের নিয়ন্ত্রণের সাম্প্রতিক ভূমি প্রাকৃতিক সম্পদ।

এই যে আমরা দেখাতে চাইছি প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর পুঁজির নজরের বৃদ্ধি। এর বিপরীতেই রাখতে চাইছি প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের জীবযাপনের সম্বন্ধ।

আমাদের দেশে ভৌগোলিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থনীতিক, ঐতিহাসিক কারণে বেশিরভাগ, বেশির ভাগই মানুষমানুষীর জীবনযাপন, বেঁচেবর্তে থাকা, নানাভাবে বেঁচে থাকার ভিত্তি প্রাকৃতিক সম্পদ।

প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক জীবনযাপনের রসদের তালিকা বিশাল, অঞ্চল ভেদে, অবস্থা ভেদে তার তারতম্য থাকলেও। একটা মোটাদাগের হিসেব এই রকম—প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে মানুষ পায় শস্য, খাদ্য, ঔষধ, জল, জ্বালানি, সার, গৃহস্থালি দ্রব্য, ছোট শিল্পের উপাদান, বাসস্থান নির্মাণ ও মেরামতির উপকরণ, বাতাস, সংস্কৃতির রসদ, পশুপালন উপাদান, পরিবহন, এইসব, আরও অনেক সব।

প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে এই যে দুটো দিক—পুঁজির বিনিয়োগের জায়গা, আর মানুষের জীবনযাপনের রসদ—এই দুটো দিক পরস্পরের বিপরীত, বিরুদ্ধ। এই বিরুদ্ধতা এখন প্রকাশিত। এই বিষয়টায় আমরা এখন ঢুকবো না। পাশে রেখে দিচ্ছি, পরে ঘুরে আসবো।

এই দুটো দিকের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের আলোচনার তৃতীয় দিক—পরিবেশ। আগেই বলে রেখেছি পরিবেশ কী সেটা এক কথায় বলা যায় না এবং দিন দিন পরিবেশের আওতা বড় হয়ে যাচ্ছে। অনেক অনেক কিছু এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, ঢুকিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

পরিবেশ নিয়ে দুটো কথা এখন সামনে চলে আসছে। এক, পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে, ক্ষতি বাড়ছে। দুই, পরিবেশ বাঁচাতে হবে, সংরক্ষণ করতে হবে। এই দুটো কথা পরিবেশ নিয়ে ভাবনা, প্রয়োগ, নীতি, আইন, প্রকল্প, প্রচার, আন্দোলন, সচেতনা, শিক্ষা, চুক্তি, সম্মেলন, তর্ক এসবের মধ্যে রয়েছে, প্রধান হিসাবে রয়েছে।

মানা হচ্ছে এবং হচ্ছে না পুঁজির বিনিয়োগ এবং পণ্য উৎপাদনে, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে প্রাকৃতিক সম্পদের এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে যুক্ত পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে।

সাম্প্রতিক উন্নয়ন বিতর্ক থেকে উদাহরণ দেওয়া যায়। চাষের জমিকে শিল্পের জন্য দিয়ে দিলে পরিবেশের নানা উপাদানের ক্ষতি হয়। জমি দেওয়া মানে জমির উর্বরতার ক্ষতি। যে উর্বরতা তৈরি করতে প্রকৃতি অনেকদিন সময় নেয়, জমি ভিত্তিক জীব বৈচিত্র্য যা প্রকৃতির, মানুষের, প্রাণীর, পৃথিবীর বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় রসদ তা ধ্বংস হওয়া, জল কমে যাওয়া, আর তৈরি না হওয়া। বিশুদ্ধ বাতাস কমে যাওয়া, আবহাওয়ায় ক্ষতিকর পরিবর্তন আসা এইসব এইরকম সব।

ক্ষতির বিপরীতে আসে রক্ষার, সংরক্ষণের কথা। পরিবেশ রক্ষার কথা।

আর ঠিক এইখানে আমরা আনবো আমাদের আলোচনা কাঠামোর চতুর্থ দিক—

অধিকার বিষয়। পরিবেশ নিয়ে, পরিবেশ রক্ষা নিয়ে অধিকার প্রশ্ন। এবং এই লেখার প্রেক্ষিতে বলা যায় উন্নয়ন বিতর্কে অধিকার ভাবনা নিয়ে আসা।

অধিকার ভাবনার পরিধি প্রতিক্ষণে বড় হয়ে চলেছে। আমরা এই আলোচনায় অধিকার ভাবনায় দুটি নতুন সংযোজন আনবো, ভাবনা বিস্তৃত হয়ে চলার সুযোগে।

প্রচলিত অধিকার ধারণায় অধিকার একজন ব্যক্তির। আমরা আনতে চাইছি গোষ্ঠীর অধিকার ধারণা। অধিকার ভাবনায় নতুন বর্গ—গোষ্ঠী। তেমনি আনতে চাইছি অধিকারের নতুন বিষয়—প্রকৃতি। একসঙ্গে মিলিয়ে রাখলে প্রকৃতি বিষয়ে গোষ্ঠীর অধিকার। প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ে গোষ্ঠীর অধিকার। প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক পরিবেশ বিষয়ে গোষ্ঠীর অধিকার। মানব সমাজের নির্দিষ্ট বিষয়ে গোষ্ঠীর অধিকার। আসলে আমরা চাইছি গোষ্ঠী, প্রাকৃতিক সম্পদ, অধিকার এই সম্বন্ধের স্বীকৃতি, মান্যতা। আমাদের আলোচনার যাত্রা এই দিকে।

আমাদের অধিকার ভাবনার উপাদান প্রকৃতি। প্রকৃতি বলতে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জীব বৈচিত্র্য, যাদের কথা আমরা আগে বলে রেখেছি।

প্রাকৃতিক সম্পদের উদাহরণ যেমন অরণ্য, নদী, সমুদ্র, ভূমি ইত্যাদি। প্রকৃতির এই কটি উদাহরণ রাখলাম এই কারণে যে এখানে প্রকৃতি-মানবমানবী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। যেমন অরণ্য—অরণ্যবাসী, নদী—নদীতীরবাসী, সমুদ্র—সমুদ্রউপকূলবাসী, ভূমি—ভূমিবাসী এইরকম। এক একটি গোষ্ঠীর প্রকৃতি ভিত্তিক, এক একটি প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর জীবনযাপন নির্মিত হয়ে আছে। এই নির্মাণ সহাবস্থানের। একজনের স্থায়িত্বে অন্যজনের স্থিতি। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনীতির পরিবেশ তৈরি হয়েছে, হয়ে আছে।

এই সম্বন্ধে, স্থিতাবস্থায় সাম্প্রতিক হস্তক্ষেপ পুঁজির। আমরা আগে বলেছি বীজবিলের কথা। এখানে আবার বলি প্রাসঙ্গিকতায় বিশ্লেষণে। আমাদের প্রথম উদাহরণ বীজের সঙ্গে কৃষকের সম্পর্ক; প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। কৃষক বীজ সংগ্রহ করে, সঞ্চয় করে, রোপণ করে, সংরক্ষণ করে, বিনিময় করে, বিতরণ করে। বীজ কৃষকগোষ্ঠী, সমাজের বিষয়। বীজজ্ঞান, লোকজ্ঞান, সামাজিক জ্ঞান। কৃষকের বীজ পুঁজি বিনিয়োগ, উৎপাদন, মুনাফা, পণ্য, বাজার এই কাঠামোর বাইরের বিষয়। বাইরে রাখতে চায় না পুঁজি। তার আর্থনীতিক কাঠামোর ভিতরে নিয়ে আসতে চায়। আনলো। বীজ এখন নির্মিত হয়, বীজ নির্মাণের প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে, বীজ নির্মাণের সংস্থা হয়েছে। পুঁজির বিনিয়োগ হয়েছে, পুঁজির মুনাফা অংক কষে বীজের দাম নির্ধারিত হয়েছে। বাজার হয়েছে। পুঁজির এই ব্যবস্থা সফল হতে পারে না কৃষক-বীজ সম্পর্ককে না ভাঙতে পারলে। ভেঙে দেওয়ার উদ্যোগ, ভারত সরকারের উদ্যোগ বীজ বিল, যা বীজ আইন হতে চলেছে। বীজ বিলে বলা আছে আগে বলেছি, এখানে বলা দরকার বলে আবার বলছি, কৃষক সংগৃহীত বীজ অদক্ষ, পুঁজি নির্মিত বীজ দক্ষ। কৃষকের বীজ সরিয়ে দিয়ে পুঁজির বীজ আনা হবে। কৈফিয়ৎ বানানো হয়েছে—কৃষকের বীজের রাসায়নিক গুণাগুণের কোনো তথ্য নেই। সেই তথ্য জানার জন্য কৃষককে তার বীজ সরকারের কাছে নথিভুক্ত করতে হবে। নথিভুক্ত না করা বীজ বেআইনি বীজ। কৃষকের নিজের বীজ, বেআইনি বীজ কৃষকের কাছে রাখা

দণ্ডনীয় অপরাধ। এইসব ব্যবস্থাবিধানের উদ্দেশ্য কৃষকের বীজ সরিয়ে দিয়ে পুঁজির বীজ নিয়ে আসা। প্রকৃতি মানুষ সম্বন্ধে পুঁজির অনুপ্রবেশ। ভূমি-ভূমিবাসী সম্বন্ধ অমান্যতা।

দ্বিতীয় উদাহরণ, অরণ্য-অরণ্যবাসী সম্বন্ধ নিয়ে। অরণ্য অরণ্যবাসী মানবগোষ্ঠীর আবাসভূমি, অরণ্যসম্পদ অরণ্যবাসীর জীবনযাপন রসদ। অরণ্য পরিবেশ অরণ্যবাসীর সাংস্কৃতিক নির্মাণ ভূমি। অরণ্যবাসীর অস্তিত্বে অরণ্যপ্রাণী মানুষ সহাবস্থান। এই কাঠামোয় পুঁজির হস্তক্ষেপ। পরাধীন দেশে সাম্রাজ্যের আর্থনীতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে অরণ্যরসদের ব্যবহার। স্বাধীনদেশে তার ধারাবাহিকতা। পুঁজির অবাধ প্রয়োজনে অরণ্যে অরণ্যবাসীর বসবাস এবং অরণ্যরসদ ভিত্তিক জীবনযাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা, অরণ্যবাসীর উচ্ছেদ, অরণ্যবাসী সম্বন্ধে অমান্যতা। অরণ্য পুঁজির বিনিয়োগ, উৎপাদন, মুনাফা, বাজার অর্থনীতির কাঠামোয়।

তৃতীয় উদাহরণ সমুদ্রউপকূল—উপকূলবাসী সম্বন্ধ। সমুদ্র উপকূল সমুদ্রতীরবাসী মৎস্যজীবীদের কর্মভূমি। পূর্ববর্তী সরকারি নীতি উপকূল নিয়ন্ত্রণ বিধি অনুযায়ী সমুদ্র উপকূলের একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল স্থির করা হয়েছিল যেখানে যে-কোনো নির্মাণ নিষেধ। পরিবর্তিত সরকারি নীতি উপকূল পরিচালন বিধি, যেখানে উপকূলে পূর্বের নিষেধ বদলে দিয়ে নির্মাণের প্রস্তাব। অর্থাৎ মৎস্যজীবীদের কর্মভূমিতে পুঁজির অনুপ্রবেশ।

চতুর্থ উদাহরণ, সাম্প্রতিক রচিত সরকারি কৃষিনীতি চিরসবুজ বিপ্লব প্রকল্প। কৃষিভূমি কৃষিজীবী সম্বন্ধে কৃষকজ্ঞান নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা। এই কৃষি ব্যবস্থায় পুঁজির অনুপ্রবেশ। পুঁজি উৎপাদিত উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, রাসায়নিক কীটনাশক, কৃষিযন্ত্রপাতি ভিত্তিক সবুজ বিপ্লবের প্রয়োগ। কৃষকের প্রাকৃত বীজ, স্থানীয় জৈব সার, আঞ্চলিক কীটপ্রতিষেধক জ্ঞান, স্থানীয় নির্মিত কৃষিযন্ত্রের উচ্ছেদ। জমির স্বাভাবিক উর্বরতা ক্ষমতা হ্রাস, জলস্তরের ক্ষতি, শস্যের এবং কৃষকের স্বাস্থ্যহানি, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি। সম্প্রতি রচিত সরকারি নীতি চিরসবুজ বিপ্লব প্রকল্পের প্রতিবেদনে সবুজ বিপ্লবের ক্ষতির স্বীকৃতি।

এই ক্ষতি স্বীকার করেও পূর্ববর্তী প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী প্রকল্প ঘোষিত। চিরসবুজ বিপ্লব। চিরসবুজ বিপ্লবে পুঁজি নির্মিত আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ। প্রযুক্তি নির্দেশিত আধুনিক কৃষি উপাদানের প্রয়োগ। এবং অতএব কৃষকের লোকজ্ঞান, কৃষিজীবী গোষ্ঠীর সামাজিক জ্ঞানের অস্বীকৃতি এবং সুতরাং পুঁজি নির্মিত জ্ঞানের স্বীকৃতি। প্রকৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ উদ্ভিদ মানুষ সম্বন্ধে পুঁজির হিংস্রতা।

পঞ্চম উদাহরণ, পর্বত পর্বতবাসী সম্বন্ধে পুঁজির হস্তক্ষেপ পর্যটন এবং প্রমোদ প্রকল্প। ষষ্ঠ উদাহরণ নদী নদীতীরবাসী সম্বন্ধে পুঁজির পদক্ষেপ বৃহৎ নদীশাসন প্রকল্প। সপ্তম উদাহরণ, আগে বলা উদ্ভিদ জগৎ প্রাণী জগৎ মানবগোষ্ঠী সম্বন্ধে পুঁজির দখলদারি মেধাস্বত্ব অধিকার আইন। এইরকম অবিরত উদাহরণসমূহ।

এইসব উদাহরণ প্রকাশিত আর্থনীতিক ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সম্মেলনে উন্নয়ন ধারণা ও প্রয়োগ নির্মাণ। এই প্রয়োগ ও নির্মাণে এই উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার অধিকার প্রকাশিত।

এই প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার বিরুদ্ধতায় নতুন অধিকার নির্মাণ আমাদের প্রস্তাবনা। নতুন অধিকার নির্মাণ প্রকল্পে দুটি নতুন বিষয় প্রস্তাবিত হবে। একটি মানবগোষ্ঠীর অধিকার, অন্যটি প্রকৃতির অধিকার। এবং একত্রে মানবগোষ্ঠী প্রকৃতি সম্বন্ধের অধিকার।

প্রচলিত অধিকার ধারণায় দুটি বর্গের অধিকার স্বীকৃত। ব্যক্তির এবং রাষ্ট্রের। এই অধিকার লিখিত ও আইনি। তা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আওতায় এবং অথবা পুঁজির ক্ষমতার পরিধিতে। রাষ্ট্র-পুঁজি-ব্যক্তি এই কাঠামোয় রচিত ও ব্যবহৃত।

গোষ্ঠীর অধিকার রচনার কাঠামো ভিন্ন। একটি গোষ্ঠী হিসাবে আঞ্চলিক বসবাস। প্রকৃতি নির্ভর ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থনীতিক জীবনযাপন ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায়। এই ধারাবাহিকতায় অধিকার অর্জন। অলিখিত অথচ ধারণাবদ্ধ। অনাইনি অথচ প্রয়োগিত। এই কাঠামোয় রাষ্ট্র, পুঁজি, ব্যক্তি, অনুপস্থিত। রাষ্ট্রতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র উপস্থিত। ভূমিবাসীদের অধিকার নদীতীরবাসীদের গণতন্ত্র। অরণ্যবাসীদের গণতান্ত্রিক অধিকার, সমুদ্রউপকূলবাসীদের গোষ্ঠীগণতান্ত্রিক অধিকার ইত্যাদি। এটি আমাদের প্রস্তাবিত অধিকার ১।

আমাদের প্রস্তাবিত অধিকার ২ প্রকৃতির অধিকার। সাধারণভাবে অধিকার তিন প্রকার, নাগরিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং মানবিক অধিকার। এই তিন প্রকার অধিকার মানবকেন্দ্রিক এবং প্রকৃতি উদ্ভিদ জগৎ ও মানবব্যতীত প্রাণীজগৎ অনুপস্থিত। যেহেতু অধিকার রাষ্ট্র নির্মিত, যেহেতু রাষ্ট্র মানব নির্মিত, যেহেতু প্রকৃতির ওপর মানবের আধিপত্য উদ্দেশ্য, অতএব অধিকার ধারণায় প্রকৃতি অস্বীকৃত।

যেহেতু ক্ষমতার জ্ঞান এই যে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে বাঁচে, যেহেতু ক্ষমতার প্রয়োগ এই যে প্রকৃতি স্বাধীন নয়। প্রকৃতির মালিকানা রাষ্ট্রের, অতএব রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য—অরণ্য ধ্বংস, নদী বাঁধ, পাহাড় খনন, সমুদ্র উপকূল ব্যবহার। রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ধারণায় ধারাবাহিকতায় পুঁজির অর্থনীতি। প্রকৃতির ওপর পুঁজির দখলদারি, মালিকানা। প্রকৃতি প্রাণহীন অতএব অধিকারহীন। আমাদের ধারণা প্রকৃতির অধিকার অস্বীকারে প্রকৃতি মানবগোষ্ঠী সম্বন্ধ অমান্যতায়, প্রকৃতির রাষ্ট্রীয় ও পুঁজিকেন্দ্রিক ব্যবহারে—নদীখাতে পলিজমা, বন্যা, খাত পরিবর্তন, ভাঙন, পাহাড়ে ধস, নদীখাতে পলি বয়ে আনা, জমির উর্বরতা হ্রাস, জমির মরুকরণ, জলাভাব, জঙ্গলের বৃক্ষহীনতা, তৃণহ্রাস, বৃষ্টিপাত ও জলবায়ুতে পরিবর্তন, তাপবৃদ্ধি ইত্যাদি।

আমাদের প্রস্তাবনা গোষ্ঠীর অধিকার স্বীকৃতিতে যেমন গণতন্ত্র, প্রকৃতির অধিকার স্বীকৃতিতে তেমনই প্রকৃতিতন্ত্র। এবং মানবগোষ্ঠী ও প্রকৃতির, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদ জগতের সহাবস্থানে, সমতায়, সখ্যতায় 'গণপ্রকৃতিতন্ত্র' ধারণা নির্মাণ এবং তার প্রেক্ষিতে 'গণপ্রকৃতিতান্ত্রিক অধিকার' স্বীকার করা।

এই ধারণার সমর্থনে লোকজ্ঞানের অস্তিত্বকে উপস্থিত করা যায়। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর আঞ্চলিক লোকজ্ঞানের অস্তিত্ব এখন স্বীকৃত। এই লোকজ্ঞান মানবগোষ্ঠী প্রকৃতি সম্বন্ধের ভিত্তিতে রচিত। চাষ, মাটি ব্যবহার, সার, জলব্যবহার, জলসংরক্ষণ, শস্য প্রক্রিয়াকরণ,

জীববৈচিত্র্য রক্ষা, উদ্ভিদ সংরক্ষণ, ব্যবহার, অরণ্য বৃক্ষ এবং প্রাণী সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য রক্ষা, ওষধি ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে লোকজ্ঞান রচিত এবং প্রয়োগিত। লোকজ্ঞানের মূল বিষয় প্রকৃতির নিয়ম অনুধাবন।

গণপ্রকৃতিতন্ত্রের এবং গণপ্রকৃতিতান্ত্রিক অধিকার ধারণার পক্ষে সমর্থন সংগ্রহ করা পূর্ববর্তী কয়েকটি ভাবনা থেকেও।

১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব পরবর্তী 'মানব ও নাগরিক ঘোষণা'য় উল্লেখ আছে—মানুষের কিছু অধিকার আছে যা থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। আমাদের ব্যাখ্যায় অন্যতম অধিকার গণপ্রকৃতিতান্ত্রিক অধিকার। ১৭৮৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় লেখা আছে—মানুষের কিছু অধিকার আছে জীবন, স্বাধীনতা ও সুখের জন্য। আমাদের বিশ্লেষণে—গণপ্রকৃতিতান্ত্রিক অধিকার আওতায় প্রকৃতি মানুষ সম্বন্ধের সুখ। ১৯৪৮-এর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণায় রয়েছে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত করা চলবে না। আমাদের প্রস্তাবনায়—এই আঘাতের বিরুদ্ধতায় গণপ্রকৃতিতন্ত্র। ১৯৮৬র উন্নয়নের অধিকারে বলা আছে—প্রাকৃতিক সম্পদ ও রসদের ওপর রয়েছে জনগণের সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্বের অধিকার। আমাদের ধারণায়—এই অধিকারই গণপ্রকৃতিতান্ত্রিক অধিকার। সম্প্রতি ঘোষিত ভারত সরকারের অরণ্য আইনে এই প্রথম গোষ্ঠীর বসবাসের অধিকার ও অরণ্যসম্পদ ব্যবহারের অধিকার আইনি মান্যতা পেয়েছে। এই স্বীকৃতির ভিত্তি ধারণা প্রকৃতিমানবগোষ্ঠীর সহাবস্থান পরস্পরের অস্তিত্ব রক্ষায়। অস্ট্রেলিয়ার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে ভূমি সম্পদের বেলায় ব্যক্তিস্বত্ব ও রাষ্ট্রস্বত্বের বাইরে একটা তৃতীয় স্বত্ব মানতে হবে—জনগোষ্ঠীর যৌথস্বত্ব। ভারত সরকারের সাম্প্রতিক পরিবেশ নীতিতে 'জনঅছিনীতি' প্রস্তাবিত হয়েছে। বলা হয়েছে দেশে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক রাষ্ট্র নয়, নির্দিষ্ট সম্পদে থাকা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী। বিশ্ববাণিজ্য নীতির মধ্যে থাকা মেধাস্বত্বের অধিকারের ধারণায় জ্ঞানের জগতে গোষ্ঠীজ্ঞানের বিষয় নিয়ে আসা হচ্ছে। গোষ্ঠীমেধাস্বত্বের আইনি স্বীকৃতি আলোচিত হচ্ছে। স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে স্থানীয় গোষ্ঠীর অনুমতি গ্রহণের নীতি গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন ভাবনা সূত্রে পাওয়া এইসব ধারণাকে একত্রিত করলে প্রকৃতিপ্রাকৃতিক সম্পদ মানবগোষ্ঠীর সম্বন্ধের ধারণার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। আমাদের প্রস্তাবিত গণপ্রকৃতিতন্ত্র এবং গণপ্রকৃতিতান্ত্রিক ধারণার মান্যতা মেলে।

আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা আমাদের রচনার প্রথম পর্বে উল্লেখিত বিষয়টিকে ফিরিয়ে আনবো। এখন উন্নয়ন বিতর্কের মূল বিষয়টি প্রকৃতির ওপর। প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর, প্রকৃতি জনগোষ্ঠী সম্বন্ধের ওপর পুঁজির আক্রমণ, রাষ্ট্রের প্রশাসনিক সন্ত্রাস পুঁজির পক্ষে। পুঁজি প্রস্তাবিত এবং রাষ্ট্র সমর্থিত এই উন্নয়ন ধারণা এবং প্রয়োগে ক্ষতি প্রকৃতির, জনগোষ্ঠীর, পরিবেশের। এই উন্নয়ন ধারণার বিরুদ্ধতায় আমাদের প্রস্তাবনা গণপ্রকৃতিতন্ত্র এবং গণপ্রকৃতি-তান্ত্রিক অধিকার ধারণা। এই লেখা সেই প্রস্তবনা। উন্নয়ন বিতর্কে অংশগ্রহণের জন্য।

# রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী ও সমসময়ের সমস্যা

## শাওলী মিত্র

ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন তথা শিল্পায়ন আজকের দিনের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। পৃথিবীকে উন্নততর করতে গেলে নাকি এ ব্যতীত আর উপায় নেই। মানুষের আক্ষরিক অর্থে বেঁচে থাকবার মূল রসদ খাদ্য। সেই খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষিজমি যদি কমে যায় তাহলেও শিল্প গড়তেই হবে। নইলে নিস্তার নেই। কী শিল্প? কেমন শিল্প? কী তৈরি হবে তা থেকে? সেইসব দ্রব্য মানুষের বেঁচে থাকবার জন্য কোন কাজে লাগবে? এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই বড় ঝাপসা। জেগে ওঠে কেবল এই সম্মোহনী শব্দবন্ধ যা নাকি মুক্তিলাভের একমাত্র পথ। আর সেইজন্যেই মা বসুন্ধরার আঁচলকে দস্যুবৃত্তি করে টুকরো টুকরো কর। বল, 'এসবই মানুষের উন্নতির জন্য।' রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন, "নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল, সেটা কি সেকালের কথা নাকি এ কালের?...তখনো কি সোনার খনির মালেকরা নবদূর্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঘুঁটি ধরে টান দিয়েছিল?....কৃষী যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে। নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটীর ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন?..." বলেছেন, "...রাম হল আরাম, শান্তি; রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর; আর-একটিতে শান-বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্খধ্বনি।...রাম ও রাবণ একদিকে মানুষের ব্যক্তিগত রূপ, আর-এক দিকে মানুষের দুই শ্রেণীগত রূপ।....." 'রক্তকরবী' প্রসঙ্গে রামায়ণের কথা বলতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন, "...রত্নাকর গোড়ায় ছিলেন দস্যু, তার পরে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনই সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল।..." 'রক্তকরবী' নাটকের কথা আজকের দিনের প্রেক্ষিতে বড় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। মাটির প্রতি, প্রকৃতির প্রতি অজস্র ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে এ নাটকের পরতে পরতে, সংলাপে সংলাপে। যে-ভালোবাসায় স্বাভাবিক মানুষের স্বভাবসিদ্ধ আনন্দের স্বাভাবিক রূপ উপচে উপচে পড়ে। ধানীরঙের কাপড় পরা নন্দিনী সম্পর্কে অধ্যাপক বলেন, "পৃথিবীর প্রাণভরা খুশিখানা নিজের সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে, ঐ আমাদের নন্দিনী।" গাঁয়ের সব তরতাজা যুবকদের, নন্দিনী দেখতে পায়, ওবে নিংড়ে 'রাজার এঁটো' করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তারা বেরিয়ে আসছে মকর মুখের খিড়কির দরজা দিয়ে। এদেরই সম্পর্কে নন্দিনী বলে, "..... গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল।—অধ্যাপক, লোহাটা ক্ষয়ে গেছে, কালো মর্চেটাই বাকি। এমন কেন হল।" শিল্পায়নের আগুনে প্রাণকে, প্রকৃতিকে ছারখার

করে দিলে মানুষ বাঁচে না সে কথা রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালে সম্যক বুঝতে পেরেছিলেন এবং আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। নন্দিনী তাই বলেছিল, "...এই যদি মানুষের হওয়ার রাস্তা হয় তা হলে চাইনে এমন হওয়া।..." বিশ্বায়নের গ্রাস আমাদের যে 'উন্নতি'র দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে তা মানুষকে তার প্রাণের রস থেকে বহু দূরে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। একটু চোখ খুলে তাকালেই তার বড়োবড়ো দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। কিন্তু যারা দেখতে চায় না তাদের বোধোদয় হবে কেমন করে? রবীন্দ্রনাথ তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে মানুষের যে দুর্দশা দেখতে পেয়েছিলেন তা বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে এসে আছড়ে পড়েছে সুনামির ঢেউ-এর মতো। সেই ঝাপটায় কত প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে এবং যেতে থাকবে তার বোধ করি ইয়ত্তা নেই।

রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে সুবিধামত উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের ভাবনার যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা, অল্পবিস্তর, আমরা সবাই করে থাকি। দুঃখ হয়, যখন এই অত্যন্ত মানবদরদী মানুষটিকে মানবনিধন যজ্ঞের সামিল করবার জন্য তাঁর লেখা থেকে আংশিক উল্লেখ করে সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা হয়। পুঁথির বাইরের পড়া এবং জানার আগ্রহ যেটুকু ছিল এই তোতা-তৈরির শিক্ষাব্যবস্থায় তা দূরে নিক্ষেপিত হয়েছে। ফলে যাঁরা সমাজে পণ্ডিত বলে পরিচিত হয়ে যান,—ডিগ্রির জোরে বা দলীয় প্রচারের জোরে,—আমরা কোনো কিছু যাচাই না করে তাঁকেই সর্বতোভাবে বিশ্বাস করে চলি। নিজেরা পড়ে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি না আসল সত্যিটা কী। সেই রকমই কিছু লেখা ইদানীং চোখে পড়ছিল বলেই অনেক কথা মাথায় ঘুরছিল। তারই সঙ্গে সমাজে অতি দ্রুত ঘটে যাচ্ছিল এমন সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দেখতে পাচ্ছিলাম যা একটি সমাজে বা রাজ্যে ঘটে চলা কাম্য নয়। তাই 'রক্তকরবী' বা 'রাজা' বা 'ডাকঘর' নাটকগুলিকে এইসময়ের খুব জরুরি নাটক বলে মনে হচ্ছিল। তেমনিই জরুরি 'মুক্তধারা' নাটকটিও।

ইদানীং কাগজেপত্রে দেখি শিল্পায়নের সপক্ষে বলতে গিয়ে অনেক সময়েই তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃত করা হয়। এমন কথাও বলা হয় যে তিনি কৃষিজমি হরণের পক্ষেই লেখালেখি করেছিলেন। এইসব থেকেই 'রক্তকরবী' নাটকটি নিয়ে আলোচনা করবার লোভ অদম্য হয়ে উঠল। কিন্তু তার আগে একটি কথা মনে রাখলে বোধহয় ভাল হয়,—রবীন্দ্রনাথ যখন শিল্প-র প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন তখন আমরা বৃটিশের দাস। এবং তখন বৃটিশরা যে-পরিমাণ ধন নিংড়ে নিয়েছে এই দেশ থেকে সেই পরিমাণে নজর দেয়নি এখানকার সাধারণ মানুষের আর্থিক মান উন্নয়নের জন্য। স্বাভাবিক। তারা তো বাণিজ্য করবার জন্যই এ দেশে মৌরসীপাট্টা গেড়েছিল, লোকহিতের জন্য তো নয়। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে দেশের উন্নতির জন্য কোন প্রেক্ষিতে কী কথা বলেছিলেন সে-কথা মাথায় না রেখে আমরা যদি তাকে আজকের অবস্থার সঙ্গে মেলাতে যাই তাহলে খুব ভুল হবে। আমাদের এ কথাও ভাবতে হবে, তখনকার লোকসংখ্যা আর এখনকার লোকসংখ্যার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। মনে রাখতে হবে, তখনকার কৃষিজমির পরিমাণ আর এখনকার উর্বর জমির পরিমাণের পার্থক্যের কথাও। মনে রাখতে হবে, তখন বাংলার সীমানা এ দেশে পশ্চিমবঙ্গের আয়তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ

ছিল না। তখন ছিল অবিভক্ত বাংলা। তদুপরি যদি শিল্পায়নের জন্য কৃষিজমি হরণ করা বিধেয় এ কথাই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করে থাকেন তাহলে তিনি খামোখা 'রক্তকরবী'র মতো নাটক কেন লিখতে গেলেন এবং তার এই নাটক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উপরের উদ্ধৃতির সঙ্গে সঙ্গে আরও অনুরূপ কথা কেন লিখলেন সেই বিচারটুকু আবশ্যিক হয়ে পড়ে। তাই এ আলোচনা এমন অপরিহার্য হয়ে উঠল।

'রক্তকরবী' নাটকের নাট্যঘটনা যক্ষপুরীতে সংঘটিত হচ্ছে। এখানকার রাজা পাতালে সঞ্চিত ধন-হরণে ব্যস্ত। ধনবাহুল্যের ছটায় মুগ্ধ হয়ে লোকে নাকি আদর করে এর নাম দিয়েছে যক্ষপুরী। এইরকম কথা বলেই তিনি প্রশ্ন করেন, "লক্ষীপুরী কেন বলে না?"—তিনি নিজেই এর উত্তরও দেন। বলেন, "লক্ষীর ভাণ্ডার বৈকুণ্ঠে, যক্ষের ভাণ্ডার পাতালে।" তিনি এ কথাও স্পষ্টতই বলেছেন, "...কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলই উজাড় করে দিচ্ছে। তাছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা, দেবহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসের মতো।...". এ কি বড় আজকের কথা নয়? সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম এবং আরও অজস্র জায়গায় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই কৃষিকাজের পরিসর নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে শিল্পায়নের নাম করে। তদুপরি যে-শিল্প হচ্ছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা থেকে কিছু উৎপাদন হচ্ছে না। বিশেষত এই রাজ্যে যে খেলাটি শিল্পায়নের নামে শুরু হয়েছে কয়েক দশক ধরে তা সম্পূর্ণত এক ভণ্ডামির জালে যেন আবৃত। শিল্পনগরী আসানসোল, দুর্গাপুর, রাণীগঞ্জ তাদের এক সময়কার মহিমা হারিয়েছে। আমাদের চা-শিল্প, চট-শিল্প, রেশম-শিল্প, কাগজ-শিল্প এ সবই হারিয়ে গেল কোথায়। কয়লা নিয়ে কী পরিমাণ দুরাচার ঘটে চলেছে এ রাজ্যে সে কথাও তো আমরা জানতে পারি। দু-দিন অন্তর খনি দুর্ঘটনার কথা বেদনায় মূক করে দেয় আমাদের, যখন জানতে পারি জল ঢুকে ইঁদুরের মতো ফাঁদে আটকা পড়ে মানুষগুলো মরে গেছে। সে-দুর্ঘটনা তো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা নয়। এক শ্রেণীর মানুষের সীমাহীন লোভ আর-এক শ্রেণীর মানুষকে নিরত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। প্রশাসনের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সবাই জানে কেন কী হচ্ছে। তবু মদত জুটছে তাদের যাদের অনেক আছে। আমাদের রাজ্যের অধুনা সর্বাপেক্ষা গর্বের শিল্পনগরী হলদিয়াতেও উৎপাদনযোগ্য কোনো শিল্প মানুষের আশা পূর্ণ করতে সক্ষম হয়নি। করলেও তা সংখ্যায় এত স্বল্প যে মানুষের বিকল্প রুজির বন্দোবস্ত হয়নি। মাঝখান থেকে তাদের অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের শিকড় যাচ্ছে হারিয়ে। অঞ্চলের মানুষের রুচি যাচ্ছে বদলে। কীরকম বলব?—আগে, আমি ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলে অনেক নাটকের দল কলকাতা থেকে গিয়ে নাটক করে আসত। সেখানে 'রক্তকরবী', 'পুতুল খেলা' এই ধরনের নাটক বিপুল সাড়ায় অভিনীত হয়েছে একাধিক বার। রবীন্দ্রনাথের গল্প অবলম্বনে শ্রুতিনাটক করে এসেছি। দিশেরগড়, বার্ণপুর, রূপনারায়ণপুর এমন কত জায়গায় বেশ ভারী অনুষ্ঠানও যথাযোগ্য মর্যাদা পেয়েছে। সম্ভবত, '৯০-এর দশক থেকে অবস্থাটা বদলে যেতে লাগল। এইসব জায়গায় শুনতে পাই, হিন্দী-ফিল্মীগানের যত চাহিদা অন্য কোনো বিষয়ের চাহিদা তেমন

নয়। গত শীতে আমাকেআসানসোলে বঙ্গসংস্কৃতির কোনো অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমি কবি বুদ্ধদেব বসুর মহাভারতভিত্তিক কাব্যনাটক পাঠ করেছিলাম। সে-অনুষ্ঠানে দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি কম ছিল বলে উদ্যোক্তারা মঞ্চেই, মাইক্রোফোনে বড় দুঃখ প্রকাশ করছিলেন। সেইদিনই অপর একটি সংগঠন কোনো টিভি সিরিয়ালের গানের প্রতিযোগিতায় বিজিত শিল্পীর একটি গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ফেলেছিল তড়িঘড়ি, ফলে বাঙালী দর্শক—যাঁদের উপস্থিতি এ অনুষ্ঠানে অনিবার্য ছিল—তাঁরাই সেই হিন্দী গানের অনুষ্ঠানে চলে গিয়েছিলেন।—এ খুব সোজাসাপটা দেখতা একটি উপমা। তবে নিশ্চিত জানি, সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা করলেও, দেখা যাবে রুচি কত বদলে গেছে। আর তা নিম্নগামী। এইসব অঞ্চলে তো বটেই, সারা দেশ জুড়ে এক অদ্ভুত সংস্কৃতি উদিত হয়েছে যেখানে অতি অল্প-আবরণে আবৃত নরনারীর অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি 'নৃত্য'-র মর্যাদা পেয়ে থাকে। প্রত্যহ ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে এই সংস্কৃতি শিল্পের নামে। কী ভাবছেন 'সংস্কৃতিসম্পন্ন' সরকার? শিল্পায়নের নামে দিকে দিকে এই কাহিনীই রচিত হচ্ছে। উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-সংস্কৃতির এই মেলবন্ধনই কি কাম্য? এ যে বড় নিষ্ঠুর বাস্তব।

মকররাজ সদাসর্বদা এক জালের আড়ালে, লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করে থাকেন। একটিমাত্র জানলার মাধ্যমেই বহির্জগতের সঙ্গে তাঁর যাবতীয় সম্বন্ধ। অর্থাৎ জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচেন এই রাজা। আজকে আমাদের যারা নিয়ামক তারাও তো তাই-ই। জনসাধারণের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে তাদের যে কোনো সম্বন্ধ আছে সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত বিবৃতি থেকে তা বোধ হয় না। এই রাজা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "... বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎবজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদে শৃঙ্খলিত করে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারত। কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন। মূঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটে নি, কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তাছাড়া কলিযুগের রাক্ষসের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘটবে, এমনও একটা সূচনা আছে।..." রামায়ণের সঙ্গে এই তুলনাটিও খুবই প্রণিধানযোগ্য। তাই নয়?—নাটককার এক জায়গায় লিখেছেন, "যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে এনেছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত।...সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে।..." আমাদের বর্তমান সভ্যতাও কি এই একই দিকে ধাবিত হচ্ছে না?

এবারে নাটকের সংলাপের মধ্যে একটু প্রবেশ করা যাক। তাহলে তাঁর মনোভাব নিয়ে আর কোনো সংশয় থাকে না। এ নাটকের অধ্যাপক এক জায়গায় বলেন, যে যেখানে লোকে মা-বসুন্ধরার আঁচলকে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ে না, সেইখানে রঞ্জনকে নিয়ে

নন্দিনী যেন সুখে থাকে। যক্ষপুরীতে তা-ই করা হয়। কেন ঐ বসুন্ধরার আঁচলকে টুকরো করার কথা বলা হয়? কেন এ-নাটকের মুখ্যচরিত্র, ঐ মানবকন্যা, রাজাকে বলে, "পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিস আপনিই খুশি হয়ে দেয়। কিন্তু যখন তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য বলে ছিনিয়ে নিয়ে আস তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস। এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিম্বা সন্দেহ করছে, কিম্বা ভয় পাচ্ছে।" আর এই অভিসম্পাতকে সে বলেছে, "খুনোখুনি-কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত।" আকর্ষণজীবী সভ্যতার এ এক ভয়ঙ্কর দিক যার আগ্রাসন কালো দৈত্যের মতো আমাদের দিনে দিনে বর্বরতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পূর্বে বা কখনো কল্পনা করিনি তা অনায়াসে ঘটে যাচ্ছে আমাদের চোখের সামনে। এই অংশের কথোপকথনে রাজার সংলাপেও বড় মূল্যবান, বড় আজকের দিনের সভ্যসমাজের উন্নয়নের দিক সত্য হয়ে প্রকাশ পায়। রাজা বলেন, "...আমি এক প্রকাণ্ড মরুভূমি—তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি—আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ঐ একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।" রাজা নিজের শক্তির মধ্যে মরুর সেই শুষ্কতা দেখতে পান। নিজেকে ক্লান্ত পর্বতের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, "শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন করে নিজেকে পিষে ফেলে সেই পাহাড়টাকে দেখে তাই বুঝেছিলুম। আর, তোমার মধ্যে একটা জিনিস দেখছি—সে এর উল্টো।" কী তা? না, "বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ।" এ উপমা কেন দেন রবীন্দ্রনাথ? কেবল কবিত্ব প্রকাশ করবার জন্য? নাকি উর্বরতার সঙ্গে এই প্রাণের ছন্দের এক সাযুজ্য খুঁজে পান তিনি? পরমুহূর্তেই তিনি বলেন, সেই ছন্দ বড় সহজ, বড় সুন্দর। নন্দিনী সম্যক জানে সেই স্বাভাবিক ছন্দ আছে সেইখানে, যেখানে পৌষের রোদ্দুর পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে মেলে দেয়। যেখানে ফসল কাটার আনন্দে অনায়াসে গান গেয়ে ওঠে চাষীরা। তাই তো সে রাজাকে ডাক দিয়ে বলেছিল, "তুমিও বেরিয়ে এস রাজা তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই।" রাজা অবাক হয়ে বলেছিলেন, "আমি মাঠে যাব?' কোন কাজে লাগব?" রাজা বোঝেননি ফসল ফলানোর মধ্যে লুকিয়ে থাকে প্রাণের মহিমা। সৃষ্টির স্বতোৎসারিত আনন্দ। এ কথা বুঝতে রাজার দেরি হয়েছিল। সারা নাটক জুড়ে রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন আমাদের।

ফাগুলাল বিশু এইসব শ্রমিকেরা মদ্যপান করে। কেন করে? চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করে তাদের। তার উত্তরে বিশু বলে বনের সবুজ, রোদের সোনার মায়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে যখন কেবল সোনা তোলার জন্য (অর্থাৎ শক্তিসংগ্রহের জন্য) বসুন্ধরার জঠরের অন্ধকারে প্রবেশ করবার কাজে তাদের নিয়োগ করা হয়, তখন বিধাতার সহজ দানে যে নেশার উৎসে সেই উৎসের মুখ যায় হারিয়ে। ভুলে যায় মানুষ যে প্রকৃতির দানে নেশাগ্রস্ত হয়ে যাওয়া মানুষের সহজ স্বাভাবিক ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ সেই নেশার বুঁদ থাকতে পারতেন বলেই তো প্রত্যেক দিনের সূর্য ওঠা প্রত্যক্ষ করা তাঁর ছিল অসীম আনন্দ। নেশা না থাকলে

কি প্রত্যহ ব্রাহ্ম মুহূর্তকে প্রত্যক্ষ করার অমন অমোঘ আকর্ষণ জন্মায়? তিনি জানতেন কাকে বলে প্রকৃতিদত্ত মদ। কোনো কৃত্রিম উপায়ে তৈরি নেশার সামগ্রী নয়। নেশার উপাদান ছড়িয়ে আছে বনের সবুজে, রোদের সোনায়, বসন্তের সমারোহে, বর্ষার ঘনঘটায়। তাই তিনি যখন এই কথাটি বলেন তখন আমাদের ভাবতে হয় বসে যে জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে ছুটি আর কাজ একাকার হয়ে থাকে। উন্নতির নামে সেই স্বাভাবিক ছন্দ ব্যাহত হলে তা সভ্যতার বিকাশ ঘটায় না, হয়ত কিছু মানুষের সাময়িক আর্থিক উন্নতি হয়। কিন্তু সাধারণ-স্বাভাবিক মানুষের কাছ থেকে তার জীবনের ছন্দ কেড়ে নেওয়া হয়। তাই বিশু এই প্রসঙ্গে এমন একটি বাক্য বলে যার দৃষ্টান্ত আজ ঘরে ঘরে দেখতে পাওয়া যায়। সে বলে, "সহজ নিঃশ্বাসে যখন বাধা পড়ে তখনই না মানুষ হাঁপিয়ে নিঃশ্বাস টানে।" আজকের সমাজের মদ্যাসক্তি সমস্ত স্তরে এমন ভয়াবহ ভাবে বেড়ে গেছে যে কৃত্রিমতার ফাঁসে আটকা পড়ে গেছে এ সমাজ। আর তাই খুনোখুনি-কাড়াকাড়ির এই সমাজে সমস্তরকম অস্থিরতা, অশ্লীলতা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। আর এর থেকে মেয়ে-পুরুষ কারোরই রেহাই নেই। 'সোনা সোনা' করে প্রাণটা সর্বদাই খাবি খায়। গয়নার বিজ্ঞাপনে ছেয়ে যায় শহর। হীরে-মুক্ত-পান্না-সোনা কেনবার প্রবল আগ্রহ কেমন উন্মাদ করে তুলেছে এই কলকাতা শহরকেও। বিজ্ঞাপন সেই উন্মাদনাকে জাঁকিয়ে তুলেছে। যেন বহুমূল্য অলঙ্কারাদি না কিনলে কী এক সাংঘাতিক অঘটন ঘটে যাবে। যেন বড়ো বড়ো শপিংমলে বাজার না করতে পারলে মানবজন্ম বৃথা হয়ে যাবে। এই অস্বাভাবিক চাহিদা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি হচ্ছে কিছু লোকের সুবিধার জন্য। আমাদের অনুভূতিকে ভোঁতা করে দেওয়া হচ্ছে, সহানুভূতি, সংবেদনশীলতা নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে, আমাদের মাতিয়ে রাখা হচ্ছে ভাঁড়ামোতে। সেই অনুভূতিহীনতা যক্ষপুরীতেও প্রকাশ পায় তখনকার প্রথা অনুযায়ী। গোকুল খোদাইকর বলে যে নন্দিনীকে সে বিশ্বাস করে না। বলে, "আমরা বিশ্বাস করি সাদা মাটা গোছের চেহারা, বেশ ওজনে ভারী।" ফাগুলালের বৌ চন্দ্রাও নন্দিনীর 'সুন্দরীপনা' করে বেড়ানোকে ধিক্কার দেয়। শোষক সমাজে সৌন্দর্য সম্পর্কে ধারণা গড়ে দেয় শোষণকারী। তখন তারা যেমন বলবে নিজেকে তেমনটি তৈরি করাতেই জীবনের সাফল্য নির্ধারিত হয়ে যায়। মন যেন তেমনটাই তৈরি করতে বাধ্য হয়। সোনা বা হীরে পরে আমাকে সুন্দর দেখাক বা না-দেখাক হীরে আমাকে পরতেই হবে। সব মানুষ যেন একই ছাঁচে গড়া। যে-সমাজে রবীন্দ্রনাথের কথা অনুযায়ী 'স্টাইল' বলে কিছু নেই, কেবল 'ফ্যাশান' আছে। বিশু বলে, "যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের 'পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয়, এইটেই সর্বনেশে। নরকেও সুন্দর আছে, কিন্তু সুন্দরকে সেখানে কেউ বুঝতেই পারে না, নরকবাসীর সবচেয়ে বড়ো সাজা তাই।" স্বভাবিক সৌন্দর্যে ভাঁটা পড়ে বলেই কি এই সমাজের নরনারী মেতে ওঠে অনভিপ্রেত অশ্লীল অনুকরণে? এই অস্বাবাভিকতাতেই কি শরীর দেখানোটাই 'স্বাভাবিক' বলে পরিগণিত হয়ে যায়? মায়েরাও মেয়েদের প্রশ্রয় দেন বিশেষ বিশেষ পোশাক পরতে? প্রতিযোগিতা কি এইখানেই টেনে নিয়ে যায়?

সম্প্রতি শিল্পমন্ত্রী বলেছেন, কৃষকেরা যে শ্রমিক হয়ে উঠছেন তাতে তাঁর গর্ববোধ হয়েছে। এস্-ই-জেড্ সংখ্যায় বাড়ানোর জন্য সরকার মরীয়া হয়ে উঠেছে কারণ ধনতান্ত্রিক পরিকাঠামো এক 'ইউটেলিটেরিয়ন্' সমাজের প্রবর্তনা করে যা সমগ্র সমাজের উন্নতির কথা ভাবে না। তারা এক সুপরিনির্দিষ্ট অংশের কথা ভাবে যারা নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা বাটোয়ারা করে নিতে পারবে। এই ফলদিয়া শিল্পায়নে কেবল তাদেরই লাভ হয় যারা সেখানে ক্ষমতার উচ্চশিখরে বসে আছে। যারা ধরে নিয়েছে 'জমি কারোর বাপের নয়, দাপের!' আর আমাদের বামপন্থী সরকার তাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে অনবরত। পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি তাই সমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুলিশ, আইন—সমস্ত ক্ষেত্রকেই কলুষিত করে দিয়েছে। তাই 'রক্তকরবী' নাটকের শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে আজকের সর্দাররাও কেমন মিলে যায়। চন্দ্রা-ফাগুলালেরা বাড়ি যাবার ছুটি চাইলে সর্দার অক্লেশে বলে ওঠে, "কেন? যে বাসা দিয়েছি সে তো খাসা, বাড়ির চেয়ে অনেক ভালো। সরকারি খরচে চৌকিদার পর্যন্ত রাখা গেছে।..." বস্তির বাসার পাশে চৌকিদার মজুত থাকে বৈকি! আর সেই 'কলোনি' তো অবশ্যই গ্রামের খড়ে-ছাওয়া মাটির বাড়ির থেকে 'অনেক ভালো'। তারপরেই বিশু যখন কথাপ্রসঙ্গে সর্দারকে বলে, "সর্দারজী, তোমার কথা শুনে আমোদ লাগছে না। তোমাদের এলাকায় নাচানো-ব্যবসা যে কত সাংঘাতিক তার মোটা মোটা দৃষ্টান্ত দেখেছি, এমন হয়েছে সাদা চালে চলতেও পা কাঁপে।"....তখন আমাদের আজকের কথা মনে পড়ে যায়। স্বাধীনতাদিবসের অনুষ্ঠানে পথনাটকের জন্য পুলিশিজুলুম সইতে হয় এ রাজ্যে। হাজতবাস করতে হয়। আদালতে হাজির হতে হয়।—এ সমস্তই ঘটছে এ-রাজ্যে। সরকারের নিন্দা করলে নাটকের দলের আমন্ত্রিত অভিনয় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। নাটকের দল তখন পায়ে ধরে সেই শাসকেরই যারা বন্ধ করতে প্ররোচিত অথবা বাধ্য করেছে। তারপর সেই শাসকের মহামহোপাধ্যায়েরা অবতীর্ণ হন ত্রাতার ভূমিকায়। আর তার পরে নিরস্ত্র কৃষকের উপরে গুলিচালনা হলেও আর প্রতিবাদ করবার 'সাহস' দেখানো সম্ভব হয় না। তখন যে দাতা-গ্রহীতার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে গেছে কিনা! আর তারপরে প্রতিবাদ করবার ইচ্ছেটুকুও কখন যে মরে যায় আমার টের পাই না। যেমন কৃষিকাজে যে সৃষ্টির আনন্দ আছে মজুরির লোভ দেখিয়ে সেই ভাবনা এবং ভালোবাসা শিকড় থেকে মুড়িয়ে দেওয়ার ঘোর প্রচেষ্টা চলেছে। আর নিবারণ পাঁজা, দেবাশিস্ মালিক কিম্বা হরিরাম মান্নারা নিজেদের পরিচয় ভুলতে বসে, হয়ে ওঠে সংখ্যামাত্র। বিশু তাই বলে। বলে, এই শাসকশ্রেণীর কাছে তারা মানুষ নয়, কেবল সংখ্যা। বলে, "গাঁয়ে ছিলাম মানুষ এখানে হয়েছি দশ-পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে। পৌষের গানটুকু শুনতে পাওয়ার পর্যন্ত উপায় নেই।

রাজার এঁটোদের দেখে নন্দিনী যখন বলেছিল, "দিন-রাত এই মানুষ-ধরা ফাঁদের খবরদারি করে এরা কি একটুও ভালো থাকে?" অধ্যাপক সুতীব্র স্বরে বলেছিলেন, "ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে। এদের সেই থাকাটা এত ভয়ঙ্কর বেড়ে গেছে যে, লাখো লাখো মানুষের উপর চাপ না দিলে এদের ভার সামলাবে কে?

জাল তাই বেড়েই চলেছে। ওদের যে থাকতেই হবে।"—'রক্তকরবী'র রাজা একই দেহে রাবণ ও বিভীষণ এমন কথা বলে তাঁর অবস্থান যক্ষপুরে ঠিক কোথায় তা লেখক স্পষ্টতই বুঝিয়ে দিয়েছেন। কোনো সংশয়ের অবকাশ রাখেন নি। আর সেইজন্যেই তো রাজা (যাঁকে রবীন্দ্রনাথ ইংরিজি অনুবাদে 'সায়েনটিস্ট' বলে চিহ্নিত করেন, 'কিং' বলেন না) নন্দিনীকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলেন প্রাণ দিয়ে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। মনে করে নিতে পারেন, নন্দিনীই হল প্রলয়পথে তাঁর দীপশিখার মতো। নন্দিনীকে বলেন তাকে লড়াই করতে তাঁর বিরুদ্ধে, কিন্তু তাঁরই হাতে হাত রেখে।

ইওরোপে যখন 'রক্তকরবী'র ইংরেজি অনুবাদের সমালোচনা হয়েছিল তখন রবীন্দ্রনাথ যে-উত্তর দিয়েছিলেন, তাতে তিনি শোষণকারী সভ্যতার চরিত্র নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, "....Today another factor has made itself immensel evident in shaping and guiding human desitiny. It is the spirit of organisation, which is not social in character, but utilitarian. ...Naturally, in all organisaitons, variation of pesronality is eliminated,....The world has becomme the world of Jack and Gaint–the Giant who is not a gigantic man, but a multitude of men turned into a gigantic system...the hungry purpose, having science for its steed, running about unchecked, trampling our life's harvest, is not an intellectual generalisation unfit for imaginative literature. It is intensly real; its hotbreath is upon us; its touch is all over our shrinking soul. It is the principal hero today in the drama of human destiny; I have the right to invoke it in my own play, not in the spirit of a politician, but of a poet, possibly a lyrical poet....." আমরা যারা রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাই তাদের বোধহয় এই অত্যন্ত যুক্তিসহ এই দৃঢ় উচ্চারণ মনে রাখা প্রয়োজন।

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার শোষণের কদর্য রূপের ছবি বড় স্পষ্ট এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। আর সেই সঙ্গেই প্রকৃতির 'জাদু'র কথা বলেছেন। মাটির ভালোবাসায়, প্রকৃতির মায়ায় মনুষ্যসভ্যতার ছন্দ লালিত হয়। সেই ছন্দকে বিনাশ করতে চাইলে সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে *ঠেলে* দেওয়া হয়। মাটিকে কংক্রীটে মুড়ে দিয়ে পৃথিবীকে সুন্দর করতে চাইলে প্লাবনকে আহ্বান করা হয় ; যে-প্লাবন মানুষের দুর্দশা ডেকে আনে। যে-অহিনি খাদান থেকে ক্রমাগত খনিজ দ্রব্য সংগ্রহ করে বহু টাকার মালিক হতে চাইলে,—খনিতে ধস নামে। মানুষ মরে। নদীর পাড়ের গাছপালা কেটে, পাথর তুলে ফেলে বা ক্রমাগত বাঁধ তৈরি করে তাকে বেঁধে ফেলে 'উন্নয়ন' ঘটাতে চাইলে,—নদী অশান্ত-উত্তাল হয়ে ওঠে, তলিয়ে যেতে থাকে বাড়ি-ঘর, ইস্কুলবাড়ি। পাহাড়ে শত শত রাস্তা তৈরি করে নিজেদের সুবিধা বাড়াতে চাইলে, পাহাড়ী জঙ্গলের গাছ কেটে লাভের অঙ্ক ক্রমাগত ট্যাকে ভরতে চাইলে,—পাহাড়ে ধস নামে, পাহাড়ের জীবনে দুর্দিন নেমে আসে। সমুদ্রের ওপরে ক্রমাগত থাবা বসিয়ে তার দখল নিতে চাইলে, তাকে শাসন করতে চাইলে সুনামি হয়। এ সমস্তই বিপন্ন করে তোলে মানুষের বাঁচা, তার জীবনধারণ। আর এ সব দৃষ্টান্ত সারা বিশ্বে তো

বটেই, খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আজকের এই পশ্চিমবঙ্গটুকুর মধ্যেও।—কেবল আপনার সুবিধার জন্য প্রকৃতিকে লুঠ করতে চাইলে, তাকে ধ্বংস করতে চাইলে মানুষ নিজেও ধ্বংস হবে এ খুব স্বাভাবিক কথা,—কারণ মানুষ তো এই প্রকৃতিরই একটি অংশ। বলা যেতে পারে একটি ক্ষুদ্র অংশ। তার লোভ, তার সুবিধা তাই সভ্যতার শেষ কথা হতে পারে না।—'রক্তকরবী' এই কথাটা স্পষ্ট করে দেয়; আর আজকের এবং সম্ভবত আগামী দিনের সমস্ত সাধারণ মানুষের অ-রাজনৈতিক (অর্থাৎ, কোনো রাজনৈতিক সুবিধার জন্য নয়, কেবল স্বাভাবিক বেঁচে থাকার জন্য) সুতীব্র প্রতিবাদের আশ্রয় হয়ে ওঠে।—রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন, মানবধর্মের প্রকাশনা ঘটে থাকে প্রেমের মধ্য দিয়ে। দ্বেষ বা নিষ্ঠুরপ্রবৃত্তির মধ্যে দিয়ে নয়।

বড় দুঃখের হলেও, বড় সত্যি, যে পশ্চিমবঙ্গের আজকের সরকার দরিদ্র মানুষের প্রতি সর্বতোভাবে নির্মম হয়ে উঠেছে দৈত্যাকার লোভের পৃষ্ঠপোষকতা করে, সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনস্পৃহাকে নিষ্ঠুর ভাবে বলি দেওয়ার প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে।

১

# পশ্চিমবাংলার শিল্পায়ন : ইতিহাসের তাগিদ

দিলীপ ভট্টাচার্য

## ১। ভূমি-সংস্কার

ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত বাংলা দেশ তুলনামূলক ভাবে শিল্পোন্নত অঞ্চলের স্বীকৃতি পেত। স্বাধীনতার পরে, সঠিক ভাবে ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় শিল্পনীতি লাগু হতে, পশ্চিম বাংলার শিল্পোন্নয়নের গতি অধোমুখী হয়। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে অবস্থা ফের পাল্টাতে শুরু করে। এ সময় থেকে পশ্চিম বাংলার শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা ক্রমশ স্বীকৃতি লাভ করে।

কৃষি-প্রধান উন্নয়নশীল দেশে শিল্প-বিকাশের প্রাক-শর্ত কৃষি-উন্নয়ন। অন্যথা শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের ক্রেতা থাকে না, তাই চাহিদা জন্মায় না, বিশেষত ভোগ্য পণ্যের। সারা ভারতেই এর জন্য আশু প্রয়োজন ছিল সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে কৃষি-ক্ষেত্রে উৎপাদন-বিরোধী শৃঙ্খল ছিন্ন করা, এককথায় আমূল ভূমি-সংস্কার। এটা দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যসহ ১৯৮০-র দশক অবধি পশ্চিম বাংলায় হয়নি; হিন্দি বলয়ে আজও বাকি আছে। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে বাংলা দেশে শিল্প-বিকাশের মাত্রা তুলনামূলক ভাবে বেশি হলেও মূলত শিল্পপণ্য উৎপাদনকারী এলাকাগুলি গড়ে উঠেছিল কতগুলো পৌর-দ্বীপের মত। সেই শিল্পের সাথে কৃষি-নির্ভর বৃহত্তর বাংলার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা স্থাপিত হয়নি। ১৯শ শতকের জাগরণের মত উৎপাদন-শিল্পও ছিল গ্রাম বাংলা থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন, উপরন্তু প্রধানত ঔপনিবেশিক উদ্যম। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা সারা ভারতেই সর্বাঙ্গীন শিল্প-বিকাশের প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়িয়ে থাকলেও, বাংলা দেশে কতগুলি বিশেষ বাধা ছিল, অনন্য ভূমি ব্যবস্থা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যার অন্যতম। সেগুলির স্বল্প আলোচনা পশ্চিম বাংলার ভূমি-সংস্কার এবং শিল্পায়নের বর্তমান তাগিদ ও সেই বিষয়ে সাম্প্রতিক সমালোচনার কিছু কারণের প্রতি আলোকপাত করতে এবং সেই সঙ্গে কৃষি-সমৃদ্ধ পাঞ্জাব ও পশ্চাৎপদ বাংলার তুলনামূলক অনুসন্ধানের সহায়ক হতে পারে।

এটা প্রায় সর্বজ্ঞাত যে পশ্চিম বাংলার জন-ঘনত্ব ভারতে সর্বাধিক। ২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার জন-ঘনত্ব যেখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯০০-র বেশি, পাঞ্জাবে সেখানে ৪৮২ এবং সারা ভারতে ৩০৪। চাষযোগ্য জমির ওপর চাপ পশ্চিমবাংলায় হেক্টর প্রতি প্রায় ১৫০০, পাঞ্জাবে হাজারের কাছাকাছি। কৃষি-জমির ওপর চাপের প্রধান কারণ অবশ্যই পশ্চিম বাংলার নিবিড় জনবসতি। ব-দ্বীপের সহজ লভ্য ও উর্বর কৃষি-জমির আকর্ষণে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এখানে মানুষ ভিড় করেছে। কিন্তু এর অন্য কারণও আছে।

দেশভাগের সময়, দুই বাংলার অননুরূপ, দুই পাঞ্জাবের ভেতর প্রায় পূর্ণ অধিবাসী বিনিময় হওয়ায়, পশ্চিম বাংলার মত পাঞ্জাবে জমির ওপর উদ্বাস্তু আগমন জনিত চাপ

ছিল না। তার ওপর, পূর্বে লক্ষ্ণৌ, পশ্চিম মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ অবধি বিস্তৃত নানা শহরে পাঞ্জাবি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, সেনাবাহিনীতে নিয়োগ, সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহের বরাত দান, বিনা মূল্যে বসতবাড়ি এবং ক্ষুদ্র শিল্পের পুঁজির জোগান দিয়ে কর্ম-সংস্থান করা হয়। পশ্চিম বাংলায় এসব না হওয়ায় প্রধান শহর এবং গ্রাম, উভয় অঞ্চলেই উদ্বাস্তুর চাপ তীব্র ছিল।

এর থেকে কৃষি-উৎপাদনে একটি গুরুতর ত্রুটির জন্ম হয়। কৃষি-ভূমিতে জনসংখ্যার চাপ কৃষি-উদ্বৃত্তকে সীমিত রাখে। এই ব্যবস্থায় জীর্ণ ঘানির মত উৎপাদনের সিংহভাগ কোনওমতে উৎপাদন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে এবং উৎপাদককে বাঁচিয়ে রাখতে ব্যয়িত হয়। কৃষকের মুনাফা বা কৃষি-উদ্বৃত্ত অপ্রতুল হয়, ফলে পণ্য-বাজার দুর্বল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নের অর্থের জোগানেও ঘাটতি পড়ে।

জনসংখ্যার চাপ জনিত এই দুর্বলতা ছিল পশ্চিম বাংলার ভূমি-সংস্কারের পরোক্ষ তাগিদ, তার প্রত্যক্ষ তাগিদ নিহিত ছিল বাংলার কৃষকের সঙ্গে কর্ষিত জমির সম্পর্কের মধ্যে। নিবিড় বসতি সেই তাগিদকে তীব্র করেছিল।

পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও ইউপির পশ্চিম প্রান্তের ভূমি ও কৃষি-ব্যবস্থায় খামারের উদ্ভব এবং ব্যাপক মাত্রায় শ্রমিক নিয়োগে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের অধিকতর প্রসার লক্ষ্যে আসে। এর ফলে সৃষ্ট কৃষি-সমৃদ্ধিও দৃষ্টি এড়ায় না। বিপরীতে পশ্চিম বাংলায় উৎপাদন-বিরোধী অচল এক ভূমি-সম্পর্ক দীর্ঘকাল কৃষি-বিকাশকে রুদ্ধ করে রেখেছিল। সংক্ষেপে, মুঘল আমলের শেষ পর্যায়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা কৃষককে নিংড়িয়ে কর আদায়ের প্রথাকে আইনি রূপ দিয়ে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা ছিল কৃষি-বিকাশের প্রধান প্রতিবন্ধক। এই বন্দোবস্তে জমির ওপর কৃষকের সনাতন অধিকার কেড়ে নিয়ে সেই অধিকার কর-সংগ্রাহকদের দিয়ে সৃষ্ট জমিদার নামক এক নতুন শ্রেণীকে দেওয়া হয়। এই ভাবে মুঘল সরকারের বেতনভুক নৃশংস অত্যাচারী আদায়কারীরা কলমের খোঁচায় কৃষি-জমির স্বত্বাধিকারী জমিদার পরিণত হয়। এর ফলে বাংলার কৃষক একদিকে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়, অন্যদিকে তার কৃষি-উৎপাদন নিম্নগতি লাভ করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সরকারকে দেয় জমিদারের কর, আনুষঙ্গিক খরচ নিয়ে প্রায় ৪ কোটি টাকার চিরকালের মত সীমিত হয়। কিন্তু কৃষকের কাছ থেকে আদায়যোগ্য করের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারিত হয়নি।

অতি লোভনীয় এই ব্যবস্থার আকর্ষণে জমিদার ও কৃষকের ভেতর অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগীর আবির্ভাব হয়। পিরামিডের মত তার চূড়ায় থাকে জমিদার এবং সবচেয়ে নীচে ভাগচাষি, ভূমি-সত্বহীন ছোট মাঝারি কৃষক; দাদনদার মহাজনের কাছে যাদের জমি, ঘটিবাটি এবং ক্ষেত্র বিশেষে কৃষকসহ তার স্ত্রী-কন্যা বাঁধা থাকে।

ভাগচাষি, ঠিকা প্রজা, দখলি স্বত্বহীন রায়ত নিয়ে এক দরিদ্র কৃষক বাহিনী বাংলার কৃষিজীবীর গরিষ্ঠাংশে পরিণত হওয়ার পরিণামে উৎপাদনের মুনাফা থেকে বঞ্চিত বিপুল সংখ্যক কৃষক উৎপাদনে উৎসাহ বোধ করতেন না। নিরুদ্যম কৃষকের ক্রমবর্ধমান ভিড়ে

বাংলার কৃষি-উৎপাদন দিনকে দিন নিম্নগতি হচ্ছিল। উৎপাদন-বিরোধী ভূমি-সম্পর্ক কৃষি-বিকাশের পথে মূল প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।[১]

তার ওপর জমিদাররা সেচ-ব্যবস্থা সংরক্ষণে উৎসাহ বোধ করতেন না। ইংরেজ সরকারও সেচের দায়িত্ব কোনওদিন স্বীকার করেনি। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শুরুতে খাজনার পরিমাণ বৃহৎ ও স্থিতিশীল হলেও, কালেদিনে সরকারি তবিলে জমা মোট রাজস্বের তুলনায় খাজনার পরিমাণ নগণ্য হয়ে দাঁড়ায়। তবু এই ব্যবস্থা টিকে ছিল কারণ এটি একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করত। এই বন্দোবস্তে ইংরেজ শাসক, তাদের শাসন বজায় রাখার পক্ষপাতী, অনুগত একটি প্রভাবশালী জমিদার বাহিনী পেয়েছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থায় ফলনের সঙ্গে সরকারি আয়ের সম্পর্ক ছিল না, সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব পূর্ব-নির্দিষ্ট ছিল। সেচ-ব্যবস্থার সংস্কার করলেও ইংরেজ সরকারের আয় অনড় থাকত। তাই তারা সেচ-ব্যবস্থা সম্পর্কে উদাসীন ছিল। পরিণতিতে বাংলার সেচ-ব্যবস্থা যুগ-প্রাচীন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ল। কৃষি-বিকাশ দূরের কথা, কৃষকের প্রাণ রক্ষার উপায়ও ক্ষীণ হল। দুর্ভিক্ষ তার চির-সঙ্গী ছিল।

এর সামাজিক ফল হয়েছিল ভয়ঙ্কর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের আগেই, ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৭৬৯-৭০ খ্রি) বাংলায় একটি বড় দুর্ভিক্ষ হয়। দেশের অধিবাসীর এক-তৃতীয়াংশ, এক কোটি মানুষ, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে প্রাণ হারান। এটি ছিল সদ্য শুরু হওয়া ইংরেজ শাসনের ভবিষ্যৎ রূপের একটি পূর্বাভাস। পরবর্তী কালে, ১৮০২-৫৪ কালে মোট দুর্ভিক্ষের সংখ্যা ছিল ১৩, মৃত্যু প্রায় ৫০ লক্ষ। ১৮৬০-৬১ পর্বে দুর্ভিক্ষের সংখ্যা দাঁড়াল ১৬, মৃত্যু ১ কোটি ২০ লক্ষ।

এই কৃষি-ব্যবস্থা, স্বাধীনতা প্রাপ্তি অবধি যা বাংলার কৃষকের ঘাড়ে অটুট চেপে ছিল, কৃষকের হাল কত ভঙ্গুর করেছিল তার সব থেকে মর্মান্তিক উদাহরণ পঞ্চাশের মন্বন্তর, যখন এক বছরের মধ্যে ৩০ থেকে ৩৫ লক্ষ বাঙালি অনাহারে প্রাণ হারান। এঁরা শতকরা একশ ভাগ ছিলেন কৃষক। সে সময়ের জমি হস্তান্তরের সংখ্যা এবং কৃষি-নির্ভর মানুষের শ্রেণী বিশ্লেষণে মৃতদের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮শ থেকে ২০শ শতক অবধি একটার পর একটা কৃষক-বিদ্রোহ এখানে ভূমি-সংস্কারের তীব্র তাগিদের সাক্ষ্য রূপে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে পাঞ্জাব ও ইউপি রাজ্যে সেচ-ব্যবস্থা অনেক উন্নত ছিল, সংস্কার ও তত্ত্বাবধানেরও অভাব ছিল না সেখানে। পাঞ্জাবের ভূমি-সম্পর্ক ছিল উন্নততর, যা বর্তমানে ধনতান্ত্রিক উপাদানে সমৃদ্ধ। সেখানে ভূমির ওপর জনসংখ্যার চাপও ছিল স্বল্পতর। ঐতিহাসিক কারণেই পাঞ্জাব এবং অন্যান্য অধিকাংশ রাজ্য থেকে পশ্চিম বাংলায় ভূমি-সংস্কারের তাগিদ বহুগুণ অধিক ছিল।

বাংলার ভূমি-সম্পর্কের ইতিহাস লেখা এই রচনার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু তার অবসানের প্রতিবন্ধকতার দিকে দৃষ্টিপাত অবশ্যই এর লক্ষ্য।

১৯২৭ সালে বর্গাদার ও গরিব কৃষকের স্বার্থে আনা একটি বিল তৎকালীন বিধানসভায় কংগ্রেসের বিরোধিতায় প্রত্যাখ্যাত হয়। সরাসরি যিনি বিরোধিতা করেছিলেন,

তাঁর নাম অখিল দত্ত। কিন্তু অখিলবাবু ব্যক্তিগত ভাবে বিরোধিতা করেননি। সেসময় কংগ্রেসের নেতা-প্রতিনিধিদের ভেতর ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও শরৎচন্দ্র বসু।

এরপর ১৯৩৭ সালে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সরকারের উদ্যোগে ১১জন সদস্য বিশিষ্ট বঙ্গীয় ভূমি-রাজস্ব তদন্ত কমিশন বা ফ্লাউড কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের একাধিক সুপারিশের অন্যতম ছিল বর্গাদারকে রায়তি স্বত্ব দিয়ে, তাদের খাজনা, উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের বদলে এক-তৃতীয়াংশ ধার্য করা। এই সুপারিশ কার্যকর হয়নি। এমনকি স্বাধীনতার পরেও ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ বস্তাবন্দী অবস্থায় পড়েছিল।

অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুর জেলার বর্গাদারের অনুপাত ছিল মোট কৃষকের ৬০–৭০ শতাংশ। ওই জেলার ঠাকুরগাঁ মহকুমার অটোয়ারি থানার রামপুর গ্রামে, ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ধানকাটার মরশুমে মূলত বর্গাদারের ভাগ ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ করার দাবিতে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। সুহ্‌রাবর্দি সাহেবের মুসলিম লিগ সরকার আন্দোলনরত কৃষকের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। আন্দোলন দমন করতে সরকার আর জোতদারের পুলিশ-গুণ্ডা ৭৭ জন কৃষককে হত্যা, ৩১১৯ জনকে গ্রেপ্তার, ২০০০ কৃষকের বিরুদ্ধে ৪০০ মামলা দায়ের করে। এ ছাড়াও ছিল ধর্ষণ, অসম্মান, যা শুধু তেভাগার সহৃদয় ইতিহাস রচয়িতাদের বিবরণে নথিভুক্ত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তেভাগা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে।

তেভাগা আন্দোলনে অবিভক্ত বাংলার ১৯টি জেলার ৬০ লক্ষ মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পরে, পশ্চিম বাংলার দক্ষিণের কয়েকটি জেলায় আবার কৃষক-আন্দোলন গঠিত হয়। এই দ্বিতীয় পর্বে সংগ্রামের ঝড়কেন্দ্র ছিল সুন্দরবন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতা বহির্ভূত সুন্দরবন অঞ্চলের শোষণ ছিল আরও ভয়ঙ্কর। এবং সেই শোষণের খবর মূলস্রোত বাংলায় আসত না। ওপরের বাংলা আর নিচের সুন্দরবনের মধ্যেকার পর্দা উঠতে শুরু করে ১৯৩০-এর দশকে, বঙ্গীয় কৃষক-সভা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর। যবনিকা উঠলে সুন্দরবন কৃষকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক হাল সম্পর্কে খবর আসতে লাগল।

জানা গেল যে সেখানে অর্ধেক ফসলের ওপরও ছিল ছাব্বিশ রকমের বাজে আদায়; এবং তার ওপরে ছিল অসম্মান, কৃষকের মনুষ্যত্ব হরণ, যার ফলে যৌন রোগ ছিল কৃষকের নিত্য সহচর।

১৯৪৭ সালের ধানকাটার সময় সুন্দরবনের কৃষক দ্বিতীয় পর্বের তেভাগা আন্দোলন শুরু করে। তার কিছু পরে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গুরুতর পরিবর্তন হয়। নতুন নেতৃত্ব অতি-বাম বিচ্যুতির শিকার হন। সুন্দরবনের আন্দোলনও হঠকারী পথ নেয়। এটা নেতৃত্বের ত্রুটি, কৃষকের নয়। সেই কৃষকের ন্যায্য দাবির আন্দোলনকে বর্বর ভাবে দমন করা হয়। তার একটি দৃষ্টান্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ১৯৪৮ সালের ৬ নভেম্বর সকাল নটায় বোট নিয়ে পাঁচশ পুলিশ নামখানার পাঁচ মাইল দক্ষিণে ফ্রেজারগঞ্জের রাস্তায় হরিপুর গ্রামের অদূরে দক্ষিণ চন্দনপিড়ি গ্রামে হানা দেয়। হানাদাররা গর্ভবতী কৃষক-রমণী অহল্যার

পেট চিরে দেয়। মৃত্যুপথযাত্রী রক্তাক্ত অহল্যাকে উদ্দেশ করে সেবাদলের একটি গাতক তাকে তেভাগা নিতে আহ্বান জানায়।

তেভাগা ও কাকদ্বীপের আন্দোলনের সংগঠক ছিল কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক-সভা। কমিউনিস্ট দল ও তার গণ-সংগঠনগুলি একক ও নিঃসঙ্গ রাজনৈতিক শক্তি রূপে তেভাগা আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। ১২ মার্চ, ১৯৪৭, জ্যোতি বসু এই প্রসঙ্গে বিধানসভায় সংগ্রামীদের পক্ষে একটি মর্মস্পর্শী ভাষণ দিয়েছিলেন। কিন্তু কমিউনিস্ট ছাড়া বাকি সব দলই কংগ্রেস, মুসলিম লিগসহ অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি পর্যন্ত তেভাগা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। সাম্প্রদায়িকতা কলুষিত হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ক্ষতবাহী সেই বাংলায়, তেভাগা-বিরোধী দলগুলি সাম্প্রদায়িকতা বিসর্জন দিয়ে ধর্মনির্বিশেষে কৃষক দমন করতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন।

তেভাগা ও তেভাগা-উত্তর কালে ১৯৪৭ সালের বেঙ্গল বর্গাদার্‌স টেম্পোরারি রেগুলেশন বিল, ওই বছরেরই স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেনান্সি বিল, ১৯৫০-এর বর্গা আইন, ১৯৫৩-র পশ্চিম বাংলা জমিদারি অধিগ্রহণ আইন, এবং ওই বছরেই পশ্চিম বাংলা ভূমি-সংস্কার আইন পাস হলেও এই আইনগুলিকে কার্যকর করার প্রচেষ্টায় লক্ষণীয় ঘাটতি ছিল। ফলে কৃষকের দাবিগুলির সমাধান হয়নি, এবং পশ্চিম বাংলার কৃষি-উৎপাদনের প্রতিবন্ধকগুলিও দূর হয়নি।

১৯৬৭ সালে পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় যা দুই দফায় ২২ মাস টিকে ছিল। সীমাবদ্ধতার বেড়াজালে দুবছরের কম সময়ে প্রায় ৬ লাখ একর জমি ভূমিহীন চাষিদের মধ্যে বিলি হয়। অবশ্য পাট্টা দেওয়া সম্ভব হয়নি। বর্গাদারদের অধিকারও নথিভুক্ত করা যায়নি। ১৯৭৭ অবধি এই হিসেবই ছিল। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। এই আমলে ১৯৮১ ও ১৯৮৬ সালে পশ্চিম বাংলা ভূমি-সংস্কার আইনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করা হয় এবং অপারেশন বর্গা নামে খ্যাত কার্যক্রমে বর্গাদারদের অধিকার নথিভুক্ত করা হয়। এই আইনের বলে ১৩ লাখ ৪০ হাজার বর্গাদারের নাম নিবন্ধীকৃত, ১১ লাখ একর জমি উদ্ধার এবং সেই জমি ২ লাখ ৪০ হাজার ভূমিহীন কৃষক পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হল। এটি একটি চালু প্রক্রিয়া।

ভূমি-সংস্কার ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েতি-রাজ প্রতিষ্ঠায় বাংলার অধিকাংশ কৃষকের হাল আগের চেয়ে ভালো হয়েছে শুধু নয়, মুর্শিদাবাদ, হুগলি বর্ধমান, নদিয়া, দক্ষিণ ২৪-পরগনার পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানের সমৃদ্ধি চোখে পড়ে। সামাজিক ক্ষেত্রেও গুণগত পরিবর্তন দেখা যায়। নারী, দলিত সম্প্রদায় সমাজে প্রাপ্য স্থান অর্জনের সুযোগ পেয়ে স্বনির্ভরতার জন্য সচেষ্ট।

কিন্তু সমস্যা রয়ে গিয়েছে, নতুন সমস্যাও সৃষ্টি হয়েছে। জমির ওপর চাপ বাড়ছে। তার ওপর পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, অবিভক্ত ২৪-পরগনার পূর্বভাগ ও সুন্দরবনসহ বেশ কিছু অঞ্চল এখনও এক-ফসলি রয়ে গিয়েছে। দক্ষিণের নোনা মাটি এবং পুরুলিয়ার কিছু অঞ্চলে আদৌ ফসল হয় না, জমি বন্ধ্যা পড়ে থাকে। সেখানে

শিল্প গড়ার উদ্যোগ নিতেও যথেষ্ট গড়িমসি হয়েছে। এমনিতেই বেকার সমস্যা তীব্র, এইসব অঞ্চলে তার মাত্রা ভয়াবহ। সেখানকার গ্রামীণ বেকাররা, কলকাতায়, জেলা শহরে ভিড় করেন, রিকশা চালিয়ে, অনিয়মিত দিন মজুরের কাজ করে জীবন ধারণ করেন। যাঁরা তা পারেন না, আদিবাসী বৃদ্ধা, অনাথদের কেউ কেউ অর্ধাহার, অপুষ্টি, রোগে প্রাণ হারিয়ে খবরের শিরোনাম হন।

তেভাগা ও কাকদ্বীপ, উভয় আন্দোলনেরই লক্ষ্য ছিল পরিশ্রী কৃষকের ওপর থেকে মধ্যযুগীয় শোষণের অবসান। তেভাগা আন্দোলন দমনের দায় ছিল মুসলিম লিগ সরকারের। তার সঙ্গে অন্যান্য দলও ছিল, বিশেষ করে কংগ্রেস, যার বহু প্রমাণের মধ্যে কংগ্রেস দলের অন্যতম মুখপাত্র অরুণ গুহের একাধিক বিবৃতি সাক্ষ্য রূপে রয়ে গিয়েছে। আর কাকদ্বীপ-সংগ্রাম দমন করেছিল স্বাধীন ভারতের পশ্চিম বাংলা সরকার ; প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছিল প্রশাসন, জোতদার, কিছু কংগ্রেসি নেতা এবং কংগ্রেস সেবাদল। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলায় কৃষকের স্বার্থে যে আইনগুলি প্রণীত হয় সেগুলি রূপায়ণেও শাসক কংগ্রেস দলের ঢিলেমি ছিল। সেগুলি কার্যকর করার প্রথম উদ্যোগ নেয় দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকার, বামফ্রন্ট আমলে কাজ সম্পূর্ণ হয়।

শিল্প-উন্নয়নের ক্ষেত্রে, কেন্দ্রের পক্ষপাতমূলক আচরণ অন্য রাজ্যগুলিকে এগিয়ে দেওয়ার যতটা সুযোগ দিয়েছে, সারা পূর্বাঞ্চলসহ পশ্চিম বাংলাকে পশ্চাৎপদ করার জন্য ততটাই তৎপর হয়েছে। ১৯৫৬ সালে ভারত সরকারের শিল্প নীতি চালু হয়, যার দুটি ব্যবস্থা পূর্বাঞ্চলকে বঞ্চিত করার জন্য প্রণীত হয়েছিল। একটি হল লাইসেন্স প্রথা, অপরটি মাশুল-সমীকরণ নীতি। সে যাবৎ শিল্প গড়তে গেলে কোনও লাইসেন্সের প্রয়োজন হত না, শিল্পনীতিতে লাইসেন্স বাধ্যতামূলক হল। ব্যক্তিগত উদ্যোগের বেলা তো বটেই, রাজ্য সরকারের উদ্যোগের ক্ষেত্রেও লাইসেন্স নেওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় হল। সরকারি ও বেসরকারি, বহু প্রস্তাব, প্রকল্পকে লাইসেন্স দেওয়া হল না। পশ্চিম বাংলায় বিদ্যুতিন সমাহার গড়ার প্রস্তাব এভাবে খারিজ হল, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল-এর প্রস্তাব এই নীতির শিকার হয়ে দীর্ঘদিন ঝুলে রইল। দ্বিতীয়, মাশুল সমীকরণ করে পশ্চিম বাংলা এবং পূর্বাঞ্চলের প্রাকৃতিক সুবিধাগুলো কেড়ে নিয়ে তাদের বিপুল ক্ষতি করা হল।

এগুলো বঞ্চিত করার ঘোষিত নীতি। অঘোষিত নীতিও কম ছিল না, এখনও তার বেশ কিছু বহাল রয়েছে। সারা ভারতে ব্যাংকের আমানতের ৬৫ শতাংশ রাজ্যে বিনিয়োগ হয়, পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলিতে বিনিয়োগের হার ৮০শতাংশ, পশ্চিম বাংলায় ৫৫শতাংশ। পশ্চিম ভারতের থেকে তো বটেই, সারা ভারতের গড় বিনিয়োগের হারের থেকেও এটা কম। এগুলি RBI-এর নিজস্ব রিপোর্ট থেকে সংগ্রহ করা তথ্য। হাজার চিৎকার করেও এই বৈষম্য দূর করা যায়নি।

এসব সত্ত্বেও যথাসময়ে ভূমি-সংস্কার হলে পশ্চিম বাংলা পাঞ্জাবের মত সমৃদ্ধ হত কিনা বলা যায় না, কিন্তু এটুকু বলা যায় যে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও জন-অধ্যুষিত, কৃষি-প্রধান পশ্চিম বাংলায় একটি গ্রামীণ বাজার সৃষ্টি হত এবং সেই বাজার এখানে ক্ষুদ্র

শিল্পের সুস্থ ভাবে বাঁচা ও বৃদ্ধির গ্যারান্টি হতে পারত। সুতরাং শোষণ থেকে কৃষকের মুক্তি, বাংলার কৃষি-বিকাশের প্রধান প্রতিবন্ধকের অবসান, কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, গ্রামীণ বাজার সৃষ্টি এবং পরিণতিতে ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনে সাফল্য—পরস্পর সম্পর্কিত এই কার্যক্রম গ্রহণ করে পশ্চিম বাংলার উন্নয়নের যে বিকল্প কর্মসূচি প্রাপ্তিসাধ্য ছিল, একনাগাড়ে তাকে দূরে ঠেলে দেওয়ার দায় কেন্দ্রের নয়।

ঐতিহাসিক জটিলতা সত্ত্বেও, রাজ্যের নিজস্ব উদ্যোগে যে ভূমি-সংস্কার করা যেত, উত্তর-১৯৭৭-এর অভিজ্ঞতা তার প্রমাণ। সেটা না হওয়ার দায়িত্ব, যে দলেরই হোক, একান্তই পশ্চিম বাংলার। তেভাগা আন্দোলন ও পরবর্তী ঘটনাক্রম থেকে এই সত্য পরিস্ফুট হয়। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বাংলাকে অনেক ভাবে বঞ্চিত করেছে, একথা যেমন সত্য, এটাও সত্য যে বাংলার Civil সমাজের উঁচুতলায় ভূমি-সংস্কারের প্রতি অনীহা ছিল, যার দায়িত্ব কেন্দ্রের নয়।

এই দায় স্বাধীনতার আগে যাঁরা বাংলার প্রধান রাজনৈতিক শক্তি ছিলেন তাঁদের এবং সেই একই শক্তির, স্বাধীনতা-উত্তর কালে যাঁরা তিন দশক বাংলার শাসক ছিলেন। তাঁদের শ্রেণী অবস্থানের তাগিদে ভূমি-সংস্কার করা সেই কংগ্রেস দলের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আজ সেই দল তাদের উত্তরাধিকারীদের নিয়ে পশ্চিম বাংলার শিল্পোন্নয়নের পথে প্রধান রাজনৈতিক বাধা রূপে মঞ্চে অবতীর্ণ।

২। কৃষি ও কৃষক সম্পর্কে উদ্বেগ

এতগুলি কথা বলার উদ্দেশ্য নিছক ইতিহাস চর্চা নয়। এটি পরিষ্কার যে বর্তমানে শুধুমাত্র ভূমি-সংস্কারের সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রে আর কর্ম-সংস্থান হচ্ছে না। অথচ জনসংখ্যা ও গ্রামীণ বেকারের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি-উৎপাদন ও কৃষি-ক্ষেত্রে কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধি, একই সঙ্গে এই দুই উদ্দেশ্য সাধন করার মত আর্থিক বা সাংবিধানিক ক্ষমতা, কোনওটাই রাজ্য সরকারের নেই। তার ওপর সমবায়, যৌথ বা ধনতান্ত্রিক খামার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি গাঠনিক পরিবর্তন করে কৃষি-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা গেলেও, এইসব পদক্ষেপের অনুসারী যন্ত্রায়ন কৃষি-ক্ষেত্রে এক বিপুল উদ্বৃত্ত শ্রমিক বাহিনী সৃষ্টি করবে। ফলে গ্রামীণ বেকারের সংখ্যাও বহুগুণ বাড়বে। সমস্যার অন্য সমাধান শিল্পায়ন এখানে জরুরি।

ভূমি-সংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণে গৌরব, সাহস, রোমাঞ্চের ওপরেও থাকে এক উন্মুক্তির সন্ধান, যাকে শিল্পায়নের দ্বার বলা যায়। তার সুযোগ নেওয়ার পথে একাধিক বাধা আসছে, যার প্রধান উৎস অবশ্যই বামফ্রন্টের বাইরে। প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস সর্বতোভাবে এবং দ্বিতীয় বিরোধী দল কংগ্রেস খাপছাড়া বাধা সৃষ্টি করছে। এদের পূর্ব কীর্তির কিছু তথ্য এই আলোচনায় পরিবেশিত হয়েছে। ভূমি-সংস্কার এবং শিল্পায়নে এঁরা চিরকাল নেতিবাচক এবং পশ্চিম বাংলার স্বার্থ-বিরোধী ভূমিকা নিয়েছেন। সাবেক শাসক দলের এই বিরোধিতাকে প্রতিহত ও নিষ্ক্রিয় করা জরুরি হলেও, একে প্রতিক্রিয়ার নিষ্ফল তর্জনের বেশি গুরুত্ব দেওয়া যায় না।

অন্যদিকে কিছু বামপন্থী দল, এমনকি বামফ্রন্টের একাংশও শিল্পায়নের সমালোচনায় শামিল হয়েছেন। তাঁদের নানারকম যুক্তি আছে, যার দুটি আমি আলোচনায় আনছি।

(ক) খাদ্য স্ব-নির্ভরতা : শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়ে এঁরা কিছু উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যার অন্যতম হল খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা হ্রাসের সম্ভাবনা এবং ভূমিচ্যুত কৃষকের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা নিয়ে বলা প্রয়োজন যে পশ্চিম বাংলা খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেনি। তণ্ডুল শস্য, তরিতরকারি ও কিছু ফলমূলে সে স্বয়ম্ভর, কিন্তু ডাল, আলু, পেঁয়াজ, মাছ প্রভৃতি নিত্য খাদ্যে পশ্চিম বাংলা আজও অন্য রাজ্য থেকে আমদানির ওপর নির্ভরশীল। এটা বলার প্রয়োজন এই কারণে যে পশ্চিম বাংলা ভারতেরই একটি অঙ্গ রাজ্য, কোনও সার্বভৌম দেশ নয়। একটি সার্বভৌম দেশের পক্ষে খাদ্যে স্ব-নির্ভরতা অর্জন ক্ষেত্র বিশেষে জাতীয় লক্ষ্য হতে পারে, কিন্তু রাজ্যের ক্ষেত্রে সেটা জরুরি নয়, সর্বদা সম্ভবও নয়। রাজ্যে যেটা উৎপাদন সম্ভব ও লাভযোগ্য সেই পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতাটা জরুরি। সেই স্থলে আঘাত পড়ছে কিনা সেটা দেখাও জরুরি।

অনেকেরই স্মরণে আছে গত শতকের ষাটের দশক অবধি পশ্চিম বাংলা খাদ্যে ঘাটতি-রাজ্য ছিল। বর্তমানে পশ্চিম বাংলা তণ্ডুল শস্যে শুধু স্বয়ম্ভরই নয়, সে সারা ভারতে ধান উৎপাদনে প্রথম স্থানের অধিকারী। অন্য কিছু কৃষি-পণ্যেও বাংলা এগিয়ে বা প্রথম সারিতে আছে। সেই স্থান থেকে চ্যুতি বাঞ্ছনীয় নয়, তাই চ্যুতির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। প্রাক্তন এই ঘাটতি-রাজ্যের বর্তমান অবস্থান এবং পরিবর্তনের অঙ্কটা যে বিপুল নিচের সারণী থেকে সেটা পরিষ্কার হবে।

### পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান শস্যের উৎপাদন-পরিসংখ্যান[১]

একক : '০০০ মেট্রিক টন

| ত্রিবর্ষ | দানা শস্য | | | অন্য শস্য | মোট কৃষি |
|---|---|---|---|---|---|
| | তণ্ডুল | অন্য | মোট | | উৎপাদন |
| ১৯৫৮-৬১ | ৪,৭১১ | ৩৬৫ | ৫,০৭৬ | ১,৮৫৩ | ৬,৯২৯ |
| ১৯৬৪-৬৭ | ৫,২৭২ | ৪২১ | ৫,৬৯৩ | ২,০৬০ | ৭,৭৫৩ |
| ১৯৬৯-৭২ | ৫,৫০৪ | ৩৫৩ | ৫,৮৫৭ | ২,১৩০ | ৭,৯৮৭ |
| ১৯৭৪-৭৭ | ৬,৭২৬ | ৩৭৯ | ৭,১০৫ | ২,৪২৪ | ৯,৫২৯ |
| ১৯৭৯-৮২ | ৬,৮২১ | ২৫৮ | ৭,০৭৯ | ৩,৩৮৫ | ১০,৪৬৪ |
| ১৯৮৩-৮৬ | ৮,৬৭৭ | ২৪৮ | ৮,৯২৫ | ৪,৬০৪ | ১৩,৫২৯ |

ওপরের সারণীর তথ্য অনুযায়ী ১৯৫৮-৬১ থেকে ১৯৮৩-৮৬ অবধি বাংলার খাদ্য উৎপাদন ৬৯.২৯ লক্ষ টন থেকে ১৩৫.২৯ লক্ষ টনে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ ২৫ বছরে কৃষি-উৎপাদন ৬৬ লক্ষ মেট্রিক টন বেড়েছে। পরবর্তী কালেও এই বৃদ্ধি বজায় রয়েছে। বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানে ওপরে সারণীর সূত্র, এবং পশ্চিম বাংলার কৃষি-তথ্যের আকর সচ্চিদানন্দ দত্ত রায়ের *বিকল্প পরিসংখ্যানের আলোকে পশ্চিম বঙ্গের কৃষি-অগ্রগতি (১৯৫৮-২০০১)* গ্রন্থ থেকে নিচের উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

ফলনের হার : পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমি সীমাবদ্ধ। এখানে নিট কর্ষিত জমি পরিমাণে বাড়ার সুযোগ তেমন নেই। তবে সেচের প্রসারের ফলে চাষের নিবিড়তা অনেক বেড়েছে, অর্থাৎ একাধিক মরশুমে চাষের জমি ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা সম্ভব হয়েছে এবং হচ্ছে জলসেচের প্রসারের দ্বারা। জলসেচের নতুন সুযোগ সৃষ্টি সম্ভাবনা কমে আসছে কেননা সেচের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সীমার দিকে আমরা দ্রুত এগোচ্ছি। চাষের ধরন পাল্টে এবং জলের সদ্ব্যবহারের ওপর জোর দিয়ে চাষের নিবিড়তা ভবিষ্যতে আরও কিছু বাড়বে। ইতিমধ্যে (১৯৯৮-২০০১ ত্রিবর্ষ) অবশ্য রাজ্যে চাষের নিবিড়তা ১৭৩ শতাংশ ছাড়িয়েছে। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ থাকবে জমির উৎপাদিকতা বৃদ্ধির মাধ্যমে।[৫]

তাহলে, সেচ এবং জমির উৎপাদকতা বৃদ্ধি করে পশ্চিম বাংলায় কৃষি-উৎপাদন বেড়েছে এবং সেচের প্রসার ক্রমশ সীমিত হয়ে এলেও জমির উৎপাদকতা বৃদ্ধি করে ফসল বাড়ানোর সুযোগ রয়ে গিয়েছে।

সেচের প্রসারের সম্ভাবনা কতটা?

ওই গ্রন্থ থেকেই জানা যায় যে বিশেষজ্ঞের মত অনুযায়ী পশ্চিম বাংলায় ৬১.১০ লক্ষ হেক্টর (সব মরশুম মিলিয়ে) জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব। এ যাবৎ ৪৯.৪২ লক্ষ হেক্টর জমির জন্য সেচ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু উপযোগ হয়েছে ৩৯.০৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে। অর্থাৎ সৃষ্ট ব্যবস্থার ১০.৩৪ (৪৯.৪২-৩৯.০৮) লক্ষ হেক্টর জমি ব্যবহার হয়নি এবং সম্ভাবনার ১১.৬৮ (৬১.১০-৪৯.৪২) লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়নি। তাহলে মোট ২২.০২ (১০.৩৪ + ১১.৬৮) লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ উপযোগ করে ফলন বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।[৬] এ রাজ্যের নিট কর্ষিত জমির পরিমাণ (একটি মরশুম বিবেচনা করে) ৫৪.৪৩ লক্ষ হেক্টর (১৯৯৮-২০০১ ত্রিবর্ষ) এবং সব মরশুম মিলিয়ে এই পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৩.৩৪ লক্ষ হেক্টর। সেচ প্রসার করে একে বাড়িয়ে ১১৫.৩৬ (৯৩.৩৪ + ২২.০২) লক্ষ হেক্টর করা যায়।

সেচ-ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়ে উৎপাদন-বৃদ্ধির ওপরে উচ্চফলনশীল বীজ, সার প্রয়োগ করেও জমির উৎপাদকতা বেড়েছে এবং বাড়ানোর সুযোগ রয়ে গিয়েছে।

ভূমি-সংস্কারের প্রেরণায় উৎপাদন-বৃদ্ধির হার হয়ত মাপা যায় না, তার প্রভাবও দীর্ঘদিন থাকে না। কিন্তু উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগের সুযোগ থেকে যায়। পশ্চিম বাংলায় চালের ফলন ১৯৭৪-৭৭ সালে ছিল হেক্টর প্রতি ১,১৬৩ কেজি, ১৯৯৮-২০০১ ত্রিবর্ষে সেটা বেড়ে ২,২২৩ কেজি হয়েছে।[৭] এটা কম না হলেও, পাঞ্জাবের হেক্টর প্রতি ৩,২৮২ কেজি থেকে কম। সেখানে পৌঁছনোর কাজ বাকি আছে। আবার কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, এমনকি চিনের তুলনায়ও পাঞ্জাবের ফলনের হার কম। সেটাও বাড়ানো যায়। সুতরাং জমির সীমাবদ্ধতা, এবং শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ সত্ত্বেও এ রাজ্যে খাদ্য সঙ্কটের সম্ভাবনা নেই। এর জন্য শিল্পবন্ধুদের উদ্বেগের কারণ নেই।

(খ) ভূমি-চ্যুত কৃষকের ভবিষ্যৎ : জমিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা পরিমাপের পদ্ধতি নিশ্চয় আছে। কিন্তু জমির উপযোগ, গুণাগুণ, ফসল মিশ্রে বৈচিত্র্য, চাষের নিবিড়তা ইত্যাদি কারণে শ্রমিক : জমি অনুপাতের কোনও অভিন্ন মাপকাঠি নেই। তাহলেও, অনুমান যে পশ্চিম বাংলার অধিবাসীর প্রায় ৬০ শতাংশ বা পাঁচ কোটি মানুষ জীবিকার জন্য

প্রধানত কৃষি-জমির ওপর নির্ভর করেন। এই হিসাবে গড়পড়তায় হেক্টর প্রতি কৃষি-নির্ভর মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯ থেকে ১০ জন। এঁদের ভেতর জমির মালিক, নথিভুক্ত ও অ-নথিভুক্ত বর্গাদার, খেতমজুর, বিপণনে নিযুক্ত পাইকার, ফড়িয়া, পরিবহনকারী, পণ্য ওঠানো নামানোয় নিযুক্ত শ্রমিক, অর্থাৎ প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে নিযুক্ত সব মানুষই পড়েন।

সিঙ্গুরের কথা ধরলে, সেখানে ৯৯৭ একর জমি অধিগ্রহণের আওতায় এসেছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী এর ভেতর ৯১০ একর এক-ফসলি, ৩৯ একরে একাধিক মরশুমে চাষ হয় এবং বাকি ৪৮ একর কৃষি-জমি রূপে ব্যবহৃত হয় না। এই বিভাজন উপেক্ষা করে যদি পুরো জমিই কৃষি-জমি বিবেচনা করা হয়, তাহলে মোট জমি হয় ৪০০ হেক্টর। পূর্বোক্ত হেক্টর প্রতি ৯-১০ জন মানুষের নিযুক্তির হার ধরলে, সিঙ্গুরের অধিগৃহীত কৃষি-জমিতে মোট নিযুক্তির পরিমাণ হয় ৪,০০০।

টাটা মোটরস্ জানিয়েছে যে গাড়ি তৈরির প্রস্তাবিত কারখানায় ২,০০০ লোক প্রত্যক্ষ কাজ পাবেন। তার ওপর ১০,০০০ মানুষ অনুসারী শিল্প ও পরিষেবায় পরোক্ষ নিযুক্তি পাবেন। কারখানার ২,০০০ কর্মীর ভেতর নিশ্চয় কিছু স্থানীয় মানুষ থাকবেন। তাঁদের কথা বাদ দিয়েও অভিজ্ঞতা বলে যে পরোক্ষ নিযুক্তিতে লাভবান ১০,০০০ মানুষ হবেন স্থানীয় অধিবাসী। তাহলে, এই শিল্পে ভূমি-চ্যুত কৃষকের পুনর্নিযুক্তি কোনও অলীক কল্পনা নয়।

সিঙ্গুরে কারখানা স্থাপনে যাঁরা আপত্তি তুলেছেন, বিশেষত বামফ্রন্টের ভেতরের মানুষ, তাঁদের বক্তব্য কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্বচ্ছতা, তথ্য জানার অধিকার তাঁরা দাবি করতেই পারেন। আমি এই আলোচনায় সেগুলো আনিনি, তা নিয়ে মন্তব্য করার অধিকার আমার নেই বিবেচনা করে। যাঁরা অন্তর থেকে মনে করেন যে সিঙ্গুরে কারখানা হলে, পশ্চিম বাংলার কৃষি-উৎপাদন ও অর্থনীতি বিপন্ন হবে কিংবা কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাঁদের গোচরে আনার জন্য কথাগুলি বললাম।

আর যাঁরা নেহাৎই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সিঙ্গুর তথা শিল্পায়নের বিরোধিতা করছেন তাঁদেরও এই সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে শিল্পায়ন কারও ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন নয়, একে বাধা দিলে সমাজের জৈবগুণকে অস্বীকার করা হয়, যা কোনওদিনই শেষ অবধি সফল হয় না। যেমন জমিদার জোতদারদের স্বার্থ চেষ্টা করেও ভূমি-সংস্কারকে শেষ অবধি রোখা যায়নি, সে রকম শিল্পায়নকেও রোখা যাবে না।

---

**উল্লেখপঞ্জী/টীকা :**

১. ১৯৮৫ সালে প্রবর্তিত বর্গায় প্রজাস্বত্ব আইনে ২৬ শতাংশ কৃষক স্বত্ব পেয়েছিলেন, বাকি ৭৪ শতাংশ কোনওদিনই জমিতে স্বত্ব পাননি।

২. সারণি ৬.১, পৃষ্ঠা ১০১, *বিকল্প পরিসংখ্যানের আলোকে পশ্চিম বঙ্গের কৃষি-অগ্রগতি*, সচ্চিদানন্দ দত্ত রায়, সেরিবান, কলকাতা।

৩. সারণি ৩.৫, ৩.৯ক, ৩.১১ পৃ. ৫৭-৫৮, প্রাগুক্ত।

৪. ভূমিকা, পৃ ১৪, প্রাগুক্ত।

"আমার রবীন্দ্রনাথ" কবিতাবৃত্ত থেকে

## আমার মুক্তি তুমিই

সিদ্ধেশ্বর সেন

"ধন্য আমি, ধন্য আমি মাটির পরে"

ভৃঙ্গারখানি প'ড়ে আছে
খরধূলির পথে

তবে কী নিয়েছে তৃষাকণিকাও
আমার—

করপুটেই ছিল
ভৃঙ্গার

পেতেও ছিলাম
তোমার দানের কাছে
: ভৃঙ্গারখানি আছে,—
তুমি কী কুড়াবে শেষ-উচাটন
মন্ত্রে

মন্ত্রও তবে
ফেরাবে—
সে আমি জানি

আমার মুক্তি তুমিই
কিনেছ
কঠিন তপের ব্রতে

তোমাকেই আমি পরমাত্মীয়
মানি

পেয়েও ছিলাম পথের ধারের
একদা কূপে
তোমারই শীতলে

জুড়ালে—
আমার তাপিত গ্লানি

জনপদ-পথে আমারই চলার পাথের
তবে কী বাড়ালে—।
মানবী তুমিই ধন্যা

যেমন মানবও আমি
তোমারই পুণ্যদানের হাতে।

---

* কবিগুরুর 'চণ্ডালিকা' অবলম্বনে।
সময়ের প্রেক্ষিতে, এই কবিতাসূত্রে রবীন্দ্রনাথকে যুক্ত নেওয়াই ('ইন্টারপ্রেট') আমার অভিপ্রায়।
—সি সে।

## হাসপাতাল থেকে

তরুণ সান্যাল

আরো একটা দিন গড়ালো
সূর্য নিভলো জ্বলে উঠলো লক্ষ রাত-চোখ
সূর্য গড়িয়ে গেল টয়োটা মারুতি অ্যামবি সুমো
সাত নাকি একুশ আইন
আলোকরূপসী খায় ট্রেডনামের বিজ্ঞপ্তির চুমো
ঘিঞ্জি কলকাতা হচ্ছে তিলোত্তমা নাকি তিলোত্তম
নারী ভাবলে কলকাতাকে বেশ লাগে
কিন্তু হিংস্র দাঁতনখ ঠেলে এক দানবী
ভৈরবী নাচনে ভাঙছে বুলডোজারে বাড়ি বস্তি দোকান
পিছে পড়ে থাকছে পাহাড়গাছালির শব

আলোর বহম ওকে মাটিতে শোয়াবে
এ পাহাড়ে ও পাহাড়ে

হাইরাইজে দেবদেবীরা হাততালি শোনাবে
ফুল ছড়াবে
জয়ধ্বনি দেবে

শেষ রোদ এখনো হয়তো বিশতলার শার্সিতে চমৎকার
দেবদেবীরা অলিম্পাসে বসে দেখে পিঁপড়ার মিছিল
সার সার আরশোলা বা মুর্খুরে পোকা ঘাসফড়িং
শিশির কি ভিজাবে তাও জলে

সামনের চক্রটি ঘিরে আলো ঝলাৎ দেয়ালি মশাল ছুট ছুট
বাঁয়ে চলছে ডাইনে যাচ্ছে
একটি ধূমকেতু দৌড়ে অন্যটিতে মিশে যাচ্ছে
দেখছি বন্দী হয়ে হাসপাতালে
কলকাতাও হয়ে পড়েছে এক বেশ বড়ো পিঁজরাপোল
দেবদেবীরা আছেন আছে পিঁপড়ে টিপড়ে
শুধু মানুষ নেই
মন্ত্রী ও মেয়র চান দারুণ ঝকঝকে এক বিশ্বায়নী ঠেক
আমাদের বালকবেলা প্রথম যৌবন হঠাবাহার
সে মাটির বেহালা ছিল এখন গিটার

পশ্চিমে সামান্য বুক চাপা মেঘ
গোপনে ঢেকেছে মুখ নক্ষত্রপ্রবণে শেষ দেখা সূর্যটিও
কিছু বিচ্ছুরণ শাদা তরোয়াল মনে হচ্ছে শুইয়ে রেখে গেছে
আকাশও ঘোলাটে লালচে ছায়া কালো অ্যাসফল্ট ছিটানো
ট্রাফিক সবুর হলে ঐ পথেও চাঁদ গড়িয়ে যাবে
আজকে পূর্ণিমা কিনা
আধা হলুদ কিছু একটা ঝুলতে থাকবে টবের ট্রলিতে
কয়লা বয়ে দূর দূর ট্রাশিজ হয়ে এমন সার্কাসে

রাত গড়াবে
যেমনটি গড়ালো দিন

এমনিই সর্বস্ব শুনছে গাছপালার বংশধর ধূলি ম্লান কেয়ারি
ঝরাপাতায় একটি দুটি কাগজের খাম শুকনো টাকা
অর্থাৎ বা মানুষ ছাড়া মানুষের বিশদ দরদাম

পশ্চিমে বুক চাপা মেঘ থেমে থেমে নিঃশ্বাস ফেলছিল
আমিও তো হাসপাতালে মনও হয়ে ওঠে প্রতিস্বর
কালো চেস্ট দক্ষিণ সমুদ্র থেকে দশবিশ বিদ্যুৎ থাম্বা ঘিরে
লাফিয়ে পড়লো : ভাঙো দরদালান ভাঙো হেরিটেজ
ভাঙো যা কিছু আত্মিক মানুষের
দীর্ঘ টানা ফ্লাইওভারে আমরা যে মানহাট্টান যাবো।

## আসা-যাওয়া

**অমিতাভ দাশগুপ্ত**

ভরা জোয়ারের কাল আসছে।
নৌকায় টান লাগছে। কাছি খুলে দাও।
সবাই দক্ষিণা নিয়ে চলে গেছে।
আর আমি সব কিছু চুকিয়ে বুকিয়ে, এবার
অগমপারের দিকে ছুটে যাবো।
আমার মাতাল তরণী
দিশেহারা হয়ে সবকিছু পেরিয়ে
শুধু ছুটে, ছুটে আর ছুটে যাচ্ছে।

এখন
চারপাশ থেকে ভেসে আসছে কত নাম-না-জানা
ফুলের গন্ধ
এখন
চারপাশ থেকে ছুটে আসছে
জন্মের কান্নার শব্দের অশ্রুত অথচ ফিসফাস বাতাস
হ্যামেলিনের বাঁশির মত
কে যেন আমাকে ডাকছে, ডাকছে আর ডাকছে,
যাওয়া আর আসার মাঝখানের বিরাট ফাঁকে
প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত বসে আছি—
আমার আর যাওয়া হয় না, আসা-ও হয় না।

# আরো একবার

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ফার্ন পাতাদের সঙ্গে ভাব হয়েছিল বয়স বাইশে
ফার্ন খুব ডালপালা ছড়ায় না, কিন্তু আকাশের দিকে খুব দ্রুত ওঠে।
এখন আমার ওই বালের সবুজ মানায় না। তাই মানচিত্রের দিকে চেয়ে থাকি,
মানুষ মানুষেরই চোখে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে সে কি
তখনো যথেষ্ট মানুষ। নাকি দেশ-মানচিত্রের সঙ্গে তার অন্যরকম সম্পর্ক হয়েছে?
সম্পর্ক তো ভূগোল পরীক্ষার ম্যাপ-পয়েনটিং নয়।
ফার্নপাতার চিত্র আছে মানচিত্র নেই
যেমন সূর্যের কোনো বংশপরিচয়
প্রযোজনই হয় না। মানুষেরই পদবী দরকার, গোত্র-পরিচয়ও প্রয়োজন আছে
মনে হয়।
গোত্র মানে তো পূর্বপুরুষ মুনিটির ক'সহস্র গোধন ছিল।
এক সময় গরুই ছিল আভিজাত্য, পদবী তো জীবিকার তুলনামূলক পরিচয়।
মানুষ-প্রসঙ্গ লিখতে চাই বলেই যে এ-সব লিখছি তা কিন্তু নয়
বংশ পরিচয়ের কোনো তাৎপর্যই নেই আজকাল
আসলে মানুষ এবং তার দেশ-পরিচয়
কখনোই কি জানতে পারে স্বাধীনতা কতদূর যেতে পারে, যায়,
এই পৃথিবীবিবাগী মন এখন তাই জানতে চায়।

যে-কোনো সবুজ ফার্ন জন্মস্বাধীন, আমরা স্বাধীন হয়েই পরমুহূর্তে পরাধীন
এই অদলবদল চলতেই থাকে, জেট-প্লেন বানিয়েও লাভ হয় না। কোনদিন
মেঘ-ছেঁড়া-বোমারুচালক আকাশে দেখবে না জল-প্রার্থী কিউমুলাস মেঘ
শুনবে না জ্যোৎস্নার মুগ্ধ সম্ভাষণ, এখন তো পেছন থেকে নিরাবেগ
কে যেন নির্জন ডাকে ডেকেই চলেছে 'সমরেন্দ্র চলে আয়'
সে ডাকের একমাত্র উপাধি মৃত্যু,
জেনেও মুখ ঘোরাবো, না কি শূন্যমেধা তাকিয়েই থাকবো।
অথবা ফার্নপাতার কাছে নতজানু হয়ে আরো একবার
শৈশব ফেরৎ চাইবো।

# এই পৃথিবী

শ্যামসুন্দর দে

অন্তহীন আবর্তিত পৃথিবী তোমাকে জানাই সেলাম
তোমার কক্ষের আবর্তন পথে
কত জন্ম কত লয়
কত হর্ষ কত বেদনা-কাহিনী
রয়েছে আমার মনের সঞ্চয়ে।
এক নক্ষত্রের আলোয় আলোয়
তোমার চলার শুরু
তারপর আদি অনন্তকাল ধরে ঘূর্ণন
যার নেই কোন ক্লান্তি
কত কাহিনীর জন্ম দিলে তুমি
কত উত্থান-পতন
কত সৃষ্টি আনন্দ-ধ্বনি
কত ধ্বংসের করুণ আর্তনাদ
তোমার বাতাস তরঙ্গে তরঙ্গে
মিশে গিয়েছে পৃথিবী
শুধু লেখা যা রয়েছে ধুলোর পরতে।
আমি যে চলেছি ধ্বজা ধরে
নক্ষত্রের আলোয় আলোয়
রাতের গভীর থেকে সকালের অন্বেষায়

কারা যেন হাতছানি দেয়
কাছে ডাকে
সে সব ছায়ারা সরে যায় দূরে দূরে
রোদের প্রখর আলোয়।
একদিন থেমে যাবে আমার অন্বেষা
পথ চলা
মিশে যাব তোমার ধুলায়
তখন সে ইতিহাসের কাহিনী
রয়ে যাবে ধুলোর আড়ালে
আর থামবে না তোমার অন্তহীন ঘূর্ণন।
তোমাকে জানাই আমার সেলাম
হে পৃথিবী।

## সখ্য

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

তোমার জন্য বৃষ্টি বাদল
আমার পথে রাত্রি গহন
তোমার দিকে জারুলছায়া
আমার বুকে লঙ্কাদহন,

তোমার হাসি পৌর্ণমাসী
সৌর নদী উতল হয়
তোমার জন্য ঘর বেঁধেছি
তোমার জন্য সূর্যোদয়,

তেপান্তরের ডাক পেয়েছি
বকুলবাগান বন্ধকি
এক ডুবেতে ভোমরা টিপে
রক্তসাঁতার মন্দ কি,

তোমার জন্য আষাঢ়-শ্রাবণ
গ্রীষ্মদেনা উসুল করে
তপ্ত কড়াই রপ্ত এখন
তিরিশ রকম ফোসকা পড়ে,

সদ্যকাটা কলাপাতায়
গরম ভাতে গর্ত করে—
মুসুর ডালের গন্ধে পাগল
চন্দ্র এসে আছড়ে পড়ে,

সেই ভাঙাচাঁদ পোঁটলা করে
তোমার হাতে দিলাম তুলে,
ফের জুড়ে দাও ঝাউয়ের মাথায়
বিপর্যয়ের তাপ্পি খুলে,...

## কথার গান কথার কবিতা

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

অনেকদিন ঘুম হয়নি
পোষমানারা কিন্তুর ঘুমিয়ে থাকে
নিদারুণ রাতেও ঘুমোন না...
তাই নিরাশ্রয় পাখিদের গান শুনতে পান
অন্ধকার বুকের কথা শুনতে পান
দয়াবান বৃক্ষের হাতে কবিতা
কারও দীর্ঘশ্বাস কত দীর্ঘ
কত অন্তর্গত ঘুমোলে শোনা হত না।

দিনের কথা থেকে রাতের কথারা
সাত মাইল দূরের রাস্তায়
নতজানু কিছু কথা নৈঃশব্দ সমীপে
সাঁঝে গোধূলিবেলার সঙ্গী
সাঁকোটা দারুণ খাঁ খাঁ
আপনার কথারা নিখুঁত গুঞ্জরিত
সময়ের কথারা কান থেকে বুকে
বুক থেকে মাটিতে পা রাখে

কথারা হয় ঘুঙুরের মতো বাজে
সংসারে দিন হয় রাত হয়
কথারা গান হয়, কবিতা হয়
শেষ কথাটাও শেষ কথা নয়।

০

## রুশদেশে লেখা শাহিদ সুরাবর্দীর দুটি কবিতার অনুবাদ
সঞ্জয় চন্দ্র

শাহিদ সুরাবর্দী 'পরিচয়ে'র প্রথম পর্বের আপনজন। তখন 'যে-কোন বিতর্ক নিষ্পত্তির জন্য আপীল হতো' তাঁর কাছে। 'তাঁর রায়ই ছিল শেষ কথা'। তাঁর ইংরাজি কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন বিষ্ণু দে পরিচয়ের পাতায়। তিনি 'বাংলা লেখেন নি কেন?' বলে অনুযোগ করা হত।

মস্কোতে ছিলেন শাহিদ সুরাবর্দী ১৯১৬ থেকে ১৯১৯। ইংরাজি পড়াতেন, রুশ পড়াতেন। স্তানিস্লাভস্কির সহকর্মী ছিলেন মস্কো আর্ট থিয়েটারে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' সেখানে মঞ্চস্থ করেন ১৯১৮তে। দিলীপ রায় তাঁকে স্মরণ করেছেন ১৯২২-এর লেখায়। বস্তুবাদী শাহিদের এক প্রজন্ম আগে রুশদেশে পড়িয়েছেন নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়। তিনিও কূটনীতিবিদ হতে চেয়েছিলেন দেশে ফিরে। পারেন নি। সম্ভবত তাঁর 'চরিত্রগত কি একটা নৈতিক বিকলতা ছিল'। তা ছিল না বলে শাহিদ পেরেছিলেন। তবে এদেশে আজ বিস্মরণের শিকার দুজনেই।

বি. বি. সি. র শ্রোতারা কিছুদিন আগে কুড়িজন শ্রেষ্ঠ বাঙালির একজন বলে বাছেন শাহিদকে। এক দশকেরও ওপর শাহিদ বাগীশ্বরী অধ্যাপক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অথচ, তাঁর লেখা কোনো বই নেই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বা কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে। এমনকি, সুরাবর্দী এভিন্যুর বাংলাদেশ মিশনেও না।

নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো ছাত্র ও সহকর্মী ড. সতীশ কুমারের আনুকূল্যে হাতে পাওয়া শাহিদের 'এসেজ ইন ভার্স' থেকে দুটি কবিতা এখানে অনুবাদ রাখা হল। দ্বিতীয় কবিতাটি মনে পড়ায় সমবয়সী সিম্বলিস্ট রুশকবি আনা আখমাতভা আর মারিনা ৎস্‌ভিতায়েভার কথা। শাহিদ রুশবিরোধী ছিলেন না।

### রাশিয়াতে

আমার কামরার কাঠের ছাদে বাজে
বৃষ্টিবিন্দুদের অবিরাম বোল।
একা বসে ধরে নিই তারা
দেবদূতের চরণদোল।

তোমারই যন্ত্রণায় বিদ্ধ, হে হৃদয়,
'জানবে বেদনার উষরে
রাত্রিকে নক্ষত্রকম্পন নিয়ে
আর মমতা-তুষারে।

## প্রতীকদের লেডি

(এম. এন. জি. কে)

নিশায় গামিনী এক লেডি
যখন মৃদু সুগন্ধ সরণিতে পাতা,
আর প্রাচীরেরা শান্ত ছায়াময়
আর সরোবর উদ্ভাসিত কাঁথা।

বংকিম দীর্ঘদেহী আর খজুসজ্জিতা,
জীর্ণ পটের হতে সদ্যনির্গতা;
আর ওর দিকে তাকালেই বিবাদে ভরাট,
যেন পুরাতন কলক তা।

চাঁদ কিংবা অরণ্যের থেকেও প্রাচীনা,
হ্যাঁ, ধূসর ধীরে-বাঁকা ছোটনদীর থেকেও প্রাচীনা
রাজাদের প্রণয়িনী ছবিটি,
অদ্ভুত কেতাব খসা সে ললনা।

মূক, অপসৃয়মানা, ইংগিতরহিতা,
চক্ষুকোটর খোলে না আলোর আশ্বাসে,
আর তবু পুরুষেরা ভালবেসে তাকে,
পৃথিবী ভরিয়েছে তাদের দীর্ঘশ্বাসে।

সূর্যহৃদয় পুরুষেরা খুশিতে দিয়েছে জীবন
তার আঙুলের স্পর্শধন্য একটি গোলাপের আশ,
আর কবিদের গাওয়া গৌরবগাথা
তার অনুভংগিমায় করে বাস।

# পি. সি. যোশি : জন্মশতবার্ষিক কিছু ভাবনা

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

॥১॥

না—জন্মশতবর্ষে এটি পি. সি. যোশির কোনও মূল্যায়ন নয়, কারণ তাঁর সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করার ধৃষ্টতা বা অধিকার কোনওটাই আমার নেই। কিন্তু স্বাধীনতার বাট্‌ বছরে, একশ বছরে পা দেওয়া প্রয়াত এই মানুষটির জীবন ও কর্ম নিয়ে ভাবনাচিন্তার বোধ হয় এক গভীর প্রয়োজন রয়েছে, অন্তত দুটি কারণে। এক : যোশির চিন্তা বরাবরই প্রাধান্য পেয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বামপন্থার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়টি। ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বহুলাংশে তারই স্বাক্ষর বহন করছে। দুই : তাঁর স্বপ্ন ছিল কমিউনিস্ট পার্টিকে একটি সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করা। জাতীয় রাজনীতিতে, ভাঙন সত্ত্বেও, কমিউনিস্টদের গুরুত্ব আজ অনস্বীকার্য, যা দেখে যোশি নিশ্চয় খুশি হতেন। পি.সি. যোশির জন্মশতবর্ষে এই কথাগুলো যদি প্রাসঙ্গিক বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে আবার একইভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে দেখা দেয় আরও কিছু প্রশ্ন। এ কথা সর্বজনবিদিত যে প্রায় ছন্নছাড়া, উপদলীয় কোন্দলে বিধ্বস্ত এক গুচ্ছ কমিউনিস্ট গোষ্ঠীকে একত্রিত করে একটি সংগঠিত কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি করা এবং তাকে একটি যথার্থ গণভিত্তি প্রদান করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে অন্যতম প্রধান একটি শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রধান রূপকার ছিলেন পি.সি. যোশি। তাঁর নেতৃত্বেই ১৯৩৬-৪৭ পর্বে কমিউনিস্ট পার্টি পেয়েছিল যথার্থ রাজনৈতিক স্বীকৃতি এবং সাধারণ মানুষের কাছে কমিউনিস্টরা হয়ে উঠতে পেরেছিলেন শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র। কিন্তু ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব বদলের জেরে যোশির অপসারণ এবং পরবর্তীকালে পার্টির মধ্যে থেকেও তাঁকে প্রায় ব্রাত্য ঘোষণা করার যে নীতি কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করেছিল, তার পরিণতিতে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তিনি যে পর্যবসিত হলেন এক বিস্মৃত, নিন্দিত ব্যক্তিত্বে, যাঁকে চিহ্নিত করা হলো "দক্ষিণপন্থী" ও "সংশোধনবাদী" শিরোনামে, তার যথার্থ ব্যাখ্যাটি কী হতে পারে? যোশি কমিউনিস্ট পার্টিকে পরিত্যাগ করেন নি, কিন্তু কার্যত পার্টিই তাঁকে পরিত্যাগ করে। সাধারণ সম্পাদক (১৯৩৬-৪৭) হিসেবে তিনিই যে পার্টিকে গড়ে তুলেছিলেন, সেই পার্টিই তাঁকে রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় ও বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে ক্ষতিসাধন করল কার? যোশির জন্মশতবর্ষে এই প্রশ্নেরও মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন। এই বিষয়গুলিকে মাথায় রেখেই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

॥২॥

যোশির রাজনৈতিক কালপর্ব মোটামুটি দু'টি স্তরে বিভক্ত। প্রথম পর্ব : ১৯২৯-১৯৪৭। দ্বিতীয় পর্ব : ১৯৪৮-১৯৮০। ১৯২৯ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই

বিশের দশকের গোড়ায় বাম রাজনীতিতে তাঁর হাতেখড়ি হয়ে গিয়েছিল। ইলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ইতিহাসের ছাত্র তরুণ পি.সি. যোশি মার্কসবাদের সংস্পর্শে এসে যুব লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন, আর সভাপতি ছিলেন জওহরলাল নেহরু। তারই সূত্র ধরে তিনি জড়িয়ে যান ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের আদিপর্বের ঘটনাবলীর সঙ্গে এবং তার পরিণতিতেই কানপুরে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুবাদে ১৯২৯ সালে মীরাট মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে যোশি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ এবং জেলে থাকাকালীন অবস্থাতেই তাঁর কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অন্য বন্দীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিনয়ী ও আত্মপ্রচারে বিমুখ, কঠোর শৃংখলাবদ্ধ এবং পার্টির দলিল রচনায় বিশেষভাবে পারদর্শী এই তরুণ সহজেই নিজেকে বর্ষীয়ান অন্য বন্দীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন এমন একটি কালপর্বে যখন সদ্যোজাত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে বহুবিভক্ত ও সীমিত ছিল মাত্র দেশের কয়েকটি প্রধান শহরাঞ্চলে (যেমন, কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি)। মীরাট মামলার ধাক্কায় সেই অস্তিত্বটুকুও প্রায় বিলুপ্তির মুখে এসে ঠেকে। এই পরিস্থিতিতে যখন মীরাট বন্দীরা তিরিশের দশকের প্রথম পর্বে মুক্তি পেতে শুরু করলেন, তখন সমস্যা দেখা দিল গোষ্ঠীকোন্দলে দীর্ণ ও সাংগঠনিকভাবে বিধ্বস্ত কমিউনিস্ট পার্টিকে একটি সুশৃংখল ও সংগঠিত চেহারা দেবার প্রশ্নটিকে ঘিরে। ১৯৩৬ সালে এই দায়িত্ব এসে বর্তাল যোশির স্কন্ধে এবং ১৯৩৬-৪৭ এই অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্বে তিনিই ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

১৯৩৬ সালে পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যোশির এই দায়িত্ব নেবার অবশ্য একটি নেপথ্য কাহিনী রয়েছে, যা এখনও প্রায় অজানা থেকে গেছে। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সাম্প্রতিককালে উন্মোচিত আর্কাইভ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভারতবন্ধু রজনী পাম দত্তের একটি প্রতিবেদন থেকে জানতে পারি যে যোশির তরুণ বয়স, বুদ্ধিবৃত্তি ও সততার খবর তার কানে ইতিমধ্যেই পৌঁছেছিল এবং তিনিই উদ্যোগ নিয়েছিলেন যে যোশিকে যেন সাধারণ সম্পাদক করা হয়, কারণ পাম দত্তের বিচারে যোশির চেয়ে উপযুক্ত আর কেউ পার্টিতে ছিলেন না, যিনি এই দায়িত্ব নিতে পারেন। কী ছিল এই দায়িত্ব, যা পাম দত্তের কাছে মনে হয়েছিল এত গুরুভার? এক : ভাঙাচোরা, অবিন্যস্ত, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত বিভিন্ন কমিউনিস্ট কেন্দ্রগুলিকে একত্রিত করে একটি সংহত ও ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত করা। দুই : ১৯৩৫ সালে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন কমিনটার্নের নেতৃত্বে ষষ্ঠ কংগ্রেসের (১৯২৮) তীব্র বাম সংকীর্ণতার রাস্তা ছেড়ে গ্রহণ করেছিল যুক্তফ্রন্টের নীতি। এই নীতিকে কার্যকরী করার দায়িত্বও বর্তাল যোশির পরে। রজনী পাম দত্তের সঙ্গে যোশির এই সময় থেকেই এক গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা এখন জানা যাচ্ছে পাম দত্তের অপ্রকাশিত কাগজপত্র থেকে। যোশি ছিলেন পাম দত্তের বিশেষ স্নেহভাজন এবং পরম নির্ভরযোগ্য একজন কমিউনিস্ট, তাই ১৯৪৮ সালের পরবর্তী পর্বে যোশিকে তৎকালীন সি. পি. আই নেতৃত্ব যেভাবে ব্রাত্য ঘোষণা করেছিল,

পাম দত্ত তা মেনে নিতে পারেন নি। পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কাছে পাঠানো একাধিক পত্রে পাম দত্ত তাঁর গভীর ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আবার এ কথাও বলারও বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে যে পাম দত্তের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও ভাবনাচিন্তা, যা ছিল বহুলাংশেই রীতিমত গোঁড়া ও রক্ষণশীল, যোশীর দৃষ্টিভঙ্গির একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করত; কিন্তু মতাদর্শগত ব্যবধানে অতিক্রম করে গিয়েছিল তাঁদের আত্মিক সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা।

১৯৩৬-৪৭ এই অতি কঠিন, সমস্যাসংকুল ও জটিল কালপর্বে যোশিকে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে ও সামাল দিতে হয়েছিল, তা ছিল অভূতপূর্ব। প্রথমত কমিনটার্নের সপ্তম কংগ্রেসে গৃহীত যুক্তফ্রন্টের নীতি ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত বাম-সংকীর্ণতার নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত ও পরিপন্থী হলেও কমিনটার্নের কোনও দলিলেই এ কথা স্বীকার করা হলো না যে ষষ্ঠ কংগ্রেসের ভাবনাচিন্তা ছিল সম্পূর্ণ ভুল ও আত্মঘাতী। তার ফলে সপ্তম কংগ্রেসে(১৯৩৫) গৃহীত যুক্তফ্রন্টের নীতিকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে যোশির প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল ষষ্ঠ কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ বিরোধিতায় আচ্ছন্ন কমিউনিস্ট পার্টিকে রাতারাতি লাইন পাল্টে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মোর্চা গঠনের ভাবনায় উজ্জীবিত করা। ষষ্ঠ কংগ্রেসের নীতিকে বাতিল করার কোনও নির্দেশ না থাকায় যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজন ও যথার্থতা নিয়ে পার্টির মধ্যে দেখা দিল প্রবল সংশয় ও বিভ্রান্তি এবং অনেক ক্ষেত্রে পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের তরফ থেকে প্রায় হুমকি দিয়ে বলতে হয়েছিল যে যুক্তফ্রন্ট ও কংগ্রেস-কমিউনিস্ট মোর্চাকে বাস্তবায়িত করার নীতির বিরোধিতা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

দ্বিতীয়ত, ১৯৪২ সালের আগে পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি ছিল বেআইনি। আত্মগোপন অবস্থায়, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে, বিশেষত ১৯৩৮ সালের পর থেকে কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির মধ্যে একটি শক্তি হিসেবে সি. পি. আই-কে একটি যথার্থ গণভিত্তির ওপরে দাঁড় করিয়ে একটি মর্যাদাপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন পি. সি. যোশি। এই ভাবনার বাস্তবায়নে যোশি হতে পেরেছিলেন আশ্চর্য রকমের সফল আর এই সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব এক বৌদ্ধিক ভাবনা যার মূল কথা ছিল এটাই যে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রতি নেতিবাচক নয়, আপেক্ষিকভাবে একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কমিউনিস্টদের চলতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টিকে অগ্রসর হতে গেলে জাতীয়তাবাদকে উপেক্ষা বা তার বিরোধিতা করে নয়; তার সঙ্গে প্রয়োজনমত সহযোগিতা ও একই সঙ্গে তার সীমাবদ্ধতার সমালোচনা করতে হবে। ভারতবর্ষের মত ঔপনিবেশিক দেশে জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করার অর্থ যে জাতীয় জীবন থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া,— সেটিই ছিল কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের নীতি,—যোশির বৌদ্ধিক মননে এই ভাবনা প্রোথিত ছিল অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে। তারই সূত্র ধরে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে কমিউনিস্ট পার্টিকে তার দেশজ পরিপার্শ্বিক ও পরিস্থিতির একান্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিজস্বতাকে আত্মস্থ করতে হবে। যোশির ভাষায় এই শ্রেণীকে ছাপিয়ে উঠেছিল দেশ, প্রাধান্য পেয়েছিল

দেশের সাধারণ, খেটে খাওয়া, বঞ্চিত, নিপীড়িত অসংখ্য মানুষকে একত্রিত করে এক বৃহত্তর গণসংগ্রামে নিয়োজিত করার তাগিদ। এই ভাবনায় ঋদ্ধ হয়েই যোশি কমিউনিস্ট পার্টিকে সংযুক্ত করতে পেরেছিলেন কমিউনিস্ট নন, এমন অসংখ্য মানুষও ধারার সঙ্গে, যার ফলশ্রুতি তাঁর নেতৃত্বে একাধিক গণসংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির গণভিত্তি প্রতিষ্ঠা। এই ভাবনারই ফসল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, প্রগতি লেখক সংঘ, সর্বভারতীয় কিষাণ সভা, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন এবং সর্বোপরি কমিউনিস্ট পার্টির একটি জাতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা ও স্বীকৃতি।

তৃতীয়ত, ২২ জুন, ১৯৪১ নাৎসি জার্মানি দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পরিণতিতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নির্দেশে সি. পি. আই-কে যখন ১৯৪২ সালে কংগ্রেস পরিচালিত "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের পথ থেকে সরে আসতে হলো এবং যুক্তি হিসেবে যখন বলা হলো যে "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ" এবারে পর্যবসিত হয়েছে "জনযুদ্ধে" এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করার প্রয়োজনে ব্রিটেন-সহ মিত্রশক্তির বিরোধিতা করা হবে "প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের" প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা মাত্র, তার জেরে সি.পি.আই এক দিকে যেমন জাতীয় জীবনের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, অপরদিকে তাকে যথেষ্ট রাজনৈতিক মূল্যও দিতে হয় অনেককাল ধরে। কিন্তু যে কথাটা বলা বিশেষ প্রয়োজন তা হলো এই যে, যোশির আশ্চর্য সাংগঠনিক ক্ষমতা ও বৌদ্ধিক ভাবনার দৌলতে ১৯৪২ সালের পরবর্তী সময়ে, যখন সি.পি.আই. কার্যত কোণঠাসা ও বহুলাংশেই জাতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠনগুলিকে কিন্তু তখনও মজবুত ও অক্ষত রাখা সম্ভব হয়েছিল। তার অন্যতম দৃষ্টান্ত ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষে ও তার পরে স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা বন্ধ করতে কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা, যার সুবাদে কমিউনিস্ট পার্টি বহুলাংশে তার রাজনৈতিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সক্ষম হয়। শুধু তাই নয়, যুদ্ধের অবসানে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সি.পি.আই-কে প্রায় দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে যে একগুচ্ছ অভিযোগ পেশ করা হয়, তার প্রতিস্পর্ধী জবাবও দিয়েছিলেন পি.সি. যোশি, কমিউনিস্ট প্রত্যয় ও দৃঢ়তার যা এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

॥ ৩ ॥

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলো। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলো সি.পি.আই-এর দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস। ১৯৪৩ সালে পার্টির প্রথম কংগ্রেসে সর্বসম্মতভাবে ও আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশির বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ এনে তাঁকে অপসারিত করা হলো প্রথমে সাধারণ সম্পাদকের পদ ও পরে পার্টির সদস্যপদ থেকে। অভিযোগ : জাতীয়তাবাদের প্রতি নরম মনোভাব ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ঘটনাকে যথার্থ বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুধাবন করতে না পারা, অর্থাৎ, "মেকী" স্বাধীনতার তাৎপর্য বোঝার ক্ষেত্রে তাঁর চরম ব্যর্থতা। এবারে শুরু হয় যোশির রাজনৈতিক জীবনের

দ্বিতীয় পর্ব। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের আত্মঘাতী, রাজনৈতিক লাইনের পরিণতি কী হয়েছিল, সে ইতিহাস আজ সবারই জানা। ১৯৫০-৫১ পর্বে অজয় ঘোষের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি যখন তার ভুল-ত্রুটি শুধরে রাজনীতির মূল স্রোতে আবার ফিরতে শুরু করে, তখন যোশিকে পার্টিতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ করে দেওয়া হয়, কিন্তু যোশি তার হৃতগৌরব ও মর্যাদা আর কোনও দিনই ফিরে পান নি। পার্টিতে তিনি চিহ্নিত হয়ে যান "সংশোধনবাদী", "দক্ষিণপন্থী" হিসেবে, কারণ তাঁর সামগ্রিক ভাবনাচিন্তায় শ্রেণীর তুলনায় প্রাধান্য পেয়েছে দেশ, শ্রেণীসংগ্রামের চৌহদ্দিকে অতিক্রম করে গেছে নির্যাতিত মানুষের, শোষিত মানুষের সংগ্রামী ঐক্যের বিষয়টি। রাজনৈতিকভাবে প্রায় উপেক্ষিত পি.সি. যোশি তাঁর বিকল্প ভাবনাচিন্তা ও রাজনৈতিক লাইনকে তুলে ধরার প্রয়াসে ও.পি সংগল ও নেমিচাঁদ জৈনের সহায়তায় "ইন্ডিয়া টুডে" নামে একটি সাময়িকপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন এবং পরে তাঁকে এটি বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয় পার্টি নেতৃত্বের তরফ থেকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে "ইন্ডিয়া টুডে"-তে প্রকাশিত মতামতগুলি ছিল স্বীকৃত পার্টিলাইনের বিরোধী। ১৯৫৬-৫৭ সালে তাঁকে পার্টির কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটে ফিরিয়ে আনা হয় এবং সাপ্তাহিক "নিউ এজ" পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও দেওয়া হয়,—কিন্তু নেহরু সরকারের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে যোশির ভাবনাচিন্তা ছিল সি. পি. আই-এর দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় বহুলাংশেই ভিন্ন। যোশির ভাবনায় দেশের সামনে সবচেয়ে বড় বিপদ এসেছিল দু'টি দিক থেকে : সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, এবং দেশীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও তার সহযোগী সাম্প্রদায়িকতা। নেহরু সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার তুলনায় যোশির চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিস্পর্ধী চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেহরুর বিদেশনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা—কমিউনিস্ট পার্টির অনেকের চোখেই যা ছিল "দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদের" প্রতিরূপ মাত্র।

রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও প্রায় একা হয়ে গেলেও যোশি কিন্তু তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ও মস্তিষ্কচর্চার ক্ষেত্রে কোনও ছেদ টানতে রাজি ছিলেন না। সত্তরের দশকে দিল্লিতে জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বদান্যতায় এবং মূলত পি.এন. হাকসার ও জি. পার্থসারথির উদ্যোগে যোশিকে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্দোলনের ইতিহাস সংক্রান্ত একটি বিপুল গবেষণা প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এটিই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর প্রধান বৌদ্ধিক অবলম্বন। যোশি যে শুধুমাত্র একজন দক্ষ পার্টি সংগঠক ছিলেন তাই নয়; তিনি যে একইসঙ্গে ছিলেন একজন যথার্থ কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী, তার প্রমাণ যোশির রেখে যাওয়া এই অসম্পূর্ণ গবেষণা প্রকল্প, যার ব্যাপকতা যে-কোনও গবেষকের মাথার কারণ হতে পারে। যোশির আশা ছিল তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্দোলনের একটি যথার্থ নির্মোহ ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় সক্ষম হবেন এবং তারই সূত্র ধরে তিনি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী কে. দামোদরণ যে বিপুল পরিমাণ তথ্য ও দলিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত এবং দেশের একাধিক মহাফেজখানা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, তা

সত্যিই বিস্ময়কর। আমার কথা একটাই যে জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে যোশির সংকলিত এই দলিলগুলির নির্বাচিত কয়েকটি সংকলন খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে।

॥৪॥

যোশির এই বহুমুখী জীবনবৃত্তান্ত তাঁর জন্মশতবর্ষে বেশ কয়েকটি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। এক : কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ক্ষেত্রে যোশি যে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক সাফল্য পেয়েছিলেন, তার অন্যতম কারণ কিন্তু ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের অনুকূল পরিস্থিতি। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক যদি দিমিত্রভ প্রবর্তিত যুক্তফ্রন্টের থিসিস ১৯৩৫ সালে গ্রহণ না করত, যদি ষষ্ঠ কংগ্রেসের নীতিই অপরিবর্তিত থাকত, যদি কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি গড়ে উঠে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট মোর্চাকে প্রসারিত করার সুযোগ না দিত, তাহলে যোশির ভাগ্যে কী জুটত আমরা কিন্তু তা জানি না।

দুই : শ্রেণীর তুলনায় দেশকে প্রাধান্য দেওয়ার যে ভাবনা যোশিকে এক ব্যতিক্রমী কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল, তার সূত্রই বা কোথায়? যোশির সময়ের কেতাবী মার্কসবাদ যা ছিল প্রবলভাবে যান্ত্রিক ও রক্ষণশীল, এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দেয় না। এর উত্তর সম্ভবত এটাই যে তাঁর জীবনের একেবারে প্রথম পর্ব কেটেছিল আলমোড়ার পার্বত্য অঞ্চলে, সেখানেই সম্ভবত তিনি স্বাদ পেয়েছিলেন অবহেলিত, পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ ভারতের। আর বোধ হয় এই ভাবনায় বিদ্ধ হয়েই পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে চেপে, কখনও বা স্রেফ হাফ প্যান্ট পরে তিনি গোটা ভারতবর্ষ চষে বেড়িয়েছিলেন এবং চলমান জীবনের এই অভিজ্ঞতাই বোধ হয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ, সম্বল ও পাথেয়।

তিন : ১৯৪৮ পরবর্তী পর্বে যোশিকে প্রায় ব্রাত্য ঘোষণা করার পিছনে যে মানসিকতা কাজ করেছিল, তার ব্যাখ্যাই বা কী? এর উত্তর পাওয়া যাবে যোশি রচিত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস সংক্রান্ত একটি অপ্রকাশিত ও অসম্পূর্ণ খসড়া থেকে। তিনি সম্ভবত ঠিকই বলেছেন যে আসলে ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াতেই এক তাত্ত্বিক গলদ রয়ে গেছে। সেই তাত্ত্বিক গলদের কাণ্ডারী হলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। রায়ের সঙ্গে পরবর্তীকালে কমিনটার্ন ও সি.পি.আই-এর বিচ্ছেদ হলেও বিশের দশকের গোড়ায় কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের বিরোধিতা করতে গিয়ে রায় যে দলিলটি পেশ করেছিলেন এবং সেটি লেনিনের বদান্যতায় সংশোধনী-সহ একটি পরিপূরক দলিল হিসেবে গৃহীত হয়, তার মূল ভাবনাটিই ছিল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে এক প্রবল নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। রায়ের এই ভাবনাই প্রসারিত হয়ে রূপায়িত হয় কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের উপনিবেশবাদ প্রসঙ্গে থিসিসে, আবার এই ভাবনাই প্রতিধ্বনিত হয় ১৯৪৮ সালের সি.পি.আই-এর দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে, যখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে অর্জিত স্বাধীনতাকে "মেকী" স্বাধীনতার নামে বর্জন করা হলো। সচেতনভাবে না হলেও মানবেন্দ্রনাথ প্রদর্শিত পথকে অনুসরণ করেই যোশিকে

"সংশোধনবাদী" বা "দক্ষিণপন্থী" আখ্যা দেওয়ার ব্যাখ্যা মেলে এবং এও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে স্বাধীনতার পরবর্তী পর্বে বিভিন্ন সময়ে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি বারেবারেই কেন অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছে। যোশিকে ব্রাত্য ঘোষণা করে তাঁর রাজনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি আরও বড় ক্ষতি কিন্তু সইতে হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টিকে। পার্টি ও গণসংগঠন তৈরির ব্যাপারে যিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত, সংস্কৃতিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যিনি ছিলেন অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এক ব্যক্তিত্ব, তাঁকে দূরে ঠেলে দিয়ে, "সংশোধনবাদী" আখ্যা দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি নিজেই ক্রমান্বয়ে রিক্ত ও নিঃস্ব হয়েছে, একথা বোধ হয় আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

চার : বাম-ইউ.পি.এ. সরকারের বর্তমান সম্পর্ক ও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে মনে রেখে এমন কথা আজ অনেকেই বলছেন যে যোশি বেঁচে থাকলে আজ খুশি হতেন, কারণ তাঁর স্বপ্নই আজ অনেকটা বাস্তবায়িত। কথাটা মেনে নিতে পারলাম না একাধিক কারণে। প্রথমত, যোশির ভাবনায় প্রাধান্য পেয়েছিল নেহরু পরিচালিত রাষ্ট্রতান্ত্রিক এক ভারতবর্ষ, যা সেই সময়ের বিচারে বাজারি ব্যবস্থার তুলনায় প্রগতিশীল বলে গণ্য করা হত। সংস্কারপন্থী বাজারি অর্থনীতির দিকে ক্রমেই ঢলে পড়া, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রায় বিসর্জন দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে উদ্যোগী কংগ্রেস পরিচালিত এক "প্রগতিশীল" সরকার এবং তাকে সমর্থন জোগাচ্ছে কমিউনিস্টরা—এমন এক পরিস্থিতি যোশির কল্পনায় কোনওদিন ছিল বলে জানা নেই। দুই : স্বাধীনতার ষাট বছর পরেও বহু ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও ত্রিপুরায় সীমিত থাকা ও বহু ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র ভোটের অঙ্ক ঠিক রাখতে গিয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে আপস করার ঘটনা, যা এক এক সময় কমিউনিস্টদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে,—এসব বোধ হয় পি.সি.যোশির অভিপ্রেত ছিল না। যোশির ভাবনাচিন্তা সম্পর্কে এতটা অতিসরলীকরণ বরদাস্ত করা মুশকিল।

প্রবন্ধের গোড়াতেই বলেছি এই লেখার উদ্দেশ্য যোশির কোনও মূল্যায়ন নয়। কিছু জানা-অজানা তথ্য দেওয়া গেল, কিছু প্রশ্ন তোলা হলো, কিছু বিতর্কের আভাস দেওয়া গেল। জন্মশতবর্ষে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম রূপকার ও পুরোধা এই ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আগামী দিনে যাতে এক নির্মোহ দৃষ্টিতে কিছু আলোচনা, মতবিরোধের পরিবেশটুকু অন্তত তৈরি হয়, এই আশা নিয়ে লেখাটা শেষ করছি।

# গীতবিতান ৭৫ : বিকল্প-দেবীর বারোয়ারি

## অরুণকুমার বসু

সম্প্রতি যে-কোনো একটা ঐতিহাসিক ঘটনার গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে বছর-লেখা লম্বা খুঁটি পুঁতে তাতে একটা তেকোনা নিশান উড়িয়ে দেওয়ার পাবলিক রেওয়াজ বেশ জমে উঠেছে। অন্তত আমাদের বাঙালি সমাজে তো বটেই। তবে সেই সুবাদে অন্য দেশের ভিন্ন ভাষায় অন্যান্য রাজ্যের সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার কিছু প্রভাব পড়তেও পারে। এর অনুকূলে কিছু সাধু উচ্চারণও আছে। তরুণ প্রজন্ম অতীত বিমুখ হতে চায়। শিকড়ের খোঁজ রাখতে চায় না। তাই তাদের কাছে আমাদের ঐতিহ্য আমাদের অতীত আমাদের গৌরবময় পশ্চাৎকে তুলে ধরা, বয়স্ক প্রবীণদের অবশ্য-পালনীয় প্রকল্পতা হয়ে দেখা দেয়। এতে অন্যায় অশোভন কিছু নেই। স্বাধীনতা-অর্জনের ৫০ বছর, স্বাধীনতা-হারানোর দেড়শো বছর। সিপাই-বিদ্রোহের দেড়শো বছর পুনঃস্মরণ, পুনর্মূল্যায়নের উপযুক্ত উপলক্ষ্য বটেই। বঙ্গভঙ্গের টিপির ওপর ছেঁড়া পতাকাটা এখনও উড়ছে।

কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার-অভিনেতা-দেশনেতাদের জন্ম-মৃত্যুর বুড়ি ছুঁয়ে ৫০-৭৫-১০০-১২৫-১৫০, এমনকি ২০০ বছরের স্মরণ ঘটনাও মোটামুটি এই ভজন-পূজন-সাধন-আরাধন সমিতির নিত্য কৃত্যের তালিকায় চেপে বসেছে। সুযোগসন্ধানী দৃষ্টি খুঁজে পেতে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা ছাড়াও গ্রন্থপ্রকাশের শতবর্ষ, প্রথম অভিনয়ের পঞ্চাশ বছর পেরে গেলেই দেখতে হবে না। একবার কেউ শুরু করলেই হল। বুদ্ধিজীবীর একাংশ সেটা যদি ভালো 'খান', তাহলে তার গড্ডলিকা চলতেই থাকবে। সেই বছর পেরিয়ে গেলেও। জন্মমৃত্যুর সঙ্গে যেমন স্মৃতিরক্ষার একটু দায়বদ্ধতা দেখা যায়, অন্য ক্ষেত্রে সে জাতীয় থাকে না। কিছু সভা, বিদ্যায়তনিক সেমিনার, লিটল ম্যাগাজিনের বিশেষ সংখ্যা, গুরুত্বভেদে দৈনিক পত্রিকা ক্রোড়পত্র এসবেই কর্তব্যের পুণ্যস্নান শেষ হয়। তারপর কিছুদিন সামাজিক কর্মপটুরা স্তিমিত থাকেন, যতদিন না গ্রহসন্ধানীর দূরবিনে নতুন কোনো হুজুগ-গ্রহের আবির্ভাব ঘটে।

এসব ভূমিকা-ভণিতার কারণ আপাতত 'গীতবিতানের ৭৫ বছর' 'ধামাকা'-টি। 'গীতবিতানের ৭৫ বছর' এই শব্দগুচ্ছ-উচ্চারণে বর্তমান লেখকের বিরক্তি ও কুণ্ঠার আভাস পেলে পাঠকরা মার্জনা করবেন। গত এক বছর নাগাদ ক্রমাগত বুদ্ধিজীবী মহলে, সংস্কৃতিক্ষেত্রে, নানাজনের মুখে পুনরাবৃত্ত হতে হতে এটি এক অদ্ভুত মূঢ়তার ঢাকের বদ্যিতে পরিণত হয়েছে। বেতারে দূরদর্শনের চ্যানেলে-চ্যানেলে এই শব্দব্রহ্মের মহিমা প্রচারে কী বিপুল অর্থব্যয়, কী সাড়ম্বর অপচয়, কত মধ্যবিত্ত পুরোহিতের কী মসৃণ উপার্জন। হুজুগ-প্রভুর হুকুমে বশংবদ বুদ্ধিমানের নির্বোধ কর্তব্যপালনও পাল্লা দিয়ে চলেছে। ঢাকে কাঠি দেওয়ার বাজনদার জুড়িদার দৈনিকের ক্রোড়পত্র, গুণতিবহির্ভূত লিটল ম্যাগাজিন, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সেমিনার বক্তৃতা-প্রদর্শনী, সবই এই মূঢ় কর্তাভজার ঢপকীর্তন।

উষ্মার মাত্রা হয়তো সীমালঙ্ঘী মনে হচ্ছে পাঠকদের। হয়তো সরোষ জিজ্ঞাসাও ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসবে। গীতবিতান শাসক বাঙালির এই নিত্যস্মর প্রিয়তম গীতিগ্রন্থটির প্রকাশের ৭৫ বছর কি ১৪১৩ বঙ্গাব্দে পূর্ণ হয়নি? যাঁর গান আজ আমাদের জীবনের নাব্যতার প্রতিকল্প, তাঁর শ্রেষ্ঠ ও সমগ্র গীতিসংকলনের দীর্ঘ ৭৫ বছর পূর্তির ঘটনা কি আমাদের বরণীয় উৎসব হতে পারে না?

সবিনয় নিবেদনমেতৎ, বর্তমান প্রবন্ধকারের সদ্য শিক্ষিত ক্ষোভ ও উষ্মা কবির গীতগ্রন্থের অভিমুখে নয়। একটি অবাস্তব উপলক্ষ্যের অবান্তর গুরুত্বের দুঃখে। যে-গীতবিতান রবীন্দ্রনাথের অ-সমগ্র গীতসংকলন (১ম ও ২য় খণ্ড), সেটি ১৩৩৮-এই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল—এ তথ্যে কোনো বিভ্রান্তি নেই। কবির প্রথম জীবনের প্রথম গানের সংকলনের নাম 'রবিচ্ছায়া'। সেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে। তারপর রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবিজীবনে রবীন্দ্রনাথের গানের বিভিন্ন সংকলন বেরিয়েছে—কোনো সংকলনের শতবর্ষ-স্মরণের কোনো হুজুকিয়া-উৎসব পালিত হয়নি। কারণ, রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে প্রকাশিত সংকলনের রূপই ছিল খণ্ডিত, যেহেতু কবির গীতসৃষ্টির ধারা অব্যাহত ছিল। 'রবিচ্ছায়া' থেকে 'গীতবিতান' পর্যন্ত রবীন্দ্রসংগীত-সংকলনের ধারাবাহিক ইতিহাস রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী'তে (১ম খণ্ড ১৩৭৬, ২য় খণ্ড ১৩৮৫, দুই খণ্ড একত্রে ১৩৯১) ইহকাল পূর্বেই সবিস্তার বিবরণ দিয়েছেন। সেই তথ্যাদি সাজিয়ে গুছিয়ে একটি প্রদর্শনী করে কোনো বাণিজ্যবুদ্ধি ইতিমধ্যে অবিশ্বাস্য মুনাফাও করে থাকতে পারেন। বিশ্বভারতীর নিজস্ব সংগৃহীত তথ্যাদি আত্মসাৎ করে এখন কত ধুরন্ধর, রবীন্দ্রনাথের গানের জগতের পুরন্দর সেজে বসার অপেক্ষায় আছেন হয়তো, কে জানে।

কিন্তু তাই বলে 'গীতবিতান ৭৫' প্রায় জাতীয় উৎসব? একে প্রায় পূজাপার্বণের মহিমা দেওয়া? পালন না করলে জাত যাবে, না একঘরে হওয়ার ভয়, না স্বধর্মচ্যুতির পাপবোধ?

২

এবার গীতবিতান ৭৫-এর অন্তঃশাঁসহীনতার খোলসাট দেখা যাক। প্রথমেই প্রশ্ন জাগে, গীতবিতান নামক রবীন্দ্রসংগীত-সংকলন প্রকাশের ৭৫ বছর পূর্তি—এর উৎসবযোগ্যতার অভিমুখ্য কী? রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তার ৭৫ বছর পেরিয়ে আসা?

কিন্তু ১৩৩৮ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার যে তালিকা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় দিয়েছেন তার গীতসংখ্যা ১৭৮০ কবির মৃত্যু পর্যন্ত গীতসংখ্যা ২১৭৫। সংখ্যাতত্ত্বে যতই গোলমাল থাকুক, এ কথা মেনে নিতেই হবে, কবির শেষ দশ বছরে আরও প্রায় চারশো গান তিনি রচনা করেছেন, যার মধ্যে তাঁর অসংখ্য স্মরণীয় বর্ষার ও বসন্তের গান আছে, আছে নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা ও নৃত্যনাট্য শ্যামার সংগীতগুলি। সেগুলি বিস্মৃত হয়ে 'গীতবিতান ৭৫' কেন অনিবার্য উৎসবের শিরঃপীড়া ঘটাল?

অবশ্যই রবীন্দ্রসংগীত আজ বাঙালির শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের গান সমগ্র রবীন্দ্রনাথের সংহত গীতধ্বনি হয়ে আমাদের অপৌত্তলিক গৌরবে পরিণত। অবশ্যই এ গান আমাদের সর্ব ধর্ম-চিন্তা-আনন্দের হোতা, আমাদের সায়ংসন্ধ্যার জপমন্ত্র। এই জাতীয় বাক্যের তালিকা দীর্ঘতর করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন, তা কি মাত্র ৭৫ বছরে ঘটেছে?

তা যদি না হয় তবে গীতবিতান প্রকাশের ৫০ বছর, ১৩৮৮ সালে, কেন উৎসব-পর্ব হয়ে উঠল না? ১৩৯৩ বাংলা সালে কবিজন্মের ১২৫ বর্ষপূর্তি পালন করবার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল, তাই অন্য বাকি আমল দেওয়া হয়নি? না কি, গীতবিতান ৫০ ভাঙিয়ে কিছু কামানোর ধান্ধা কারও মাথায় আসেনি?

উত্তর যাই হোক, বা যে-যেমন ভাবুন, এই প্রবন্ধকার আজ নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করেন, হুজুগই যুগের স্রষ্টা। 'তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম।'

ক্ষোভের পরবর্তী কারণটি জানাই। রবীন্দ্রসংগীত আমাদের প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, কর্মের প্রেরণা, স্বপ্নের দোসর.....ইত্যাদি অনেক কিছু। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতাও কি তা নয়? রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে এড়িয়ে আমরা কি শুধু তাঁর গানকেই জীবনবিমা করেছি? তা যদি না হয়, তবে ১৪১৩ বঙ্গাব্দে কেন 'সঞ্চয়িতার ৭৫ বছর' আমাদের আরও একটি অবশ্যকৃত্য অপরিহার্য উৎসব ঘোষিত হল না? সেই একমাত্র রবীন্দ্র কবিতা সংকলনটিও রবীন্দ্রনাথের জন্মের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে, সমোদ্দেশ্যে, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের পরিকল্পনা অনুযায়ী, 'সঞ্চয়িতা'-'গীতবিতান' স্মারক সংকলন হিসেবেই বেরিয়েছিল। সমগ্র রবীন্দ্রনাথ আজও শিক্ষিত বাঙালির ঘরে ঘরে হয়তো পৌঁছয়নি। কিন্তু একমাত্র সঞ্চয়িতাই গত ৭৫ বছর ধরে প্রত্যেক বাঙালির কাছে তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয় হয়ে আছে : বিপুল রবীন্দ্রকাব্যের একমাত্র ব্যবহার্য নিত্যস্মর আনন্দনিকেতন। তার গুরুত্ব কি এতই অকিঞ্চিৎকর গীতবিতানের তুলনায়?

উষ্মা ও ক্ষোভ এখানেই শেষ হতে চায় না। 'গীতবিতান ৭৫' উপলক্ষ্যে যে গীতবিতান গ্রন্থটিকে আজ পট্টবস্ত্রে মুড়ে একটিপ চন্দন ও একমুঠো ফুলে সাজিয়ে ক্লোজ-আপ ছবিতে দেখানো হচ্ছে, সেটি কিন্তু ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ ৭৫ বছর আগে প্রকাশিত হয়নি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী-র ১৪১০-এ প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণ অনুযায়ী তথ্যগুলি এইরূপ :

গীতবিতান ১ম ও ২য় খণ্ড
(১৩৩৮ আশ্বিন ॥ ১৯৩১)
গীতবিতান ৩য় খণ্ড
(১৩৩৯ শ্রাবণ ॥ ১৯৩২)
গীতবিতান (নূতন সংস্করণ) ১৩৪৮ মাঘ

১ম ও ২য় খণ্ড ১৩৪৬ সালের ভাদ্র মাসের মধ্যে মুদ্রিত হয়, কিন্তু কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত। তৃতীয় খণ্ড কবির মৃত্যুর পর ১৩৫৭ সালের আশ্বিন মাসে বিশ্বভারতী প্রকাশনী বিভাগের সম্পাদনায় মুদ্রিত হয়।

সুতরাং ইতিহাসের তথ্যে ১৩৩৮-ই গীতবিতানের প্রকাশবর্ষ এতে কোনো ভুল নেই। সমগ্র রবীন্দ্রসংগীতের একটি সংকলন গ্রন্থের চাহিদা ছিলই। ১৯৩০ সালে এমনকি নজরুলের গানের বড়ো সংকলন বেরিয়ে গেল 'নজরুল-গীতিকা'। ১৯১৮ থেকে ১৯৩০ সাল অর্থাৎ গীতবিতান প্রকাশের বারো বছর আগের হিসেবে গীতিলেখা-গীতলিপি-গীতপঞ্চাশিকা-গীতিবীথিকা-কেতকী-শেফালি-কাব্যগীতি-নবগীতিকা-গীতমালিকা ইত্যাদি স্বরলিপির বইগুলোই ছিল রবীন্দ্রসংগীতপ্রিয় নাগরিকদের রবীন্দ্রসংগীতের আকর। গীতবিতান নামক সংগ্রহগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের মোটামুটি সব গান প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রসংগীতানুরাগীদের দীর্ঘকালের আগ্রহ ও প্রয়োজন চরিতার্থ হবে—বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগের এই প্রস্তাব ছিল যথেষ্ট সময়োচিত। ফলে ১৩৩৮-এর আশ্বিনে 'গীতবিতান', কবিপ্রদত্ত নামে, রবীন্দ্রনাথের সেই সময় পর্যন্ত প্রকাশিত গানের বৃহৎ সংকলন বেরিয়ে গেল।

গীতবিতান যাঁরা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন, তাঁরা সঞ্চয়িতা-র আদর্শেই গানের বিন্যাস করেছিলেন। প্রথম সংস্করণ গীতবিতানের সূচিপত্র থেকেই সেটা বোঝা যাবে। 'কালানুক্রমিক সূচীপত্র' শীর্ষনামে গান সাজানো হয়েছিল এই অনুক্রমে :

| | গীতসংখ্যা |
|---|---|
| কৈশোরক (১৩০৩ সাল) | ১৮ |
| বাল্মীকি প্রতিভা (১২৯২ সাল) | ৫৪ |
| ছবি ও গান (১২৯০ সাল) | ২ |
| প্রকৃতির প্রতিশোধ (১২৯১ সাল) | ৬ |
| কড়ি ও কোমল (১২৯৩ সাল) | ৯ |
| মায়ার খেলা (১২৯৫ সাল) | ৬৩ |
| মানসী (১২৯৭ সাল) | ১ |
| রাজা ও রাণী (১২৯৬ সাল) | ৮ |
| বিসর্জন (১২৯৭ সাল) | ৫ |
| সোনার তরী (১৩০১ সাল) | ৩ |
| চিত্রা (১৩০২ সাল) | ৯ |
| চৈতালী (১৩০৩ সাল) | ১ |
| (১৩০৩ সনের কাব্যগ্রন্থাবলীর "গান" অংশ হইতে) | ৫৬ |
| ১৩০৩ সনের কাব্যগ্রন্থাবলীর "ব্রহ্মসঙ্গীত" অংশ হইতে | ১৩১ |
| কল্পনা (১৩০৭ সাল) | ১৬ |
| নৈবেদ্য (১৩০৮ সাল) | ১৭ |
| মোহিত সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের ৮ম ভাগ "গান" বই হইতে (১৩১০ সাল) | ৭৬ |
| চিরকুমার সভা (হিতবাদী সংস্করণ গ্রন্থাবলী। ১৩১১ সাল) | ৩ |

| | |
|---|---|
| খেয়া (১৩১৩ সাল) | ৮ |
| প্রজাপতির নির্বন্ধ (মজুমদার | |
| লাইব্রেরি সংস্করণ গদ্য গ্রন্থাবলী, ১৪১৪ সাল | ১ |
| শারদোৎসব (১৩১৫ সাল) | ৯ |
| (১৩১৫ সনে প্রকাশিত "গান" গ্রন্থ হইতে | ৯২ |
| প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬ সাল) | ১ |
| গীতাঞ্জলি (১৩১৭ সাল) | ৫৬ |
| রাজা (১৩১৭ সাল) | ২৫ |
| অচলায়তন (১৩১৮ সাল) | ২৩ |
| উৎসর্গ (১৩২১ সাল) | ১ |
| (১৩২০ সনের 'গান' বই হইতে) | ৫ |
| ধর্ম্ম-সঙ্গীত (১৩২০ সাল) | ২১ |
| গীতি-মাল্য (১৩২১ সাল) | ৮৭ |
| গীতালি (১৩২১ সাল) | ৬৬ |
| ফাল্গুনী (১৩২২ সাল) | ২৯ |
| বলাকা (১৩২২ সাল) | ২ |
| গীতলিপি ২য় খণ্ড (১৩১৭ সাল) | ১ |
| গীতলিপি ৪র্থ খণ্ড (১৩১৭ সাল) | ১ |
| গীতলিপি ৫ম খণ্ড (১৩১৭ সাল) | ৪ |
| গীতলেখা ১ম ভাগ (১৩২৪ সাল) | ১ |
| গীত-পঞ্চাশিকা (১৩২৫ সাল) | ৪৪ |
| বৈতালিক (১৩২৫ সাল) | ৩ |
| গীত-বীথিকা (১৩২৬ সাল) | ২০ |
| কাব্য-গীতি (১৩২৬ সাল) | ১৫ |
| অরূপরতন (১৩২৬ সাল) | ১০ |
| ঋণশোধ (১৩২৮ সাল) | ৫ |
| মুক্তধারা (১৩২৯ সাল) | ৯ |
| বর্ষা-মঙ্গল (১৩২৯ সাল) | ১৮ |
| নবগীতিকা ১ম ভাগ (১৩২৯ সাল) | ২৯ |
| নবগীতিকা ২য় ভাগ (১৩২৯ সাল) | ৪১ |
| বসন্ত (১৩৩০ সাল) | ২৩ |

গীতসংকলন হিসেবে ১১২৮ টি গানের এই সঞ্চয়ন রবীন্দ্রগীতগ্রাহীদের পক্ষে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় ও প্রত্যাশিত হতে পারত। এই সংকলন-বহির্ভূত আরও ৩৫৭টি গান নিয়ে ১৩৩১ শ্রাবণে গীতবিতান ২য় খণ্ড প্রকাশিত হল। ফলে মোট গান হল ১৪৮৫টি।

তখনও রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসানের আরও কয়েক বছর অবশিষ্ট ছিল। যদি সঞ্চয়িতার মতন এই গীতবিতানই প্রচল থাকত, নব নব সংস্করণে নূতন নূতন গান সংযোজিত হত, তাহলে 'গীতবিতান ৭৫' এই তথাঘোষিত উৎসব ভালোই লাগত। কিন্তু কী ছিল বিধাতার মনে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতসংকলন গীতবিতানের এই বিন্যাসে অপ্রসন্ন হলেন। কোনো ভিন্নতর এক বিন্যাসের তাগিদে অস্থির হতে থাকলেন তিনি। পুরনো বিন্যাসকে ভেঙে-চুরে নতুন রূপে গীতবিতানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাব্যের মর্যাদা দিতে ব্যগ্র হয়ে প্রকাশিত গীতবিতানটির তিনটি খণ্ডেরই প্রকাশ রহিত করে দিতে নির্দেশ দিলেন। বাজার থেকে অবশিষ্ট অবিক্রীত খণ্ড প্রত্যাহৃত হল। সুতরাং ১৩৩৮ সাল গীতবিতানের প্রকাশ-বৎসর, এই তথ্যটি কোথাও সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রইল না।

৩

এবার কবি তাঁর গানের বিন্যাসে নিজস্ব পদ্ধতি খুঁজে নিতে চাইলেন। 'আমার সেইখানেতেই কল্পলতা যেখানে মোর দাবি-দাওয়া।' কী ছিল সেই ভিতরমহলের দাবিতে? বছর চার-পাঁচের অবকাশে কবি তাঁর গানগুলির কালানুক্রম মুছে দিয়ে গানের বিষয় বিবেচনা করে তাদের সাজালেন পূজা, স্বদেশ, আনুষ্ঠানিক, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র এইসব চেনা শব্দের মোড়কে। নতুন এই উচ্চারণের পতাকার পিছনে রচনার কালপরিচিতি হারিয়ে গানগুলি কবির নির্ধারিত মিছিলে সমবেত হল। সাজঘরের কাজ শেষ করে যবনিকা-উত্তোলনের ঘোষণার মতো জানিয়ে দিলেন :

"গীতবিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলনকর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলাবিধান করতে পারেননি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তাই নয়। সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেইজন্য এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে সুরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্য রূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।"

১৩৪৫-৪৬ বঙ্গাব্দে নতুন পরিবিন্যাসে গীতবিতান দুই খণ্ডের মুদ্রণ সমাপ্ত হতে চলল। কিন্তু এই দুই খণ্ডের বহির্দালানে কবির বহু গান অপাংক্তেয় রয়ে গেল, তাদের এই দুই তরীতে ঠাঁই দিলেন না। গীতবিতান সাজানোর তত্ত্বাবধায়ক সুধীরচন্দ্র করকে চিঠিতে জানাচ্ছেন,

"অন্য সকল বইয়ের মধ্যে গীতবিতানের দিকেই আমার মনটা সবচেয়ে বেশি তাড়া লাগাচ্ছে—নতুন ধারায় ও একটা নতুন সৃষ্টিরূপেই প্রকাশ পাবে।"

রবীন্দ্রনাথের এই ইচ্ছাকমল, নতুন গীতবিন্যাসের ব্যস্ততা, সংকলন কর্তাদের যেন ঈষৎ সমালোচনা, এই জাতীয় ভাবনার লতাপাতায় জিজ্ঞাসার কিছু শিশির জমে, সহজে রোদে শুকোয় না। সংকলনকর্তাদের সত্বরতা গ্রন্থ প্রকাশের দ্রুততায় নিবিষ্ট থাকতে বাধ্য, কারণ কবির ৭০তম জয়ন্তী-উৎসবে তার প্রকাশ ঘটানো ছিল বাধ্যতামূলক। বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলাবিধানের' দায় বা নির্দেশ তো তাঁদের উপর ছিলই না। গীতবিতান প্রথম সংস্করণের

অপূর্ণতা তাঁদের কাছে অনভিপ্রেত, স্বয়ং কবিই তা বর্জনের দায়িত্ব নিয়ে দ্বিতীয় গীতবিতানের জন্ম দিলেন। এই অভিপ্রায়-পরিবর্তনের নেপথ্যে ছিল অভিনবত্বের কোনো তাগিদ, যার রহস্যভেদ আমাদের অসাধ্য। কেন পূজা প্রেম প্রকৃতি এই জাতীয় অভিধার আভিধানিক বেড়ায় তাঁর গানকে এঁটে রাখতে চাইলেন, তা তিনিই জানেন। কিন্তু যে-রবীন্দ্রসংগীতের সুর তখন 'বিপুল প্লাবিয়া তোমার বীণা হতে এসেছে নামিয়া' তাকে তিনি পাঠ্যকবিতায় বেঁধে রাখবেন? পাঠক সুরের সহযোগিতা ছাড়াই তাদের অনুষঙ্গে গীতিকাব্যরূপে পাঠ করবে, এই বিশ্বাস তাঁর হল কেন? গীতবিতান-ভুক্ত কত শত গান তো তাঁর কাব্যগ্রন্থেই মুদ্রিত আছে, সেখান থেকে গীতবিতানে সরিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু পাঠক কি সেই-সেই কাব্যনিবদ্ধ গানগুলিকে গীতিকাব্যরূপেই উপভোগ করছেন? তাঁর নাটকে ব্যবহৃত গান কি নাটকে সুরের সহযোগিতা ছাড়া গীতিকাব্যরূপে চরিত্রের কণ্ঠে আবৃত্ত হত?

তবু এই নব-পরিকল্পনায় পুরনো আবাস ভেঙে দিয়ে তিনি স্বনির্মিত প্রাসাদের গৃহকর্তা হয়ে এলেন। এই নতুন রচনার জন্য ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ নবজাতক কাব্যের 'প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে' কবিতাটির দুটি স্তবকে সুরারোপ করে তাকে গীতবিতান ১৩৪৮ সংস্করণের ভূমিকারূপে স্থাপন করলেন। ১৩৩৮-এর গীতবিতানকে প্রেতলোকে নির্বাসিত করে নতুন গীতবিতান কবির শেষ রচনাগ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হল ১৩৪৮-এর মাঘে, কবির মহানির্বাণের জ্যোতির্বলয় রেখায় উজ্জ্বল শুকতারা রূপে। সুতরাং এই একমাত্র, অদ্বিতীয়, আমাদের নিত্যবক্ষসঙ্গী, 'চিরপথের সঙ্গী চিরজীবন হে' গীতবিতান। তার প্রকাশ ১৩৪৮ সাল। তার পঁচাত্তর পূর্তি হবে ১৪২৩-এ। এখন, 'গীতবিতান ৭৫' উচ্চারণ নির্বোধ মূঢ়তার জয়ঢাক, ধূর্ত চৌর্যপঞ্চাশিকার রহস্য-শিকারের সরকারিকরণ।

আমি এর অংশভাক্ হতে চাই না।

> বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে
> হানিবে অবিচল রব তাহে;
> রসের নিবেদন অরসিকে
> ললাটে লিখো নাহে লিখো নাহে।

# মুখচলতি গল্প

## রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

ন্যারেটলজি, গল্পের ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছুকাল ধরেই বিস্তর লেখাপত্তর বেরচ্ছে। কম্পিউটারে ক্লিক করলেই পাতার পর পাতা খুলে যাবে, পড়তে বা ডাউনলোড করতে পয়সা লাগবে না। যে-কোনো বলা বা লেখা গল্পই ন্যারেটিভ-এর আওতায় পড়ে। অবশ্যই 'বলা' আসে আগে, 'লেখা' পরে। সকলেই বোঝেন : মুখে মুখে যে-গল্প তৈরি হয় তার স্বাদ লেখা গল্প থেকে আলাদা। তাই ন্যারেটলজির দস্তুর অনুযায়ী সব গল্পকেই এক করে দেখার ঝোঁক খুব একটা কাজে দেয় না। 'কাজ' বলতে বোঝাচ্ছি : গল্পের ধরণধারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা। চুটকি গল্প থেকে লেখা ছোটোগল্প, উপন্যাস ইত্যাদিকে আলাদা না-করলে গল্প ব্যাপারটাকেই ভুল বোঝা হবে।

অরুণ নাগ-এর "গল্প ও তার গোরু" আর সুধীর চক্রবর্তীর "প্রান্তিক মানুষ না কেন্দ্রীয়" লেখা-দুটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই বুঝবেন মুখে-বলা গল্পের বৈচিত্র্য কত বেশি। সুধীরবাবুর আর-একটি লেখা, "কথকের বিচিত্র কথন"-এ একটা চ্যালেন্জ্ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে আধুনিকোত্তর ন্যারেটলজিস্টদের দিকে। উত্তরবঙ্গে সুধীরবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মদন দাসের। লোককে গল্প শুনিয়ে হাত পেতে টাকা নেওয়াই তাঁর পেশা। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এইভাবেই তাঁর জীবন চলে। দাঁতের মাজন, দৈবশক্তি কবচ ইত্যাদির মতো গল্পই মদনের পশরা। অন্য লোকের কাছে শোনা গল্প, নিজের বানানো গল্প, ভুলে-যাওয়া গল্পের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ বানানো কিছু জুড়ে তিনি গল্প বলে চলেন। কখনও কখনও সে-গল্পের মাথামুণ্ডু থাকে না : হয়ে ওঠে এক আদর্শ হ য ব র ল। সে-সব গল্পের ব্যাকরণ খাড়া করা জেরাল্ড্ প্রিন্স-এর কম্ম নয়। তার কারণ এই : এ সব গল্পের ব্যাকরণ হয় না। স্রেফ বলার গুণে বা কোনো কোনো ঘটনা উদ্ভট বলেই সেগুলো জমে যায়।

তেমনি ধরুন, বাতেলা, আর অরুণ নাগ যাকে বলেছেন, কাউন্টার-বাতেলা।[1] ছোটো-বেলায় শোনা এমন একটা গল্প এখনই মনে পড়ছে। একটি ছেলে বড়াই করে বললে : আমার মামার বাড়িতে একটা গোয়াল আছে। সেটা এত বড় যে এক মুখ দিয়ে ঢুকে তার উলটো মুখে যেতে যেতে গরুর সঙ্গে সঙ্গে একটা বাছুরও বেরিয়ে আসে।

গল্পটি শুনে তার বন্ধু পালটা গল্প ফাঁদল : আমার মামা দার্জিলিঙ-এ থাকে। সেখানে বৃষ্টির সময়ে মেঘ দেখলেই একটা বাঁশ দিয়ে মামা সেই মেঘ সরিয়ে দেয়।

প্রথম ছেলেটি তাচ্ছিল্য করে জানতে চাইল : যা-যাঃ, অত বড় বাঁশ তোর মামা রাখে কোথায়?

ভালোমানুষের মতো মুখ করে দ্বিতীয় ছেলেটি জবাব দিল : কেন, তোর মামার গোয়ালে।

এ ধরণের গল্প ন্যারেটলজির আলোচনায় আসে না। কিন্তু বড়াই আর সেই বড়াই-এর তুখোড় জবাব মুখ-চলতি গল্পর এক বিশেষ ধরণ। সাধারণভাবে যাকে বলা যায় চালিয়াতির স্বরূপমোচন বা এক্সপোজার, এটি তারই রকমফের। প্রথম ছেলেটির গল্পটিকে মেনে নিয়েই দ্বিতীয় গল্পটি বলা হলো টেক্কা দেওয়ার মতলবে। প্রথম ছেলেটি সেটি বোঝে নি। তাই বোকার মতো সে একটি প্রশ্ন করে। আর তার উত্তরেই ফাঁস হয়ে যায় তার নিজের গল্পটা কতখানি উদ্ভট।

কিন্তু মুখচলতি গল্পর সঙ্গে লেখা গল্পর কিছু তফাত থাকেই। পত্রপত্রিকায় পাদপূরণের জন্য যেসব চুটকি গল্প ছাপা হয় সেগুলো আকারে অনেক ছোটো, তবু তাদের ছোটোগল্প বলা যায় না। কতটা ছোটো হলে ছোটোগল্প হবে আর কতটা বড় হলে উপন্যাস— তার কোনো বাঁধা নিয়ম নেই। ঠাট্টা করে বলা হয়েছে : উপন্যাস যেন *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা*-র মতো অত বড় না হয়, আর ছোটোগল্প যেন সাধারণ পোস্টকার্ড-এর মতো ছোটোও না হয়।[২] কথাটা বেশ। সাধারণত মুখ-চলতি গল্প কখনোই খুব বড় হয় না। গোপাল ভাঁড়, বীরবল বা মোল্লা নসিরউদ্দিনের এক-একটা গল্প অনায়াসে একটা পোস্টকার্ড-এ লিখে ফেলা যায়। খুদে খুদে হরফে লিখলে দু-তিনটে গল্পও একটা পোস্টকার্ড-এই এঁটে যেতে পারে। একই কথা বলা যায় পশুপাখি নিয়ে নীতিমূলক গল্প (ফেব্‌ল) ও ধর্ম-উপদেশমূলক কাহিনী (প্যারাবল) সম্পর্কে। গল্প বলাটাই এখানে উদ্দেশ্য নয়, তার মধ্যে দিয়ে কিছু শেখানো বা বোঝানোই আসল লক্ষ্য।

লেখা ছোটোগল্পরও এমন লক্ষ্য থাকতে পারে। থাকেও। কিন্তু গল্পটিই সেখানে বড়। ফলে নীতিশিক্ষা বা ধর্মশিক্ষার দিকটি অবধারিত নয়। এমনকি শিক্ষা দেওয়ার মতলবটি উহ্য থাকলেও কিছু যায় আসে না।

শুধু আকার নয়, প্রকারের দিক থেকেও লেখা ছোটোগল্প আর মুখচলতি গল্পর মধ্যে কিছু তফাত থাকে। মুখচলতি গল্পে বাড়তি চরিত্র, ঘটনা বা উপাখ্যান (এপিসোড) থাকে না বললেই হয়। শুরু হওয়ার পরেই সেটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলে শেষ হওয়ার দিকে। লেখা ছোটোগল্পে কিন্তু বেশ খেলিয়ে বলার ঝোঁক থাকে : শুরু আর শেষ-এর চেয়ে মধ্যভাগটাই বড় হয়।

মুখে মুখে যে সব গল্প বানানো হয় তার সমাপ্তি নির্ভর করে গল্পবলিয়ে-র ইচ্ছের ওপর। শ্রোতা বুঝে তিনি গল্পটি ফেনাতে পারেন বা যে-কোনো এক জায়গায় শেষ করতে পারেন। সে পরিণতি সুখের হতে পারে, দুঃখেরও হতে পারে। "কথকের বিচিত্র কথন"-এ সুধীরবাবু যে গল্পটি বানান, মদন দাসও তাতে যোগ দেন।[৩] কিন্তু দুজনের বানানো গল্পর শেষটুকু হয় আলাদা। মদন দাস চেয়েছিলেন সুখের পরিণতি : সুধীরবাবু আরও নিষ্ঠুর একটি পরিণতি বেছে নেন। দুটি পরিণতিই *ওপেন এনডেড*, ইচ্ছা করলে আরও বানিয়ে যাওয়া যায়। তবে বলা বা লেখা যে-কোনো গল্পই এক সময়ে শেষ করতে হয়। গল্প-বলিয়ের মর্জিই সেখানে প্রধান। তবে শ্রোতাদের ইচ্ছে/অনিচ্ছে বুঝে সেই মর্জিরও রকমফের হয়। তার জন্য আসে জোড়া (অর্থাৎ দুটি) সমাপ্তি, এমনকি তারও বেশি সমাপ্তি।[৪]

এত কথা বলছি এই কারণেই যে, গল্পের ব্যাকরণ অত সহজ নয়। আর, বাস্তেলা আর অতিকথা *(মিথ)* প্রসঙ্গে অরুণ নাগ যা বলেছেন তা-ও ভাবার মতো। অর্থাৎ শুধু ব্যাকরণ জেনে গল্প কিছুই বোঝা যায় না। কেন গল্প বলা হয়, লেখা হয়, নতুন গল্পের পাশাপাশি কিছু পুরানো গল্প চির নতুন থেকে যায়— এসব বুঝতে হলে ব্যাকরণ ছাড়িয়ে পৌঁছতে হবে গল্পের অন্দরমহলে, যেতে হবে সমাজ ও ইতিহাসের আঙিনায়।

মানুষের সৃষ্টিশীলতার যতগুলো দিক আছে, গল্প বানানো তার একটি। সে-গল্প মুখে মুখে চলতে পারে বা গোড়াতেই লেখা হতে পারে। এই সৃষ্টিশীলতার তিনটি লক্ষণ সহজেই চোখে পড়ে : (১) গল্পটি শুনে শ্রোতা/পাঠক নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেটিকে মিলিয়ে নিতে পারেন, (২) শ্রোতা/পাঠকের অভিজ্ঞতায় ছিল না—এমন ঘটনা জানতে পারেন, আর (৩) শ্রোতা/পাঠকের ইচ্ছাপূরণ হয়, অর্থাৎ যেমন ঘটলে তিনি খুশি হতেন তেমন ঘটনা শুনে/পড়ে তিনি আনন্দ পান। বাস্তবে যা ঘটে বা ঘটা সম্ভব বলে মেনে নেওয়া যায়, তার বাইরেও গল্প এমন একটা সুযোগ করে দেয়। ইচ্ছাপূরণ যদি বাস্তবে অসম্ভবও হয় তাতে কিছু ক্ষতি নেই। গল্পের জগতে ইচ্ছাপূরণ হলেই শ্রোতা/পাঠক খুশি হন।

সৃষ্টিশীলতার দিকটি এই ধরনের ইচ্ছাপূরণের গল্পে খুব বেশি করে ধরা পড়ে। হ য ব র ল থেকে শুরু করে নানান কিসিমের ইউটোপিয়া পর্যন্ত এই ইচ্ছাপূরণের বিস্তার। শ্রোতা/পাঠক মনে মনে জানেন : গল্পে যা বলা হচ্ছে বাস্তবে তা হয় না, হওয়ার নয়। তবু শোনা/পড়ার সময়ে সেই বাস্তববোধ মুলতুবি রেখেই তিনি সেই গল্পটি শোনেন/পড়েন। ছোটো মুখচলতি গল্পে ইচ্ছাপূরণের দিকটি আসে না। তার কারণ এই যে, খানিকটা জায়গা নিয়ে ঠিকমতো পটভূমি তৈরি না-করলে ইচ্ছাপূরণের গল্প শ্রোতা পাঠকের মনে দাগ কাটতে পারে না।

শ্রোতা/পাঠকের নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে গল্পের ঘটনাকে মিলিয়ে দেখা অনেক সহজ কাজ। এক মুহূর্তেই তা করা যায়। কিন্তু ইচ্ছাপূরণ মানেই অভিজ্ঞতাকে নাকচ করে, 'হয়'-কে ছাড়িয়ে 'হলে বেশ হতো'-র জগতে পৌঁছনো। এর জন্য একটু সময় লাগে। প্রিন্স্ যাকে বলেছেন 'ন্যূনতম গল্প', সেখানেও অসুখী থেকে হঠাৎ সুখী হয়ে যাওয়ার নমুনা আছে।[৫] কিন্তু সমস্যা হলো : এত সংক্ষেপে আর এতই হঠাৎ তা ঘটে যায় যে কোনো শ্রোতা বা পাঠকের পক্ষেই সেটি মানা সম্ভব নয়। ইচ্ছাপূরণের জগৎটি পুরোপুরি অবাস্তব হলেও চলে না, বাস্তবের সঙ্গে তার একটা যোগ ক্ষীণ হলেও থাকা চাই।

আর তার জন্যেই মুখচলতি গল্প থেকে লেখা গল্প আলাদা হতে বাধ্য, মুখচলতি গল্পে বাস্তবের সঙ্গে যোগটা ঠিকমতো প্রতিষ্ঠা করা হয় না, শেষ করার তাড়া থাকে। লেখা গল্পে বরং কমবেশি ধীরেসুস্থে সেই যোগটা গড়ে নিয়ে তারপর ইচ্ছাপূরণের খেলায় মাতা যায়।

সকলেই বোঝেন, ব্যাকরণ-বই-এর গোড়ায় ব্যাকরণ-এর যে সংজ্ঞার্থ দেওয়া থাকে সেটি ডাহা মিথ্যা। ব্যাকরণ পড়ে কেউ কখনও কোনো ভাষা শুদ্ধ ভাবে পড়তে, বলতে ও লিখতে শেখেন না। বরং উল্টোটাই সত্যি : জীবনে কখনও ব্যাকরণ-বই-এর মলাট না খুলে লোকে যে-কোনো ভাষা বলতে, পড়তে ও লিখতে পারেন। শেখা ব্যাপারটা নির্ভর করে সেই ভাষা শোনা, পড়া ও ক্রমাগত লেখার ওপর। তেমনি 'গল্পের ব্যাকরণ' পড়েও কেউ গল্প বানাতে শিখবেন না; কোন গল্পটি ভালো, কোনটি মন্দ, কোন্‌টি নেহাতই ম্যাড়মেড়ে—সে-সম্পর্কেও তাঁর কোনো বোধ তৈরি হবে না। সেই বোধ তৈরি হতে পারে নতুন নতুন গল্প শুনে ও পড়ে। একটা সীমার মধ্যে চুটকি গল্পেরও নিজস্ব স্বাদ থাকে, নিরক্ষর মানুষও তেমন গল্প থেকে মজা পান। লেখা ছোটোগল্প শুনে/ পড়ে যে বোধ তৈরি হয় সেটি কিন্তু একেবারেই অন্য জাতের। ঘটনা ছাড়াও এখানে আসে ব্যক্তিচরিত্র, রচনারীতি ও আখ্যান সাজানোর কৌশল। ফলে মুখচলতি চুটকি গল্পের ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলতার মাত্রাকে যদি ১ বলে ধরা হয়, লেখা ছোটোগল্পে তার মাত্রা ৩ বা আরও বেশি। গল্প বানানোর মধ্যে দিয়ে মানুষের সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ পায়—এই কথাটা আগেও বলেছি। সে-গল্প মুখে বলাও হতে পারে, লেখাও হতে পারে। লেখা গল্পের ধরণধারণ এক হয় না। ঘটনার সংখ্যা এক বা কয়েকটিমাত্র হলে তা ছোটোগল্পের মধ্যেই এঁটে যায়। ঘটনার সংখ্যা আরও অনেক বেশি হলে বড়গল্প ও উপন্যাসের দরকার পড়ে। অতীতে মহাকাব্য ও মঙ্গলকাব্য রোমান্স্‌, ইত্যাদি দিয়ে এমন অনেকগুলি ঘটনা শোনানো হতো।

তেমনি নাটকও গল্প বলার এক বিশেষ আঙ্গিক। কোনো বিবরণ না দিয়ে, শুধু সংলাপের মধ্যে দিয়ে সেখানে গল্প সাজানো হয়। চলচ্চিত্রও তেমনই এক আঙ্গিক। এখানে গল্প বলার প্রথম বাহন ছবি, পরে সংলাপ (সবাক ছবির ক্ষেত্রে)।

তবু এই কথাটি মনে রাখা চাই : প্রত্যেকটি আঙ্গিকের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলি অন্যান্য আঙ্গিকে নেই। ফলে 'ন্যারেটিভ' বলে একটি ছাতা-মার্কা শব্দ দিয়ে সব ধরনের গল্প বলা/লেখার ধরণকে একাকার করে দেওয়া ঠিক নয়। লোককথা থেকে ছোটোদের গল্পের বীজ পাওয়া যায়, কিন্তু বড়দের গল্পের বীজ খুঁজতে হলে যেতে হবে মুখচলতি গল্পে ও বাতেলায়। এগুলোর বৈচিত্র্য এত বেশি, চরিত্রদের রকমসকম এত বিচিত্র যে জেরাল্ড্‌ প্রিন্‌স্‌-এর কায়দায় তাদের ব্যাকরণ খাড়া করা শক্ত। আদৌ তা করা যায় কিনা, সে নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই যে তেমন ব্যাকরণ তৈরি করা যায়, তবে সে-ব্যাকরণ খাড়া করতে হবে প্রচুর সংখ্যায় মুখচলতি গল্প জোগাড় করে, প্রিন্‌স্‌ যে কায়দায় মন-গড়া গল্প লিখেছেন, সে-কায়দায় নয়। মুখচলতি গল্পে যে-সৃষ্টিশীলতার সূচনা হয়, সেটি পূর্ণতা পায় : লিখিত রূপে তৈরি হয় ভাষা-দিয়ে-গড়া নতুন নতুন ইমারত। অর্থাৎ মুখচলতি গল্প, বাতেলা ইত্যাদি হলো এক একটি ইট। তেমন অনেকগুলি ইট মিলিয়ে ছোটোবড় বাড়িঘর বানানো হয়। ছোটোগল্প, বড়গল্প, উপন্যাস—সব কিছুরই পেছনে রয়েছে গল্প বানানোর সৃষ্টিশীলতা।

কিন্তু দেশে-দেশে কালে-কালে তার রূপ ও বৈচিত্র্য বদলায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়েছে মহাকাব্য, রোমান্স্‌, মঙ্গলকাব্য, আখ্যায়িকা, কথা ইত্যাদি। দেখা দিয়েছে চলচ্চিত্রর মতো নতুন শিল্পরূপ। এর প্রত্যেকটিই যেমন আলাদা, তেমনি মূলে একটা মিল আছেই। সব কটাই সূচনা হয়েছিল মুখচলতি গল্প, বাতেলা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে।

**টীকা :**

১। অরুণ নাগ, ২৮। হিন্দী শব্দটি অবশ্য বাতেলা, তবে বাঙলায় চালু উচ্চারণটাই লিখলুম।
২। লিন্ড্‌, ১৩।
৩। সুধীর চক্রবর্তী, ৫২-৫৩।
৪। অন্যত্র এ নিয়ে আলোচনা করেছি। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (২০০৬) দ্র.।
৫। যেমন ধরুন, প্রিন্স্‌-এর বানানো এই 'ন্যূনতম গল্প'টি : "জোন ছিল গরিব, তার পরে সে সোনা পেল, তার পরে সে বড়লোক হয়ে গেল"। এর উল্টো গল্পও তিনি লিখেছেন : "জেন ছিল সুখী, তার পরে মে-র সঙ্গে দেখা হলো, তার পরে সে দুঃখী হলো।" প্রিন্স্‌ (১৯৮২), ৭৫।

**রচনাপঞ্জি :**

অরুণ নাগ। *গল্প ও তার গোল*, ধীমা, ২০০৫।
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। "ভরতের ঝুমঝুমি : গড়নের দিক", সাংস্কৃতিক সমসময়, ১৫:১, জুলাই ২০০৬, ৯-১৪।
সুধীর চক্রবর্তী। বয়ানা বাহিয়ানা। পত্রলেখা, ২০০৬।
Lynd, Robert in Ruskin Bond (ed.) *The Rupa Laughter Omnibus* Rupa & Co., 2003. [লিন্ড্‌-এর রসরচনাটির নাম ওয়েল্‌স্‌-এর একটি গ্রামের নামে। সে-নামটি এতই বড় যে, ছাপতে গেলে ভুল হবেই। তাই সেটি আর দিলুম না].
Prince Gerald. *Narratology. The Form and Functioning of Narrative*. Berlin, etc.: Mouton Publishers, [1982].

# ঠাকুরমার ঝুলি : স্বদেশী শিল্পের পুনঃপাঠ

## শুভঙ্কর ঘোষ

বঙ্গবিচ্ছেদ প্রতিরোধ আন্দোলনের কালে, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের তাগিদ ও সমগ্র বাঙালি জাতির ঐক্যবদ্ধ হবার অনিবার্যতায় বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের আহ্বান ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র বাঙলায়। আত্মপরিচয়ের টান ও আত্মআবিষ্কারের উন্মাদনায় বাঙালি যখন শুনতে চাইছে শিকড়ের শব্দ, স্বদেশের মাটির গান, স্বদেশী সাহিত্যের সন্ধান তার অঙ্গীকার হয়ে উঠছে, তখনই, ১৯০৭-এ, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংগৃহীত ও সংকলিত 'ঠাকুরমার ঝুলি' বাঙালি চিত্তের আশ্রয় রূপে স্বীকৃতি পেল। রূপকথা ধারার স্রষ্টা দক্ষিণারঞ্জন সময় ও স্বদেশকে নিপুণ গ্রন্থনায় বাঙালির রুচিই নয়, জীবনবীক্ষাতেও নতুন মাত্রা সঞ্চারিত করলেন। আমরা চাইছিলুম একান্তভাবে নিজেদের কথা; গাছ-লতা-পাতা-ফুল-ফল-প্রকৃতি-আকাশ-নদী-রাজা-রানী রাক্ষস-খোক্কস-শুভঅশুভ, যুদ্ধ-শান্তি, সত্য-অসত্য-র ভেতর থেকে বোধের মহিমায় স্থিত হতে চাইছিলুম। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সম্বন্ধ ও দূরত্বের নিরবচ্ছিন্ন বিতর্কের ভেতর থেকে 'ঠাকুরমার ঝুলি'র গ্রহণীয়তাও বাঙালি জীবনে সদর্থকতায় চিহ্নিত হতে পেরেছিল, যেমন সেদিন, তেমনি আজকেও। খুব বাড়িয়ে না বললেও দাবি করা যায়, 'ঠাকুরমার ঝুলি'র অপরিহার্যতা নিত্যবর্তমান।

স্বদেশী আন্দোলন 'লক্ষ্যভ্রষ্ট' হয়েছে ভেবে সরে যাওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, 'বহুকোটি বাঙালির সম্মিলিত হৃদয়ের মাঝখানে আমাদের মাতৃভূমি বিরাজ করিতেছে', আর ঐ যাবতীয় প্রেক্ষায় স্বদেশী সাহিত্য আমাদের কতখানি আলোড়িত করতে পারে তার নজির 'ঠাকুরমার ঝুলি'—রূপকথার গঠন নিয়েই তার উদ্ভাস সমগ্রত। 'বাঙলার মাতৃপ্রধান অন্তঃপুর থেকে সযত্নে' সংগৃহীত রূপকথাগুলি একটা জাতির অস্তিত্বের ভিত্তিকেও চিহ্নিত করেছে। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবতে চেয়েছেন, 'ঠাকুরমার ঝুলি/ঠাকুরদার ঝুলি-র পরিগ্রহণ যে অত মসৃণ হয়েছিল বিশ শতকের প্রথম দশকে, তার অন্যতম কারণই হয়তো রূপকথার পাতায় প্রতিকূল পরিবেশে নবীনের জয়যুদ্ধের রোমাঞ্চ ও প্রাচীনার অক্ষয় পুণ্যযশের মণিকাঞ্চন যোগে, 'ঐতিহ্যে'র সায়-সমর্থনে আরোহই প্রাণ পেয়েছিল 'আধুনিক'দের স্বদেশী আবেগ-ব্যবস্থা।' [ঠাকুরমার ঝুলি : অতীত না ভবিষ্যপুরাণ?]।

ঠাকুরমার ঝুলি—'স্বদেশী জিনিস', রূপকথা, স্বদেশী শিল্প। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নাতুর হয়ে সদর্থক উত্তর খুঁজেছিলেন, 'ঠাকুরমার ঝুলির মত এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে?' কিন্তু তিনিও আক্ষেপ ও উদ্বেগ চেপে রাখতে পারেন নি,—'কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং মাঞ্চেস্টারের কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতেছিল। এখনকার কালে বিলাতের 'Fairy Tales' আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে। তাঁদের ঝুলি ঝাড়া দিলে কোন কোন স্থলে মার্টিনের এথিক্স এবং বার্কের ফরাসী বিপ্লবের নোট বই বাহির হইয়া পড়িতে

পারে, কিন্তু কোথায় গেল—রাজপুত্র পাত্তরের পুত্র, কোথায় বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, কোথায় সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারের সাত রাজার ধন মাণিক।' রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা সত্ত্বেও, দুনিয়া ব্যাপী ঘোর সঙ্কটে, বৈদ্যুতিন মিডিয়া, হ্যারি পটার সিরিজের দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও, আজ একশো বছর পরেও, এই সাম্প্রতিকে, উত্তর-আধুনিকেও ঠাকুরমার ঝুলি বাঙালি চিত্তের অন্তঃস্থিত পরিসর থেকে নস্যাৎ হয়ে যায় নি—এর অপরাজেয়তা এখানেই। আজকের আন্তর্জাতিক আঙিনায় বিপুলতা ও বিবৃতি-তে হ্যারি পটারের কোটি কোটি বিক্রয়ের সংবাদ পেয়েও বলা যায়, প্রায় ২৬ কোটি বাঙালির চৌহদ্দীতে 'ঠাকুরমার ঝুলি' মোটেই উপেক্ষিত নয়।

'ঠাকুরমার ঝুলি' শুধু শিশুদের সাহিত্য, তা নয়; তা বড়োদেরও। রূপকথার ছোট-বড় হয় না। শিশুসাহিত্য শিশুদের জন্য লিখছেন বড়োরা, শিশুমনটি নিয়ে বা সেই মনের অন্দরমহলে ঢুকে। কিন্তু এখন আর সীমারেখা টানা যায় না। রূপকথার জগৎ বড়োদেরও। বাঙলা দেশের মা-ঠাকুমা-পিসিমা-মাসিমার মুখ থেকে শোনা, কল্পনার স্পুটনিকে উড়তে উড়তে ফ্যানটাসি-বাস্তবের জগৎকে মেলাতে মেলাতে বিশ্বাসে বশে বাধ্য হতে হতে প্রতি মুহূর্তে বড়ো হওয়া—সব মিলিয়ে রূপকথা স্বরূপত অলীক নয়, অন্তর্জগতে কোথায় যেন রিয়েলিটি কাজ করে। রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণারঞ্জনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, ছাপাখানার যুগে, মুখের সাহিত্যকে তিনি স্থায়িত্ব দিয়েছেন ব'লে—'তিনি ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ তেমনি তাজাই রহিয়াছে; রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতদূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।' বয়স্ক পাঠে শিশুসাহিত্য নানার্থবোধক হতে পারে, বড়দের কাছে রূপকথার তাৎপর্য হতে পারে ভিন্নতর। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র শতবর্ষে তাই রূপকথার সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য-তাৎপর্য যেমন বহুতর, রূপকথার টেক্সট নিয়েও তা বৈচিত্র্যময়।

প্রত্যেক দেশেই কেরারি টেল থাকে। আমাদের দেশেও আছে। পঞ্চগৌড় নিয়ে বঙ্গ দেশ। এই বঙ্গদেশের তাবৎ লোক-কাহিনীর অন্তঃসার ঠাকুরমার ঝুলিতে আছে। শুধু রাঢ় বা বরেন্দ্রী বা হরিকেলের নয়, গুরুত্বপূর্ণ কথা, সমগ্র বঙ্গদেশের ঐক্য বলতে যা বুঝি, তা এই বইতে আছে। বাঙালি ঐক্য। বাঙলাটাও নতুন, সাধুগদ্যে, কিন্তু কথার চলিতের ঢঙ্। ছড়াগুলো লৌকিক। হাজার বছরের অস্তিত্ব নিয়ে, রক্তের গভীরে, বিরাজ করছে এই বাঙালি সংস্কৃতি, যা কিনা বিশ্বসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

রূপকথার লিখিত রূপ, মুদ্রিতরূপের কালেই গঠনরীতির আলোচনা শুরু। Axel Olrik মনে করতেন, লোককথার মধ্যে যে এপিক অনুশাসন বা Epic Laws -এর বাধ্যবাধকতা আছে; রূপকথার গল্পেও তা অপ্রাসঙ্গিক নয়। রূপকথায় কল্পনার যথেচ্ছ বিহার, অবাস্তব, অসম্ভবের দেশ, কাব্যধর্মী ভাষা, রোমান্স, যুদ্ধ। রাজপুত্র-রাজকন্যা, রাক্ষস-খোক্কস, রাক্ষসী মায়াবিনী, পশুপাখি—সকলেই চরিত্র, কিন্তু আখ্যানের নিয়ন্ত্রক কেউ নয়; পরিণামে শুভ বা কল্যাণের জয়। রূপকথায় অনেক কিছুই থাকে—সে একটি মাত্র ইউনিট নয়, অনেক কিছু মিলিয়েই তার হওয়া। মানুষ কি কেবল রূপকথা পাঠে আনন্দ লাভ করে? সে কি রি-অ্যাক্ট

করে না? উপকথা, লোককথা, পশুকথা, পুরাকথা, লোকগীতি, লোকছড়া, নীতিকথা —একটি শিশুমনে, সাধারণত সমস্ত কিছুকে প্রবেশ করিয়ে দেবার জন্য তৈরি হল রূপকথা। রূপকথায় সব আছে, মহাকাব্যের কাহিনীও আছে। শিশুর মনটাকে গড়ে তোলার জন্য রূপকথা। নিছক আজগুবি বিষয়ই নয়, যা সামাজিক সত্য দেখছি তাকে ইনভার্ট করে দেওয়াটাই রূপকথা। Invertion of Social Truth is fairly tale, অর্থাৎ ঘুরিয়ে দেখা; রাজা-রানী-শিশু-রাজা স্ত্রীর কথা, শাসনকর্তা রাজা, রানী হল রাক্ষসী; ঘুরিয়ে না বললে আমরা 'শক্' পাব না। বলার কথা, 'ঠাকুরমার ঝুলি'র পুনঃপাঠ-অভিজ্ঞতায় এই সত্যই যেন উন্মোচিত হয়।

'ঠাকুরমার ঝুলি', বয়স্ক পাঠে, নানা মানে নিয়ে আসে। শিশুমনে রূপকথার মুছে যাওয়া কখনোই সম্ভব নয়। ফিউডাল সমাজের গল্প যখন শুনব, তখন তার ভেতরকার শোষণ, অসম সমাজের কথা জানব। শিশু কিন্তু তার নিজের মতন জগৎ গড়ে তোলে। নোয়াম চমস্কি বলেন, বালক বয়সে আমরা যা দেখি-যা শুনি সারা জীবন ধরে তা আমাদের মনে থাকে। যে-শব্দ যে-ছবি যে-কষ্ট দেখেছি, যে-ভাষা শুনেছি তা সব মনে আছে। শিশু-বয়সে যে রূপকথা আমরা শুনি, আমাদের পৃথিবীতে, সেই বেশি বয়সে, তা আসে; তাই রূপকথা শুধু ছোটদেরই নয়, বড়োদেরও। আমরা বলতে পারি, রূপকথা আদৌ গল্প নয়, বিশুদ্ধ পাঠ থেকেও বলা যায়, রূপকথা একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ শিল্প, যা কিনা কল্পনা দিয়ে অভিষিক্ত। কারও জীবনকথা বলতে গেলে আমাদের মন দিয়েই তাঁর জীবনীতে কল্পনা যুক্ত হয়। যা ঘটেনি তা বলতে ভালোবাসি। এটা একটা মিথলজি, ইতিহাস। মানুষ যখন বলে সে তখন নিজেই ইতিহাস। He himself becomes a history। সেও একটা শিল্প। এভাবেই 'ঠাকুরমার ঝুলি' একটা মিথ, ঘুরিয়ে দিলেই মিথ।

ঠাকুরমার ঝুলিতে এক-একটি গল্প এক-একটি সত্যের সন্ধান দেয়। দুঃখসাগরের ঢেউয়ে লুকিয়ে থাকা সত্যকে উন্মোচন করাটাও আমাদের পাঠক্রিয়ায় অনিবার্য। আমাদের পাঠে এই জিজ্ঞাসার জাগরণ ঘটে—

হাজার যুগের রাজপুত্র রাজকন্যা সবে
রূপসাগরে সাঁতার দিয়ে আবার এল কবে!

তারই অনুসন্ধান থেকে এই স্বদেশী শিল্পের পাঠ-পাঠান্তর। 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পের মুখ্য বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা জাগে, যখন শোনা যায়—

শুকপঙ্খী নায়ে চড়ে কোন কন্যা এল,
পাল তুলে পাঁচ ময়ূরপঙ্খী কোথায় ডুবে গেল
পাঁচ রানী,, পাঁচ রাজার ছেলের শেষে হল কি,
কেমন দুভাই বুদ্ধ ভুতুম বানর পেঁচাটি। [দুখের সাগর]

সংক্ষেপে আখ্যানটি হল, এক দেশে সাত রানী। পাঁচ রানীর অহংকার। সন্ন্যাসীর কাছ থেকে শিকড় বাটা খেয়ে অপুত্রক রানীদের সন্তান হল। বড় রানী, দুয়োরানী, মেজরানী, সেজরানী ও কনেরানী শিকড়বাটা ভাগাভাগি করে খাওয়ায় যথাক্রমে পাঁচ পুত্রের জন্ম হল— হীরা রাজপুত্র, মানিক রাজপুত্র, মোতি রাজপুত্র, শঙ্খ রাজপুত্র, আর কাঞ্চন রাজপুত্র।

শিকধোয়া জল খাওয়ায় ন-রানী ও ছোটরানীর পেটে যথাক্রমে পেঁচা ও বানরের জন্ম হল—নাম হল ভুতুম আর বুদ্ধু। ভুতুমের মা নরানী চিড়িয়াখানার বাঁদী আর বুদ্ধুর মা ছোটরানী ঘুঁটেকুড়ানী দাসী। ভুতুম আর বুদ্ধু বকুল গাছের ডালে বসে খেলা করে। বুদ্ধু মায়ের ঘুঁটে কুড়িয়ে দেয়, আর ভুতুম পাখির ছানাগুলোকে খাওয়ায়। আর পাঁচ রাজপুত্র পাঁচটি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায়। হঠাৎ শুকপঙ্খী নৌকা এল। নায়ের মধ্যে মেঘবরণ চুল কুঁচবরণ কন্যা বসে সোনার শুকের সঙ্গে কথা বলছে। পাঁচ রানীই কুঁচবরণ কন্যাকে পেতে চাইছে। নাও ভেসে যাচ্ছে। সে বলছে—

মোতির ফুল মোতির ফুল সে বড় দূর
তোমার পুত্র পাঠাইও কলাবতীর পুর।

কুঁচবরণ কন্যা কলাবতীর দেশের ঠিকানা জানিয়ে যায়, ঢোলডগর বাজিয়ে, বুড়ীর কাঁথা গায়ে, তিনবুড়ীর রাজ্য ছেড়ে, রাজনদীর জল বেয়ে যেতে হবে। রাজবাড়ির পাঁচ রাজপুত্র ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়ে চলল, বুদ্ধু আর ভুতুম চলল সুপারির ডোঙায়। কাহিনীসূত্রে দেখা যাচ্ছে, ঢোলডগর যার, রাজকন্যা তার—যেমন বুদ্ধুর, কলাবতী তার। অপরদিকে ভুতুমের হীরাবতী। পাঁচ রাজপুত্র কিছু পেল না, পাঁচরানীর মর্মান্তিক পরিণাম ঘটল।

'কলাবতী রাজকন্যা'-য় একটা ছোট্ট শ্রেণীসংগ্রামের গল্প আছে। রাজা একদিকে কেন্দ্রীয় শাসক, তার অনেকগুলো বউ বা রানী আছে, যারা হল আনন্দ লাভের উপায়। আবার একদিকে পাঁচ রাজপুত্র, অন্যদিকে নির্বাসিত দুজনের দুর্গত চেহারা—পেঁচা আর বাঁদর। উচ্চকোটির যারা, এদের তারা ঘৃণা করে। কিন্তু দেখা যাবে তলার মানুষ দুটি—বুদ্ধু আর ভুতুম—অপর ভাইদের বাঁচাবে। এটা একটা সত্য। অপরদিকে, বুদ্ধু আর ভুতুম আদতে মানুষ—রাজবাড়ি পাহারা দিত। এদিকে অপার কৌতূহলে রাজকন্যারা পাখি আর বানরের পোষাক পুড়িয়ে দেয়। তখন তাদের আর ছদ্মবেশ থাকে না, মানুষ হয়েই ফিরে আসতে হয়। তারা গোপনে রাজবাড়ি পাহারার দায়িত্ব পালন করত। এখন তাও আর সম্ভব নয়। যা হোক, রাজা শেষ পর্যন্ত তাদের স্বীকার করে নিলেন। আসলে এই গল্পে কল্পনার মধ্য দিয়ে সুখী মানবিক সমাজ গঠনের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটেছে। এখানে রানীরা শোষণের অংশ। এরা অত্যাচার করে। তাই দুটি শোষিত; তারা ফিরে আসবে, জয় করবে। কলাবতী হীরাবতী মেয়ে দুটি প্রেম দিয়ে বুদ্ধকুমার ও রূপকুমারকে গ্রহণ করবে। আদতে গল্পের পরিণামে একটি সুখী স্বচ্ছন্দ সমাজ গড়ার ইঙ্গিতটিই প্রতিফলিত। এত বড় বিপ্লবী কল্পনা শিশুমনে ঢুকিয়ে দেওয়াটাই রূপকথার বিষয়।

'ঘুমন্ত পরী' গল্পে রাজপুত্রের অসীম প্রতীক্ষা ও রূপাতুর হয়েও প্রবল সংযম তাকে সক্ষমতা দিল ঘুমন্ত পুরী-কে জাগিয়ে তুলতে, রাজকন্যা প্রাপ্তিও হল রাজ্যপাটে সজীবনী পরিবেশ গড়ে তোলার গল্প হয়ে উঠল এই গল্প। এর ভেতর কি কোথাও জাদুবাস্তবতার ইঙ্গিত মেলে?

'কাঁকনমালা—কাঞ্চনমালা' গল্পের প্রাথমিক পাঠে হিংসার পরাজয় ঘটে, জেনে যাই। এরই অন্তর্গত অপর সত্য সূঁচ রাজার গল্পাংশ যেখানে রাখালবন্ধু সুতো নিয়ে খেলা দেখানোর

পারঙ্গম, রাজাকে সে সুঁচমুক্ত করে; কাঁকনমালার চোখমুখ সেলাই হয়ে যায়; কাঞ্চনমালার দুর্ভোগ শেষ হয়; রাখাল রাজ-দত্ত বাঁশি বাজায়; রাজা-কাঞ্চনমালা, বন্ধু-মন্ত্রী রাখাল সুখে দিন যাপন করেন। এ গল্পে লোকজীবনের ব্রত-উৎসব, মাটি ঘেঁষা জীবনের স্পর্শ-গন্ধ মেলে; অপরদিকে নিরীহ স্বভাবের প্রতিবাদ বাঙালি জীবনে কেমন রূপ নেয়, স্বপ্নে-কল্পনায় তারও ছবি পেয়ে যাই আমরা। রাখালের অন্তর্লোকের মহিমা আমাদের মন টানে।

'নীলকমল-লালকমল' গল্পে আমরা মানবিক শক্তি আর অমানবিক শক্তির ভিন্নতা ও স্বরূপ অবহিত হই। এক রাজার দুই রানী। এদের এক রানী রাক্ষসী। রাক্ষসী রানীর ছেলে অজিত। লক্ষ্মী মানুষ রানীর ছেলে কুসুম। অজিত-কুসুমে খুব ভাব। লক্ষ্মী মারা যায়। কুসুমকে রাক্ষসী খেল। অজিত ভীত। ধীরে ধীরে রাজার রাজত্বে রাক্ষসে ছেয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত অজিতেরও প্রাণ গেল। জীবন্ত মানুষ পালাতে লাগল দলে দলে। ইতিমধ্যে জোড়া ডিম ভেঙে জন্ম নিল লাল নীল রাজপুত্র। লালকমল নীলকমল। তারা খোলা তরোয়াল হাতে রাজ্য ছেড়ে চলে গেল—ভিন রাজ্যে। সেখানে খোক্কসের হাত থেকে রাজ্য বাঁচাতে বদ্ধপরিকর জেনে রাজা তাদের আশ্রয় দিলেন। খোক্কসের পেটে বহু রাজপুত্র গেছে। পাহারারত লালকমলকে মারতে এল খোক্কসেরা। নীলকমল নিদ্রিত। পরিচয় জানতে চাইলে লালকমল উত্তর দেয়—'নীলকমলের আগে লালকমল জাগে/আর জাগে তরোয়াল,/দপ্ দপ্ করে ঘিয়ের দীপ জাগে—/কার এসেছে কাল?' নীলকমলের নাম শুনে খোক্কসের দল ভয়ে পিছিয়ে যায়, কেননা পূর্বজন্মে নাকি নীলকমল রাক্ষস-সন্তান ছিল। নখের ডগা দেখতে চাওয়ায় লালকমল নীলকমলের মুকুটটা তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে বার করে দিলেন। নখের ডগায় গড়ন দেখে তারা ভয় পেল; থু থু দেখতে চাইলে লালকমল প্রদীপের ঘি গরম করে ছিটিয়ে দিলেন। খোক্কসেরা যন্ত্রণায় পালিয়ে গেল। ফিরে এসে জিভ দেখতে চাইলে লালকমল নীলকমলের তরোয়াল দরজার ফাঁক দিয়ে বাড়িয়ে দিলেন। টানাটানিতে দু'হাত কেটে কালো রক্তের বান ছুটল। খোক্কসেরা পালিয়ে গেলে লালকমলের বিশ্রাম ও ঘুম। কিছু পরে আবার খোক্কসদের হামলা; তখন ভুলবশত নিজের নাম বলে ফেলায় খোক্কসেরা ঘরে ঢুকে পড়ে। তখন নীলকমল জেগে উঠে তাদের প্রতিরোধ করেন এবং তাঁর বুদ্ধিতেই লালকমল প্রাণে বাঁচেন। ওদিকে নীলকমলের বুদ্ধিতেই ফেলে আসা রাজ্যে, রাক্ষসী রানী মারা গেল। রাজ্যে ফিরে এল শান্তি। রাজা শুধোলেন, 'তোরা কি আমার অজিত-কুসুম?' প্রজারা বলল, 'হ্যাঁ এরাই অজিত-কুসুম।' তখন দুই রাজ্য এক হল। নীলকমল-লালকমল ইলাবতী-লীলাবতীকে নিয়ে সুখে কাল কাটাতে লাগল।

এখানে লক্ষ্য করি, একই পরিবারের ছেলে আর কৃষকের ছেলে, যাই বলি না কেন, আসলে তারা একই মাতৃভূমির দুই মানবিক সন্তান। একসঙ্গে লড়াই করতে হবে রাক্ষস শক্তির সঙ্গে। আমাদের মনে পড়বে, বহুদিন পরে, বিষ্ণু দে, ১৯৪৭-এ, 'সন্দীপের চর' কাব্যে রূপান্তরিত প্রেক্ষিতেও পুনর্নির্মাণ করেন রূপকথাকে,—

জন্মে তাদের কৃষাণ শুনি কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কৃষাণের বউ পইছে বাজু বানায়।

যাত্রা তাদের কঠিন পথে রাখীবাঁধা কিশোর হাতে—
রাক্ষসেরা বৃথাই রে নখ শানায়।
নীলকমলের আগে দেখি লালকমল জাগে
তৈরি হাতে নিদ্রাহারা একক তরোয়াল
লাল তিলকে ললাটে রাঙা, ঊষার রক্তরাগে
—কার এসেছে কাল?

'সাত ভাই চম্পা' গল্পে বড়রানীর ষড়যন্ত্রে ছোটরানীর অশেষ দুর্ভোগ বাড়তে থাকে। 'শেষ পর্যন্ত পোড়াকপালী ছোটরানীর দুখে গাছ-পাথর কাটে, নদী-নালা শুকায়—ছোটরানী ঘুঁটে কুড়ানী দাসী হইয়া, পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন।' রাজা ভেবেছেন অন্যরকম। বড়রানীর ষড়যন্ত্রেই এই অবস্থা। রাজাও বিরূপ। অথচ রাজার সাত ছেলে এক মেয়ে হয়েছে। এদিকে রাজার পুজোর ফুল মেলে না। পুরোহিত পাশগাদায় সাত চাঁপা কে পারুল গাছে ফুল ফুটতে দেখে রাজার অনুমতি নিয়ে ফুল আনতে গেল। কিন্তু ফুল মেলে না। রাজা, রাজার বড় রানী, মেজরানী, সেজরানী ন রানী, কনে রানী, দুয়োরানী হাজির হলেও ফুল ক্রমশ উপরে উঠতে থাকে; 'ফুলেরা গিয়া আকাশে তারার মতো ফুটিয়া রহিল'। অবশেষে ঘুটে-কুড়ানী দাসী ছোটরানী উপস্থিত হতেই ফুলের মধ্য থেকে সাত রাজপুত্র, পারুল ফুল কন্যাটি রানীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বড়রানীদের শাস্তি হল—মৃত্যু। ছোটরানী সাতপুত্র ও এক কন্যাকে নিয়ে রাজার সঙ্গে রাজবাড়িতে প্রবেশ করলেন। এখানে কেউ বলবেন, এদের মিলনে 'শাশ্বত বাংলার মা ও সন্তানের মমতা ঘেরা মুহূর্তটি বড় বেশি সংবেগী ভাবে' প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের বলার কথা, এই আপাত বোধে স্থিত থাকলে চলে না, আসলে এখানে ষড়যন্ত্রের পরাজয় ও সুন্দরের অর্থাৎ সত্যের জয় ঘোষিত হয়েছে।

এভাবেই 'ঠাকুমার ঝুলি'তে শীত-বসন্ত, সুখু আর দুখু, কিরণমালা, শিয়াল পণ্ডিত ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি গল্পেই কোনো-না-কোনো বার্তা পাওয়া যাবে। ঠাকুরমার ঝুলিতে শুধুমাত্র আনন্দপাঠ নয়, জীবনপাঠও বটে। এখান থেকেই বুঝে নিতে পারি মানুষের বিরুদ্ধে যে শক্তি আঘাত করে, তারা শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে না, মানুষই জয়ী হয়। 'ঠাকুরমার ঝুলি'-তে খবুই মানবিক গুণসম্পন্ন কাহিনী আমরা পাই। এইসব গল্পের মধ্যে আছে শ্রেণীবিযুক্তি, শ্রেণীসংহতি। সতীনদের মধ্যে বিরোধ, পুত্র কন্যাদের মধ্যে বিরোধ আসে, ভাইবোনেদের মধ্যে মিলও থাকে, জয়ী হয় অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে, হিংসা-ঈর্ষা-চক্রান্তের বিরুদ্ধে। সমাজকে সুন্দর রূপ দেবার জন্য শিশু বা বালক-বালিকাকে দাঁড় করানোই লক্ষ্য।

এই সময়ে, কাছে-কিনারের কালে, মিথচর্চা বেড়েছে। লাতিন আমেরিকার তো আমরা দেখেই থাকি। সেখানকার সাহিত্যে, আখ্যানে সেখানে কল্পিত জগৎটা, মায়াবী জগৎটা ফিরে ফিরে আসে। হ্যারি পটারের মধ্যেও স্বপ্নের বিষয়, কিন্তু ঠাকুরমার ঝুলি স্বরূপত ভিন্ন—তার স্বপ্ন, তার কল্পনা, তার সময় ও আমাদের জীবন। বিশ্বায়নশাসিত দুনিয়ার ফসল সে নয়। আমরা এখন দুটো পৃথিবী দেখছি। একটা পৃথিবীতে বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে অসম্ভব পৃথিবীতে প্রবেশ করছি; আর একটা আমাদের না-জানা পৃথিবী। জানিনা কত কিছু। আমরা

যে পৃথিবীটা জানিনা— যেমন হঠাৎ মাথার ওপর দিয়ে ছুটে এল টোমাহক, ধ্বংস করছে, আমরা তা জানি না। কোনো পণ্য বাজারে এল, অন্যসব পণ্যকে শূন্য করে দিল। অজানা জিনিস আমাদের জ্ঞাত জিনিসকে পরাস্ত করছে।

আমরা সমস্ত কল্পনা দিয়ে রাক্ষসশক্তিকে দেখছি। মায়ার শক্তি, জাদু শক্তিকে দেখছি। অপরদিকে জাদু কল্পনা করি। রূপকথা ফিরে আসে। ঠাকুমার ঝুলি' বাস্তব নয় মনে হলেও, আদতে তা পরিপূর্ণ ম্যাজিক রিয়্যালিটি। কল্পনা দিয়ে সমস্ত জগৎটাকে চিহ্নিত করছি। বাস্তব জগৎ যা আছে, তা কল্পনা দিয়ে নির্মাণ করে কল্পিত জগৎটাকে চিহ্নিত করছি। সূঁচ দিয়ে মানুষকে শাস্তি দেবার ঘটনা ও তার অবসান আশ্রয় করে ভাবতে পারি পরিণামে মহিমান্বিত কল্পনার শেষে রয়েছে আশ্চর্য নারী শক্তি। এই তো রূপকথা।

রূপকথা আমাদের বাঁচায়। পৃথিবীর সমস্ত মহাকাব্যেই রূপকথার বিস্তার। সামাজিক রাক্ষস, সামাজিক বিমাতা কাহিনীতে বিন্যস্ত করা হয়। এতে আমাদের নানারকম মনে হতেই পারে। রূপকথা না পড়লে আমাদেরই ক্ষতি। ধানের বীজ পুঁতলে মাটি থেকে চারা হয়, গাছটা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কেউ বলবেন Negetion of Negation—অর্থাৎ হাঁ থেকে না, না থেকে হাঁ। মনোজগতের ভেতরেই রূপকথা প্রোথিত আছে। রূপকথাটা ধানের বীজ। রূপকথা, ঠাকুরমার ঝুলি, তার রহস্য ইত্যাদি দিয়ে সব কিছু পড়ি কেন? জনজাতির ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত না হতে পারলে তা সমূহ ক্ষতি। কবেকার রূপকথা 'ঠাকুরমার ঝুলি' থেকে আধুনিক রূপকথা—ওয়ার অ্যান্ড পীস, গোরা, পুতুল নাচের ইতিকথা' ইত্যাদি আমাদের বাঁচায়। কালে কালোত্তরে রূপকথার গঠন কলায়, কপিবুক সংজ্ঞায় মেলে না; কিন্তু 'ঠাকুরমার ঝুলি' পড়তে পড়তে যদি অলীকতা-অবাস্তবতার ওজর তুলে বাতিল করতে বসি, তাহলে ভুল করব। মনে পড়ছে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য—'রূপকথা বাস্তব জীবনের সমস্ত অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিয়া তোলে, নিষ্করুণ দৈবের বিচার উল্টাইয়া দেয়; এবং মানুষ নিজের ভাগ্য বিধাতা হইলে কিরূপ পরিপূর্ণ সুখ ও শান্তির মধ্যে আপনার জটিবহুল ও ভ্রমসংকুল জীবননাট্যের উপর শেষ যবনিকাপাত করিত তাহার সুস্পষ্ট আভাস দেয়।' [রূপকথা]।

'ঠাকুরমার ঝুলি' রূপকথা হলেও নিছক বিনোদন সংস্কৃতি নয়, আমদানি করা কোনো বিদেশি জিনিস নয়, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার তাৎক্ষণিক উচ্ছ্বাসের অবলম্বন নয়। বস্তু নির্বাসিত এই ব্যস্ত জীবনেও, হ্যারি পটারের রমরমার ফাঁকেও গ্রামনগর থেকে চুঁইয়ে পড়া জ্যোৎস্নার আলোর মতন 'ঠাকুরমার ঝুলি' শতবর্ষ-অতিক্রান্ত স্বদেশীশিল্পটি আশ্রয় করলে বিশ্বায়নের বাধা আসতে পারে, কিন্তু আন্তর্জাতিক সাহিত্যের মহিমান্বিত পরিসরে, ভারতীয় ও বঙ্গীয় নিরিখে পা ফেলা পা তোলায় বাধা থাকবে না।

জড়িয়ে পড়ে আসে। তুলে দেখে সেটা হচ্ছে একটা গাছের গুড়ি। জাল থেকে গুড়ি ছাড়িয়ে আবার ফেলল জাল। এবার উঠলো একটা মরা গাধা। আবার জাল ফেলে—এবার উঠলো কাদা ভর্তি মাটির জালা, আরেকবার ভাঙা বাসন এবং কাচের টুকরো।

শেষবার জাল ফেলতে উঠে এলো—একটা ভারি তামার জালা, জালার মুখ সিলমোহর করা। সিলমোহরে দাউদের ছেলে শাহেনশা' সুলেমানের নাম। জেলের মন আশায় নেচে ওঠে। সিলমোহর খুলে অনেক কষ্টে যেমনি ঢাকনাটা খুলেছে, অমনি একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি বেরিয়ে আসতে থাকে জালার ভেতর থেকে। ধোয়ার কুণ্ডলি ছড়িয়ে পড়ে আকাশে, শেষে ঐ ধোঁয়ার কুণ্ডলিটা রূপ নেয় বিরাটাকার এক দৈত্যে....

দৈত্য নিজের রূপ ধরে এ কথা সে কথার বলে যে সে জেলেকে মেরে ফেলবে। জেলে তাকে অনেক বোঝায়, যথেষ্ট কাকুতি মিনতি করে, তবু দৈত্য অনড় থাকে তার কথায়, তখন জেলে বোঝে, বুদ্ধি খাটিয়ে বাঁচা ছাড়া দ্বিতীয় রাস্তা নেই।

জেলে তখন তাকে বলে, সে জালার মধ্যে ছিল তার প্রমাণ কোথায়? অত বড় একটা শরীর কী করে থাকে ঐ ছোট্ট জালায়, সেজন্য সে বিশ্বাস করতে পারছে না যে অতবড় শরীর নিয়ে কেউ ঐ জালায় থাকতে পারে? তা শুনে দৈত্য খেপে যায়, এবং নিজের শরীর গুটিয়ে একটুকু করে জালায় ঢুকে পড়ে। দৈত্যের ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে

জেলে খপ্ করে ঢাকনি এঁটে জালার মুখ বন্ধ করে দেয়, আর দৈত্য ছটফট করতে থাকে ঐ জালার মধ্যে।....

এতদূর মনে পড়তেই আয়ু কেন যেন খুশিতে উছলে ওঠে, হাঁ, এ রকমই একটা কিছু করতে হবে বুদ্ধি খাটিয়ে

ছায়া যখন পড়ছে, তখন ভূত নয় নিশ্চয়; সে শুনেছে ভূতের শরীরের ছায়া পড়ে না, তাহলে ঐ ছায়াদের কী বলা যায়, ছায়া অথচ শরীরের পাত্তা নেই? এদের তবে অভূত বলা যায় বটে, এখন অভূতদের কব্জা করতে হবে

দৈত্যকে জালায় পুরে বন্দ করা গেছে, এখন তেমন জালা পাওয়া যায় না, বাজারে হয়ত মাটির জালা পাওয়া যাবে সহজে, কিন্তু তামা বা অ্যালুমিনিয়াম-এর জালা অনেক খুঁজে পেতে মিলবে, আর দাম-ও অনেক হবে কিন্তু

মাটির জালা-ই বা এনে কী হবে? আনলেই তো সকলে জিজ্ঞেস করবে—এটা আনলি কেন, কী দরকার, টাকা-পেসি কোথায়, হঠাৎ কিসের জন্য জালার দরকার পড়লো, জায়গা কোথায় রাখার ইত্যাদি আরও আরও প্রশ্ন উঠবে, উত্তর সে দিতে পারে, কিন্তু

উত্তর দিলেই তো সব ফাঁস হয়ে যাবে, ও যে ছায়াদের বন্দী করতে চাইছে একটা কারণে, সেটাই তাহলে সকলে জেনে যাবে, আর জেনে গেলে সে তাক লাগাতে পারবে না কাউকে, এমন কি কেউ কেউ বাগড়াও দেবে, অতএব—

চুপচাপ কাজ সারতে হবে, দৈত্যকে ঢোকানো হয় জালায়, ছায়াগুলো ছোট ছোট তাই তাদের ঢোকাতে হবে ছোট্ট আধারে, আয়ু তখন জোগাড় করতে থাকে শিশি, বোতল ছিপি, কর্ক....

অদ্ভুতদের ঐ শিশি বোতলে ভরতে হবে, তারপর টাইট্ করে বন্ধ করতে হবে মুখ ছিপি, কর্ক দিয়ে, তারপর এক সময় হেঁচকা টান মেরে খুলতে হবে ঢাকনা, তাহলে জোরে শিশি বোতলের সরু মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে বন্দী ছায়ারা...

ছায়ারা ছড়িয়ে পড়বে ধোঁয়ার মত; তারপর আলায় ধোঁয়া যেমন দৈত্য হয়ে যায় ছাড়া পেয়ে, তেমনি ভাবে ঐ ছায়া ছড়িয়ে পড়ে আস্তে আস্তে ঘন হয়ে

যে যার রূপে হাজির হবে চোখের সামনে, কিন্তু

ঐ অদ্ভুতদের বোতলবন্দী করা যাবে কী ভাবে? অত উঁচুতে হাত পৌঁছবে না, লাঠি-নিয়েও কাত করা যাবে না কারণ নীচে দাঁড়িয়ে ওদের ছুঁতে গেলেও নিজের টলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা, এক হয় টেবিলের উপর চেয়ার বা টুল তুলে তার উপর দাঁড়ানো, তা করলে

হৈ হৈ করে ছুটে আসবে সকলে, তারা পড়ে যাবে পড়ে যাবে রব তুলে এক কাণ্ডই বাঁধিয়ে ফেলবে, আয়ু এসব হতে দিতে চায় না, চুপচাপ কাজ সারতে চায়

আঁকশি বানিয়ে ওগুলো পেড়ে আনলে কেমন হয়, আঁকশি দিয়েই তো লোকে অনেক কিছু পাড়ে, সে আঁকশি তৈরি করবে—ঠিক করে, তখনি মনে হয়

আঁকশি দিয়ে ফলমূল বা কোনো শক্ত জিনিস পাড়া যায়, ছায়া কি আঁকশি দিয়ে পাড়া যাবে, ছায়ার তো কোনো শরীর নেই, কিংবা নির্দিষ্ট কোনো আদল?

তাহলে?

উপর থেকে ওদের যাদের সে অদ্ভুত নাম দিয়েছে, তাদের নীচে নামানো, তারপর শিশি বোতলে পোরো—কী করে সম্ভব হবে? ভাবতে ভাবতে দিশেহারা হয় আয়ু, শিশি বোতল-ও

যথেষ্ট জোগাড় করতে পারছে না, কাউকে না জানিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে করছে বলে সময় লাগছে বেশি—খুব বেশি, জানালেই তো আসল মজাটা থাকবে না, কিন্তু মূল সমস্যা হচ্ছে

অদ্ভুতদের ওখান থেকে নামাবে কী করে, আঁকশি দিয়ে নামানো যাবে না, ফলে-দেরি আরও হয়ে যাচ্ছে, আঁকশি ছাড়া নামানোর আর কি যন্ত্র আছে?

আয়ু তা নিয়ে ভেবে চলেছে এখন, ভাবতে ভাবতে খুঁজতে খুঁজতে এক সময় যাচ্ছে গোটা ব্যাপারটা, বেমালুম ভুলে বসে তার আসল কাজ, লক্ষ্য...

সেদিন হাতে কাজ ছিল না কোনো, তার উপর বাড়ি সুনসান

মন বসছিল না কোথাও, মন এধার ওধার ঘুরে বেড়ায়, এমন অবস্থায় কী করা যায়? আয়ু টি.ভি-র সুইচ অন্ করে, দেখে, একটি মেয়ে খবর পড়ছে

সঙ্গে সঙ্গে রিমোটের অন্য বোতাম টেপে, সেখানে

খবর, ফের চ্যানেল বদলায়

তাতেও খবর, দ্যুৎ তেরি, খবরের নিকুচি করি বলে বন্ধ করতে যাবে তার আগেই আরেকটা চ্যানেলের বোতাম টিপে ফেলে অচেতনে, সেখানে

# মর্গের মানুষগুলো হঠাৎ কেঁপে ওঠে যদি

## অমলেন্দু চক্রবর্তী

মোটামুটি শান্ত নিঝুম দুপুরবেলা নিঃশব্দে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল পাড়ায়, আশ্চর্য, কাকপক্ষী টের পেল না কেউ? অথচ বিকেল-গড়ানো বারবেলায় 'কাজের মেয়েরা' ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবার পর 'অকাজের গিন্নিদের' মুখে মুখে ডালপালাপল্লপল্লবে বাল্টকমিষ্টির সাতকাহন কেভাবে ছড়িয়ে পড়ল ঘরে-ঘরে। লেজমুড়ো বলা পাকিয়ে এমন একটা তালগোল, সেটা নিয়ে অনায়াসেই নিটোল একটি বাংলা সিরিয়ালের গোটাকয়েক প্লট হয়ে যেতে পারে। শুধু গপ্পো আর গপ্পো। গপ্পোর গায়ে গপ্পো বুনে গপ্পের ঠাসবুনন। চেনা মুখ আর অচেনা হয় না কোথাও। অচেনা আপন।

অথচ অবাক কাণ্ড। বিকেল প্রায় পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটা নাগাদ ফ্যাশান-শোর মডেলদের প্যারেড যেমন, মিত্তিরদের বাড়ির বিমলি হাইহিলের পায়ে জিনসের প্যান্ট আর গায়ে নামাবলি মার্কা কী-সব লেখাজোকা গেরুয়া পাঞ্জাবি চড়িয়ে পাড়ার রাস্তার লোকজনের চলাচলে কানে সেলফোন সেঁটে হেসে কেঁদে যেভাবে দেমাকি চালে ঘরে ফিরে এল গোল-গোল চোখের বিস্ময়ে দেখল সকলেই। সারিবাঁধা ঘরবাড়ির দরজায় জানালায় উঁকিঝুঁকি বা দুপাশের দোকানপাটে বা রাস্তায় পথ-চলতি পাড়ারই মানুষজন, যাঁরা দুপুরের গপ্পোগাছা জানেন বা শুনেছেন, সবাই অবাক হয়ে রইলেন মেয়েটির চলার ঢঙে পুরুতঠাকুরের খড়মের আওয়াজ গোছের হাইহিলের খটখটির দিকে। কেউ কিছু না বললেও, পরিষ্কার বোঝা যায় নিজের নিজের কাছে অল্পবিস্তর হতাশ সকলেই। তাহলে আর কী হলো? পুরো গপ্পোটাই যে মাঠে মারা যায়। তোবড়ানো গালের যে-বুড়োগুলো রাগবাপের বিবে জ্বলছিলেন ঘরে বসে—'হবে, এই তো হবে এখন। এসবই চলবে। রাস্তাঘাটে লজ্জা নেই শরম নেই, ফিরিঙ্গি বিবিদের বেলেল্লাপনা আর পিছু পিছু ইয়াংকি কেষ্টঠাকুররা ঢলে পড়ছে মোসাহেবিতে। নিউ জেনারেশন? গুষ্টির পিণ্ডি.... বিকেলে পার্কের বেঞ্চিতে বুড়োদের আড্ডায় যাঁরা গলা ফাটাবেন বলে গোটা দুপুর ভরে গপ্পোটা নিয়ে নানাভাবে ছক কষছিলেন, বলা বাহুল্য, বান্ডিল বান্ডিল বাতিল ক্যালেন্ডারের দাদুরা বিমর্ষ সকলেই।

আসলে সবই বাতুলতা। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরেছে বলেই এত এত মানুষের হাপিত্যেশী গপ্পোগাছার শেষটুকু মিথ্যে হয়ে যাবে? সে-হয় নাকি? এ তো আর এ-পাড়ার খোঁড়া ল্যাংচার সঙ্গে বেপাড়ার কানা মদনার বোমাবাজি ছুরি চালাচালি নয় যে সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার ঘরে ঘরে জানালাদরজা পটাপট সব বন্ধ হয়ে যাবে। রাস্তায় যে যেখানে ছিলেন, কিঞ্চিৎ থমকে দাঁড়িয়ে কিছু বুঝে না না বুঝেই আগুপিছু না ভেবেই পড়িমরি ছুটতে শুরু করলেন। দুপাশে ছোটবড় দোকানপাটে টপাটপ কলাপসিবল বা শাটার টানার আওয়াজ এবং পুলিশ। পুলিশের গাড়ি পৌঁছনোর পরই নাট্য মায়ার ক্লাইম্যাক্স পয়েন্ট। গোটা পাড়ায় অঘোষিত কার্ফুর শুনশান। স্বেচ্ছাবন্দি পুরজন ভেজা পায়রার মতো নিজেদের চার দেয়ালে কুঁকড়ে থেকে বন্ধ দরজার বাইরে কোথায় কী ঘটছে জানতে চায়। অকুস্থলে পুলিশ বাহিনী তৃতীয় পক্ষ। বেআইনি যুদ্ধে

আইনি ফৌজ। তাণ্ডব মহাতাণ্ডবে সমারোহ পেতে থাকে। ঘনঘন গুলির শব্দ বোমার আওয়াজ বোঝা যায় না আইন বা শৃঙ্খলার নিয়মমাফিক কায়া কোনদিকে। ঘরে ঘরে গৃহবাসীদের জোড়ায় জোড়ায় চক্ষুকর্ণ সতর্ক উন্মুখ। কোথায় কী ঘটছে বা কারুর লাশ পড়ল কিনা, কজন হাসপাতালে জানার কৌতূহলে সকলেই শিশু ভোলানাথ। ঘটনায়-অঘটনে গল্প জমে উঠতে থাকে। পাখির ঠোঁটে ঘর বানানোর খড়কুটো বয়ে আনার মতো বাইরে থেকে ঘরে ফেরে যারা, সকলের কথাবার্তাগুলোও সব সময় এক রকম নয়। অনেক রকমফেরে থাকে। অনেকটাই বাংলা সংবাদপত্রের 'নিজস্ব সংবাদদাতার মতো। মিল শুধু ভয়ানক রসে। সবই সর্বনাশা। ভয় আর আতঙ্কের। মারপিটরক্তারক্তি আর পুলিশের সাতসতের। সব শুনলে ফিচটাকরা সব নিয়ে গলা শুকিয়ে আসে। এসব রোমহর্ষক টিভিতে দেখতে ভালো, লোকের মুখে শুনতেও মন্দ লাগে না। বলির খাঁড়া সত্যি হয়ে ঘাড়ে পড়লেই বিপদ।

দিনের শেষে পাড়ার মেয়ে ঝিমলি যে একই ভাবে প্রতিদিনের নিয়মে রাস্তায় হেঁটে ঘরে ফিরল, রোজকার এই তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ তা সাধারণ একটা ঘটনা যে হঠাৎ-ই এক দুপুরে এত অস্বাভাবিক সমাচার বা অসাধারণ হয়ে উঠল, না, সেখানে কোনো মাফিয়ার গন্ধ নেই। টেলিফোন একটা এসেছিল ঠিকই। এ-খবরটুকুই যা-হোক একমাত্র সত্যি। কিছুমাত্র শোনা-কথা নয়। বেরুবার সময় ঝিমলির ছোটকাকা নিজে বলেছেন। কিন্তু সেটা কোনোভাবেই কিডন্যাপ -কেস নয়। পণবন্দির দাবিও করে নি কেউ কোথাও। টেলিফোনের পর-পরই দুটো গাড়ি বোঝাই হয়ে বাড়ির সবাই ছুটে বেরিয়ে গেছে। গাড়িতে মেয়েরাও ছিল। দুপুরের দিকে পুলিশের গাড়িও একবার দেখা গিয়েছিল বাড়ির দরজায়। থানার বড়বাবু নিজে এসেছিলেন। কী ওদের গোপন কথাবার্তা, কী যে হলো মেয়েটার বলবে কে? পাড়ায় যাদের সঙ্গে ওদের উমেদারি, তারাও নাকি জানেন না। বাড়ির সামনে যা বিশাল ফটক, জবরদস্ত দারোয়ান আর নেকড়ের চেয়েও ভয়ঙ্কর অ্যালসেশিয়ান। এদের টপকে ভেতরে ঢুকবে সাধ্যি কার? ওদের দিকে রাখঢাক নিয়ে কত বেশি বাড়াবাড়ি, বলা বাহুল্য, সেখান থেকেই পাড়াপড়শিদের কানাঘুষোর শুরু। নিতান্তই প্রতিবেশীসুলভ সদাচারে ঘরে ঘরে গেরস্তরা ভরদুপুরে ভাতঘুমের দিবানিদ্রা বা টিভির গল্প বন্ধ রেখে জ্যান্ত গল্পে নিজেদের চেনা চরিত্রের ভালোমন্দে আকুল হতে থাকে। এত কিছু পর ফিসফাসের গুলতানিগুলো এগোতেও পারে না বেশিদূর। ঝিমলি তো এভাবে রোজই কলেজে যায়-আসে পায়ে হেঁটে। আজও গেছে। দেমাকি চালে ফিরেও এসেছে। সবই সবাই দেখেছে।

পয়সাওলা ঘরের কনভেন্টে-পড়া মেয়ে। শরীরস্বাস্থ্যে স্লিম সুঠাম। খুব একটা রূপসী না হলেও দেখতে-খারাপ এমন কথাও বলবে না কেউ। ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পড়ছে। এ-বছরই নাকি ফাইনাল পরীক্ষা। এমন তাজা বয়সের একটি মেয়েকে নিয়ে কী যেন হচ্ছে সব। শেষপর্যন্ত ভালোমন্দ কিছু একটা যদি হয়েই যায়? সেটাও যেন কেমন-কেমন। দেমাকি মেয়ের তেরচা চাহনি আর নিত্যনতুন পোশাকআশাকের ঢঙবাজিতে যত চমকানিই থাক, সকলেরই নজরকাড়া। হাজার হোক, পাড়ারই তো মেয়ে। মাত্র দুই-তিন আগেও যারা পাড়ায় ভাড়া এসেছেন, মিত্তিরবাড়িকে চিনে ফেলেছেন সকলেই। ঝিমলিকে নিয়ে উঁকিঝুঁকি কানাকানি তো সব ঘরেই।

কিন্তু মুশকিল, আজ যদি কোথাও, পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে টিম-ইন্ডিয়ার সঙ্গে অন্য কোনো দেশের ওয়ান-ডে হোক অথবা পুরোপুরি টেস্ট—কোনো রকম ক্রিকেটফিকেট থাকত,

কেচ্ছা নিজের ঘরে বসে শুনতে ভুলতে। দিন গড়ানোর পর পাখিদের নিয়মে ডেরায় ফিরে হাত মুখ ধুয়ে চা-জলখাবারটুকু গিলে নেবারও ফুরসত থাকে না। শুরু হয়ে যায় ঘরে বসে-সবাই মিলে ব্রতকথা শোনার পালা। ধানদুর্বো থাকে না হাতে। কথকঠাকুর গল্প শোনায়, গল্প দেখায়, দেশদুনিয়ার হরেক কিসিমের ভেলকি। চোখ মেলে স্বপ্ন দেখায় মাদকতায় যখন আর পলক নড়ে না, গোটা শরীরটাই আস্তে আস্তে থার্মোমিটার হয়ে উঠতে থাকে এরপর। প্রেমদুখে আতঙ্কে আবেগে রক্তের পারদ ওঠে নামে, ঝাঁকানি খায় ওষুধের শিশি নাড়িয়ে নেবার মতো। মাইনের টাকায় ডি.এ. বাড়ে তো ঘাটতি চড়ে সংসারের খরচায়। বউয়ের সঙ্গে কথা বললেই যদি ঝগড়া, ছেলেমেয়েগুলোও যদি এভাবে বাজারি দরদস্তুরেই বাপ-মাকে মাপে, বাইরের টেনশন থেকে রেহাই পেতে যদি ফেরা, ঘরের সাতঝামেলায় তাকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে হয় বাইরে, সদর অন্দর ফারাক থাকে না। ঘর আর বাইরের বেড়া ভেঙে পড়ে। তৃতীয় আশ্রয় নেই। রক্তচাপ ঊর্ধ্বগতি। উত্তেজনা বাড়ে। কেউ আর আপন নয় কারুর। এপাশে দোকানি, ওপাশে খদ্দের। দোকানি লাভ খোঁজে, অন্যজন সস্তা চায়। কেউ ঠকে, কেউ ঠকিয়ে যায়। তবু যদি মানুষের ওপর নির্ভর রেখে মানুষকে নিয়েই বেঁচে থাকার নিয়ম। তুচ্ছতার গ্লানি বয়ে সবার মধ্যে থাকার ক্রোধ আর যন্ত্রণাগুলো যে-কোনোভাবে নিজের সম্ভ্রম খোঁজে। লোকালয়ে বসবাসে সেই মর্যাদা আদায়ের আর্তনাদ এক প্রবল বিস্ফোরণ চিৎকার আর কোলাহল। তোলা-তোলার জায়গিরদারিতে এলাকা দখলের লড়াইয়ে এ পাড়ার খোঁড়া ল্যাংচা আর ওপাড়ার কানা মদনার বোমাবন্দুক পিস্তলের পৌরুষমহিমায় যদি ভ্রূকুঞ্চন থাকে, তবে সামাজিক বিধি মেনেই সমাজ কল্যাণে দল বেঁধে ক্লাব গড়ে বছরের হরেক পুজোআচ্চায়, রক্তদান শিবিরে, বস্ত্রদানে জলসায় ঘরে ঘরে চাঁদা আদায়ের তোলাবাজিতে বেইমানি থাকে না কোথাও। সবই দেশ আর দশের কাজ, পাড়ার ইজ্জত।

চতুর্দিকে লাইটপোস্টে চোঙা বেঁধে লাউডস্পিকারে গানের তাণ্ডব। পঁয়ষট্টি ডেসিবলকে থোরাই পরোয়া। বিশ্বকাপে টিম-ইন্ডিয়ার প্রতিটি জয়ে, ভাসানের ভক্তি মিছিলে ভোটের বিজয়মিছিলে, লোকনাথবাবার আবির্ভাবতিথিতে, পনেরই আগস্ট স্বাধীনতার দেশপ্রেমে আরো ছুটহাট দিনে কিছু একটা ঘটলেই বেজায় মস্তি। সারা গায়ে আবির মেখে, আবিরের রং ছড়িয়ে ব্যান্ডপার্টি তাসাপার্টি নিদেন ঢাকের বাজনায় খোলা রাস্তায় উদোম গায়ে উদ্দাম নেত্য। মায়ের কারণবারি তো মহাপুণ্যিসুধা। ট্যাঁ-পুঁ করবে, কার ঘাড়ে কটা মাথা? জনগণ প্রসাদঘরে বাঁধা। পার্টির ঝান্ডাই যদি মুস্কিল আসান, দাপট আর দাবড়ানি অবাধ অবাধ।

কিন্তু এমন মস্তির দিন তো আর বছর ভরে রোজই আসে না। ক্রিকেট নেই ফুটবল নেই, পাড়ায় হল্লা বাঁধানোর পুজোপার্বণ নেই, ক্যালেন্ডারে দেশপ্রেমমার্কা লাল দিন নেই, পার্টির ব্রিগেড নেই, মায় পাড়ায় একটা মড়াকান্না অব্দি নেই। এমন একটা নিরিমিষ্যি দিনে কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ, মাথার ওপর তাল পড়ার মতো ঝিমঝিমি এসে পড়ল। পাড়ার মেয়ে বেপাত্তা। এ তো আর টিভির গপপো নয় যে, দেশ জুড়ে সবাই একসঙ্গে দেখবে শুনবে। এ একেবারে পাড়ার এক নম্বরি সরেস স্পেশাল কিস্‌সা। দশগাল করে দশজনকে শোনানোর মতো। কিন্তু কেচ্ছাটা ডিম হয়ে ফুটল তো হানা পয়দা করতে গিয়ে সব গুবলেট। কালোদা নিজেই যদি বলে থাকেন,

টেলিফোনটা জানি কিনা, সে-এক্ষুনি বলতে পারছি না। তবে এ-কোনো হিলোপাটিলোপের ব্যাপার নয়। আরে, তাই তো হবে। সোজা শিরদাঁড়ার সোহারা শরীর। দেখলেই মনে হয় ইউক্যালিপ্‌টাস গাছ। ব্যস্‌ ব্যাস। বুক-চেতানো বলিষ্ঠ মেয়েকে দিনদুপুরে তুলে নিয়ে ট্যাক্সিতে পুরবে, অ্যাতো হিম্মতওয়ালা আদমি কে আছে? কজন? বলিউডি কায়দায় যেটি এমন ঘুষনি বাড়বে যে ছেচল্লিশ ইঞ্চির চারটে-পাঁচটা পিনা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে একেবারে আটলান্টিকের ওপার।

সে-না হয় হলো। মেয়ে-পাকড়ানোর কেসটাই যদি বিগড়ে গেল, তবে যে একটু একটু করে দানা বেঁধে ওঠা গল্পটারও বারোটা বেজে যায়। তাহলে হিতৈষী পাড়াপড়শিরা বুকের আইঢাই নিয়ে করবে কী গোটা দুপুর? ভালোমন্দ যাই হোক, একটা হিল্লে তো হবে কিছু। পাড়ার মেয়ে। টিভিতে পুলিশ-ডায়েরির সিরিয়ালে হরবখত এ-রকম সব থাকে। সব সত্যি কথা। ডবকা বয়সের একটা মেয়ে বেপাত্তা হলে বুঝতে হবে, বজ্জাত মেয়ে নিজেই পালিয়েছে কারুর সঙ্গে। নয়তো কবজায় পড়েছে কোথাও। নির্ঘাত ভিলেন থাকবে একজন। থাকবেই। খুনখারাপি হয় তো গপ্পো জমেই গেল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে, অ্যাম্বুলেন্স আসবে, হাসপাতাল থাকবে। ভিলেন সটকে পড়বে। পালিয়ে যাবে কোথায়? পালিয়ে যাবে কোথায়? পুলিশ আসবে। খোঁজতল্লাশি চলবে, তদন্ত হবে। মিত্তিরবাড়ির ঘরে ঢুকে মস্তানি? কোনো টালবাহানা ঢিলেমি থাকতে পারে না পুলিশি গন্ধ শোঁকায়। কুকুরও শুঁকবে, উর্দিপরা মানুষও শুঁকবে। চুল্লির খুপড়ি কি জুয়ার আখড়া থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনবেই বাছাধনকে। ধ্বজা-ওড়ানো বাড়ির মেয়ে খুন বলেই ধরে নিতে হবে, ডানে-বাঁয়ে সমান তাল রেখে তিনকোণে খেলছিল সোহাগি। শুধু ভিলেন কেন? তাহলে অন্যজনও তো জড়িয়ে যাবে জালে। আর এসব যদি কিছুই না হয়, তবে মেনে নিতেই হবে, মেয়েটা পাশাখেলার দ্রৌপদী। বাপকাকাজ্যাঠাদের পাপে এমন বিচ্ছিরিভাবে গুন্ডার হাতে মরে গেল আবাগি। বাঘের ঘরেই ঘোগের বাসা। কংসরাজের অত যে হম্বিতম্বি, তাঁর মরণ যে তাঁর নিজেরই ভগ্নীর গর্ভে জন্মাল। সেও তো মিথ্যে নয়। হিরের নেকলেস গলায় ঝোলালেই তো হবে না। ওর কলমদানিতেই ডাকাতের হাত। গলাটাই কাটা পড়ে যেতে পারে। আততায়ী নির্ঘাৎ মিত্তিরবাড়িরই ঘুরে-ফিরে মানুষ। সবাই যাকে চেনে জানে। কেউ জানে না—কে?

সত্যি সত্যি কোথায় কী ঘটেছে, সেটাই বা কে জানে। যদি তার বাস্তব ইতিবৃত্ত অন্ধকারেই থেকে যায়, তবে বিজ্ঞানের যা নিয়ম—শূন্যতা থাকতে পারে না সচল মস্তিষ্কে এবং সম্মিলিত মানুষের জল্পনা কল্পনায় গাড়িয়ে এক তীব্রগতি দুর্বার মহাকাশযান। ধূম্রপুচ্ছে বিপুল মেঘপ্রান্তর ছড়িয়ে নভযাত্রার ভূপৃষ্ঠে শুধুই ধোঁয়া, ঘনকৃষ্ণ ধোঁয়ার কুয়াশা। বিড়িসিগ্রেটের ধোঁয়া, পানজর্দার সুবাস, জনগুঞ্জনের তক্কাতক্কি হ্যাচিংকার সবজান্তা-ক্যারেটে কসরতে ফুরেসের নিঃস্বতা নেই, কম্পিউটার অপারেশন বাতুলতা। নাসা নেই ক্যামেরা নেই ওয়েরারলেস নেই। শুধুই ধূম্রছায়া। যুক্তি-অযুক্তি-কুযুক্তি বাস্তব-অবাস্তব-পরাবাস্তব, সম্ভব-অসম্ভবের রসায়নে লোককল্পনা মানুষের চেনা আকাশ ছেড়ে মহাকাশ চিরে চিরে শূন্যতার পর শূন্যতা পেরিয়ে হয়তো বা স্বর্গেই পৌঁছে যেতে পারে। যথাযথ মর্যাদায় ঝিমলিকে স্বর্গে অধিষ্ঠিত রেখে নিজেদের প্রত্যাবর্তনে নতুন করে ভূমিষ্ঠ হতে বেলা পড়ে যায়। ক্লান্তিও অগাধ। তাছাড়া এসব পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মে দুঃখযন্ত্রণা তো থাকবেই কিছু। হাজার হোক পাড়ার মেয়ে এবং ইত্যাকার সেবাধর্মে পাড়ার সুধী পড়শিজন।

যাবে আর পাঁচ পাবলিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে। কেড়ালের বাচ্চাও আর কিছু না পারুক, একটু কিউটমিউ করবে না?'

কিংবা বাঁদিক থেকে অন্য একজন আরো দাবড়ানিতে—'টেলিফোন এসেছিল। কীসের টেলিফোন? কে করেছিল? কী বললে? ওসব কাঁটবাজি কথা। নিজের ঘরের কেচ্ছা নিয়ে কেউ বাজারে ঢাক পিটিয়ে বেড়ায়? দেখুন গে কোন নিমকিবাজিতে ছুঁড়ি নিজেই ফেঁসে গিয়ে...'

'না না বাবা, এই যে শুনলুম ওদের বাড়ি পুলিশের গাড়ি এসেছিল। ও.সি. নিজে ছিলেন।'

'পুলিশ? পুলিশ ওদের বাড়ি যাবে না তো আপনাদের মতো সাধুবাবাদের আখরায় কেত্তন গাইতে যাবেন? মিত্তিরদের কেবিসি জানেন?'

কেবিসি? সেটা কী বস্তু? ভালো কিছু নাকি খারাপ? বিশ্ববিদ্যালয়ের একদা অধ্যাপক, অধুনা প্রাক্তন, বিহ্বল বিহ্বল চোখে তাকালেন এদিকে ওদিক। কীভাবে কী করেই যেন চক্রাকার সেনাবিন্যাসে ঢুকে পড়েছিলেন। নিষ্ক্রমণের মন্ত্র জানেন না। অথচ তাঁকেই তাক করে পাড়ারই চেনামুখের এক ছোকরা—'কবং মাদদার পার্টি মেসোমশাই। সে-আপনি বাপের জন্মে ভাবতে পারবেন না। কলকাতা শহরে তিন জায়গায় বাদশাহি তিনটে জুয়েলারি শপ। গড়েহাট, বৌবাজার আর উল্টোডাঙার কী জানি সল্টলেকের মুখে কী ঝাঁ-চকচক দোকান মেসোমশাই, দেখলে চোখ টেঁকিয়ে যাবে। সোনা...যেদিকে তাকাবেন শুধু সোনা। দিনদুপুরে আলোগুলো জ্বলছে, মনে হবে, হিরেমুক্তো চমকাচ্ছে চারদিকে। তিন ভাই তিন দোকানে বাঘের চোখ নিয়ে বসে আছে। পকেটে কেশ কয়েক বান্ডিল ভালো মালকড়ি থাকে ত ভেতরে ঢুকতে পারবেন। নইলে বন্দুমার্কা যে লোকটা বন্দুক নিয়ে বাইরে বসে আছে না? দেখলেই পেটের পিলে মাথায় উঠে নাচবে।'

'ওদের ঘরের ঝাড়ুদারগুলোও...জানেন ও দাদু, রোজ সকালবেলা ঘর ঝাড় দিয়ে ধুলোগুলো কোঁচড়ে ভরে নিয়ে যায়। ঘরে গিয়ে শেরেফ ধুলো ঝেড়েই নাকি বছরে দু-পাঁচ ভরি সোনা পেয়ে যায় মুফতে। ওফ্, কী কপাল নিয়ে ঝাড়ুদার হয়ে জন্মেছিল মুখ্যুগুলো....'

নিরস্ত্র যুবকদেরও সৈন্যসামন্ত বলে ভুল হচ্ছিল তাঁর। গায়ে হাত দেয় নি কেউ। কোথাও কোনো অসম্মানও ছিল না সেভাবে। হয়তো বা চেনামুখ কেউ। অচেনাদের ভিড়ে তাঁর ছাত্ররা কেউ নেই। ডানে বাঁয়ে কী যেন সব বকে যাচ্ছে ওরা। অধ্যাপক বিদ্ধ হচ্ছিলেন। সর্বদেহে তিতিবিরক্ত হয়ে ক্লান্ত ঘর্মাক্ত। বিধ্বস্ত বৃদ্ধ ব্যূহ ভেদ করে পালাতে চাইছেন না। দুপাশের মানুষকে ঠেলেঠুলে এগিয়েও এসেছেন অনেকটা এবং তখনও পেছন থেকে—'আপনার কেবিসিও তো কিছু কম নয় দাদু....'

থমকে গেলেন বৃদ্ধ। ছিঃ ছিঃ ওরা এভাবে এসব নোংরা ইতর ব্যাপারে তাঁকে টানছে কেন?"

'আপনি আর দিদিমা কোথায় কী মাস্টারি করতেন। দুজনই পেনশনের লম্বা চেক বাগাচ্ছেন মাসে মাসে....'

কিছুমাত্র মিথ্যে নয়। দুহাতে প্রাণপণে ভিড় ঠেলছেন অধ্যাপক। অসভ্যের মতো দুপাশে হাসছে লোকগুলো। পেছনে তাড়া।

'ইন্দ্রনীলদা কোথায় কোন্ মুলুকে লন্ডনে না আমেরিকা থাকেন। ইউরো না ডলার কামাচ্ছেন খাবলা খাবলা...'

সত্যি। সবই সত্য কথা। হাঁপাচ্ছেন অধ্যাপক। ঠেলেঠুলে পালাচ্ছেন প্রাণ নিয়ে। আগে তো বাঁচা।

'কল্পনাদির বিয়ে হলো, মনে হয়, এই তো সেদিন। বিয়েবাড়ি ভাড়া করে সানাই বাজিয়ে কী জম্পেশ বিয়ে। নেমন্তন্ন পাই নি। হলে কী হবে? পাড়ায় তো থাকি। সবার সব জানি। সব দেখি। গাড়ি হাঁকিয়ে জামাইবাবু প্রায়ই তো আসেন বউ-ছেলেকে নিয়ে। য়া...জম্পুরুর। কি শালা। অমন দু-পাঁচ লাখ রুপেয়া তো হাতের ময়লা...'

দুর্যোগ আর দুর্ভোগের বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন বৃদ্ধ। তথাপি রেহাই নেই। সর্বাঙ্গে ঘামছেন। হাঁপে নিশ্বাসে দাঁড়াতে পারছেন না স্থিরতায়। দুঃস্বপ্নের তাড়া। জীবনে ভুল হয়তো করেছেন অনেক। এতটা অনুতপ্ত হবার মতো কোনো অন্যায়, মনে তো হয় না, করেছেন কোনোদিন। নিরপরাধও কী অপরাধ মানুষের?

ভিড়ভাট্টার বাইরে পাড়ার আরো সব লোকজন ছিলেন অনেকেই। সকলেই এগিয়ে এলেন—'আপনি এরকম করছেন কেন চৌধুরীমশাই? শরীর...শরীর খারাপ? কী হয়েছে?'

'কে.বি.সি. কী? জানেন?'

ভদ্রজনরা দিশেহারা—'কী বলছেন? কী হলো?'

বেয়াড়া ধরনের কেউ একজন ছিলেন। একেবারে সোজাসুজি—'আপনার কী মাথাটাথা একদম গেছে নাকি দাদা? পাড়ার যত উল্টোপাল্টা নচ্ছারবজ্জাতগুলোর সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিলেন? এখন বুঝেছেন কেন, কী বলেছে ওরা?'

কোনোদিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই বৃদ্ধের। সুধী ব্যক্তিদের প্রতি অভদ্রতাই কিছুটা। ঘরের দিকে ফেরার পথে বাইলেনের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল জনাকয়েক কলেজ পড়ুয়া ছেলে। দ্রুত এগিয়ে গেলেন ওদের দিকেই—'কে বি সি কাকে বলে? জানো?'

ছেলেরা হাসছে—'হঠাৎ আপনি? আপনি এসব শুনলেন কোথায়?'

'আঃ বলো না, জানো কিছু?'

'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি...' বলেই ফেলল একজন।

'মানে? তার মানে কী?'

'সেই যে অমিতাভ বচ্চন টিভিতে সিরিয়াল করতেন না একটা? খুব পপুলার হয়েছিল সিরিয়ালটা। শুধু প্রশ্নের পর প্রশ্ন। অবিশ্যি অপশন থাকত। ঠিক মতো উত্তর দিতে পারলে দশ হাজার পঁচিশ হাজার থেকে লাফাতে লাফাতে এক লাখ দেড় লাখ পেরিয়ে একেবারে এক কোটি টাকার চেক.....'

'কোটিপতি হয়েছে কজন?'

'কোটি টাকার প্রশ্ন। সে-কী সোজা কথা?' তিনজন যুবকই একসঙ্গে—'আমরাই কী শুনেছি নাকি রোজ? মাঝে মাঝে দেখেছি।'

'কী রকম প্রশ্ন? দু-চারটে শুনি...'

'সে-কিছুই আর মনে আছে নাকি? হিস্ট্রি জিয়োগ্রাফি সায়েন্স ফিল্ম স্পোর্টস জ্ঞানভাণ্ডারের কী নেই? মায় কস্‌মেটিক্স পর্যন্ত। একটা আস্ত এনসাইক্লোপিডিয়া মুখস্ত রাখতে হবে। কম্পিউটারের এনকার্টা খুললে যেমন।'

কোটিপতি হতে পারল না কেউ, শেষে এই কেবিসিতে এসে দাঁড়াল?'

ছেলেরা হাসছে। হাইকোর্টের পুরনো অ্যাডভোকেট খেঁকুড়ে বৃদ্ধ গোবিন্দ সান্যাল তেড়েফুঁড়ে উঠলেন—'আপনাকেও বলিহারি চৌধুরীমশাই, কাজকম্মো নেই আপনিও গিয়ে কতগুলো হুলিগানদের বোঝাতে গিয়েছিলেন? কী বলছিলেন? পোলিটিক্স?'

'গোটা জীবনভর মাস্টারি করার এই এক ঝামেলা, বুঝলেন মাই লর্ড....' ঘড়িতে দুপুর দেড়টা। ঘরমুখো ফিরছিলেন বৃদ্ধেরা। পুরনো ইঞ্জিনিয়ার বিকাশ মুখুজ্জে হাসতে হাসতে হঠাৎ-ই অন্য সুরে—'হুলিগান বলে এড়িয়ে গেলেও তো চলবে না এখন আর। এরা তো আমার আপনার ঘরেই ছেলে দাদা। তিরিশ-বত্রিশ বয়স হয়ে গেল, কোনো কাজকাম তো দূরের কথা, আমি-আপনি তো ডেকে দুটো কথাও বলি না কোনোদি। ডক্ক্যনোজ অব অ্যাংগার। কার্বাঙ্কল জানেন? একটা ফোঁড়ার অনেকগুলো মুখ। অসহ্য যন্ত্রণা। এখন যে আমাদেরই কোটিপতি ভাবতে শুরু করেছে মশাই। পালাবেন কোথায়?'

হীনবল অধ্যাপক চৌধুরীও হাঁটছিলেন মন্থর শিথিল পায়ে পায়ে—'হ্যাঁ, ঠিকই বলছেন বিকাশবাবু। আপনাদের ক্লাশফাস শ্রেণীচেতনা ফেতনা কী যেন সব বলতেন এক সময়? এখন তো ওসব সবই লোপাট। এখন শ্রেণীঈর্ষা। কাঁড়িকাড়ি নোটের বান্ডিলই মানুষের মুখ।

বেলা প্রায় দুটো নাগাদ ভিড়ের জমাট আলগা হতে শুরু করেছিল। আড়াইটা-তিনটের পর গোটা পাড়া অদ্ভুত শুনশান। অনেকটাই শ্মশান থেকে ফিরে লোহা আগুন ছুঁয়ে নিমপাতা দাঁতে ঠেকিয়ে ঘরে ঢোকার মতো। জ্যান্ত সিরিয়ালটা শেষ অব্দি মাঠে মারা গেল। রোজকার মতো স্নান খাওয়া সেরে ঘর ছেড়ে বেরিয়েও বিমলিকাণ্ডে যাদের আপিস-যাওয়া হয় নি, সকলেই খামোকা একটা ছুটে ভগায় গেল জেনেও ফিরে বিছানাবালিশ আঁকড়ে ধরলেন দিব্যি খোশ মেজাজে। টিভির পর্দা কালো শ্লেটের মতো লো-ই থেকে যায়। ভরদুপুরে সিরিয়াল নেই। থাকলেও আধখ্যাঁচড়া। ক্রিকেট নেই ফুটবল নেই টেনিস নেই। রান্নাবান্না, রূপচর্চা, শরীর রক্ষার জ্ঞান। কলতু আজেবাজে সব। ঘরে ঘরে অস্থির মেয়েরা। দোতলার রেলিং বুক চেপে বাড়ির বউ ও বাড়ির গিন্নিদের সঙ্গে অথবা রাস্তা টপকে এঘর-ওঘর করে পাড়ার মা-মাসিরা ভিড় করে ভেঙে পড়লেন কোথাও—'এমন সোমত্ত বয়সের মেয়ে গো। রাস্তায় গাড়িচাপা বাসচাপা অ্যাকসিডেন্টে পড়ে মরে যায়, বরং ভালো। অনেক ভালো। কিন্তু এমনটা বেহদিশ হয়ে গেলে....ও মাগো, সে-তো ভাবতেই পারছি না। কোথায় যাবে, কোন্ শ্যালশকুনিতে ছিঁড়ে খাবে....ওফ্ এমনটা যেন না হয় ভগবান্....'মেয়েমানুষের শরীরটা যদি নিজেদেরই শরীর, চোখে আঁচল চাপলেন অনেকেই। যেন অন্য রকমের মা হয়ে উঠলেন আবেগে উদ্বেগে।

অবিশ্যি আরেক ধরনের তর্ক শোনা গেল গোটাকয়েক ভেতরবাড়ি—'হয় গ হয়, ট্যাকার গুমর দেখালে এমনটাই হয়। কচি খুকি ত নয় বাপু, ডবকা বয়েসে বুকপাছা নাচিয়ে মন্দাই সেজে বেড়াবে ত রাস্তার মন্দাইগুলান করবে কী? বলবে না আকথা কুকথা?'

'মেমরি ত কারুর ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মেছে গ। কারুর মেয়ে হবে, কারুর বোন হবে, কারুর মা হবে। সে-নয়। কারুর মেয়ে নয়, কারুর বোন নয়, কারুর বউ নয়, কারুর মা নয়। ভালোবাসাবাসি করে বিয়ে হবে ত দিন সাতেকের মজা লুটে সব ছাড়ানছুড়ান দিয়ে চলে আসবে। তা'হলে হবেটা কী ওদের? এমনটাই হবে। মরবে....'

নায়িকারা মরে না কখনও। মরলে ভিলেন থেকে যায়। ভ্যান্ত সিরিয়ালেও গল্পের ছকটা উলটোপাল্টা হয় না কিছু।

পুরোপুরি বিকেল হবার আগেই, বেলা প্রায় সাড়ে তিনটে চারটের সময় ঝিমলি নামের সেই মেয়ে যথারীতি ঢ্যাঙা শরীরে সোজা থেকে কানে হাওয়াই ফোন চেপে একা-একাই কীসব বকতে বকতে বুক চিতিয়ে হেঁটে গেল। চোখ মেলে দেখল সবাই। কারুরই কোনো ভুল ছিল না। ভূত নয়, সত্যি-সত্যি মিস্তিরবাড়ির ঝিমলি।

অলক্ষুণে ভাইরাসের মতো হাওয়ায় হাওয়ায় খবরটা চারিয়ে যায় চারদিকে। ঘরে ঘরে মেয়েরা কানে কানে গুজনে খবরটা শুনেই ছোট বড় সকলেই তড়িঘড়ি ছুটে এল। ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজায় জানলায় বারান্দায়। নানা রকমের পুরুষ মানুষরা রাস্তায় নেমে মেতে উঠল সম্ভব অসম্ভবের নতুন গুলতানিতে। এ-আরেক ঝামেলা। চোখে দেখা ঝিমলি যদি সত্যি সত্যি ঝিমলিই হয়, ঝিমলি মরে যায়। সিরিয়ালটা ভূতের গপপো হয়ে ওঠে। বিশ্বাসই করবে না কেউ। চোখের দেখা যদি সত্যি হয়, অর্থাৎ যারা দেখেছেন তাঁদের দেখা যদি ভুল না হয়, তবে ঝিমলি বেঁচে থাকে। সিরিয়ালটা মার খায়। ঝিমলি ফিরে এলে পাড়ার লোকের কী লাভ? ওই ঢ্যাম মেয়ে তো এদিক-ওদিক তাকায়ই না কোনোদিকে। মানুষ বলে গ্রাহ্যিই করে না কাউকে। কিন্তু সিরিয়াল তো আর মাস্তানর পার্টির চোরাই মাল নয়। পাঁচ-পাবলিকের খোরাকি চাল। সবার ঘরে ঘরে। সবাই সমান ভাগ পায়।

ঝিমলি, বরবাদ। শেষ অব্দি ভ্যান্ত সিরিয়ালই অদ্ভুত জমে গেল। কেননা, ভিলেন এসে গেছে।

মেয়েটা ঘরে ফিরে নেপথ্যে চলে যাবার পর মিনিট কয়েকের মধ্যে পুলিশের গাড়ি নিয়ে মিস্তিরদের দুটো গাড়ি আশ্চয্যি, গাড়িগুলো সোজা মিস্তিরবাড়ি না গিয়ে বেঁকে গেল ডানদিকের রাস্তাটায়। এবং এসব ক্ষেত্রে যা হয়, ভিড়ের জটলা ছুটল পিছু পিছু। পুলিশ মানেই পাড়ার দুর্গন্ধ আছে কোথাও। পাড়ার মানুষ জানে না। পুলিশ জেনে গেছে। নির্ঘাৎ কোনো ভিলেন। মানুষের পুলিশ না পারে, পুলিশের কুকুর গন্ধ শুঁকে শুঁকে টেনেহিঁচড়ে বের করবে দুশমনকে।

অবাক কাণ্ড। গাড়িগুলো এসে থামল 'বিবিক্ত' ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে। 'বিবিক্ত' মানে কী, জানে কেউ কেউ। কারুর বাড়ি বাংলা অভিধান নেই। বাচ্চারা ইশকুলে কলেজে মাস্টারমশাইদের জিজ্ঞেস করবে, উৎসাহই নেই কারুর। মানে জানা থাক বা না-ই থাক, বিবিক্ততে বিরক্ত নয় কেউ। সবাই জানে, এটা ভদ্দরলোকদের বাস। চারটে আলাদা আলাদা বিল্ডিং নিয়ে মস্ত ফ্ল্যাট বাড়ি। ফ্ল্যাটের খোপে খোপে সবাই নাকি বড় বড় পণ্ডিত-মানুষ—কলেজের প্রফেসর প্রিন্সিপাল, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অ্যাডভোকেট আরো কত কী। পাড়ার সাতঝঞ্ঝাটে কেউ নেই। বাংলা মিডিয়াম আর ইংলিশ মিডিয়ামে ওদের নিজেদের ঝঞ্ঝাট। বাংলা মিডিয়াম চেনা যায়, ঘরে

ঘরে সকাল-সন্ধের রবীন্দ্রসঙ্গীত। নিজেদের গলায় নয়তো সি.ডি.তে। মুনিয়ার মস্ত মস্ত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায়, বাজারের থলে হাতে রাস্তায় দেখা যায় না কাউকেই।

এদের ঘরে পুলিশ? এ-রকম বেখাপ্পা জায়গায় মিত্তিরবাবুরাই বা ঢুকতে যাবেন কেন? পুতুলনাচের সুতো কে কোথায় কোন বিধাতা কীভাবে খেলাচ্ছেন, জানে না কেউ। তাজ্জব সব ব্যাপার-স্যাপারে জনতা দোল খায়। আরো গোলমেলে—কিছুক্ষণ বাদেই কাউকে সঙ্গে না নিয়ে গোমড়া মুখে বেরিয়ে এলেন মিত্তিরবাবুরা। চার-চারটে পুলিশ নিয়ে বড়বাবু সঙ্গে ছিলেন। লোহালক্করমার্কা লোকগুলো কেউ কথা বলছে না। সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। শুধুমাত্র রাজামশাই, অন্তত নিজেকে তিনি হয়তো এ-রকমই কিছু মনে করেন, কী ভেবে ভিড়ভাট্টার মধ্যেই মিশে রইলেন—'ছাড়ব না, আমি ছাড়ব না হারামিকে। ভালো ছেলে? এমন প্রফেসর ইঞ্জিনিয়ার কয়েক ডজন ভালো ছেলে আমার শালা জুতো সাফ করে। মিত্তিরবাড়ির মেয়েকে নিয়ে রংবাজি শালা? ও-পুলিশফুলিশ মানি না। শুয়োরের বাচ্চাকে হাতের কাছে পাই একবার। পাড়ার রাস্তায় ফেলে সবার সামনে লাথাব, চাবকাব শালাকে....'

বাঘাপালার দুঃশাসনি গলাবাজিতে যেভাবে গদা ঘুরিয়ে যাচ্ছেন, দুহাতের দশ আঙুলে গোটা সাত-আট চুনিপান্না-হিরেমুক্তো ঝলকাচ্ছে খামোকা। ওদের টাকার গরম সবাই জানে। ব্যাঙ্কের সুদে টাকার মেদ বাড়ে তো পয়সার গরমে মানুষেরও যে এই হাল হয়, ভয়ঙ্করে, হতবাক জনতা সরে সরে যায়। মানুষটা এক্ষুনি জাপটে ধরে ফেলা উচিত। এমন দিশেহারা লাফালাফিতে মেদল শরীরটা ধ্বসে পড়বে এক্ষুনি। নির্ঘাৎ হার্ট স্ট্রোক। কিন্তু প্রজাস্বত্বে বাঁধা প্রতিবেশীরা এগোয় না কেউ। হিম্মতই নেই কারুর। বাঘ মরলেও নাকি ছুঁতে নেই। হঠাৎ লাফিয়ে উঠতে পারে।

অথবা খবরটা চাউর হয়ে যাবার পর পাড়ার ঘরে ঘরে রীতিমত অবিশ্বাসের স্তব্ধ বিস্ময়। বিজু ইভ্‌টিজার? বিজু করেছে এত সব নোংরা কাজ? অসম্ভব। ভদ্দর লোকদের ফ্ল্যাটবাড়িতে ও-ই তো একমাত্র ছেলে যে অনায়াসে পাড়ার রাস্তায় নানা ধরনের ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারে। এমন কি, পাড়ার মোড়ে বাদলার চায়ের দোকানের শুলতানিতেও ওকে দেখা যায় মাঝে মাঝে। ছুটিছাটা দিনে বাচ্চাদের সঙ্গে ওকে ইটের উইকেটে ক্রিকেট খেলতেও দেখা গেছে কোনো কোনো দিন। সবার সঙ্গেই আছে। কিন্তু পুরোপুরি মিশে যায় না কোথাও। কেমন আলগা আলগা। পাড়ার-বেপাড়ার কলেজ-ইউনিভার্সিটির বড় বড় ছেলেরা, এমন কি মেয়েরাও নাকি বিনে-মাইনের মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়াশুনোর তালিম নিতে যায়। তাই তো হবে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভালো রেজাল্ট করে কোথায় যেন টেকনিকাল কলেজে পড়ায়। হাজার হাজার টাকা মাইনে। দেখতে শুনতে ভালো। শরীর স্বাস্থ্যও এমন খারাপ কিছু নয়। দূর থেকে পাড়ার মেয়েরা দেখে। যাঁদের মেয়ে আছে, তাঁদের গোপন ইচ্ছেগুলো বনে-জঙ্গলে আগাছা হয়েই বাঁচে।

এবং সন্ধের পর সব জানাজানি হয়ে গেলে পাড়ায় এমন কথাও তো উঠল এখানে-ওখানে আড়ালে ফিসফাসে। আসলে ঝিমলির সঙ্গেই ওই ছেলেটার গড়বড় নেই তো কিছু? দিনভর যা ঘটেছে যেভাবে ঘটেছে সবই ওই মেয়েটার সঙ্গে সাট করে। তাই তো হবে। ওই যে গো, কথায় বলে না—'মূর্খরাও কিনে নেয় পণ্ডিতের মাথা, বাদবাকিরা করবে কী আর যদি না থাকে টাকা।'

এমন সব কথা-চালাচালি চলতেই পারে। চলছেও। কিন্তু ইত্যাকার বিষয়ে 'হ্যাঁ' বা 'না'-এর মধ্যে মাথা দুলিয়ে টস করার বিপদ এই যে, ঘটনাগুলো কোথায় কখন কীভাবে কী ঘটেছে কিছুই জানা নেই। ব্যাকরণ জানা না থাকলে 'ন' এবং 'ন'-র যথাযথ প্রয়োগে সমস্যা যেমন। ঘটনাক্রম নিম্নরূপ :

ক. বেলা প্রায় দশটা চল্লিশ মিনিটে মিস্তিরবাড়িতে একটি টেলিফোন আসে। ঝিমলির মেজকাকিমা শুনলেন, একটি ছেলের গলা। ছেলেটি নাম বলল—বিজু। অন্য কী কারণে সে রুবি হাসপাতালে এসেছিল। বেরুবার সময় ওর চোখে পড়ল, বাইপাশে কী এক বাস দুর্ঘটনায় আহত অসহায় মানুষকে নিয়ে স্টেচারে নিয়ে এমার্জেন্সিতে ঢুকছিল। একটি স্টেচারে, সে স্পষ্ট দেখেছে রক্তাক্ত ঝিমলি।

খ. মিস্তিরবাড়িতে কান্নাকাটির তালগোল। তিনদিকে তিনটি দোকানে টেলিফোন। মিস্তিরবাবুরা দোকান বন্ধ রেখে তড়িঘড়ি চলে এলেন। ঘরে মেয়েদের নিয়ে তিনটি গাড়ি দ্রুত বেরিয়ে গেল। হাসপাতালে গিয়ে শুনলেন—'সকাল থেকে এ-রকম কোনো ঘটনার কথা হাসপাতালের জানা নেই। দীপান্বিতা নামের কোনো পেশেন্ট এখানে কোনো সেকশনেই কেউ নেই।'

গ. উদ্বেগ বাড়ে। মেয়েকে স্বচক্ষে দেখে যাবেন বলে বড়বউর আর্তি। নইলে তিনি গোটা দুপুর ঘরেও তিষ্ঠোতে পারবেন। গাড়িগুলো ছুটল ঝিমলির কলেজের দিকে। সব শুনে প্রিন্সিপাল নিজেও বিচলিত। রুটিন দেখে নির্দিষ্ট ক্লাশে দীপান্বিতা মিত্রের খোঁজ নিতে লোক পাঠালেন। ঝিমলি এসে সবাইকে একসঙ্গে দেখে অবাক এবং সব শুনে—'আনবিলিভেবল কেউ। ডোন্ট ওরি। তোমরা যাও। কলেজ ছুটির পর আমি যেমন যাই, যাব।'

ছোটকাকার হুকুম—'না, তোমার জন্যে গাড়ি আসবে। গাড়িতে যাবে।'

মেয়ের গোঁ—'ইমপসিব্‌ল্। আই কেয়ার নান্।'

ঘ.মেয়েদের ঘরে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হলো। মেজমিস্তির টেলিফোনে ধরলেন চেনাজানা একজন ডাকসাইটে পুলিশ অফিসারকে। গাড়ি ছুটল। বিজুর কাজকর্ম কী, কোথায় কাজ সবই যোগাড়যন্তর করে এনেছেন কালাচাঁদ, ওরফে কালু মিস্তির।

প্রিন্সিপাল ধৈর্য নিয়ে শুনলেন কিছুক্ষণ। তারপরই বেশ কঠিন গলায়—'আপনার অলরেডি যা বলেছেন ডেরগেটরি টু দ্য ডিগ্‌নিটি অ্যান্ড রেপুটেশন অব দ্য টিচার কনসার্নড অ্যান্ড দ্য ইনিস্টটুশন হি ইজ অ্যাটাচড উইথ...'

অ্যাটেন্ডেন্স খাতা অরি রোজকার রুটিন আনালেন—'আপনারা বলছেন দশটা চল্লিশে টেলিফোনটা আপনাদের বাড়িতে গিয়েছিল। এখানে দেখুন, উনি দশটায় কলেজে এসেছেন মধ্যে উনি তিনটি ক্লাশ নিয়েছেন। তখন তিনটে দশ। এখন আরো আরো একটি ক্লাশে আছেন।'

কিছুক্ষণ পরে অধ্যাপক বিজন আচার্য মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। যথেষ্ট নম্রতায়—'পাড়ায় বিজু বলে আর কোনো ছেলে আছে কিনা, আপনারা নিশ্চিত করে বলতে পারেন? কিংবা আপনারা সত্যি করে বিশ্বাস করেন, এ-রকম একটা ইতর কাজ আমি করেছি, করতে পারি? আপনারা আমরা গলার স্বর চেনেন? প্রমাণ করতে পারবেন?'

লাটাইয়ের সুতো আর বেশিদূর ছাড়ল না কোনো পক্ষই। খুবই ভদ্রভাবে মোবাইল ফোনটা চাইলেন পুলিশ অফিসার। হাতে নিয়ে একবার দেখলেন এপাশ ওপাশ। শান্তভাবে পুরলেন—'এটা রইল। সন্ধেবেলা পেয়ে যাবেন। বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে।'

স্কু. ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে এল বিকেল নাগাদ। বাসের ভিড়ে বা পায়ে হাঁটায় মিত্তিরদের দোকানের দুই পালোয়ানি চেহারায় দুই দারোয়ান মুকেশ সিং আর রতন বাহাদুর সাদাসিধে প্যান্ট জামায় কয়েক মিটার পিছু পিছু কর্তব্যে অবিচল ছিল। দীপান্বিতা মিত্র ওরফে ঝিমলি বোধ হয় সেটা নিজেও জানত না।

ঘুমে বা আলসেমিতে গোটা শহর নিঝুম হয়ে এলে মোটামুটি জনশূন্যতার খানিকটা ঘুরপথে ঘুরে। ক্লান্ত পায়ে অনেক রাতে, রাত প্রায় সাড়ে বারোটায় ঘরে ফিরল বিজন। বাড়িতে বলাই ছিল, বিকেলে র‍্যালি আছে কলেজ স্কোয়ারে। তারপর মিছিলে এসপ্লানেড। কিন্তু সব রকম হিসেবের পরও রাতটা একটু বেশিই। বাইরে সদর দরজায় ছোট ভাই, এম.বি.বি.এস ছাত্র সুজন দাঁড়িয়ে ছিল। মুখোমুখি চোখে চোখ পড়ল। কথা হলো না কিছু।

ঘরে ঢুকতেই মা ঝাঁপিয়ে এসে পড়লেন বুকে—'বাবা ফিরেছিস?'

অদূরেই বাবা শান্ত গম্ভীর। পাথর।

একটা চেয়ারে বসে পায়ের জুতো খুলছিল বিজন। কিন্তু কিছুমাত্র কালক্ষেপ নয়। প্রস্তরমূর্তি নীরবতা ভাঙলেন—'কী কেন সব হয়েছে। মিত্তিরদের বাড়িতে তুই টেলিফোন করেছিলি?'

'হ্যাঁ, করেছি তো।'

'কেন?'

'কেন কী? তোমাদের এই ফ্ল্যাটবাড়ি তো পাড়ার ইজ্জতবাড়ি। এলিটদের তো দেখছি রোজ। ভয়ে কাঁপি। পাছে আমাকেও কেউ বুদ্ধিজীবী বলে? পাড়ার সাত রকমের সব মানুষকে আমি চিনি। পচা গলা মজে-যাওয়া এই মর্গের মধ্যে থাকতে থাকতে আমরা নিজেরাই যে দম আটকে মরে যাচ্ছি। এত ভয় নিয়ে বেঁচে থাকার মানে কী? কেন বলবে না কেউ? কাকে ভয়? ভালো মানুষ হয়ে থাকাই বা কেন? কেউ তো ভালোমানুষ নয়....'

'তাই বলে,এত নোংরা, বিচ্ছিরি কাজ তুই সত্যি করেছিস?' শান্ত নির্বোধ মা হঠাৎ কান্নায়—'বিজু তুই....'

'ওই ভালো ছেলে হয়ে থাকার বন্দীদশা থেকে এবার একটু রেহাই দাও মা। প্লিজ....' বিজন থামল। শরীরটা বড় ক্লান্ত। কিঞ্চিৎ দম নিয়ে—'পুকুরটা অনেককাল বড় নিস্তরঙ্গ ছিল। একটা ঢিল ছুঁড়ে দেখলাম কাঁপে কিনা। শুনেছি, ঢিল একটা জলচুড়ির ঢেউ গোল হয়ে কেঁপেছে গোটা দুপুর। যা-হোক একটু কাঁপল তো....'

'পুলিশ তোমার সেলফোনটা দিয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে। কিছু হবে না। কোনো ভাবনা নেই।' জুতো জোড়া যথাস্থানে রেখে বিজন ভেতরের ঘরে চলে গেল।

# একটু মাটি চাই একটু আগুন চাই

## জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে টিপটিপ। কখনও আবার ঝমঝম করে। কদিন ধরেই হচ্ছে। মাঝেমাঝে থেমেওছে কিছুক্ষণের জন্যে। দিনে বা রাত্রে। তখন আকাশ যেন দম নিয়েছে। তখন বাতাস দেয় নি। বাতাসও যেন দম নিয়েছে। তারপর আবার বৃষ্টি, টিপটিপ টিপটিপ। ঝমঝম ঝমঝম। তখন আবার বাতাস দিয়েছে। কখনও মন্দগতি, শ শ্‌শ শ্‌ কখনও ঝড়ের দাপটে, দিনে এবং রাত্রে। সে দাপট টের পাওয়া যায় গাছের ডালে। বাড়ির সামনে দুটি পেয়ারা গাছ আছে। পেছনে আছে আমগাছ। সেটি বড়। আব্বুজানের হাতে লাগানো। তার গায়েই ঝড় লাগে বেশি। সে কাঁপে বেশি। ফোলে বেশি। মনে হয় যেন ভেঙে যাবে, পড়ে যাবে। কিন্তু পড়ে না। আব্বাজানের নিজের হাতে লাগানো। সে হাতের কদর কত!

সঙ্গে ব্যাঙের ডাক, সমবেত, ক্রমাগত। বাড়ির দশ দিক থেকেই যেন ডাকছে ব্যাঙ। জল জমেছে আট পাশেই। আরও জমছে। জলের ওপর জল ঝরছে ক্রমাগত, আকাশ থেকে।

শুধু পাশ থেকে নয়, আওয়াজ আসে ওপর থেকেও। মাথার ওপর বাজনা বাজে, টিনের চালে। বৃষ্টি যেমন তেমনই বাজে। তালে তালে। গত বছর বর্ষার আগে বাদল নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লাগিয়েছিল টিন। খড়ের চাল নামিয়ে দিয়ে। সে চাল কে নিয়ে গেল? নকুল কাকা? আফজল চাচা? আব্বাজানের বন্ধু ছিল দু'জনেই। ভাগ করেই নিয়েছিল হয়ত।

দান কইরে দিলে যে বড়!

ছি, ছি, দান বলো না। ওঁনারা গুরুজন, গাঁয়ের মাত্‌বর। ওঁনাদের কি দান করা যায়?

বেশ কথা, কিন্তু দিলে ক্যান?

ও দিয়ে তুমি কী করবা? তুমার তো মাথার উপর নতুন চালা হলো।

বাদল ততদিনে ভালো রোজগার করছে। এবারের প্রমোটার দত্তবাবু, লোক ভালো। আগেরটার মতো ছ্যাঁচড়া না। ভালো রাজমিস্ত্রির কদর বোঝে। ভালো পয়সা দেয়। নিয়মিতই দেয়। বাদল বলে, এমনি এমনি কি আর দ্যায়? নিজির যে কত হচ্ছে তার খবর রাখো? কইলকাতা খালি এগোয়ে আসতিছে এদিকে। গ্রামগুলো গিলে গিলে খাচ্ছে। যত খাচ্ছে দত্তবাবুরা তত বড়লোক হচ্ছে। আমরা ওরে বড়লোক করে দিচ্ছি আর ও আমাদের মজুরিটুকু দেবে না?

ফতিমা হাঁ করে তার কথা শোনে আর ভাবে। লোকটা এখনও কী সুন্দর! এখনও কী সুন্দর কথা বলে। মনে কী দয়া! কথায় কী তেজ! আল্লাহ রহমন, তুমি রহীম! তুমি দেখো, ওর ওপর নজর না লাগে।

তুমার মাথার তে পলিটিক্স গেল না অ্যাখুনও।

এমনভাবে বলেছিল ফতিমা যেন তার কথা শুনে খুব বিরক্ত হয়েছে সে।

তারপর বলেছিল,

করার তো কত কিছুই আছে। কিন্তু তুমার জন্যি....

কী করবা?

পুবের পেয়ারা গাছের পাশে জমিটা দেখিয়ে ফতিমা বলে,

ক্যান, ওখেনে একটা গোয়াল করা যায়। ওই চালাডা দিয়েই তো....

তারপর?

এট্টা গোরু পুষতাম।

তারপর?

আমাদের সোনা খাঁটি দুধ খাইতো।

তারপর?

আর একটা গোরু হইতো, আরও দুধ....

তারপর?

সেই দুধ বেইচে দুডো পয়সা আইসত।

জানতাম। একটু পয়সার মুখ দেখিচ তো। ওমনি পয়সা মাথায় চড়িচে। লোভ বাড়তিছে। ওসব ভুইলে ইবার পড়াশুনোর দিকি এট্টু মন দ্যাও দিনি। ইশকুল পার হওয়ার আগেই বিয়ে কইরলে, পার হওয়া আর হইলো না। তা ইবার এট্টু ওইদিকি তাকাও। আমার সঙ্গে ভুবন মাস্টারের কথাবাত্তা সব...

গোয়াল হয় নি। মাধ্যমিক পেরিয়েছিল ফতিমা। রেজাল্ট তেমন ভালো হয় নি। তবু পাস তো করেছে। বাদলের আনন্দের শেষ ছিল না। ভবতারিণী মন্দিরে দেড়শ টাকার পুজো দিয়েছিল। গাঁয়ের সবাইকে ডেকে ডেকে মিষ্টি খাইয়েছিল। তাকে দেখতে দেখতে ফতিমার মন ভরে গিয়েছিল। খোদাতালা, জগতের মালিক, দেখো, ওর উপর যেন নজর না পড়ে।

এখন ফতিমা সেসব পুরোনো কথা, ভালো লাগার কথা ভাবছিল না, ভাবতে পারছিল না। মাথার ওপর টিনের চালে বৃষ্টির আওয়াজও আসছিল না তার কানে। বৃষ্টি যে পড়েই যাচ্ছে তা-ও খেয়াল ছিল না তার। তার মন তখন শুধু তার চোখে। শুধু তার হাতে। চৌকি পাশে বসে এক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে তার সোনা, তার কামালের মুখের দিকে। আর কিছুক্ষণ পরপরই তার কপালে, গলায় হাত দিয়ে দেখছে, গরম কেমন। আরও বেড়েছে, না কমেছে, না কমতে কমতে....ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। কথাটা ভাবতে পারে না ফতিমা। ভাবতে চায় না।

ক-দিন ধরে জ্বর। তিনদিন হলো একেবারে ছাড়ছে না। হালদার ডাক্তার রোজ একবার করে আসে। কাল দুবার এসেছিল। আজ সন্ধেবেলা দুটো নতুন বড়ি দিয়ে গেল। বলল, দেখ, এই ওবুধটাতে যদি কাজ হয়। আর কী বলব? ভগবানরে ডাকো। দশটা টাকা নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলেছিল, আল্লারে ডাকো। তিনি যদি....

ফতিমা তার দিকে তাকিয়ে ভাবে, এ কেমন ডাক্তার? ভগবানকে ডাকতে বলে? আল্লাহকে ...দু'জন কি দু'জন যে আলাদা করে ডাকতে হবে? আল্লাহ্ কি ডাক্তার? তিনি কি ওষুধ দেবেন? ওষুধ তো তুমি দেবা। সে ওষুধে কাজ হলে ভালো। আরও দশটাকা...না হয়ত গাছের লাউ-কুমড়ো কিংবা গরমকালে আম। ওরে সবাই দেয়। হালদারডাক্তারই গ্রামের ভরসা। হাতুড়ে। কিন্তু ডাক্তার তো। পাস করা ডাক্তার আছে হেলথ সেন্টারে। যদি সে আসে। যদি সে থাকে। আগের ডাক্তারটা পালিয়ে গেছে। পরেরটা এসেছে কি না, এলেও এখনও আছে কিনা কে জানে। পাঁচ-ছয় কিলোমিটারের পথ। তিন কিলোমিটার পাকা। বাকিটা....এই বর্ষায়... কে খবর রাখতে যায় ডাক্তারের?

আর যদি হালদার ডাক্তারের ওষুধে কাজ না হয়...হায় আল্লাহ্। হায় আল্লাহ্। এ কি কথা মনে হয় আমার? এমন কুকথা...

এবারের কাজে বেশ দূরেই গেছে সে। তার তো আসতে এখনও.....

কামালের কপালে হাতটা জোরে চেপে ধরে ফতিমা। জ্বরটা কি ছাড়ছে? গরমটা একটু যেন কমেছে। হাতটা গলায় রাখে ফতিমা। তারপর বুকে। হ্যাঁ, আগের চেয়ে কম। জ্বরটা বোধহয় ছাড়ছে। একটা থার্মোমিটার যদি...ও এত কিছু আনে তার জন্যে, ছেলের জন্যে, আম্মুর জন্যে, একটা থার্মোমিটার আনতে পারে না? এবার যখন যাবে, বলে দিতে হবে। একটা থার্মোমিটার...

আম্মু!

প্রায় ফিসফিস করে ডাকে কামাল, ফতিমা শুধু তার ঠোঁট নাড়া-টুকু দেখে। লণ্ঠনের আলোতে যেটুকু দেখা যায়। তাতেই বোঝে, কামাল ডাকছে। মাকে ডাকছে। মা সে ডাক শুনতে পায় না। টিনের চালে, মাঠের জলে, ব্যাঙের ডাকে, চাপা পড়ে যায় তার ডাক। থেকে থেকেই বাজও পড়ছে।

বলো বাবা, কষ্ট হচ্ছে?

কামালের ঠোঁট নড়ে না। সে শুনতে পায় কিনা বোঝে না ফতিমা।

সে আবার বলে,

কষ্ট হচ্ছে, বাবু?

ছেলে হলে কী নাম রাখবে, মেয়ে হলে কী নাম, এ নিয়ে বিস্তর কথা হতো দুজনের। মাঝে মাঝে রাতভর চলত কথা। বাদল তখনই বলে দিয়েছিল, সে মেয়েই চায়। তোমার মতো। কিন্তু সে এইটুকু বয়েসে বিয়ে করবে না। পড়বে। যতদূর পারে পড়বে। যেমন করে হোক মেয়েকে পড়াবে তারা। মা-র মতো সে ইশকুল পেরিয়েই থেমে যাবে না। পড়বে, ইশকুল, কলেজ, তারপরেও....তারপর সে দিদিমণি হবে। মাস্টারনি।

কিন্তু হলো ছেলে। কামাল নামই রাখা হলো। বাদল বলল,

দেইখো, এ ছেলে কামাল কইরে ছাড়বে। আমার মতো কুলি হবে না।

তুমি কুলি? এমন কুলি হতি পারলি কতো লোক বাগায়ে পড়ে।

তুমার জন্যি?

ধ্যাৎ!....জানো, নজরুল ইসলামের এট্টা কবিতায় কামালের কথা আছে। ইশকুলে প্রতুলবাবু স্যার বলতেন তিনি নাকি কোন দেশের মস্ত বড় নেতা ছিলেন। দেশের সব বদলে দেছেলেন। মোসলমান মেয়েদের পর্দার বাইরে আইনে লেখাপড়া....

হ্যাঁ, আমাদের কামালও তাই করবে। তখন আর কোনও মোসলমান মেয়েরে হিন্দু বিয়ে করার জন্যি নিজির গ্রামের তে পালায়ে যায়ে তার দাদুর গ্রামে যায়ে থাকতি হবে না! তা ছাড়া....

নামটা বড় ভালো রাখিচ। কামালরে কমল বলেও ভাবতি পারে কেউ।

বন্ধুরা ডাকতি পারে কমল বলে।

ক্যান, এ কথা বলো ক্যান তুমি? কমল হিন্দুর নাম বইলে?

না, না, কমল পদ্মর নাম বইলে। শাদা পদ্ম, গুলাপী পদ্ম, থালার মতো বড় বড় পাতা, সবুজ রঙ দুগ্‌গা পুজোর সময় থালা ভইরে ঠাকুরির পা-র কাছে রাখে। দেখো নি? এক শ' আটটা লাগে। তারই এট্টা আমাদের কামাল।

একবার কাজের থেকে দুদিনের ছুটিতে ফিরে বাদল বলেছিল,

আমাদের ইউনিয়নের নেতা সুবোধদা ওর নাম শুইনে, বড় কী নাম দেছেন জানো?

কী?

কামাল ফতিমা বাদল। আর ওরে এই জামাডা দেছেন।

কামাল ফতিমা বাদলের শরীর তখন ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। ফতিমা প্রথমে বোঝে নি। ভাবছিল জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে। পায়ের তাপ তাই কমছে। কমতে কমতে....জলপটি দেওয়া বন্ধ করে দেয় ফতিমা। তার গলার কাছ থেকে কাঁথাদুটো নামিয়ে দেয় পেটের কাছে।

চৌকি থেকে নেমে ফতিমা দেখে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কখন থেকে পা জুড়ে বসে আছে ছেলের পাশে। পা-দুটো ধরে গেছে। মাথাটা ঘুরছে। পা-দুটো নাড়াচাড়া করতে করতে ভাবে, মাথা ক্যান ঘোরে? তখন তার মনে পড়ে, কাল রাতেই যেটুকু ভাত-তরকারি খেয়েছিল। তারপর আর জল ছাড়া পেটে কিছু পড়ে নি। এ বাড়িতে তিনদিন উনুনে আগুন জ্বলে নি। আম্মার দুধ-হরলিক্স স্টোভেই হয়েছে। টিনে মুড়ি আছে এখনও। এখন কি তবে দুটো মুড়ি জলে ভিজিয়ে খাব?

পাশের ঘর থেকে আনোয়ারার গলা ঘড়ঘড় করে ওঠে। ডান পা-টা পড়ে গেছে। ডান হাতটা এত কাঁপে, সে হাতে খেতেও পারে না। এদানিং কথাও কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে গলার ঘড়ঘড়ে আওয়াজের সঙ্গে মিশে....

ফতিমা ওঘরে মা-র দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। দেখে, আম্মা উঠে বসার চেষ্টা করছে।

এত রাত্রে ওঠো ক্যান? শোও, শোও! আম্মা, শুয়ে থাকো।

ফতিমা মাকে জোর করে শুইয়ে দেয়।

মা-ও মেনে নিতে পারে নি তাদের বিয়ে। তবু ওখানে অবস্থা যখন পাকিয়ে উঠল, প্রাণ থাকে কি যায়, মা-ই বলল, চইলেই আয়। এ গাঁয়ের লোকজন একটু অন্যরকম। লাল ঝান্ডার পঞ্চায়েত।

এ ভিটের নসীবই এরোম। তোর নানার ছেলে হয় নি। দামাদই ছিল তার ছেলের মতন। এখন দ্যাখ দুইজন, কীর'ম শুয়ে আছে পাশাপাশি, উঠোনের পাশে। ইবার আমার দামাদ। কিন্তু ও তো ওখেনে, তোর আব্বাজানের পাশে শোবে না। চিতেয় যাবে। তা যাক। তোদের যদি ছেলে হয়....

মাকে জোর করে শুইয়ে দিলেও মা গোঁ গোঁ করতেই থাকে। বাঁ হাতটা তুলে কামালের চৌকির দিকে দেখায়। ফতিমা বুঝতে পারে না।

কী, বলতিছ কী?

ওঁ ওঁ ওঁ ম-এ-কা আ আ আ আ....

হঠাৎ ফতিমার বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে। হঠাৎ তার ভীষণ ভয় করে। সে ছুটে যায় পাশের ঘরে।

কামাল, কামাল। সোনা....

কামাল ঘুমোচ্ছে, যেন খুব শান্তিতে। তার ওপর ঝুঁকে পড়ে ফতিমা তাকিয়ে থাকে। কপালে হাত দিয়ে দেখে, ঠান্ডা। জ্বর ছেড়ে গেছে। নিশ্চিন্ত হয় ফতিমা। কিন্তু...

তার ভয়টা যেতে চায় না। গা ঠান্ডা কিন্তু এত ঠান্ডা। জ্বর ছেড়ে গেল কি এত ঠান্ডা...ঘাম কোথায়? জ্বর ছাড়ল তো শরীরটা ঘামে...ঘাম কোথায়?

ফতিমা দু'হাতে ঘাম খোঁজে। কামালের কপালে, মুখে, গলায়, বুকে, পেটে, পায়ে, কোথাও ঘাম নেই এক ফোঁটা।

আঁ আঁ আঁ মার এএএ...কা আ আ মা আম্মা....

এক হাতে আর এক পায়ে শরীরটা টানতে টানতে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এ ঘরে চলে এসেছে মা। কামালকে চাইছে। কেন? মা কেন চায় ওকে? ওকে কী করবে মা? মা কী করতে পারে?

ছেলেকে দু'হাতে তুলে মা-র কোলে শুইয়ে দেয় ফতিমা। মা তখন দেয়ালে ঠেস দিয়ে দু'পা সামনে ছড়িয়ে বসে আছে মাটিতে।

নাতিকে কোলে নিয়ে তার সর্বাঙ্গে হাত বোলায় বুড়ি। বোলাতে বোলাতে তার বুকে হাত রেখে হঠাৎ কেমন স্থির হয়ে যায় আনোয়ারা। যেন জ্যান্ত না, মাটির মূর্তি।

গোঁ গোঁ ওঁ ওঁ ওঁ.........

ফতিমা আনোয়ারের দিকে তাকায়। বাঁ হাতটা মুখের কাছে নিয়ে মা কী যেন ইশারা করে। যেন কিছু বলতে বলে। তারপরেই আকাশের দিকে হাত তুলে দেয়।

আল্লাহ্! এ কি বলছে মা? মা? মা, কী কচ্চো তুমি? আল্লাহ্‌রে....

ঝাঁপিয়ে পড়ে মা-র কোল থেকে কামালকে কেড়ে নেয় ফতিমা। বুকে জড়িয়ে ধরে দোলাতে থাকে।

মানা আমার...সনা আমার...আব্বুজান আসবে...বিস্কুট-চকলেট নে আসবে...তুমারে কত আদর....

কামালের মাথাটা কেমন নুয়ে পড়ে। যেন আলতো ক'রে ঝুলে থাকে শরীর থেকে। যেন একটুও জোর করলে ছিঁড়ে পড়ে যাবে। ফতিমা স্থির হয়ে যায়। মা-র মতো।

হঠাৎ তার মধ্যে কী যেন ঘটে যায়। সব ঝড় থেমে যায়। সব দুঃখ পাথর হয়ে যায়। কান্না আসে না। সে ডুকরে ওঠে না। কামালকে বুকে রেখেই চৌকির ওপর থেকে একটা কাঁথা নামিয়ে মেঝেতে পাতে। কামালকে আলতো করে শুইয়ে দেয় তার ওপর। ততক্ষণে সে বুঝে গেছে মা কী বলতে বলছিল। আল্লাহ্‌রে ডাক। তাঁকে বল, ছেলে যাচ্ছে। দিন দুনিয়ার মালিক আল্লাতাল্লা রহীম রহমান, রহেম করো, দয়া করো।

ছেলের পাশে হাঁটু মুড়ে গোড়ালির ওপর বসে ফতিমা। দু'হাত তুলে আকাশের দিকে মেলে দিয়ে কিছু চায়। কী চাইতে হয়? কী বলতে হয়? কিছুই মনে করতে পারে না ফতিমা। নীরবে চোখ বুজে বসে থাকে সে। কী যেন বলার কথা এখন। কী যেন বলতে হয়।

ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহি রাজি উন....আমরা প্রত্যেকেই তো আল্লাহ্-র এবং প্রত্যেকেই আমরা ফিরে যাব অল্লাহ্-র কাছেই।

ফতিমা এসব কথা কিছুই বলতে পারে না। তার মনেই পড়ে না। বিড়বিড় করে সে শুধু বলে, আল্লাহ্ তুমি তো দয়াময়, তুমি দয়া করো। দয়া কইরে ওরে ন্যাও। ওর যেন আর জ্বর না হয়। ও যেন শান্তি পায়। ওর আব্বুজান যেন কাল সকালেই..না, কাল না, আজ রাত্তিরিই...

জলে ভেসে যায় ফতিমার দুই গাল। বুকের ভেতর কান্না আটকে রেখে সে শুধু গুমরে গুমরে ওঠে। গুমরোতেই থাকে।

এক সময় বৃষ্টি থামে। টিনের চালে বাজনা থামে। ঝড় থামে। ব্যাঙের ডাক থামে। সূর্য ওঠে। মেঘে ঢাকা। তবু ওঠে।

জানালা দিয়ে ঢুকে দেয়ালে পড়া আলোটুকুর দিকে তাকিয়ে ফতিমা বলতে চায়, আজ এলে। কাল আসতে পারলে না? আমার কামালের সঙ্গে তোমার দেখা হলো না। তার বাপ যদি এখন...ওর বাপ....বাবা....

হঠাৎ মনে পড়ে ফতিমার, ওর বাপের ঠাকুর আছে ঘরে। পেতলের রাধাকৃষ্ণ। মায়ের জন্যে ঘরখানা তুলতে গিয়ে মিস্তিরির নিজেরই হিসাবের ভুলে এ ঘরের ভেতর মায় ঘরের পাশে একটা ফালি বেরিয়েছিল। সেখানে জলচৌকি পেতে রাধাকৃষ্ণের জায়গা করেছিল বাদল। সে থাকলে দুটো ফুল, একটু জলবাতাসা দেয় নিজেই। না থাকলে ফতিমা দেয়। একটু দূর থেকে ঠেলে দেয়। ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে না যায়।

কাঁথাটা টানতে টানতে ঠাকুরের সামনে নিয়ে যায় ফতিমা। হাঁটু ভেঙে ঠাকুরের সামনে বসে হাত জোড় করে। কী বলতে হয় তার জানা নেই। কীসব মন্তরটন্তর আছে। কিছুই জানে না সে। মনে মনে বলে,

ঠাকুর তুমি তো ভগবান, তুমিই তো আল্লাহ্, তুমিই তো এ দুনিয়ার মালিক। সে উপস্থিত নেই। তাই আমিই তোমারে পেন্নাম জানাই। দয়া করো ঠাকুর। আমাদের ছেলেডারে দয়া করো। আর জন্মে ওরে যেন এরোমভাবে মরতি না হয়। বাপ নেই, ওষুধ নেই...এই ঝড়জল, এই অন্ধকার... এমন বেঘোরে যেন মরতি না হয়। দেখো, তুমি দেখো ঠাকুর, দয়াময়, তুমি দেখো।

মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কথাগুলো বারবার বলে ফতিমা। বাদল এমনিভাবেই প্রণাম করে।

মাটিতে মাথা...মাথাটা তুলতে পারে না ফতিমা। ঠাকুরঘরের সামনে তার শরীরটা এলিয়ে পড়ে। ফতিমা জ্ঞান হারায়। ছেলের পাশে ছেলের মতো করেই পড়ে থাকে সে। মূর্তির মতো তাদের পাশে বসে থাকে আর এক মা।

সূর্য তো থেমে থাকে না। সে গড়িয়েই যায়। ফতিমা যখন ওঠে তখন সন্ধের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে বিকেল। অল্প আলোতে কামালের মুখটা এখন কেমন সাদা দেখায়। ফতিমার মনে পড়ে যায়, যেন একেবারে হঠাৎই, কিছু তো করতে হবে। ছেলে মরে গেছে। ওরে তো ঘরে ফেইলে রাখা যাবে না। কামালের পরনে হাফ প্যান্ট ছিল। একটা জামা পরিয়ে দেয় ফতিমা। তারপর তাকে কাঁথাটা দিয়ে মুড়ে বুকে নিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। আনোয়ারা তার দিকে তাকিয়েও দেখে না। জানলার বাইরে আলো মরে আসা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে এক মনে। নড়েও না। যেন মরে গেছে।

ইমামসাহেব চা খাচ্ছিলেন। সন্ধেবেলা রোজই বিস্কুট দিয়ে এক কাপ খান।

কী ব্যাপার বেটি, কী হইচে? এখন-এই সময়?

বৃষ্টি আর পড়ছে না। তবু তিনি মসজিদের সামনে বারান্দায় বসে ঘাড় বেঁকিয়ে আকাশের দিকে তাকান।

আমার ছেলেডা...আমাদের কামাল...আল্লার পিয়ারা হইয়ে গেছে।

তাই নাকি? সে কি? কখন? আহাহাহা...

আপনিই ইমামসাহেব চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ান। তাঁর মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে যায়, ইন্না লিল্লাহে ওয়া...

আল্লাভটা তাঁর মুখে থাকতে থাকতেই ফতিমা কাঁথায় মোড়া কামালকে মসজিদের সিঁড়িতে নামিয়ে রাখে। আলতো করে, সযত্নে। পাছে তার ব্যথা লাগে ভাঙা ইটের সিঁড়িতে। ইমাম সাহেব আবার বসেন তাঁর চেয়ারে। কিছু বলেন না।

কাল রাত্তিরিই...আবার তো রাত হচ্ছে। এর একটা ব্যবস্থা...

সে কই?

কাজে গেছে। ফিরতি ফিরতি আরও তিন দিন।

হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে ফতিমা।

খরচপাতি যা লাগে তা আমি...

না, না, কথাডা তা না বেটি। কিন্তু ওর উপর তো আমাদের কোনও দখল নেই। আল্লাহ ওরে নেবেন ক্যান?

ক্যান নেবেন না?

দুঃখ পাইস নে বেটি। রাগ করিস নে। ও তো মোসলমান না। ওর আব্বা তো হিন্দু। সে তো মোসলমান হয় নি। তার ছেলে হিন্দু হলিউ হতি পারে। কিন্তু মোসলমান তো না। ওরে আল্লা ক্যামন কইরে...

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ফতিমা। বারবার বোঝাতে চেষ্টা করে ইমামসাহেবকে। তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ে। কিন্তু তিনি তাঁর কথা থেকে নড়তে পারেন না একটুও। অন্য কথা হলে না-হয় ভাবা যেত, কিন্তু এটা যে ধর্মের ব্যাপার। এ কাজ করলি আমার গুণাহ্ হবে।

তালি আপনি কিছু করবেন না?

রাগ করিস না বেটি। তোদের আমি কারুর চে কম্ম ভালবাসি নে। আল্লাহ তোদের ভালো করুন। কিন্তু....

কিন্তু টিন্তু থাক ইমামসাহেব। খালি বলেন, আপনারা গেরাম ভর্তি মানুষ থাকতি আমার ছেলেডা এটুকু মাটি পাবে না?

এ যে ধর্মের বাঁধন। সমাজের বিধি। এ আমি খুলি কেমন কইরে? আমার ক্ষমতা কী? বরং তুই বেটি ওদিকে দেখ। বাদল তো হিন্দু...ওরা যদি....

পঞ্চায়েতের মেমবার দলবলের সঙ্গে সলা করছিলেন। ফতিমার আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে আসেন।

কিরে। কী হলো? এখন কী মনে করে? এই ঝড়জল...

আমার ছেলেডা দাদা...

কী হয়েছে ছেলের?

মইরে গেছে।

সেকি? মরে গেছে? মানে? কখন মরল?

ফতিমা কামালকে বারান্দায় নামিয়ে রাখে।

আরে, আরে, করিস কী? করিস কী? তোল, তোল।

এর জন্যি এট্টু আগুনের ব্যবস্থা কইরে দ্যান, দাদা।

ফতিমার গলার কাছে দলা পাকিয়ে আসে কান্না। কোনওমতে গিলে নেয় সে। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মেমবারকে ঘিরে দলবল তখন গলা নামিয়ে সলাপরামর্শ করছে নিজেদের মধ্যে। অনেকক্ষণ চলে আলোচনা। ফতিমা দাঁড়িয়ে থাকে। কামাল পড়ে থাকে বারান্দায়। শেষ পর্যন্ত একজন এগিয়ে আসেন ফতিমার কাছে। মেমবার দু'পা পিছিয়ে যান।

তা বোইন, অরে লইয়া তুমি এইহানে আইলা ক্যান?

খান সেনার তাড়া খেয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পরিবার নিয়ে এদেশে চলে এসেছিল। বাংলাদেশ কায়েম হওয়ার পর আর ফিরে যান নি। আত্মীয়স্বজন যারা ওদেশে পড়ে ছিল, তাদেরও নিয়ে এসেছেন। এখন এই গ্রামের পাকাপাকি বাসিন্দা। বাড়ি করেছেন। দাদার জমিজমাও কিনেছেন কিছু। মেমবারের দাদার মতো।

আর কনে যাব? আমাদের সবকিছুতিই তো পঞ্চায়েত....

হ, এইডা কইছ ঠিকই। কিন্তু এইডা তো পঞ্চায়েতের মামলা না। ধর্মের মামলা।

ধর্মের?

ধর্মের না? আরে যে আগুন দেওনের কথা কও, দিব কেডা? পুরোহিত তো লাগব। সে তো জানতে চাইব, ধরমডা কী? ও মুসলিম না হিন্দু?

আপনারা ওর আব্বাজানেরে জানেন না? তার ঘরে রাধাকৃষ্ণ....

আহা তা জানুম না ক্যান? কিন্তু হ্যায় মরে নাই। যে মরছে তার ধরমডা কী? সেইডা ঠিক না হইলে সৎকারের বন্দোবস্ত....

মানে?

এই সামাইন্য কথাডা বোঝো না? অর বাপে হিন্দু, কিন্তু মায়ে তো মুসলিম। তুমি তো আর হিন্দু হও নাই। তাইলে তোমাগো পোলার ধরমডা....

খালি ধর্ম ধর্ম করেন ক্যান? এট্টা মানুষ, মানুষের এট্টা সন্তান মইরে গেছে। তার সৎকার আটাকারে যাবে ধর্মের বিচারে? এ কেমন বিচার? কেমন ধর্ম?

এইবার মেমবার এগিয়ে আসেন।

দেখো বোন, আমাকে তো অনেকদিন ধরে দেখছ। আমি হিন্দু মুসলমান বিচার করি না। সবার ঘরেই জল খাই। ভাতও খাই। মানুষকে আমি মানুষ হিসাবেই...কিন্তু এটা ধর্মের ব্যাপার। সমাজের বিচার। আমাদের তো সমাজে বাস করতে হয়। পাঁচজনকে নিয়ে চলতে হয়। ফলে সমাজের নিয়ম পছন্দ না হলেও...কী করা যাবে বলো? সমাজ যতদিন না বদলাচ্ছে ততদিন এই বিচার....ঠিকই, এ সমাজের অনেক বিচারই অবিচারের নামান্তর। কিন্তু সমাজে যতক্ষণ আছি...সমাজ যতক্ষণ না বদলাচ্ছে....

ফতিমা নিচু হয়ে কামালকে বুকে তুলে নিয়ে দাওয়া থেকে নেমে যায়। পথটা এঁকেবেঁকে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে বড় রাস্তার দিকে চলে গেছে। নিজের বাড়ির দিকে যেতে যেতে ফতিমার কেমন একা লাগে। নিঃসঙ্গ লাগে। অসম্ভব অসহায় লাগে। মনে হয় যেন গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সে ছেলেকে নিয়ে চলেছে, একা। তারা দু'জন ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কোনও মানুষ নেই। দু পাশের জঙ্গলে শুধু বাঘ, ভাল্লুক, সাপ, সিংহ, গণ্ডার, ধর্ম, সমাজ, বিচার....

অথচ তার দু'পাশে বাড়ি। মানুষের তৈরি বাড়ি। মানুষই থাকে সেসব বাড়িতে। কোনও বাড়ি অন্ধকার। কোনও বাড়িতে আলো। বাড়ির পর বাড়ি। বাড়িতে কত লোক। ফতিমার ইচ্ছা করে ছেলেটাকে বুকে আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে ওঠে, কেউ আছ? কেউ আছ? আমার কমলরে এট্টু আগুন দিতে পারো এমন কেউ আছ? আমার কামালের এট্টু মাটি দেয়ার মতো কেউ আছ? একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারে না ফতিমা। শুধু তার গলা থেকে গরর গরর আওয়াজ বেরোতে থাকে। সে-ও যেন আনোয়ারা হয়ে গেছে।

বাড়ি ফিরে আনোয়ারার পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কামালকে বুকে আঁকড়ে বসে থাকে ফতিমা। রাত হয়। কেউ আসে না। এ বাড়িতে আলো জ্বলে না। রাত বাড়ে। কেউ আসে না। রাত পার হয়ে সকাল হয়। কেউ আসে না। বেলা বাড়তে বাড়তে আবার একটা বিকেল আসে। বিকেল রওনা হয় সন্ধের দিকে। কেউ আসে না।

আনোয়ারা বাঁ হাত বাড়িয়ে কামালকে ছোঁয়। শক্ত হয়ে গেছে শরীরটা। আর দেরি করা যায় না। কেউ আসুক না আসুক।

ফতিমাকে ধাক্কা দেয় সে।

বা-আ-আ-আ....

বাঁ হাত তুলে খোলা দরজাটা দেখায় আনোয়ার।

কনে যাব?

আবেগহীন শুকনো গলায় বলে ফতিমা। যেন খুব সাধারণ প্রাত্যহিক একটা প্রশ্ন করে।

ন-ও-ও-ও-দ-ই ই ই...

ঠিক। গ্রামে কামালের জন্যে আগুন পাওয়া যাবে না। মাটি দিতেও আসবে না কেউ। ইমামসাহেব এলে কি নানা আর আব্বাজানের পাশে গোর দিতে দিত? ধর্মে আটকাত না? ঠিকই বলেছে মা। নদী। নদীই একমাত্র...

ফতিমা রওনা হয়। দাওয়া থেকে নেমে উঠোনের কোণে কবরদুটোর পাশে একটু দাঁড়ায়। দেখো দেখো আব্বুজান, তোমরা দেখো। আমরা যাচ্ছি। আমার ছেলেরে নিয়ে আমি একাই...নিজি নিজিই যাচ্ছি।

যেতে যেতে একবার পেছন ফিরে তাকায় ফতিমা। আম্মুর মুখখানা চৌকাঠের ওপরে। চোখদুটো এই মরা আলোতেও চকচক করছে। কাঁদছে নাকি আম্মু? কাঁদো। কাঁদো। আমার হয়েও এট্টু কাঁদো। আমার তো কাঁদা নাই। কান্না নাই। আমার বুকি আমার মরা ছেলে। ক্রমে ক্রমে শক্ত হয়ে যাচ্ছে তার শরীর।

শক্ত হ' কামাল, শক্ত হ'। খুব শক্ত। এমন শক্ত কেউ য্যান তোর ভাঙতি না পারে। কোনও জন্তু, কোনও জানোয়ার, কোনও সমাজ, কোনও ধর্ম, কোনও বিচার....

গ্রামের শেষ প্রান্তে পথটা যেখানে দুভাগ হয়ে গেছে, একটা চলে গেছে বড় রাস্তার দিকে, একটা নদীর দিকে, সেখানে এসে হঠাৎ থামে ফতিমা। চলে যাওয়ার আগে একবার গ্রামটাকে দেখতে ইচ্ছে করে। পশ্চিমের আকাশ লাল হয়ে ছিল একটু আগে। এখন আবার ছেয়ে গেছে মেঘে। তবু যেটুকু আলো আছে তাতেই নিজের গ্রামটাকে বড় সুন্দর লাগে ফতিমার। গ্রামের মাটিতে কাঁথাটা পেতে তার ওপর শুইয়ে দেয় কামালকে।

চইলে যাওয়ার আগে একবার দেখে নে কামাল। নিজির মাটি একবার ছুঁয়ে নে!

মাটিতে-কাদায় মাখামাখি কাঁথায় মুড়ে ছেলেকে আবার বুকে তুলে নিতে নিতে গ্রামের দিকে তাকিয়ে ফতিমা খুব শান্ত, খুব নরম গলায় বলে, যেন আপন মনে যেন নিজেকেই বলে, এত ভালো এত তবু সোন্দর তবু এ কেমন গ্রাম যেখেনে শুধু হিন্দু আর মোসলমান থাকে, মানুষ থাকে না? এ কেমন দেশ?

পথের কাদামাটি এমনভাবে তার পা-দুটো জড়িয়ে ধরে যেন তার কাছে ক্ষমা চায়। কোথায় একটা ব্যাঙ ডেকে ওঠে। দূরে কোথাও বজ্রপাত হয়। বিদ্যুৎ চমকে চিরে যায় আকাশ। তারপরেই বৃষ্টি নামে ঝমঝম করে।

# নাটকের বিদ্রোহিণী

## সাধন চট্টোপাধ্যায়

রামায়ণ লেখার বহু আগে রাম ও সীতা ভাইবোন ছিল। ওদের পরস্পরের বিয়ে হয়। ঠিকঠিক বিয়ের দিনটি কারও হিসেবে নেই। রুকমনিয়ারও নয়। এমন কি আজ বিকেলেও হিসেব করতে পারেনি, কাল বাদলমাথায় সকাল-সকাল টেরেন ধরবে না। আট স্টেশন দক্ষিণে 'লেবার'-মিস্ত্রিদের ভোরের মিলনমেলায় শুধু কাদা-জল, দু চারজন মিস্ত্রি, কিছু পুরুষ খাটুরে—উত্তরের টেরেন ধরে কোনো মেয়ে লেবারই আসেনি। ঠিকেদার ছুটি জানিয়ে, প্লাস্টিকের মোড়কে দুচাকায় চেপে ধাঁ।

ভোর পাঁচটায় আজ রুকমনিয়ার মেয়ে বুড়িয়া বলে : কাজে যেও না।

—কাহে?

: স্বাধীনদিবসুয়া !...সব ছুটি...খিচড়ি পাকাবে?

রুকমনিয়া সাত মেয়ের আবদারে মমত্ব বোধ করে। এমন আবদার মেয়েটা কোনো দিনই মুখফুটে জানায়নি। পিট্‌পিটিয়ে দেখেছে, মা ভোর রাতে উঠে প্রাত্যকৃত্যাদি ও চান সেরে, টিফিন বানিয়েছে। বাসি বর্তন মেজে রেখেছে। তারপর সিনথেটিক রঙিন শাড়ি, চুলে গার্ডার, মস্ত গোল টিপটি কপালে লাগিয়ে থলি হাতে ছুটেছে ধাঁ ধাঁ। বস্তির ভাঙাচোরা দেড়খানা ঘর তখন থেকে বুড়িয়ার শাসনে। মাত্র এগারোয় পা দিল, পাকা গিন্নিবান্নির মতো রাঁধাবাড়া শেষ করে, মোড়ের মিঠাই দোকানে চাবিটি জিম্মা দিয়ে, প্রাইমারি স্কুলে পড়তে যায়। চার ক্লাসের ছাত্রী।

মেয়ের বিরল আবদারের কিছু আগেই রুকমনিয়া টিফিনের ছাতু খুঁজছিল। আটা বাড়ন্ত, রুটির রাস্তা বন্ধ। বাইরে আকাশ কালো। সারা রাত বারিষ ঝরেছে। ভোরের প্রহরে বস্তির পরিবেশ জলদগ্ধ কাঁঠালের ভুতি। তখনই মেয়ের আবদার। কামাই দিলে রোজের পয়সা দেবে কে?

বুড়িয়া হাসে—আমি বড় হয়ে শুধে দেব।

ছাতুর খোঁজ বিফল। বড় ছেলে কমল অবিশ্যি ছাতি মাথায় আঁধার ভোরেই লুঙ্গি গোটানো ছপছপিয়ে বেরিয়ে গেছে মিঠাই দোকানে। মালকিন দু-দুটো স্কুলের বোঁদে সাপ্লায়ের অর্ডার পেয়েছে। শেষ রাত থেকে না লাগলে, সামলানো দায়। কর্মচারী কমল দোকানে বসে দেখে বস্তির মুখটায় ক্লাবের ছেলেরা বাঁশ পোতার আয়োজনে ব্যস্ত। আবার ঘন কালো মেঘ ধেয়ে এল।

রুকমনিয়া বসল খাটিয়ায়। চানের পর মাথা ধরাটা কম দপদপাচ্ছে। গতরাতে সে পুরনো স্বপ্নটা ফের দেখতে পেয়েছিল। প্রবল বৃষ্টি, ফাটা খাপড়ায় চোয়ানো জল, প্রতিকূলতা—এমনকি বারান্দায় হুঁইহুঁই পানিও স্বপ্নের কারণ হতে পারে। পরিবেশ প্রতিকূল হলেই সে স্বপ্নটি দেখে। গরমির কড়াইতে রাতটা সাতলানো চমে, রুকমনিয়া যখন হাতপাখা নাড়িয়েও ঘামে, তখনও স্বপ্নটি হাজির হয়। সিদ্ধান্ত নেয়, এবার বড়মিস্ত্রির

কাছে কথাটা পাড়বে। সংসারের মুখিয়া এখন সে। কমল কামাইয়ের হপ্তা-রোজ পুরো মায়ের হাতে তুলে দেয়। এখনও মাথা ঘোরেনি ছেলেটার, মিছে বলবে না রুকমনিয়া। ছোট ছেলেটাকে স্বামী গরীব সাউ নিজের অধিকারে রেখে দিয়েছে বহুকাল। মধ্যে রইল বুড়িয়া—এগারো বছর বয়েস, ছেলেমানষি যায়নি। টুকিটাকি সাজগোজের জন্য পয়সার আবদার মায়ের কাছে, কাজ থেকে ফিরলে ড্যাবড্যাবে চাউনি দেয়—মা নিশ্চয় মায়াপুরীর সোনার কাঠি ছুঁয়ে আশ্চর্য শক্তিমান হয়ে ফিরেছে। কোনোদিন ভাজা কট্‌কটি, অতি সস্তায় কেনা হাফডজন ডট্ কলম, চুলের ক্লিপ, নকল আংটি, কোনোকোনো ঋতুতে ছালছাড়ানো কাঁচামিঠে আম, নুন মাখানো—রুকমনিয়া ঘরে ফিরে দিনের হিসেব বোঝার পর মেয়ের মুখে জাদুকরের হাসি ফুটিয়ে তোলে। দেশ-গাঁ হলে বুড়িয়ার কবেই বিয়ে হয়ে যেত। মেয়ের এগারো বছর চাট্টিখানি কথা? কিন্তু রুকমণিয়ার কোনো গাঁ-ও নেই। তার দাঁতে ঝকমকে হাসি আছে, রসরসিকতায় ফোড়ন কাটা আছে, কৌতূহল পুরোপুরি—কিন্তু পরম্পরার দেশ নেই। ভাঙা বাংলা ও দেহাতিতে, আলোছায়ার মতো, ভাব বিনিময়ে বাধা হয় না। অনর্গল। তেমন-বাড়ির মালিক হলে মিশ্রভাষায় অবারিত কথা বলে।

: ট্রেনে যাও? থাকো কোথায়?

— নৈহাটি।

: দেশ ছিল কোথায়?

— হামকের কৈ দেশ নাই কাকু। ইখানেই বরাবর। সুন্দর হাসে রুকমনিয়া। দুলাল গুপ্ত সামান্য বিস্মিত হয়েছিলেন; বুঝলেন তিন-চার পুরুষ এখানেই; পুরনো শিকড়ে ফিরতে পারেনি।

প্রায় চার মাস ধরে অধ্যাপক দুলাল গুপ্তর বাড়িতে কড় মিস্ত্রি আলম আছে—দুলালদের পুরনো পৈতৃকভিটে পুনর্নির্মাণের কাজে। ভাইদের সঙ্গে রফা হয়ে বাকি অংশের পুরো মালিকানায় অধ্যাপক গুপ্ত কাজে হাত দিয়েছিলেন। মিস্ত্রি, লেবার, সান্ত্রাস মিলিয়ে ক'মাস ধরে বাড়িতে ধুলো-কাঁকড়-সিমেন্ট-বালি, ঠক্‌ঠক্ শব্দ, আর সাংসারিক লটবহরের রোজ নতুন স্থানান্তরকরণের গলদঘর্ম প্রক্রিয়া। এখন শেষ বর্ষায় পুরনোটা সারিয়ে আধুনিক প্রয়োজনে বাথরুম বা হামাম তৈরি হচ্ছে। গতকাল রাশি রাশি টুকরো ইট, পুরনো প্লাস্টারের রাবিশ, চাঙড়, কড়াই-কড়াই মাথায় বয়ে রুকমনিয়ার হাড় বিবিয়ে গেছে। এর দুদিন আগেই গুপ্তগিন্নি সুদেষ্ণা তালবড়া রসে দিয়েছিলেন। গোটা ছ-সাত রুকমনিয়ার কৌটায় পড়েছিল। স্বামীস্ত্রীর স্বচ্ছল অবসর-জীবন। লেখালিখির বায়ুগ্রস্ত গম্ভির মানুষ। ইদানীং রুকমনিয়ার পেছনে সূক্ষ্মভাবে লেগপুলিংয়ে মজা পায়। বোঝেন তিনি এ-যাত্রায় লেবার-মিস্ত্রি বিশেষ ফাঁকি দেয় না। রুকমনিয়া তো রীতিমতো সৎ।

গত হপ্তায় দুপুরে টিফিন সেরে, সামান্য বিশ্রামে ছিল যখন, দুলাল গুপ্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন : রুকমনিয়ার আসল নাম কি রুক্মিনী?

—হাঁ কাকু!

! আজ কিন্তু বাথরুমের পুরো ছালটা ছাড়াবে...দরজাটা ভেঙে ফেলবে...আর:...

—আর কিছু হবে নাই কাকু।

: কেন? কাল কতটুকু করলে? চোখে পড়ছে না তো?

ফিক করে রুকমনিয়া হেসেছিল। হাসলে ওকে বেশ লাগে। চোখদুটি খরগোসের মতো অসহায়; পাতলা ঠোঁট, নাকছাবি পুরনো ধরনের. সামনের মাড়িটা লাল ফোলাফোলা, দাঁতগুলো বুনো ঘষায় ঝকমকে। দেহ সামান্য বেঁকে কুঁজো মারছে, বক্ষ সৌন্দর্য বলতে কিছু নেই। রোদ জলে শরীরের ত্বক পাকা চামড়া বনে গেছে। খনখনিয়ে বলেছিল—হায় মাইয়া! কত্ত রাবিশ টানলাম চোখে পড়ল না?

গুপ্ত নীরবে মাথা নাড়িয়ে যুক্তিটা বোঝার চেষ্টা করছিলেন। সঙ্গের মিস্ত্রিটা একটু টিকুরে ধরনের। তবে সূক্ষ্ম কাজে ওস্তাদির ছোঁওয়া আছে। হালকা করে গুপ্ত বলেছিলেন—কে কে আছে বাড়িতে?

—মিয়া আছে একটা, ছিলা আছে।....মিঠায়ের দোকানে কামায়।

: মেয়ে?

—পিরাইমারি পড়ে। চার কেলাস।

: তোমার বর?

—নাই কাকু। মরে গেছে।

ছোট্ট করে দ্রুত শেষের কথাগুলো বল্ল। গুপ্ত বিস্ময়ে বলেছিলেন : তুমি বিধবা? সিঁদুর শাঁখা পরছ কেন?

চোখের ঝিলিকে সামান্য হাসি দিয়েছিল রুকমনিয়া। দু পা ছড়িয়ে যে-ভঙ্গিতে ছিল কাকুর সরাসরি শাড়িটা নামিয়ে গুছিয়ে বসল। সারা মুখে খাটুনির লালচে আভা। মাথায় ফেট্টি। প্রচুর রাবিশ টানায় ধকল নিশ্বাসে বইছে। সুদেষ্ণা ভেজা কাপড় মেলে দিয়ে নামছিলেন। শুনে বল্লেন : ওকে ছেড়ে দিয়ে তিনি ফের একজনকে নিয়ে আছেন।

: আচ্ছা। ক বছর?

রুকমনিয়ার লজ্জাটুকু কেটে যায়। বাধোবাধো ঠেকে না।

—কাকু, আমার ছোট লড়কাটা পেটে তখুন।

: তারপর?

—জোর করে নিয়ে গেল পাকাপাকি....এখন উমর ন বছর। ....বড় লড়কাকে নিতে দিলাম না। হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল রুকমনিয়া। চিরশক্তিময়ী যেন।

: আখুন হলে কাবিমা, হাঁসুয়া চালাতাম।

হাতের মুদ্রায় বাতাসে ঝকঝকে হাঁসুয়া। মুণ্ডমালিনী যেন। চিরদ্রোহিণী।

সুদেষ্ণা গম্ভীর হয়ে বল্লেন—মাথাটা ফাটিয়ে দিতে পারে না? তাঁর সঘৃণার উচ্চারণ ও ক্রোধের উদ্দেশ্য কেবল রুকমনিয়ার হতচ্ছাড়া পুরুষ গরীব সাউ নয়; নিঃশব্দ খোঁচায় যেন নানা স্তরের পুরুষতান্ত্রিক উদ্দামটুকু টার্গেট। অধ্যাপক গুপ্ত অন্তর্মুখীন ভাবনাস্রোতে একটু আৎকে শির শির আত্মপ্রতিক্রিয়ায় লাঞ্ছিত বোধ করলেন। দু-চারজন ছাত্রী, গবেষিকাদের সাংস্কৃতিক চুম্বন, বিদগ্ধজনোচিত প্রলাপে নিতম্ব বোলাতে বোলাতে নীড় বাঁধার

যে ফ্যান্টাসিগুলো বাতাসে ওড়াতেন, সুদেষ্ণা যেন গোপন ক্যামেরায় ধরে রেখেছে। গুপ্ত রুক্মনিয়ার প্রসঙ্গ খানিক ভুলে থাকলেন। খেয়ে দেয়ে সিগারেট ধরিয়ে মৌজ এনে হেসে বল্লেন : রুক্মনিয়া, তুমিও পালটা সাদি করলে না কেন?

কাকু যেন পাপ উচ্চারণ করেছে। বলে কী?

—ছিঃ কাকু! আমার লড়কার বিশ বরস...আমার বয়স হয়েছে...দুশরা মরদ ধরব?. কী বুললেন কাকু?

সুদেষ্ণা এবার স্বামীর সুরে সুর মেলালেন—লজ্জা কেন? মরদরা পারলে তোমার পাপ কোথায়? তাড়িয়ে দিল আর দুটো বাচ্চা নিয়ে বেরিয়ে গেলে?

অধ্যাপক বল্লেন : লেখাপড়ি করে ছেড়ে ছিল? বলছি ডিভোর্স করেছে রে ফের বিয়ে করল? এখন যদি তোমার কামাই খেতে চায়?

—কা-ম্-মা-ই? তপ্ত বাতাস বইল। শব্দ কটি দাঁতে দাঁত ঘষে রুক্মনিয়া এমন বিদ্রোহিণী ভঙ্গিতে বলল, যেন ইট-সিমেন্টের কড়াইয়ের চাপে, ঘাম-রোদ আর ঝিরঝিরে বৃষ্টিকণায় ফোঁটাফোঁটা রক্ত ও ঘাম গড়িয়ে ক্রমাগত সলিড টাকা বনে যাচ্ছে। রোজ নব্বইটি।

—খোরপোষ দাবি করেছিলে?

: উ চামারুয়ার কথা ছাড়ুন কাকু। মিস্ত্রির তাড়ায় মশলামাথার ছুটেছিল রুক্মনিয়া।

বুড়িয়া আজ ভীষণ খুশি। মাকে বোঝাল দুজনে মিলেই খিচুড়ি রাঁধা হবে। চটপট মুখ হাত ধুয়ে পুরনো পোশাক, ছেঁড়া কেট্‌স মোজা, চুলে ক্লিপ লাগিয়ে তাড়াহুড়োর ছুটল স্কুলে। মাস্টারজি কেলাপ্ তুলবে। গলা মেলাতে হবে তাঁর সঙ্গে। ভালোমন্দ হাতে জোটে এ-দিনটায়। মেয়ে চলে যেতেই পাকিয়েওঠা আলসেমি রুক্মণিয়াকে ফের বিছানায় গড়াতে বাধ্য করাল। বড় মিস্ত্রিকে হঠাৎ কামাই জানানো যায়নি। এখন ফ্লাইওভারের নিচে নিশ্চয়ই বাকি লেবার-মিস্ত্রির কাজের ভাগাভাগি হচ্ছে। লছমিয়া, নানী, চাচিয়ারা নিশ্চয় হাজির। কাকুটা বলেছিল কামাই না দিতে। এ-হপ্তা তার বাথরুম শেষ করতেই হবে। বড় মেয়ের বাচ্চা হবার দিন নাকি এগিয়ে এসছে।

রুক্মনিয়ার বস্তির ভাঙা বাড়িতে গ্যাসের উনুন। বড় মিস্ত্রির পরামর্শে যদি মোবাইলটা নিত! কামাই থেকে একটু একটু কেটে নেবে বলেছিল। আজ জানিয়ে দিতে পারত জ্বর হয়েছে, যেতে পারবে না। আকবর মিস্ত্রির সেকেন্ড হ্যান্ড সেট্‌টা শীতের মরশুমে রুক্মনিয়া কিনে নেবে। পুজোটা যাক। এভাবেই তো, তিনবছর আগে নৈহাটির পুবে জলাজায়গায় সে এক কাঠা ছ' ছটাক ভূমি কিনে রেখেছে। ঘর তোলার পয়সা নাই। বড় মিস্ত্রি কথা দিয়েছে, ছোটখাট কোঠা তুলিয়ে দেবে, শোধ হবে রোজ থেকে। রুক্মনিয়া যে-দিন বলবে, ইট যাবে চলে।

এটা রুক্মনিয়ার ঘুমের স্বপ্ন নয়। সুখ-দুঃখেই হঠাৎ-হঠাৎ ভেসে ওঠে এক কাঠা ছ'ছটাক। যেদিন সে হাঁ বলবে, কাজ শুরু হয়ে যাবে। তিনবছর ধরে স্বপ্নটি পোষা হচ্ছে।

এখন সে ভাবে, কমলের সাদির আগেই না পরে, সে বড় মিস্ত্রিকে হাঁ বলবে? বেটাকে সাদির জন্য রাজি করানো যাচ্ছে না। মিঠাই দোকানের চাকরির কি ঠিক-বেঠিক আছে? রুকমনিয়া ভাবে হায় কী দিনকাল এল। এর পর কি বুনা মৌগির শাশুড়ি বনবে? সে তো কাঁথায় শুয়ে শাশুড়ির কোলে বৌ হয়ে গেছল। হায় নন্দলালা।

পেটটা ফের একা ঘরে চিনচিনোতে থাকে রুকমনিয়ার। আলসারের পুরনো ব্যথাটা ফের জাগল নাকি। ডাগদারের দাওয়াইতে কম খরচা হল? আর সে গোলিয়া খায় না। অনেকবার ফটো তোলানো হয়েছে। গুচ্ছের অর্থদণ্ড ছাড়া বিশেষ কিছু লাভ হয়নি। শেষে, এ বছর শ্রাবণের শুরুতে ঘুরে এল বাঁককাঁধে, বাবা বৈদ্যনাথের কাছে। তিনি দুখীর কথা শোনেন।

বুড়িয়া ফিরল। পানিতে এ-বছর যথেষ্ট ছাত্র-ছাত্রী হাজিরা দিতে পারেনি, তাই ক্যাডবেরি পাওয়া গেল। নইলে বরাবর বোঁদে, লজেন্স জিলিপি। মেয়েটার টান আছে। পোশাক ছেড়ে, অন্দেক টুকরো জোরজবস্তি মায়ের মুখে ঢুকিয়ে মিষ্টিগন্ধযুক্ত স্বাদে দু হাত শূন্যে ছড়িয়ে ঘুরেঘুরে নাচতে থাকল। 'ঘোড়ে আউড় বান্দর/আ গিয়া হ্যায় অন্দর/মস্ত্ মস্ত্ মস্ত কলন্দর—বিকৃত গলায় বুড়িয়া বলে যায় মাথামুণ্ডহীন ছেলেমানুষি ছড়া। মেঘের আলোছায়ায় রুকমনিয়া দেখে রুনুঝুনু পায়েল বাজিয়ে মোহনবাঁশিতে যেন নন্দলালা নাচছে।

হাতের বাজুতে পবিত্র বাঁধা সূত্রটি দেখে কাকু বলে : ওটা কী বাঁধলে হাতে?

—বাবার ধামে পানি দিলাম....এটা শাওন মাস না?

: কী হবে এতে?

রুকমনিয়াও লঘু ভঙ্গিতে —হাম্ কা জানৎ ?

দুলাল গুপ্ত খেপাবার খেলায় বল্লেন : গরীব্ সাউ এবার তোমার কামাই খাবে.... জমিটাও নিয়ে নেবে!...ডিভোর্স তো দেয়নি।

কোদালটি ছেড়ে কোমর সোজা করে দাঁড়াল রুকমনিয়া। মনে হল, শিক্ষিত কাকুটা ইয়ার্কিতে লছমন রেখা পেরিয়ে গেছেন। বাঁকা আঙুলে ঘাম কাছিয়ে বলে—শুনেন কাকু। হারামিটা বহুত দুখ দিয়েছে...ইবার হাঁসুয়া দিয়ে গর্দান লিবেক—আমার কামাই খাবে? জমিন লিবে?

ডান হাতে বাতাসে হাঁসুয়ার ভঙ্গি। সাক্ষাৎ রণচণ্ডী। বুকে চাপড় মেরে ফের—আউরতদের বুঝি জান নাই? মান নাই?

অধ্যাপক গুপ্ত একটু-আধটু লেখেন। হাতের কাছে নাট্যকার ইবসেনের নোরা-চরিত্রটি দেখে অদ্ভুত বিশ্বপ্রেম বোধ করলেন। অথচ, রুকমণিয়া টিপছাপ দেয়।

: রুক্মণিয়া।

—হাঁ কাকু।

: পুরনো ঘর কোতায় তোমার? গরীব সাউর নয়া সংসার?

—কাঁকিনাড়া।

: সেখানে গেছ আর?

—রাত্তি নিয়ে ঘর করবে...খোরি যাব?...বহুৎ মারখোর খেয়েছি, হাঁ!..... ছোট লড়কাটাকে ভি দেখতে দেয় না!...শালা উর কামাইটা খাবে তো!

মেঘবাতাসের আলো ছায়ায়, ভেজা বাষ্পে খাপড়ার ঘেরাটোপে নন্দলালা ফের বুড়িয়া হয়ে গেল। আলসেমি ঝেড়ে উঠল রুকমনিয়া। গ্যাস জ্বালিয়ে চা বানায়। মেয়েকে চাল-ডাল ধুতে বলে, ছাতা হাতে ক্ষিপ্র গতিতে দরজায় খানিকটা থমকে : কমলুয়ার কাছে এট্টু ঘিয়ের ব্যবস্থা করে আসি...দুটো ডিম আনব...ভাজতে পারবি?...খিচড়ি আমিই পাকাবো!

কমলের কাছে ছোট্ট বোতলে ঘি, মাগনায় কিছু বৌদে, সবজির দোকানে দুটো ডিম কিনে সে যখন ফেরে, মেঘের কোণে রোদের ঝিলিক। রোদ-জলের লড়াই সকাল থেকেই চলছে। রোদের খুশিতে মাইকগুলো ফের গাঁক-গাঁক গান বাজায়। বস্তির মুখোমুখি মসজিদের পেছনে, মিনে করা পুরনো দোতলা দালানটার মালিক, আধবুড়ো পরেশ মৌলিক দাঁড়িয়ে রিক্সার অপেক্ষায়। একটি পা খাটো। সবাই পেছনে খোঁড়া উকিল ডাকে। সে সেশন কোর্টের দুঁদে উকিল শ্যামা ভুঁইএর মুহুরি। বস্তি আর চোর-বাটপাড়দের মুখে উকিল। লোকটি যেমন ধূর্ত, রসে বসে তেমনই কন্দর্প।

: তোরও স্বাধীন দিবস? রুকমনিয়া? ডুব মারলি?

— কা করে উকিল বাবু। কোনো কিছুর মতলবে রুকমনিয়া গুটিসুটি মুখোমুখি। খোঁড়া উকিল চুন-সুপুরির দাঁত খুটতে খুটতে পলকে মুখ-বুক-তলায় তাঁজ সেরে নেয়। অবিশ্যি, এ-মানুষগুলোর বিপদে-আপদে পরামর্শ দেয়, ঝমেলায় আইনের প্রোটেকশন বাতলায়।

: কী মতলবে? এঁ্যা?

—একটা কথা পুছব তোমায়? রুকমনিয়ার চোখমুখে হাসি।

: প্যানাস্ না, বলে ফেল...রিক্সার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

—আমার কামাইটা কি মরদ খেতে পারে?...জমিন নিতে পারে?

মৌলিক মুহুরি রুকমনিয়ার ইতিহাস জানে। ওরই পরামর্শে রুকমনিয়া মনের জোর পায়।

: গরীব সাউ? হ্যাঁ পারে।

—কেনো?

: লিখে ছাড় দিয়েছে তোকে?...আইনে বউয়ের সব সম্পত্তি স্বামীর। মৌলিক চোখ নাচায়।

—তব কা হোবে?

: আমার নিয়ে থাক!...কত বল্লাম!...প্রটেকশন পেতিস!

—ধ্যা?!...ইয়ার্কি না উকিলবাবু-সাচ্ বলছি!

: আমিও সত্যি বলছি।

শুনলে পিত্তি জ্বলে। রুকমনিয়াও সমানে সমানে পাল্লা দেয়। রাস্তার কান বাঁচিয়ে বলে—বুড্ডা তো হয়ে গেছো....

হাতের চেটোয় লিঙ্গ বানিয়ে ফের—সব আখুন কুট কৌড়ি...পারবে? শরীর কাঁপিয়ে মুহুরি হাসতেই রুকমনিয়ার খোলাখেলা দীর্ঘশ্বাস—আমারও কুছু নাই... খেটে খেটে ছাতুছিবড়া বনে গেছি!...আপনি পুরানা আদমি, আমার বিপদটো বুঝেন!

ডাকা-রিক্সা এগিয়ে এল। বুড়া খোঁড়া উকিল বল্লে—দেশটা মগের মুল্লুক নাকি?...তোর কামাই খাবে?....ভাগ, পালা এখন।

তবু সে স্বস্তি পায় না। শালা মরদটা আস্ত কেউটে। কোনো বদ কাজ তার বাধে না। কমলকে নিয়ে ভয় হয়। ফুসলিয়ে নেবে না তো? বিয়েসাদি করিয়ে ঠ্যাং-এর উপর ঠ্যাং চাপিয়ে কামাইটা খাবে। তালে চাকু মারব শালাকে, জেলখাটনি হয়তো হোক! ফের মেজাজ সামলে নেয়। মনটাকে হিলতে দেয় না।

বাবার মাথার জল নিয়ে দীর্ঘ হাঁটা পথে গভীর রাতে কে যেন বলেছিল—তুই কেন এসেছিস? স্পষ্ট শুনেছিল রুকমনিয়া।

: অভাগী আমি আসব না? আমার বিপদ তুমি জানো না?

—বিপদে হিলবি না কইন্যা।

কে এই অচেনা? কেন দিল আশ্বাস?

একমাত্র সুদেষ্ণাকেই ঘটনাটা জানিয়েছিল রুকমনিয়া। কসম খাইয়েছিল, কাউকে যেন প্রকাশ না করে। তালে শুভ কিছু ফলবে না।

ও-বাড়ির কাকুটা শুধু লিখাপড়া নিয়ে থাকে। সংসারের কুছু বুঝে না। কাকিমাটা চালাক-চতুর। ওর সাজানো রান্নাঘরের খুটিনাটি অনুসঙ্গ দেখে রুকমনিয়া অনেক কমরুচি তৈরি করে নিয়েছে মাসখানেক ধরে।

দুপুরে রান্নার বেশ গন্ধ ছাড়ছিল। পাঁচিশ কৌটার মতো ঘিয়ের খিচুড়ি আর ওমলেট্ ভাজা। যেন অমৃত-স্বাদ। রোজ টিফিন করে তো রুটি অথবা একটা কেক আর চা। অল্প খিচুড়ি খেয়েই পেট গেল ভরে। কমল মিঠাই এনেছিল। রেখে দিল বিকেলের জন্য। রাতের খিদেটা বড়িয়া হয় খুব। নতুন সে বিড়ি পি'তে শিখেছে। বুড়ি লেবার কানির উৎসাহে রুকমনিয়া শ্রান্তিতে বিড়ি ফোঁকে এক-আধটা। একটু চাঙ্গা লাগে যেন। তবে ছেলে-মেয়ের সামনে খায় না। আজ সাধ হল লুকিয়ে-লুকিয়ে।

গড়ানো দুপুরে আকাশ ছেঁড়া মেঘ সরিয়ে সামান্য পরিষ্কার হতেই হাওয়া দিল, ত্যাড়চা রোদ উঠল। পৃথিবী টাল খাচ্ছে তো এখন জলবিষুবের দিকে। চড়াই পাখির খুশির কিচির-কুচুরের মতো বুড়িয়া আবদারে বলে—এমা! মাইয়ারে!

: কা....?

—যাবি? দাদিয়ার কাছে? আমি দেখব দাদিয়াকে!

তড়িৎ হাতের কাছের কৌটোটা ছুঁড়ে মারল মা। লাগল না যদিও। ফল হল উল্টো। মেয়েটা এসে হাঁটুর ওপর বেড়াল-লুটোতে থাকে।

—চল মা। কাকনাড়া চল না। দাদিয়াকে দেখেই চলে আসব।

ইস্কুলে পড়াই-লিখাই করতে করতে, বুড়িয়া মাত্র দু-বার দাদিয়ার টানে গেছল। মাঝেমধ্যেই মন কেমন টানে, ভয়ে বলতে সাহস পায় না। বাপ-মায়ের সম্পর্কটা সে জানে। আজকের দিনটা ব্যতিক্রম থাকায়, হাত ছড়িয়ে নাচার তালটি গোপনে চলতেই থাকে। অন্ধ দাদিয়ারও হাতছানির ব্যবস্থা আছে। প্লাস্টিকের মগ-গামলা বেচা মেয়েছেলেটা বস্তিতে বস্তিতে ঘোরে। এ-ট্রেন ধরে ও-ট্রেনে যায়। কখনও কোথাও দেখা হলে রুক্মনিয়াকে আঙুলে ইঙ্গিত দেয় বুড়ি দেখা করতে বলেছে। চলে আসার পর, রুক্মনিয়া মাত্র দুবার সাড়া দিয়েছিল। তাও চৌকাঠের ভেতরে ঢোকেনি। গরীব সাউ দু-বারই পাশের ঘরে ছিল না। ওই রাত্তিটার চোখ পড়তে দড়াম করে দরজা ঠেসে দিয়েছিল।

আজ মায়ের শাসন, চড়-চাপড়েও দমল না বুড়িয়া। কাঁদতে কাঁদতে আবেগের বাধায় বলে কাল কাজ থেকে ফিরে মরা মুখ দেখতে পাবে। রুক্মণিয়ার কানে কে যেন প্রতিধ্বনি করল : তুই গরীব হাঁটছিস কেন?

স্পষ্ট শুনল যেন। বাবার মাথায় পানি ঢালতে গিয়ে গভীর রাতের সেই পুরুষ কণ্ঠ।

—উঠ। আমি ইস্টিশানে বসব...তুই দাদিকে দেখে আসবি।

: যাব না আমি।

—রাতের রোটি পাকা তালে।

: হাম কুছ্ নাই করবে।

সকালের নন্দলালার পায়েল এখন রুনুঝুনু বাজতেই চায় না। অগত্যা কী করে রুক্মনিয়া। উ-ঠ্।

বাবার লাল তাগা ও ছোট্ট গয়সাদ বুড়ি শাশুড়িকে দেয়ার গোপন ইচ্ছে উঁকি মারতে বুড়িয়ার ঘ্যানঘ্যানানি রোদের মতো ঝিলিক দিল। তারপর মা-মেয়ে পথে নামে।

ভাঙা, ত্যাবড়ানো, একটুকরো চালার ঝুপসিতে মাথা নুইয়ে দাঁড়ায় রুক্মণিয়া। হৃৎপিণ্ড চড়া তালে বাজতে থাকে। ছেলেটা কি চোখে পড়বে? কেউ লাঠি নিয়ে পড়বে না তো? বুড়িয়া তুরতুর করে খাটিয়ার কাছে এগোয়। কুঁজ ও ভাঁজকরা একটি অন্ধ শরীর কিছু টের পায়। বাতাসে পুরনো আমচুরের গন্ধ। বুড়িয়া হাসে নীরবে।

: কৌন্?

—হাম।

: হাম কৌন?

—বল তো কে আমি? বুড়িয়া কাছে ঝোঁকে।

দেহটা তখন শুকনো খড়খড়ে হাতটা শূন্যে নাড়াতে, বুড়িয়া তলায় নিজেকে মেলে ধরল। অনেকবার হাত বুলিয়ে : কেরে? বুড়িয়া?

—হাঁ দাদিয়া।

: একলা এসছিস?

—হাঁ। বলেই খিলখিল হাসিতে, বুড়ি টের পায় নাতনি মিথ্যে বলছে। শূন্যের হাত উদ্বেগে স্থির। তখন লঘু চরণে কে যেন খাটিয়ায় ভর দিতেই, শুকনো হাতটা মাথা-মুখ-চুলে ঘুরে বেড়ায়। রুক্মনিয়া কাঁদে। ধীরে ধীরে শাশুড়ির বাহুতে লাল তাগা বাঁধে।

অন্ধ বলে: বাবার মাথায় পানি ঢালবি কবে?

যেন বহুদূর থেকে শাওন মাসের একটি তিথির উল্লেখ হতেই শুকনো আঙুল সভক্তিতে কপালে ঠেকে। প্রসাদের কাগজটুকু বুড়িয়ার মারফত যায়।

—দাদিয়া, তেরা পরসাদ।

আচমকা অন্ধ দেহটি বহু পুরনো শোকের ধুন শুরু করতেই, লাগোয়া হাফ-পাকি দরজা কে যেন দড়াম শব্দে ঠেসে দেয়। কোথায় ছোট ছেলেটা? রুক্মনিয়া আর অপেক্ষা করে না। মেয়ের হাত ধরে ইস্টিশনের পথে দৌড়য়।

পরদিন দুলাল গুপ্ত মিস্ত্রিকে নিলেন একহাত।

: কবে শেষ করবে? মর্জিমতো কাজ করছ? কাল কী ছিল?

—আমি তো আইছিলুম... লেবার না এলে মুই করি কী?

রুক্মনিয়া উজ্জ্বল হাসিতে : হাঁ কাকু।...কামাই করলাম।

: করবেই তো–স্বাধীনতা বলে স্বাধীনতা।

নানা খুটিনাটির মধ্যে ইনিয়ে বিনিয়ে গতকাল মেয়েদের আবদারে গরীব সাউর বাড়ি যাবার প্রসঙ্গে, দুলাল গুপ্তর মনোবিজ্ঞানে বিছেয় কামড়াল।

: তু-মি গেলে?...এত কিছুর পরও? কী আশ্চর্য।

লিখন্ত কলমটি থামিয়ে দিয়ে গুপ্ত বিস্মিত। সোজা তাকিয়ে থাকে।

—হাঁ কাকু। নসিব। কী করা?

: ধ্যা—ৎ।...তোমাদের পুরুষ-ঠ্যাঙানিই দরকার।

গুপ্ত ভীষণ বিরক্ত, তাঁর শিক্ষিত চেতনার সমীকরণে নাট্যকার ইবসেনের নোরা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। রুক্মনিয়া নিষ্পাপ মশলা মাখে।

ক্ষুব্ধ সুদেষ্ণা 'তোমাদের' প্রসঙ্গে শ্রেণী অপমানে রুক্মনিয়ার পক্ষ নিলেন।

: পুরুষরা সম্পর্কের কী বোঝে?

গুপ্ত চকিতে তাকালেন।

সুদেষ্ণা ফের : কতটুকু অবস্থায় ওর বিয়ে হয়েছিল জানো?...শাশুড়ির বুকের দুধ খেয়েছে।

অধ্যাপক গুপ্তর কানের যন্ত্র বেয়ে কথা কটি বুকের খাঁজে ক্রমাগত ধাক্কা খায়। টুকরো হয়। সেদিনের হাঁসুয়াতোলা হাতের ছবিটি খড়্গধারিনী এক মুণ্ডমালিনীর। পুরুষরা কতটুকু জানে সম্পর্কের? পাতালনিহিত গুহ্যলতার জটিলতা? সেই কোন অতীতে রাম-সীতা ভাইবোন। তারপর রামায়ণ লেখা। গত দিনটির তারিখও সবাই ভুলে যাবে। রুক্মনিয়া গরীব সাউর বাড়ি যায়নি। শুধু...।

দুলাল গুপ্তর চোখে ইবসেনের নোরা নতুন রূপ পায়।

# শ্মশানপুরী

## জ্যোৎস্নাময় ঘোষ

বিধাননগর স্টেশনের পশ্চিম লাগোয়া ট্রাম ডিপোর কাছে আসতেই রতু বলে, 'মানুষের হৈচৈ, ট্রামের চাকার হরেকরকম বাজনা, বাস-লরি-ট্যাক্সি'—তিন চাকার উড়ো আওয়াজ শুনতে চাস? তাহলে, পুরনো কলকাতায়, রেল লাইনের পুব পারে যেতে হবে বুঝলি? আমাদের ওদিকটায় সব রইস লোকেরা থাকে। সল্টলেক, লেকটাউন—ওই—হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে। হাত বাড়িয়ে লক্ষ্মীকে ধরে ফেলে।

থেমে পড়লেও ভেতরটা তার কেঁপেই যায়। আর একটু হলেই রিক্সা চাপা পড়ছিল।

রতু হাসে, যেন মজা পেয়েছে। কাঁধ থেকে হাত না তুলে, মুখখানা আর একটু এগিয়ে দেয়, 'রিসকা চাপা পড়লে গরুর গাড়িতে করে শহর ঘোরানো হতো আগে। বেঁচে গেলি। আইনটা নেই তাই।'

লক্ষ্মীর মুখে হাসির ঝলক। বোঝা যায়, নিজের ভেতর ফিরে আসছে সে।

বলে, 'নাহ্‌বো?'

'দেখে শুনে। গাড়ি ঘোড়া তোকে জিগ্যেস করে আসবে না। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলি, যম তোর শিয়রে—আরে অই মেয়ে, দেখ, দেখ—'

চিৎকার করতে করতে ছোটে।

লক্ষ্মী ততক্ষণে রাস্তার ওপিঠে প্রায়। দেখতে-না-দেখতে রতুও এসে যায়। ফেটে পড়ে, 'শোন, কান খুলে শোন—'

'অ মা, এহানকার নোকজন বুঝি কান বন্ধ করে রাখে। আমাদের ওদিকে তো কানা খোলাই থাকে—সব্বোক্ষণ—'

'তোর মুকে ঝাঁটা, মুড়ো।'—বলল বটে খুব তেজের সঙ্গে, কিন্তু হাসি চেপে রাখতে পারল না। কান খুলে শুনবেটা কী, তা অবলাই থেকে গেল।

লক্ষ্মীর মন ততক্ষণে ছুটন্ত সব দৃশ্যের সঙ্গে ছুটছে যার বেশিটাই ওর অপরিচিত। হঠাৎ, এক জায়গায় থেমে যায় ওর চোখ। বড় রাস্তার গা ঘেঁষে অনেক লোকজন, বেশির ভাগই মেয়েমানুষ, চাক বেঁধে রয়েছে। সঙ্গে কিছু পুরুষও। 'মিটিং হবে, এই সাত সকালে! নাকি, মিটিংয়ে যাচ্ছে? অপেক্ষা করছে অন্যদের জন্যে? মিটিংয়েই যাচ্ছে যেন। মিটিংয়ের মিছিলে 'জেন্দাবাদ, চাই চাই', হেঁকো শরাখরা লোকজনের মত সব চেয়ারা, বেশির ভাগেরই কাপড় চোপড়ের কোন বাছবিচার নেই, যেমন জুটেছে চাপিয়েছে। মেয়েগুলোর সকলের সঙ্গেই একখানা করে কাপড়ের ব্যাগ। ব্যুনদা মসকরা করে,' 'ব্যাগ ভর্তি মিটিন 'নেস্‌বে' সবাই, দেহিস।'

মনের ধন্দ চেপে রাখতে পারে না, জিগ্যেস করে, 'এরা কি কচ্চে গো সব, মাসি? মিটিংয়ে চলেছে? আওয়াজ কই?'

রতু হাসে 'এহানে হাত গুটোয়ে বসে থাকতে হয় সার সার। লাইন যদি ফেল্লে করেছ, দিনটাই বরবাদ। এহান থেকে কাজ বাটা হয়।'

'অ মা!' লক্‌খি অবাক মানে। 'কাজ আবার বাটা হয় নাকি! করা বাটে, কাদের?'

'পাট্টির নোকেরা, পাট্টির নোকেদের।'

'দুর, কি যে সব বল! পাট্টির লোকেদের কাজের দরকার আছে নাকি তাই!'

'যারা গুছিয়ে নিয়েছে ওদের না থাকলেও গরিব-গুর্বো পাট্টির নোক কিছু কম আছে নাহি! তো, তারা পেটে গামছা বেঁধে কদ্দিন থাকবে মা?'

লক্‌খি কথা বলে না, শুধু তার চোখ 'পাট্টির গরিব-গুর্বোদের' ওপর দিয়ে ঘুরতে থাকে। তার সারা মুখে বোঝা, না-বোঝার জটিল সূক্ষ্ম সব রেখা ফুটে ওঠে। বলে, 'একই পাট্টির মধ্যে গরিব-বড়লোক, কেমন আর্চয্য মনে হয় না!'

'কিছুই আচর্যের নেই মা। একই চালের মধ্যে কাঁকর, পাথরকুচি, মরা চাল, থাহে তো? এ তো তেমনি। তা ছাড়া, পাট্টির দরজার বাইরে তুমি তো আর তোমার কপালখানা রেহে যেতে পার না, মানে তুমি কাজ ভিক্‌খে করবে, তারা দেবে, 'হয় ষষ্ঠীর' দিন সব লিখে দে দে গেছে সেই কুচুকুরে বেটি। এ নিয়ে বিবাদ জুড়বে কার সঙ্গে?'

লক্‌খির চোক ততক্ষণে সরে গেছে ডি-আই পি রোডের জটলায়। পথটির ওসার, চারপাশের বনজঙ্গল যেন আচ্ছন্ন করে রাখে তাকে। কাছেভিতে কোথাও থেকে একটি উৎকট আওয়াজ ছড়াতেই সে কেঁপে ওঠে। হাত বাড়িয়ে মাসিকে পেতে চায়।

রতু এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রাখে, বাংকার দিয়ে ওঠে, 'এই 'হরেনের' জ্বালায় কোন কাজ করার জো নেই। দিবারাত্র র‍্যাল গাড়ির বক্‌বক উদিকে, ওদিকে বাস, ট্যাক্সি, বাবুদের ছোটাগাড়ির হরেন—আওয়াজ যে কত রকম হতে পারে মা—ভ্যা-ভো ঘ্যা-ঘো কিলিকিলিকিলিকিলি, কানের বারটা। এ শহরের তিনভাগ লোকই কানে শোনে না। লজ্জায় বলতে পারে না, তাই।'

'এ রাস্তার নাম কি গো, মাসি?'

কথাখান শুনেই চটে যায় রতু। 'এই যে অ্যাত্‌খন ধরে কলকাতার উপর লেক্‌চারখানা ঝাড়লাম, তার এক কণাও কানে নিলি নে, হতচ্ছাড়ি! কিন্তু সে অন্য রাস্তাখানার নাম বলবে না, তাই হয়! দেশে ফিরে গিয়ে বুড়ি বলবে না যে, মাসি কলকাতার রাস্তা চেনে না।'

লক্‌খির বাঁ ডানাখানা শক্ত করে চেপে ধরে পথে নেমে যায়। তারপর, 'বক খেতে খেতে', গাড়িঘোড়া সাঁতরে সাঁতরে রাস্তার ওপিঠে। ডানা ছেড়ে দিয়ে যেন দম নেয়, হাসে, হঠাৎ জানতে চায়, 'বল তো, এইটা কোন দিক?'

'অমা, আমি কি করে বলব!'

রতু উত্তরটা যেন শুনলোই না, সামনে চোখ পেতে বলল, 'কি দেখস সামনে?'

'লোকজন, গাড়িঘোড়া—'

'আরে আবোদা, একটা বিরিজ চোহে পড়ে না?—সোজা তাকা—'

'অ-অ, হ্যাঁ গো মাসি, কাঠপুল পানা মনে হয়—'

'এই তো, চোখ খুলেছে! ওইটাই হলো, যে স্টেশনের পাশ দিয়ে আমরা এলাম—'

'বিধাননগর—'

'হ্যাঁ, হবে তোর।'—হাত বাড়িয়ে খুশিতে মাথার চুল ঘেটে দেয়।—'তা, ওইটা হলো পশ্চিম দিক। বিধাননগর। তার উল্টো দিক, আমাদের পেছনটা, পুব দিক—সল্টলেক। এই যে দক্ষিণ মুখো রাস্তা, এ একেবারে শহরের পেট ফুঁড়ে চলে গেছে যদ্দুর যাওয়ার। উত্তরের পথ ধরে হাঁট, লেকটাউন, ছিরিভূমি, আগরাম বাগরাম, সাত সতের। এবার আমরা সল্টলেকে ঢুকলাম বলে। ও, এই রাস্তার নাম জানতে চেয়েছিলি না? এর নাম হচ্ছে গে ভেইপি রোড। এবার চল, আমার হাওয়ায় হাওয়ায়। চাদ্দিক বজ্জাত লোক বোঝাই—'

'আর যে পা চলে না, মাসি।'—শরীর জুড়ে যেন ক্লান্তির ঢল। মুখ ঘামে চপ চপ।

'চলতে চলতেই বল আসবে। থেমে পড়লেই গিয়েছ। একবার, বুঝেছিস, আমারও তখন—তোর মত অবস্থা—পা চলে না। সঙ্গে যারা ছিল, তারা সব টপাটপ পা নাচিয়ে চলে গেল। এহানকার রাস্তার থামার জো নাই। থেমেছ কি, আটকে পড়েছ। আমিও আটকে গেলাম, মা। দুপুর যায়, বিকেল যায়, রাত আসে—চাদ্দিক আন্ধার, ঘুটঘুট্টি। হঠাৎ, কোথাও কিছু নেই, দেখি, সামনে একটা ট্যাস্‌কি; চোখদুটো রাগে জ্বলছে। আর আওয়াজ ছাড়ছে, গর-গর, গর-গর- সে যাত্রা তোর মেসোর জন্য বেঁচে ফিরেছি। তার তো চাদ্দিকে কত চেনাশুনা—পার্টির লোক না, হ্যাঁ কাজেই চলতে হবে, বুঝেছ?'

'হুঁ।'—চুপচাপ হাঁটতে থাকে লক্ষ্মি।

প্রায় গা ঘেঁষে অটো যায়, বাস যায়। চারপাশে এত সব ঘরবাড়ি, কিন্তু বাড়তি কোন শব্দ ভাঙে না কোথাও। ওই যে 'ভেইপি' রাস্তা থেকে এতটা পথ এল, চারপাশ কেমন যেন ঠান্ডা, জুড়নো জুড়নো। মনে হয়, এ যেন গল্পের সেই রাজপুরী, যেখানে লোক-লস্কর, সেপাই সাস্ত্রী পাত্র মিত্র সব আছে, কিন্তু গভীর ঘুমে মরে আছে সবাই। সোনা আর রুপোর কাঠির পাহারায় ঘুমে অচেতন রাজকন্যা। এখানকার পাড়াঘর যেন গল্পের সেই ঘুমন্ত রাজপুরী, নৈঃশব্দ্য জমাট বেঁধে রয়েছে ঘরে ঘরে, পথের আনাচে-কানাচে। ঘুমচ্ছে রাজকন্যা, রাজপুরীর সবাই। তাদের জাগাবার কেউ নেই। শব্দ বলতে বাস ট্যাক্সি বা আপন গাড়ির' এঞ্জিন এবং হর্নের ঘ্যাগটানি। পথে লোকজন নেই বললেই হয়।

এই নির্জন, জনহীন পুরীতে নানা গড়নের সার সার ঘরবাড়ি কেমন যেন বোকা বোকা দেখায়। ওদের ব্যবহার করার কোন গরজ নেই কারো, ইট সিমেন্টের গাঁথনিতেই উৎসাহ ফুরিয়ে গিয়েছে যেন।

'কিরে, থম মেরে গেলি কেন? ফিরে যাবি? ভাল লাগছে না?'

'নাগো। ভেবেছিলাম, এই সব বাড়িঘরে কারা থাকে গো? এত চুপচাপ কেন তারা?'

'সল্টলেকে সব বড়লোকেরা থাকে। তারা সব কতা বলে ফিস্‌ফিস্ করে। কান পেতে, দম আকটে শুনতে হয়। সব দামি কতা তো, তাই এত হিসেব করে বলা-কওয়া। অন্যদের মত নাহি। 'চান্স' পেলেই খুলে বসল কতার ঝাঁপি। এই যে বাইরের তেথ দেহাচ্ছে, চারপাশ

ঠান্ডা, কোনো শব্দশাব্দার বালাই নেই, কিন্তু, ভেতরে ভেতরে যা চলার সবই চলছে। একে বলে বড়লোকি কেতা, মা। এ সব আমাদের জন্য না।'

লক্ষ্মি হঠাৎ প্রশ্নটা করে ভেতরে ভেতরে যা কপ্‌কপ করে ফুটছিল কতক্ষণ ধরে। বলে 'আচ্ছা, মাসি, এহানকার রাস্তা কি দিয়ে বানানো গো? পিচের রং তো কালো। ওরা তো সব দেহি সাদা, ধবধবে। তোমাদের ওদিককার রাস্তার পিচও তো কালো কুষ্টি। তো এহানকার পিচ সাদা কেন—মাসি?'

রত্নু চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ, তার চোখ সাদা পথ ধরে ধরে সামনে-পিছনে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে। সাদা পিচের এই রাস্তায় তার হাঁটাচলা দু-চার দিনের নয়। অথচ ব্যাপারটা তার নজরে আসেনি এর আগে। আর যে-মেয়ে মাত্র দুদিন হলো দেশের বাড়ি থেকে কলকাতায় এলো, তার চোখে কিনা—অবাকই হয় রত্নু।

'এ-সব জায়গায় যারা থাহে, তারা হচ্ছে সব বড়লোক, নামিদামি মানুষ। গায়ের রং সব যেন ফেটে পড়ছে। দেহেই বোঝা যায় সব সন্দেশের লোক। এহানকার রাস্তাও হচ্ছে ভিন্ন রকমের। কলকাতার সব রাস্তা হচ্ছে বেলেকুষ্টি—ম্যাগো, আও। আর এহানকার রাস্তা হচ্ছে, ম্যামেদের মত সব ফর্সা। আমরা কি এ সব রাস্তায় পা রাহার যুগ্যি, মা। কোন দিন হয়তো নুটিশ বেরবে, গায়ের রং যাদের চাপা, আদ্দেোদের মত, জ্যাইপি রোডের পুব দিকে তাদের ঢোহা বারণ। সে জন্যিই, সেই কবেতেথ্ বলছি তোদের, যা দেহার তাড়াতাড়ি দেহে যাও। না, গরিব পাড়ায় মিটিন করেই হাওড়া ইস্টিশন—বড় জোর, কালীঘাট, তাও ওই গরিব পাড়ায়ই। ভাল করে দেহে যাও। ফিরে গিয়ে বলো সব, যে, মাসিরা থাহে, সন্দেশ—সাদা পাড়াতেই বলা যায়। এহানকার ঘরবাড়ি, লোকজন, পথ্‌ঘাট, সব কিছুর গায়ের রং ঝক্‌ঝক। বেশ গুছোয়ে বলবি।'

'মাসি, সেই বল্লে, এহানকার দোকান-বাজার সব এক একটা চার-পাঁচতলা বাড়ির ভেতর সাজানো, বস্তরে চেপে ঘুরতি হয় সেহানে, সে-সব দেহালে না তো?'

'হবে রে বেটি, সবুর। একটা কতা তোমাকে আগেই বলে রাখি। ওই মলের ভেতর, গরিবগুর্বোদের ঢোহা বারণ। বাইরের তেথ আলগোছে দেহে আসতে হবে, ছোঁয়াছুয়ি যেন না লাগে কারোর সঙ্গে—'

'কেন, জাত যাবে।'

'তোর আমার না। যাকগে। আর মলে ঢুহে কি বা করব আমরা—'

'কি যে সব কতা তোমাদের—মল, মল কি? সব হেগেমুতে রাহে নাকি সেহানে?'

'ধুর বেটি!—মলই তো ধ্যান বলে—'রত্নুর গলা খাপ করে নেমে যায়, সেই সঙ্গে তার আত্মবিশ্বাসও।—'কি রে?'

'অমা, আমি কি করে বলব। তবে—মল। মুত্র গুলো এগুলো কোন কতা—ছিঃ! কি শুনতে কি শুনেছ, ক্যা জানে।'

'হতে পারে, মা। তুই তো জানিস, প্যাটে আমার সাকুল্যে কালির আঁচড় পড়ে নাই। এই শহরে থাহার লোক কি আমরা। অবশ্য, কোন জায়গাই, গেরাম বল, শহর বল, গরিব মানুষের

জন্য নয়। বন্যার জল ঠেলে তুলে দিলে এখানে। আছি। শোনা যাচ্ছে, এখান থেকেও উঠতে হবে। শহরের বাবুরা—মলাই করবে হয়তো—হেগেমুতে শহর ভাসায়ে দিলে, মা—'

লক্ষ্মি হেসে ওঠে খিলখিল করে। এই সময়ই, একটি বাদামি কুকুর মাসি-বোনঝির ভেতর ঠেলে ধাক্কিয়ে ঢুকে পড়ে। রতু হাঁ-হাঁ করে ওঠে, 'অই হা-হা-গেলি—'

তখনই দুটি ছেলে ছুটে আসে, 'মাসি, ছাড়বেন না। ভোর রাত থেকে ভোগাচ্ছে—কান, কান, দুকান চেপে ধরুন, মাসি—'

'আমি ও-সব পারব না—' বলে, রতু সরে দাঁড়ায়।

ছেলে দুটো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে। কিন্তু সেই 'বাদামি' একটু ফাঁক পেয়েই ভোঁ দৌড়।

সামনের ছেলেটি হাল ছেড়ে দেয়ার মত করে বলে, 'এই কিলাইত্তি বিচ্ছু ধরা আমাদের কম্ম না। আমি আর ছুটতে পারব না। দশ টাকার অত হয় না।'

'তা বললে হয়। টাকা অ্যাড্‌ভান্‌স্‌ নেওয়ার সময় মনে ছিল না?'

'আমি আর ছুটতে পারব না। উলো, শুনলি? আমি আর—'

'হুঁ। টাকা ক্যাল—'

'কী।'

'টাকা। গুনে গুনে, টিপে টিপে পকেটে পুরেছ—'

'পকেট ফুটো, দুটোই—দ্যাখ।' পকেট উল্টে দেখায়।

'অ। মুলো, তুই মরেছিস। এখনও ভাল কথা কচ্ছি, বিউটির পেছনে ছুট লাগা—'

'কুত্তা, না কুত্তির পেছনে ছুটতে পারব না। ইতে মান খোয়া যাবে—'

'পুলিশের ডান্ডা তোর কপালে নাচ্চে—'

তখনই পেছন থেকে একটা হুংকার শোনা যায়, 'উলো মুলো, আর আড্ডা দিতে হবে না। বিউটি ফিরে এসেছে, তোমাদের সাহায্য ছাড়াই।'

উলো প্রায় লাফিয়ে ওঠে, 'শালা ইস্তিরি কুত্তা, তোর লেজে তারাবাত্তি বেধে ঘোরাব রে। লাগে কেমন দেখিস। মাসি, চলি—'

'এস, বাবা। তোমরা থাক কোতায়?'

'থাকি ওই—'

'শোনো, মাসি। যারা গরিব মানুষ, তাদের ঠিকানা একখান—ছেক্‌টার এত, ট্যাংকি নয়, কি বায়। তাই তো? কিন্তু রইস আদমি যারা, তাদের ঠিকানা মাত্রা একখান? ছি-ছি। এ বলা যাইব, তো, ও বলা খিরি, রাতে বিক্কটিন। আমরা হচ্ছি গে—'

লক্ষ্মি হেসে ফেলে।

উলো চটে যায়। —'হাসলা যে বড়।'

'হাসি পেলে কি করব?'

'এরকম যখন-তখন হাসতে নেই। মাসি তোমরা কবেথে আছ এখানে, এই কলকাতায়?

'তা তোমায় ওই, নাই, নাই করেও, বছর বার-তের তো হলোই—'

'তবে তো তোমরা খাঁটি কলকাত্তাইয়া—আমাদের মতই। তোমার মেয়ে তো মনে হয় য্যান—'

'ছেলে-মানুষের কথা ছেড়ে দাও না—'

তখনই আবার হুংকার। এবার খানিকটা কাছ থেকে।

'বা-ই'—বলেই ছুট দেয় দুজনা।

'অ, রাস্তা বিছোয়ে আড্ডা হচ্ছে! তাই তো বলি—' বলতে বলতে ভারভার্তিক মহিলাটি এগিয়ে এলেন।

রতু খানিকটা এগিয়ে যায়। সরল-সরল মুখ করে বলে, 'না গো মা, কাজকম্ম করে খাই। আড্ডা দেয়ার সময় আছে আমাদের, তাই বে!'

'উঃ!—এইটকু আসতেই বুঝি হাঁফ ধরে তার। সামনে এসে বড় করে নিশ্বাস নিলেন, ছাড়লেন, তারপর আঁচল খুঁজতে লাগলেন।

বার কয়েক চেষ্টাতেও আঁচল পেলেন না দেখে লক্ষ্মি বলল, 'আমি খুঁজে দেব?'

'তা হলে তো ভালই হয়, মা!'—

সামনে আসতেই লক্ষ্মির নজরে পড়ল, গোটা কয়েক প্যাঁচ দিয়ে আঁচল কোমরেই গুঁজে রাখা হয়েছে। সেদিকে হাত বাড়িয়ে সে বলল, 'খুলে দেব?'

'দাও—' তার কথা বলার ধরনে মনে হলো যেন লক্ষ্মির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

আঁচল হাতে পেয়ে তা দিয়ে বারকয়েক মুখ মুছে বললেন, 'বেঁচে থাক, মা। থাক কোথায়?'

লক্ষ্মি মাসির দিকে তাকায়। রতু বলে, 'ও আমার বোনের মেয়ে, লক্ষ্মি। বাবে মেদিনীপুরের এক গেরামে। আমি থাহি, ছেলেপুলে সোয়ামি নিয়ে, র‍্যাল লাইনের ধারে ঝুপড়ি বেধে। লক্ষ্মি, মাকে পেন্নাম কর।'

ভদ্রমহিলা 'না, না' করে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। তার আঁকেই লক্ষ্মি ঝুঁকে পড়ল। তিনি তার মুখ থেকে অদৃশ্য কিছু আদর পাঁচ আঙুলে তুলে এনে চুমু খেলেন, মুখ জুড়ে হাসি ছড়াল তার। রতুর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন? 'কাজ করবে, আমাদের বাড়ি? ভাল মাইনে পাবে, খাবার পাবে। কি?'

রতু হাসি-হাসি মুখ করে বলে, 'বাঁধা কাজ কি হুট করে ছেড়ে দেয়া যায়, মা?'

তার মুখের ওপর হালকা ধূসর একখানা পর্দা নেমে এল যেন। তবু রতুর কথাগুলো যেন নেহাতই ফেলনা বলে মনে হলো না মাঝবয়েসি মানুষটির।

বললেন, 'তা অবিশ্যি ঠিক। পরে কখনও যদি এ-বাড়ির কথা মনে হয়, কোন সংকোচ করো না। চলে এসো। চার নম্বর ট্যাঙ্ক লাগোয়া বাড়ি, নম্বর, এই দ্যাখ—তুমি লেখাপড়া জান তো?'

সংকোচে মাথা নাড়ায় রতু, 'না তবে, এই যে মেয়ে আমার, লেকাপড়া জানে।

আট কেলাস পাস করে এহন নাইনে বেঙ্গি গরম করছে। সামনের বছরে কলেজ ধরবো-ধরবো করবে। লক্ষ্মি, এই গেটে যে নম্বর লেগে দেয়া আছে, পড়ে দেতো মা—'

সংকোচে লক্ষ্মি যেন গুটিয়ে যায়। ভদ্রমহিলা ওর অবস্থাটা ধরতে পারেন, একফালি ঝিকে হেসে ওকে বলেন, 'না, না, পড়তে হবে না। তুমি ক্লাসে নাইনে পড়, বধা!'

রতন লক্ষ্মিকে তাড়া দেয়—যেন ওর জন্যই এতক্ষণ আটকে আছে ওখানে, 'চল বাপু, পা চালা। সল্টলেকের কিছুই তো দেখা হলো না এহনো। আসি গো, মা।' খানিকটা এগিয়েই আবার ফিরে আসে।—'একটা কাত জিগ্‌গেস করি যদি মনে কিছু না করেন।—আপনাদের কাজের লোক নোক নাই?'

'পালিয়েছে।'—ভদ্রমহিলা খর্‌-খর্‌ করে উঠলেন।—'আজ সকালে। পাশের বাড়ির বজ্জাত চাকরের সঙ্গে। রাঁধুনি বেটির আসপর্দা বোঝ। তুই যে কাতুর গলায় মালা ঝুলিয়ে কেটে পড়লি একবার ভাবলি নে লোকগুলো খবে কি, অ্যাঁ?। গিন্নি ঠাকুরুন এখন আমাকে ধরেছে, 'হেঁসেলে ঢোকে। এদের হেঁসেলে আমিষ নিরামিষ একাকার। সেখানে পা দিয় জাত খোয়াই আর কি। একটা কতা বলব? এ বেলার রান্নাটা যদি—এদের হাত খুব দরাজ—'

চল, চল।'—লক্ষ্মিকে এগিয়ে দিয়ে রতু কেটে পড়ে, 'নোকের বাড়ি ঘর বাঁট দিয়ে খাস,তার আবার ভড়াই কত। হাউস দেকে বাঁচি নে। 'এক্‌বার রান্নাটা যদি—আমার রান্না খাওয়ার জন্য কপাল চাইয়ে, বেটি। কি রকম বাজে মেয়েনোক বোঝ—নক্‌খি। এত্‌খন ধরে তারে যে আপনে-আপ্‌গে করে গেলাম, হাত দুখান জড়ায়ে ধরে, কাঁদে-কাঁদো হয়ে বলবি—বলতি হয়—যে, ভাই, তুমি বার আমি দুজনাই খেটে খাওয়া নোক, মনে করো না কিছু, জেন্দাবাদ। তা না, বল, নক্‌খি—'

আবার সেই গুনশান পুরী। এত বড় আকাশে কতটুকু সূর্য শুধু আলো জ্বেলে রেখেছে। দিদিমা বলে, দিন-লণ্ঠন। আর চাঁদ হচ্ছে, রাত-কুপি। এই লণ্ঠন আর কুপির কোন খাজনা নেই, মিটার মিলিয়ে—কি, তাতে কারচুপি করে—বিল মেটানো নেই। এদের কাছে গরিব, বড়লোক বলে কিছু নেই যার যেমন দরকার, নাও, ভোগ কর। করছে সারা 'পৃথিমির লোক।

এই যে সল্টলেক—মাসির 'সল্লেক'—ধুমসোপানা সব বড়লোকদের হুড়োহুড়ি যেখানে, কত খ্যাম্‌তা তাদের, কিন্তু এই সাবেক লণ্ঠন বা কুপির বাড়তি আলো—ভয়ে বল, দুষে বল—তাদেরও পাবার জো নেই।

'বুজেছিস, নক্‌খি, পেয়েছ এক মধুর চাক, সল্লেক, মাছিরা সব ঝাঁপিয়ে পড়েছে—ভিন্‌ ভিন্‌ভিন্‌ভিন্‌.... যা, নাগে কেমন, বোঝ একন। এক্‌বার রান্নাটা—'হঠাৎ গলা তুলে চৈচিংকারে কেটে পড়ে, 'তোর রান্না করার জন্যে রতু ঠাকুরের জন্ম হয়নি রে বজ্জাত—'

লক্ষ্মি হেসে ফেলে, 'যাকে ধমকাচ্ছ, তার উনুনের আঁচ এতক্ষণে গনগন হয়ে উঠেছে, দেখগে—'

'বলছিস।'—রতুর চোখজোড়া খুশিতে জ্বলে ওঠে।—'তুই বেটি 'ভেগ মাস্টারনি', আমারে রান্না করে ঢুকোতে চাও। হচ্ছে, তোমার, 'সবুর।'

'আচ্ছা, মাসি—'

'হুঁ—'

'লেক মানে তো—'

'শোন, মা'— রতু কথার ওপর কথা চাপিয়ে লক্ষ্মিকে আটকে রাখতে চায়।—'পড়াশুনা

প্যাটে যদি কিছু থাকত, তালে পতে পতে তোমাকে নিয়ে ঠেঙিয়ে বেড়াতাম না মা। ওই যে হুস করে চলে যাচ্ছে গাড়ি চেপে বজ্জাতেরা, তার একখানাথ তোকে চাপে হাওয়া খেতাম। শোন, ওই লেক মানে কি—তবে, এটাও সত্য কতা, আমি তো জানিই নে, স্বীকার করছি।—এহানকার সত্তর ভাবা লোক জানে না, লেক মানে কি—?

'আমি তো ষ্যান পড়েছি মনে হয়, চাদ্দিকে জল মধ্যিখানে—'

'ও আমিও জানি।'

'তাহলে চাদ্দিকে জল কই—'

'ওরা সব এহন আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। একবার নামতে দে, দেকবি, চাদ্দিকে জলে জলে জলাশয়। সাপ, ব্যাঙ, মাছ, মানুষ সব সাঁতার কাটছে সড়েকের রাস্তায়, পুখরে না। বড় মানবের কি নরাদাশা রে মা,যদি দেকতিস। চাপ মোটর গাড়িতে, ডুব সাঁতারে গিয়ে পড়বি বম্মার' 'কমন্ডলুতে'

'সেটা কি গো?'

'আরে বেটি, বম্মা যেটা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। থাকার মদ্যি তার তো ওই কমন্ডলুই আছে একখান—আর এক জোড়া ধুতি। একখানি পরে,। অন্যখান শুকায়।'

'বৃষ্টি-বাদলার দিনে সেখানা যদিনা শুকায়, মাসি?'

'খাড়া ন্যাংটা।'

মাসি—বোনঝি দুজনেই হেসে ওঠে।

'যাক্গে। সে ন্যাংটাই থাক, কি নাম্বা ইন্জের পরেই থাক, তোরই বা কি।

আমারই বা কি—'

ঠিক তখনই ভয়ংকর এক চিৎকার করে, যেন না ডুব সাঁতার কেটেই', হামলে পড়ল উলো 'মাসিগো—'

রতু ভয় পেয়ে সরে যায়, গলা বাড়িয়ে তরাসে গলায় বলে, 'কে রে, অই!'

লক্ষি চাপা গলায় ফিস্‌ফিস করে, 'ওই যে গো মাসি, উলো, না মুলো, তার একজন—

উলো প্রবল বেগে হাত-মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'না, না গো, মাসি—মেয়ে তোমাকেও বলি—আমি উলো, মুলো নই গো। সে বোদায় এতক্ষণ—'

রতু ধমকে ওঠে, 'চোপ! তোমার প্যাঁচাল শোনার সময় নেই আমাদের। ওঠো, কি হলো, ওঠো। পুলিশ ডাকতে হবে?'

পুলিশের নাম শুনেই বুঝি, তড়াক করে উঠে পড়ে। পারলে, রাস্তার ওপরই ঘাড় গুঁজে দেয়।

'শোন, বাপু, তুমি উলো তো? বেশ। ভেড়া প্যাঁচাল রেকে টুক করে কতাখান যদি বলতে পার তো বল।'

'তা বলব বলেই তো—'

'আসল কতা—

'আসলে হয়েছে কি—'

'নক্ষি, পা চালা—'

উলো, ভেতরকার কী এক চাপে যেন, হাওয়া গুলিয়ে ফেলে। কিছু বোঝার আগেই খপ করে রতুর কাঁধ চেপে ধরে। রতু হকচকিয়ে গেলেও লক্ষ্মি চেঁচিয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। তখনই কাছেভিতে গাড়ির গড়ানে আওয়াজ শোনা যায়। তা শুনেই বুঝি উলোর গা ছেড়ে দিল। হচরপচর করে অনেক কিছু বলতে চাইল, কিন্তু তা থেকে বোঝার মত কথা বেরল খান কয়েক মাত্র।

—'পুলিশ, মাসি, পুলিশ—'

রতু ফেটে পড়ে, 'কী, আমি পুলিশ—হাত উঠা—'

'ওঠালাম। জিপ এসে পড়ল। হাস, হাস—'

'কী—'

'হি-হি- লক্ষ্মি দিদি, হি-হি—'

'লক্ষ্মি তোর বোন বাপ জেলে দিদি, উহু—

'বাপই হলো—হি-হি—'

তখনই বিমধরা পুরীতে কাঁপন ধরিয়ে ছুটে আসে একখানা জিপ। উলো চোখ বুজে ফেলে, ভেতর থেকে শুধু বগ্‌বগ্‌ করে, বলকে বলকে বেরতে থাকে।

'হি-হি—'

জিপের আওয়াজ থিতিয়ে গেলেও সে চোখ খোলে না। ফিস্‌ফিস্‌ করতে থাকে, 'জিপ কি দেখা যায়, মাসি? হি-হি। ইবার ধরতি পারলে তিন বছর—হি-হি—জয় মা, নজর সরাস নি, হি-হি—লক্ষ্মি দিদি, 'সল্ট লেক দেখতে শাদা, ঝক্‌ঝক, চৈনোপাল মাজা, কিন্তু ভেতরে—হি-হি—'

আর না শোনা গেল কোনো কথা, না শোনা গেল কোনো শব্দসাড়া। যেন বা হাওয়ারই মিলিয়ে গেল সে, উলো।

চুলের মত সরু আলোর একটা রেখা লক্ষ্মিকে জ্বালিয়ে মারে রাতভোর। তার সারা মুখে অদৃশ্য সব আলপনা এঁকে যায় সে। রেল লাইনের বাঁ দিকের ঢালে গজে ওঠা ঘরগেরস্তির পা ঘেঁষে চলে গেছে ইলেকট্রিক তার। সেখান থেকে ঝাঁপ খেয়ে নেমেছে, এখানে-সেখানে, বাল্‌ব আর 'ইস্টিক'—লাঠি-আলো। তার কোনো একটি লাঠি থেকে বেরিয়ে আসে রেখাটি। সারা রাত জায়গাটি জুড়ে শব্দেরা করতাল পিটে যায়, আর তার সঙ্গে তাল দিয়ে নেচে যায় আলোর সেই বিন্দু। শব্দেরা ধীরে ধীরে মরে যেতে থাকে, মরে যায়। আর অন্ধকার ঘন হয়ে এলে বিন্দুটি টুপ করে ডুবে যায়। লক্ষ্মিও তলিয়ে যায় ঘুমের জগতে—

'এই যে, ইদিকে' কেউ চেঁচায়।

লক্ষ্মি এগোতে থাকে ঘন কালো জল কেটে কেটে।

'ধরব?'—

'তুমি কে? অজানা পুরুষ আমার গায়ে হাত ঠেকালেই আমি পাতর হয়ে যাব—'

'যদি চেনা হই?'

'ভালোই তো, ভালোই তো। উঠবার মন করে। কিন্তু উঠে যাব কই? যেদিকে চাই, মনে হয় য্যান পাষাণপুরী। সব পাথ্‌তর দিয়া তৈরি—'

'হাড়ও হতে পারে—'

'এই, অকথা না। হাড়, কার হাড়?

'দ্যাখ, এই সাপ-সুপ দু-চারটে জীব বাদ দিলে আর সকলেরই তো হাড় আছে মনে হয়। কত চাই? তবে, কন্যা, মানুষের হাড়ের কাছে—না, না—কেউ লাগে না—তালে শোন। সে অনেক কাল আগের কথা। এই যে জায়গাটা, এখানে তখন ছিল সমুদ্দুর, চারদিকে জল শুধু জল। একদিন, রাত প্রায় পুইয়ে এসেছে, হঠাৎ, সাগরের জলে উথালপাথাল। কী, কী, ব্যাপার কী? চারদিক থেকে দত্যিদানবদেবতা'দেবৃত্তি' সব ছুটে এল। তাদের দেখে, জল তোলপাড়, দুপাক চিত সাঁতার কেটে সে বলে, 'ভগবান কই?' ভগবান বললেন, 'এই যে। বল।'

'আমার নাম সিন্ধুঘোটক। বুঝেছেন?'

'হুঁ। তো?'

'সিন্ধু—মানে', কী?'

'ভগবান ঘাবড়ায়। 'তোর কাছে আমার পরীক্ষা দিতে হবে, বাচাল!'

'থাকগে। সিন্ধু হল সমুদ্দুর—'

'ধুর, বজ্জাত!'—সমুদ্র ঝামটে ওঠে।—' সিন্ধু হল চ্যাংড্যাংয়ে একখান নদী—'

'নদী।'—ভগবান শুধরে দিলেন।

'হল। অঃ। নত'। ওঃ!'—তারপর, স্বাভাবিক গলায় 'ঘোটক—সে কী করবে? সাঁতার কাটবে, জীবনভর? হ্যাঁ!'

'কাটবে। 'অত কথা কীসের?' ভগবান চটে গেলেন।

'ঘোটক মানে তো ঘোড়া, চার ঠ্যাংঅলা দৌড়বাজ। কী?'

'ভগবান দেখলেন, সকলের সামনেন মানসম্মানের টায়ার পাংচু! বললেন, 'দৈত্যরাজ, কেইসটা একটু দেখ তো ভাই। আমি এই গেলাম—' বলে তিনি গেলেন।

'দৈত্যরাজ তাকে কাছে ডাকলেন, কাছে এলে বললেন, খাটো গলায়, 'কি চাও। আগের কথাখান হচ্ছে, দেয়াথোয়ার হাত কেমন?'

'কার?'

'আমার। বদমাস, খচ্চর, বজ্জাত—'

'অ, বুঝেছি। বলেন, কী চান?'

'ডা। তুমি বলো তো, বাবা, কি চাও?'

'আমি চাচ্ছি, ঘোড়ার মত চারখানা পা হোক আমার—'

'আর?'

'জলগুলো কেচেকুচে হিমালয়ের ওপরে ঠেলে তুলে দ্যান, সেহানে তারা বরফ হতে থাক—'

'আর?'

'জল সরে গেলে যে মাটি বেরবে, তা হবে আমার। আমার ইচ্ছে মত আমি চবে বেড়াব'—

'ঠিকাছে। জলের প্রাণী স্থলের অধিকার চাও? বদলে? আমার কথা ছাড়ান দেও। কিন্তু ভগবান, জানো তো— ওই তিনি এসে গিয়েছেন—'

'তারপর, তারা দুজনে কানে কানে কিছু বলা-কওয়া করলেন। করে, 'ভগবান সিন্ধুঘোটককে বললেন, 'জল টান দিলে শেষতক এখানটার যা চেহারা দাঁড়াবে, তাকে বলা হবে হ্রদ বা দহ। পরে তা লেক বা সল্টলেক হবে। বুঝেছ? শান্তি?'

'তা, মন্দ কী—'

'এই হল সল্টলেক, সরোবরের ইতিবৃত্তান্ত।'

আসলে, হাড়ের পুরী। কথা ছিল পাষাণপুরীর। কিন্তু অত পাথর জোগাড় করা কি চাট্টিখানি কথা নাকি। তখন, এই সময়ের চালু ভগবান, পার্টির নানা কদমের হ্রীং-পুং নেতারা, মাথায় মাথা ঠেকিয়ে—না, মন্ত্র না—মন্ত্র পড়ার কালতু সময় মানে, যে-সময় সোনার ডিম বিয়োয় না, সেই বাঁজা সময় নিয়ে তাদের কোনো ঠেকা নেই— তো না, মন্ত্র না, মন্ত্রণা করে ঠিক করলেন, পাথর নেই তো কী। পরিবর্তবৌপদের টন টন আনইউজড্‌ হাড্ডি—আনইউজড্‌ মানে, অ-অ—ঝাড়ু মার—ক্লাস ওয়ান থেকে ইংরাজি, তাতে কিছু হয়। গর্ভধারণ কালীন মায়ের চারপাশে নেচে নেচে পুথিদের খোঁজ খবর নেয়া হোক, এই পড়াপাঠের কল্যাণে এক একজন তারক সেন ভূমিষ্ঠ হবেন যথাসময়ে। তা না—ধুর।

যাকগে।

'আনইউজড্‌, মানে, অ, অ—অইউজড্‌ হাড়গোড় দিয়ে কত রকম ঘরবাড়ি, সৌধই না তৈরি করা যায়, তার দৃষ্টান্ত হয়ে রইল নুনের এই দহ।'

এই পাষাণপুরীকে সকালময়ই মনুষ্যবর্জিত বলে মনে হয় লক্ষিন্দর। মাটি কালো হতেই অনাথা দুই কুমার তাকে ডাকতে থাকে—'লক্ষি এই যে আমরা—'

লক্ষি সাড়া দিতে চায়, তার মত আরও অনেকে হয়তো, পারে না। দম ফুরিয়ে যায়। তবু, কী এক মুগ্ধ প্রত্যাশায়, রাত ভোর এই পাষাণপুরীর পথে তার হেঁটে চলা।

ঠাকুমার কাছে শুনেছিল, আর এক পাষাণপুরীর কথা যেখানকার পথঘাট ঘরবাড়ি রাজসভা সিংহাসন ঘোড়াশাল গোশালে যাদের যেমন থাকার কথা, সবাই আছে ঠিকঠাক। এখানকারই কোনো এক প্রকোষ্ঠে শৈথানে আর পায়ের কাছে দুই জাদু কাঠি নিয়ে ঘুমে অচেতন রাজকুমারী। রাজকুমারের ছোঁয়ায় জীবনের বান ডাকবে এখানে। তার ডাক লক্ষি শোনে, সারারাত—

পাষাণপুরীর জীবনে ফেরার ডাক—

# সৃষ্টিকথা

## রামকুমার মুখোপাধ্যায়

জল, জল, জল। শুধুই জল। জল দোলে, জল ছোটে, জল লাফায়, জল ভাঙে, জল গড়ায়। সীমা-সীমান্তহীন অকূল এই দরিয়ায় একটাই স্বর, একটাই ধ্বনি—সাগরবারির। সাত সমুদ্রের অতল নীল স্রোত গর্জায় অনন্ত আকাশ ছুঁয়ে। সে আকাশে কোনো আলো নেই, নেই একবিন্দু আলোক-দানাও। নিকষ কালো আঁধার উপুড় হয়ে আছে উত্তাল নীল সপ্তসাগরের ওপর।

স্রষ্টা তাকিয়ে ছিলেন তাঁর সৃষ্টির দিকে। এ-প্রকৃতির একটি আপন রূপ আছে কিন্তু তা বড়ই আদিম। সিন্ধুর একটিই স্বর, গর্জনের। সেই নাদে কাঁপে ত্রিভুবন। অথচ এমন তো হতে পারে যে ওই জল ভিন্ন ভিন্ন সাত স্বর, সাত সুর তৈরি করবে। সে স্রোত গড়িয়ে যাবে ঝিরিঝিরি, বয়ে যাবে কুলকুল, প্রবাহিত হবে কলকল, উচ্চ থেকে নেমে আসবে ঝরঝর। কোথাও দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে কারো সঙ্গে হেসে উঠবে খলখল। বর্ণও হতে পারে এক-একক-অদ্বিতীয় নীলের পরিবর্তে বিভিন্ন, বিচিত্র, বিবিধ। আর সাগরকোলের ওই নিরালোক গগনটিও যদি হয়ে ওঠে দৃশ্যময়! ঘন বর্ষণে খানিক আঁধার ঝরে গেলে তরল অনন্তরাত্রির ওই ঘন স্বর, ফুটে ওঠে আলো-আঁধারের কোনো দৃষ্টিসুন্দর ছবি!

স্রষ্টা তাতারা রাবুগার বাসনা জাগল ওই আঁধার ওই জলরাশিতে জন্ম নিক পৃথিবী। প্রাণস্পন্দন জাগুক। কিন্তু জন্ম দিতে পারে একমাত্র নারী, যে ধারণ করে জরায়ু। সৃষ্টির সব ধারণ ও বৃদ্ধি ওই উষ্ণ গর্ভাশয়ে। তাতারা ফিরলেন নন্তু নোপান্তর দিকে। নন্তু সুকেশী, গৌরবর্ণা, সদা হাস্যময়ী। তার মুখখানি শুভ্র, অন্তর উষ্ণ, ত্বক কোমল, দেহ প্রাণচঞ্চল। তার চোখে আছে স্বপ্ন এবং হৃদয়ে আনন্দ। তাতারা তাকে বললেন, এক নতুন জগৎ সৃষ্টির কথা ভাবছি। সেখানে সাত রং ও সপ্তসুরের সমাবেশ ঘটবে। যদি তুমি সেই মৃত্তিকা ধারণ করো আপন দেহে তবেই তা সম্ভব।

নন্তু তাকায় নিচে। সেখানে এক উত্তাল সাগর আর এক কাজল-কালো আকাশ। পা রাখার মতো এক চিলতে তৃণভূমি, একখণ্ড পাথর বা এক বিঘত বালুচরও নেই। নন্তু ফেরে তাতারার দিকে।

তাতারা তাকিয়ে দেখছিলেন সামনের বোলং গাছটিকে। দীর্ঘ সেই গাছের ডালে গান গাইছিল এক দোচেলো পাখি। সেই গান শুনতে শুনতে একটা মাকড় পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত দু-ডালের মাঝে জাল বুনছিল। ওই বোলং গাছেরই ওপর শাখে বাসা গড়ছিল একজোড়া বাবুই। কিন্তু মাকড়ের কুঠিটির মতো হাত-পা ছড়ানোর অত জায়গা ছিল না সেখানে। মাকড়ের বসতটিতে যত রোদ তত হাওয়া। এত কুঠুরির কোঠা আর কারো নাই আকাশধামে। সেই মাকড় তাতারাকে বলল, দেবী নন্তুর জন্যে আমি একখানি বাসস্থল গড়ে দিতে পারি। সেটি ঝুলবে সাগরের ওপর কিন্তু জলের ঝাট লাগবে না। নিজের

ইচ্ছে হলে অবশ্য হাত দিয়ে ছুঁতে পারবে। আঁতুড়গৃহটি বড় করে দেব, দক্ষিণমুখী, জাতকের জন্যে একটি কুচো দোলনা বানাবো, দুলবে-হাসবে-খেলবে।

দোলনাটি ভালই বানাল মাকড়, ভাই-ভায়াদদের নিয়ে। স্বর্গের এদিকে দু-খুঁট, ওদিকে দুই—মাঝটি নামিয়ে দিল আঁধারের ভেতর দিয়ে সাগরের ওপর। বেশ সময় লাগল, বুনতেও হল অনেকখানি। সাগরের এদিক-ওদিক দুটো পাহাড় থাকলে কাজটি সোজা হত, টেনে দিত লম্বা। দুটো গাছ থাকলেও হত, জুড়ে দিত। তবে পাহাড় কিংবা গাছ মিললে মাকড়দের দরকারও হত না। গর্ভাধান, গর্ভলালন এবং গর্ভ-খালাস সবই হয়ে যেত পাহাড়চূড়ায় কিংবা গাছের ডালে মাচা বেঁধে। তবে মাকড়গৃহের মতো এতগুলি কুটুরি থাকত না তাতে। তখন প্রসবগৃহেই বাস, আঁতুড়ঘরেই খালাস। নস্তকে দোলা দিয়ে মাকড়দল বলে, দোল খাও আরামে, দোল দিও আয়েসে। জাতকটি রূপবতী ও ভাগ্যবতী হোক।

দোলা দিয়ে চলে গেল মাকড়ের দল। নস্তর বেশ আরাম লাগছিল শুয়ে। মাঝে মাঝে পদ্মকলির মতো আঙুলগুলি দিয়ে স্পর্শ করছিল সাগরের জল। শীতল হাওয়ায় ঘুম নেমে এল চোখে। স্বপ্নে দেখে তার জরায়ুজাত সন্তান হামাগুড়ি দেয়, হাসে, হাঁটে, লাফায়, ঝাঁপায়, নৃত্য করে। হঠাৎ শিশুটি ছুটে যায় সাগরপানে। চমকে ওঠে নস্ত। ডুবে যাবে। অঘোর ঘুমে চিৎকার করে ওঠে, 'ফিরে আয়।' ঘুম ভাঙে, কপাল জুড়ে ঘাম। উঠে বসতে যায়। পারে না। পারার কথাও নয়। গর্ভবতী নারীর বিশ্রামের কথা ভেবে মাকড়েরা কেবল শয্যারই রূপ দিয়েছিল নস্তর আবাসটিকে। শুয়ে শুয়ে গর্ভাধানের আগেই পৃষ্ঠদেশের ব্যথায় অর্ধমৃত স্বর্গসুন্দরী নস্ত।

দয়া হয় স্রষ্টার। তিনি সাগরজলের ওপর খানিক স্থল সৃষ্টি করলেন। কিন্তু তা তৈরি হল সাগরবালুকার ওপর। ফলে তরুণী নস্তর তার ওপর দাঁড়াতেই টলটল করে ওঠে পায়ের তলার বালি। সাতসাগর ঘেরা ওই ভূখণ্ডটিতে শারীরিক নানা মুদ্রা গড়েও দাঁড়াতে পারে না। আবার ফিরে আসে মাকড়শয্যায় এবং ধীরে ধীরে শয়নের নানা ভঙ্গী আয়ত্ত করে। অভ্যস্ত হয় নতুন দেহ আঙ্গিকে।

কিন্তু শয়ন উপলক্ষ মাত্র—লক্ষ্য পৃথিবীর জন্ম, ধরার সৃষ্টি। নস্ত কর্কটকে ডেকে বলে, খানিক মাটি আনো তো সাগরতল থেকে। অষ্টভুজ এমনভাবে তাকালো যেন এমন তুচ্ছ কাজের জন্যে তাকে কেন ডাকা। দাঁড়াগুলিতে খানিক ধারধুর দিয়ে ডুব দিল টুক করে। ডুবলো তো ডুবলোই, ফেরার নাম নেই। নস্তর গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠা পাবে নতুন গ্রহ কিন্তু মৃত্তিকা নিয়ে ফেরে না কর্কট। একসময় এল কিন্তু হাত ফাঁকা। বলে, সাগরের তল বলে কিছু নাই। জলের নিচে জল, তার তলে জল। আর সর্বক্ষণ একটা খলখল শব্দ ওই অতল সিন্ধুতে।

নস্ত হাসে। বড়রা বড় সতর্ক, হিসেবি, সাবধানী। নস্ত ডাকে একটি ছোট কর্কটকে। চেহারা ছোট হলেও নামটি তার বেশ বড়—টিপং নোকম্মা বেলপং পিতেল। নস্ত তাকে বলে, যাও তো বাছা, খানিক মাটি আনো সমুদ্রতল থেকে।

টিপং বেশ কিছুক্ষণ বেড়ায় এধার ওধার। ঢেউয়ের আগায় চড়ে দোল খায়। ভাবে একশ্বাসে চলে যাবে সাগরতলে। দু-দাঁড়া মাটি তুলে ভেসে উঠবে ওপরে। দাঁড়ার মাটি নিয়ে ধরা গড়বে দেবী তার উদরে। মুল দাঁড়া দুটি আকাশের দিকে তুলে সাগরতলে চলে টিপং। খানিক নেমে দেখে আবার জল। তারও তলে জল। তারও তলে....। সত্যিই ভয় পায় সে। টান পড়ে শ্বাসে। গুটিয়ে নেয় দাঁড়া। ভেসে ওঠে সাগরের ওপর। শ্বাস টানে বুক ভরে। বলে, সাগরতলের মাটি ধুয়ে গেছে জলে।

একটা কাচপোকা কাণ্ড দেখছিল কর্কটদের। ভয়কাতুরে বলেই ওদের অত দাঁড়া, ওরা অমন অস্ত্রধারী। সে রাজি হল সাগরতলে যেতে। বার দুই নোনাজল খেয়ে সামলে নিল নিজেকে। তারপর ডানা দুটি দিয়ে জল কাটতে কাটতে নিচে চলে। দম ফুরোলে খানিক থেমে আবার নামে। চলতে চলতে এক সময় সাগরতলে। এক চিলতে মাটি তুলে পাকায় গোল করে। তারপর গড়ায়। মাটির ওপর মাটি জমে। জমতে জমতে এক তাল। তারপর সেই তাল গড়াতে গড়াতে তুলে আনে আকাশপথে। একসময় হুশ করে সাগরের ওপরে। মৃত্তিকাখণ্ডটি নস্তুর দিকে তুলে ধরে বলে, নাও, ধরো। গড়ো তোমার সাধের ধরণী।

গর্ভাশয়ে মৃত্তিকা ধারণ করে, লালন করে, পালন করে একদিন জন্ম হল ধরিত্রীর। আকারটি বৃহৎ শিলাখণ্ডের মতো। তার দু-দিকে দুই শৃঙ্গ। শৃঙ্গ দুটির মধ্যে বড়টির নাম মাজর, ছোটটি দিনজর। আর ধরিত্রীর নাম হল 'মানে পিলতে'। দিন গড়ায়, বড়ও হয় পিলতে কিন্তু দেহটি বড় তুলতুলে। পাহাড় অত নরম হলে চলে। তাতারাকে সে কথা বলে নস্তু। স্রষ্টা দেখে সত্যিই বড় জলের আধিক্য শরীরে। অতকাল সাগরতলে থাকলে যা স্বাভাবিকও। কিন্তু কী করে শুকোবে ওই জল? স্রষ্টা গড়লেন সূর্য। ডান হাত দিয়ে তুলে বসিয়ে দিলেন আকাশে। বললেন, তাপ আর আলো দাও তো হে। সূর্য তপ্ত হল। ধরিত্রীর শরীর থেকে জল উঠতে লাগল বাষ্প হয়ে। বায়ু বইতে থাকল দ্রুত। মাটি ও পাহাড় শক্ত হল। সূর্যের আলোয় কেটে গেল অনন্ত আঁধার। আলোয় ভাসতে লাগল চারপাশ। কিন্তু এত আলো হলে আঁধার যাবে কোথায়? তারও একটি বাসস্থান দরকার। তাই সৃষ্টি হল রাত্রি। তার সঙ্গে চাঁদ-তারাও, যাতে পথচলার আলোটুকু মেলে।

ক্রোড়ের শিশু কোলে থাকে না, কাঁখে চড়ে, কাঁধে চাপে। শিশুও একদিন বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছোয়। ধরিত্রীও একদিন রজস্বলা হল। স্রষ্টা সৃষ্টি করলেন মেঘ, সেটি হল তার পরিচ্ছদ। কিন্তু একবর্ণের এক-দুখানি মেঘে শরীর ঢাকে, মন ভরে না। তাই বর্ষার মেঘমালা অঞ্জন, শরতের শ্বেতশুভ্র, হেমন্তের ধূসর, শীতের নীলাভ, বসন্তের হলুদ, গ্রীষ্মের গৈরিক। কাঁচুলিও লাগে। তাই হিম, শিশির, কুয়াশা। কিন্তু নারীর রূপ তার কেশে। বটবৃক্ষ ডালপালা ছড়ালো, অশ্বত্থ পাতা মেলল, বোলং মাথা তুলল, শাল শৃঙ্গ ছুঁলো, ঢেঙা সাওরি আর রিজাক গাছ চলল আকাশে। ধরিত্রী গায়ের রোম হল বাঁশরী, তিলু, কাশি, গং, শামিন ইত্যাদি নানা লতা ও তৃণ। ধরিত্রী মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ী হল।

জন্ম হয় মানুষের, নানা পশুর, পাখির, কীটপতঙ্গের। প্রত্যেকের জন্যে ধার্য হল নির্দিষ্ট কর্ম। সমস্যা হল দিন ও রাত্রির সংগমস্থলে। রাতে ঘুমোতে যায় প্রাণীকুল কিন্তু উঠতে চায় না সকালে। দিনের আলো ঝলমল করে তবু চোখ খোলে না কারো। মুরগি-মোরগদের ডেকে বলা হল ভোরবেলা সবাইকে তোলার দায়িত্ব তোমার। ঘরের ভেতর থেকে ডেকো না, ঢুকবে না ঘুমকাতর প্রাণীকুলের কানে। পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে কিংবা বাড়ির চালে উঠে আকাশপানে তাকিয়ে গলা ছেড়ে ডাক দিও। কিন্তু মোরগ-মুরগিদের জাগিয়ে রাখবে কে? সারমেয়গুলিকে বলা হল তুমি রাতে ডাক দিও মাঝে মাঝে। ঘুমের ফাঁকে ফাঁকেই ডাকবে কথা হল। কিন্তু ডাকল কি ডাকল না সেটি দেখবে কে? সে দায়িত্ব পড়ল পেচকের ওপর। দেখার সুবিধের জন্যে চক্ষু দুটি গড়া হল গোল এবং বাতিও বসানো হল ভেতরে। সেই আদি হিসেবমতো কাজকর্ম চলেছে এখনো।

পাহাড়-জমির প্রাণগুলি সৃষ্টি করে স্রষ্টা তাকালেন বৃক্ষগুলির দিকে। অমন সবুজ পাতা, হলুদ ফুল, লাল ফল, মুকুলের সুবাস, রাস গড়ার বৃক্ষ-কোল কিন্তু বড়ই নিঃসঙ্গ, একা। তাতারা গড়লেন সবুজ টিয়া, কালো কোকিল, খয়েরি শালিক, হলুদ টুনটুনি। তারা সুর ভাঁজতে লাগল গাছের ডালে বসে। পেচক অবশ্য সৃষ্টি হয়েছিল কিছু আগে। তাই বয়সে খানিক বড়, বিদ্যেতেও। জ্ঞানবৃদ্ধ বলে মানে সবাই। সারসও অবশ্য জ্ঞানী এবং ধ্যানী কিন্তু বড় বেশি রসনা-রসিক। চোখ দুটি সর্বদা মীনে বদ্ধ। বেশ কিছু বুনো ঘুঘুও বানালেন তাতারা যাতে বনে ঢুকলে শুধু কাঠঠোকরার ঠকঠকানি না শুনতে হয়। ময়ূর সৃষ্টির কাহিনিটি অবশ্য ভিন্ন। এক গাঁয়ে একজনের পরমাসুন্দরী একটি কন্যা ছিল। তাকে তার বাবা এনে দিয়েছিল দেবীদের পোশাক। একদিন সেই মেয়ের বিয়ে হল এক রূপবান ছেলের সঙ্গে। সুখেই সংসার করছিল তারা। একদিন নদীতে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় মেয়েটি ছেলেটিকে বলল, 'জামাকাপড় শুকোতে দিলুম। তুমি তুলো না, ঝড়বৃষ্টি এলেও না। বিপদ ঘটবে।' মেয়েটি চলে গেল। বেশ অনেকক্ষণ পরে মেঘ জমল আকাশে। শিলাবৃষ্টি শুরু হল। বাড়ির পথ ধরল মেয়েটি। হঠাৎ দূর থেকে দেখে তার স্বামী কাপড় তুলতে যাচ্ছে। স্বামীটি ভেবেছিল তার স্ত্রী মিথ্যে ভয়ে তাকে কাপড় তুলতে বারণ করেছে। মেয়েটি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসে কিন্তু ততক্ষণে স্বামী ছুঁয়ে ফেলেছে সেই কাপড়। পরে মেয়েটিও ধরে ফেলে। দেখতে দেখতে তারা দু-জনে হয়ে উঠল ময়ূর আর ময়ূরী। স্বামী আগে ছুঁয়েছিল বলে তার গায়ে বেশি পালক, স্ত্রীয়ের কম। এখনো বৃষ্টি এলে ময়ূর যে কাঁদে তা ওই দুঃখ দিনের স্মৃতিতে।

তাতারা জলেও সৃষ্টি করলেন বেশ কিছু প্রাণ। এর মধ্যে প্রধান হল নানা প্রজাতির মাছ—ইলিশ, তেলাপিয়া, চিংড়ি, পার্শে। সাগরজলে খেলে বেড়ানোর জন্যে গড়লেন বেশ কিছু দীঘল সাপ। কিছু লতাগুল্মও তৈরি করলেন সাগরতলের জন্যে। লতাপাতা গাছগাছালির সঙ্গে থাকলে মন ভালো থাকে, চোখও। কিছু জলকীটও বানালেন, তাদের ছোট ছোট পা ও ডানার নানা কসরৎ দেখতে।

কিন্তু এসব তলার সাগরের কথা, পৃথিবীর ওপরে সবাই খাঁ-খাঁ ডাঙা। স্রষ্টা ডাকলেন জলদেবী কিৰ্মি বোকরেকে। বললেন, পৃথিবীর ওপরে জলের কিছু ব্যবস্থা করো। তাতেই তৈরি হল ঝর্না, নেমে এল পাহাড় থেকে। কোথাও আবার ঝিরি ঝিরি ঝরে এল ঝরা। নদীও গড়িয়ে এল কুলকুলু। পরে পরে ঝিল, পুকুর, ডোবাও হল। সে সবে আবার নতুন জাতের মাছ ছাড়লেন তাতারা—রুই, কাৎলা, মৃগেল, আড়, ট্যাংরা, কই, মাগুর, সিঙি। পদ্ম, শালুক, জলশিউলি ফুটল ঝিলঝিলে। গেঁড়ি-গুগলিও এল। আর এল লম্বা-পেয়ে জল-মাকড়। দিনরাত পুকুর-ডোবার এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক। মাঝেমধ্যে এক দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখে নেয় শালুকডাঁটির তলে, জলটোড়াটা পুঁটিমাছ গেলে নাকি নিরামিষ খায়।

সবই হল কিন্তু অসুবিধে থেকে গেল একটাই, ঝড় বৃষ্টির। জুম থেকে ফিরছে, হো-হো করে বৃষ্টি নামে। ধানগুলি সবে শুকোতে দিয়েছে রোদে, ভেসে গেল স্রোতে। আঁতুড়ের ছেলেটিকে শুইয়েছে উঠোনে, ভিজে চান শীতের সকালবেলা। ঘরে ফিরছে সন্ধেবেলা, আকাশ ভাঙা বৃষ্টিতে আটকে গেল নদীর ওকূলে। তাতারা দেখলেন এবং বুঝলেন ঝড়বৃষ্টির আগাম খবর পাওয়া উচিত প্রাণীকুলের। সৃষ্টি হল বাজ-বিদ্যুৎ। বৃষ্টি হওয়ার আগে প্রথমে খানিক আলোর ঝিলিক, মেঘ গুড়গুড়। যে চোখে দেখে না সে শুনবে শব্দ, যে কানে শোনে না সে দেখবে আলোর আগাম সতর্কবার্তা, ছাগল মুখ তুলবে ঘাস থেকে, বাছুর লেজ তুলবে পিঠে, মানুষজন ধান-গমের বস্তা তুলবে মাথায়, বৌ-ঝিরা শুকনো কাঠ ঢোকাবে ঘরে, বাবুই ঢুকবে বাসায়, কইমাছ তৈরি হবে খেজুরগাছে ওঠার জন্যে। সবাই যে যার মতো গুছিয়ে নিল বৃষ্টি নামার আগে। শুটকি মাছগুলি তিন পশলা বৃষ্টির পরেও ধামার ভেতর তেমনই টাটো, কড়কড়ে।

দিনের সমস্যা মেটে কিন্তু ঋতুর অঘটন লেগেই থাকে। শীত-গরমের পরে কখন যে হঠাৎ বর্ষাকাল শুরু হয় কেউ বোঝে না। গরম কাটতে না কাটতে একদিন পাহাড় চুড়োয় জড়ো হল পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। বৃষ্টি নামল অঝোরে। দিন যায় রাত আসে কিন্তু বর্ষণ থামে না। যদিও থামল কদিন পরে কিন্তু আধবেলা রোদ থাকতে না থাকতে আবার কালো মেঘের আনাগোনা। পাখির বাসায় জল পড়ে, গরুর গোয়ালে বৃষ্টি ঝরে, উনুনের ভিজে কাঠে শুধুই ধোঁয়া, বাচ্চার ভিজে কাঁথা ঢাঁই করা। তাতারা দেখলেন, যুক্তি করলেন নস্তুর সঙ্গে। বর্ষা আসার খবর প্রাণীকুল খানিক আগে পেলে খড়কুটো দিয়ে নতুন করে ছেয়ে রাখতে পারে ঘরগুলি, বীজতলায় বুনতে পারে ধান, সঞ্চয় করে রাখতে পারে জ্বালানি, শুকিয়ে রাখতে পারে মাছ, শান দিয়ে রাখতে পারে লাঙল-কোদাল-খুরপি, পাথর দিয়ে বাঁধতে পারে চানের ঘাট। কিন্তু আগাম সংবাদ দেবে কে? জগৎ হাতড়াচ্ছেন তাতারা। হঠাৎ চোখ যায় নস্তুর দিকে। দেখেন তাঁর ভ্রমরকালো কেশরাশি ব্যাঙ-খোঁপা করে বাঁধা। ব্যাঙই দায়িত্ব নিক। ডাক শুনে লাফাতে লাফাতে এল ব্যাঙের দল। আনন্দে গলা ফুলিয়ে ডেকে উঠল সমস্বরে। তাতারা বললেন, ক্ষমা দে বাবারা। এখনই শুরু হবে অকাল বর্ষণ।

জগৎ-সংসারের আচার আচরণ নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

২

শিলংয়ের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরা, বন ও পাহাড় ঘেরা আলোচনাকক্ষে বক্তব্য রাখছিলেন বিশিষ্ট লোকসাহিত্য গবেষক ড. মারাক। তিনি বলছিলেন যে অন্যেরা গারো বললেও নিজেদের 'আচিক মান্দে' বলে গারো পাহাড় এবং কাছাকাছি অঞ্চলের অধিবাসীরা। আর এই ভাষা বোরো পরিবারের, যা আবার ভোট-চীনীয় ভাষার অন্তর্গত ভোট-বর্মী শাখার। আচিক মান্দের সঙ্গে আর যে সব ভাষার মিল রয়েছে সেগুলি হল বোরো-কাছাড়ি, রাভা লালুং, দিমা, দিমাসা, ককবরক, দেওরি, কোচ এবং মেচ। প্রচলিত কাহিনি অনুসারে আচিক মান্দের পূর্বপুরুষেরা উত্তরের কোনো এলাকা থেকে কোচবিহারে আসে ৪০০-৪৫০ বছর আগে। কিন্তু রাজা ও তার রাজন্যবর্গ তাদের ঠেলে দেয় দক্ষিণে। বাস্তুচ্যুত মানুষরা তখন ব্রহ্মপুত্র নদ পেরিয়ে গৌহাটির কাছাকাছি অঞ্চলে গৌহর এবং দাস হিসেবে জীবনযাপন করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক খাসি রাজপুত্র তাদের মুক্ত করে এবং বোকো অঞ্চলে বসবাসের ব্যবস্থা করে। তারা আরো সরে গিয়ে বর্তমান গারো পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। বর্তমানে মেঘালয় ছাড়াও উত্তর অসম, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশেও আচেক মান্দেরা বসবাস করে।

অধ্যাপক দাশগুপ্ত বললেন যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি যখন ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় গারো পর্বতমালায় তখন থেকে ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়াও শুরু হয়। অ্যামেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা তাদের শাখা প্রতিষ্ঠা করে ১৮৬৪ সালে। রোমান ক্যাথলিক এবং সেভেন্থ ডে এ্যাডভেনটিস্টরা শাখা প্রতিষ্ঠা করে বিশের শতকের যথাক্রমে তৃতীয় ও পঞ্চম দশকে। বর্তমানে ষাট শতাংশ মানুষ খ্রিস্টধর্মীয়। লোকসংস্কৃতি গবেষকদের কাছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হতে পারে তাতারার এই লোককাহিনি খ্রিস্টীয় এবং অখ্রিস্টীয় শ্রোতা-পাঠকদের মধ্যে বিনির্মাণ পর্বে কী কী ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. দাই বললেন, শুধু ধর্ম নয় পশ্চিমী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদও লোকসংস্কৃতির অন্য এক সংকট তৈরি করেছে। লৌকিক পালা-গান-ছড়া যেখানে পরিবার এবং কৌমকে কেন্দ্রে রাখে, পশ্চিমী জীবনাদর্শ অন্য দিকে ভাবায়। বিশ্বায়নের যুগে পুঁজির বিকাশ এবং প্রযুক্তির বিস্তার আরো জটিল এক টানাপোড়েন সৃষ্টি করতে পারে আমাদের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির ওপর। এমনকি লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণের যে নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তাও অন্য এক সংকট তৈরি করতে পারে। গল্প-ছড়া-গান বিষয় ও গঠনে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে এবং নতুন নতুন কথক ও কথনের মাধ্যমে যে লোকসাহিত্য বারে বারে নতুন হয়ে উঠত তা আর হবে না।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. (শ্রীমতী) বরভুঁইয়া বললেন, হিন্দু-খ্রিস্টান-থেকে শুরু করে সাঁওতালি-খাসি-লেপচাদেরও জগৎসৃষ্টির পুরাণকথা রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পৃথিবী সৃষ্টির আগে সমুদ্রের বর্ণনা মেলে যায় জলে সব কিছু ঢাকা ছিল। পরে পাহাড় মেলে, যেমন বর্তমান লোককাহিনিতেও লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু শাস্ত্র মতে পৃথু ধনুকের

ডগা দিয়ে পাথর ও টিলা সরিয়ে বেশ কিছু পাহাড়-পর্বত এবং সমতল তৈরি করেন। তবে হিন্দুশাস্ত্রের পৃথিবী ছিল গো-রূপা আর আচিক-মান্দেতে তা দুটি খাড়া শিংয়ের চেহারা নেয়। হিন্দুশাস্ত্রের পৃথিবী গো-রূপা হওয়ার কারণে তাকে দোহন করে সতেরো রকমের শস্য এবং অন্যান্য জিনিস মেলে কিন্তু আচিক-মান্দে, যার অর্থ পাহাড়ি মানুষ, সে অত গো-পালন করে না। বরং শূকর ও মুরগি তাদের অনেক প্রিয় এবং কাছের। মুরগি নিয়ে তাদের নানান লোকগল্প এবং মুরগির ডিম নিয়েও নানা আচার ও আখ্যান। তবে বর্তমান গল্পের সবকিছু জরুরি বিষয় হল একজন নারীর আপন জরায়ুতে পৃথিবীর সৃষ্টি। আজও আচিক-মান্দে সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। হয়ত আদিপর্ব থেকে কৌমে নারীদের বিশিষ্ট ভূমিকা থেকেই এই লোককাহিনিতে নস্তুর মতো একটি জরুরি নারীচরিত্রের সৃষ্টি।

আলোচনা শেষ দিকে। অন্ধকার নামছে বাইরে পাহিন গাছের মাথায়। তেজপাতা গাছের ডালে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে সদ্য ঘরে ফেরা একজোড়া হলুদ পাখি। কানে ভেসে আসে কাছের এক ঝরার স্বর। দিনের শেষে উত্তর-পূর্ব লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ হল।

৩

বাইরে আসার পর এক বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন সামনে। বয়স আশি-নব্বই নাকি তারও ওপর কে জানে। রোগা ছিপছিপে চেহারা, থুতনিতে কিছুটা লম্বা দাড়ি আর গায়ে একটা লম্বা আলখাল্লার মতো জামা। হঠাৎ দেখলে লাওৎ-সে বলে মনে হয়। দু-দিনই এসেছেন সভায় কিন্তু কিছু বলেননি। শ্রোতাদের সামনে চুপচাপ বসেছিলেন কিন্তু শুনছিলেন বেশ মনে দিয়ে। আজ সিঁড়ি দিয়ে দু-ধাপ নেমে কী ভেবে উঠে এলেন। আমাকে নিচু সুরে বললেন, জিনিসটি বেশ ভালো হচ্ছে। দু-দিন ধরে কত গল্পোই শুনছি।

আমি প্রশ্ন করলাম, আজকের গল্পটা কেমন শুনলেন? আলোচনা ভালো লেগেছে?

বললেন, গল্পোটি আগেও শুনেছি তবে কিনা একেকজনের মনে একেক রকম গড়ন। আপনার সভাও ভালো হচ্ছে। সব জ্ঞান গুণী মানুষ, বাণীগুলিও তাই ভালো। তবে কিনা কাচপোকা, পেঁচা, ব্যাঙ, মুরগিদের কথা কেউ তুললেন না। ওরা তো, আজ্ঞে, আজও যে যার কর্ম করে যাচ্ছে। তাতারা বা নস্তুকে দেখতে পাবেন না কিন্তু ওদের পাবেন। ওই দেখুন একটা ব্যাঙ লাফাচ্ছে রাস্তার ধারে।

সত্যিই দেখি একটা ব্যাঙ রাস্তা থেকে লাফিয়ে জঙ্গলের খানায় গিয়ে পড়ল। আমি নিশ্চিত যে গেস্ট-হাউসের সামনের ঘন জঙ্গলে প্রচুর কাচপোকা, পেঁচাও মিলবে। এমনকি দু-চারটে বনমোরগও মিলতে পারে। কিন্তু বৃদ্ধ যদি গল্পের সব চরিত্র আমাকে এখন বনে দেখাতে চায় তো বেশ মুস্কিল। পানীয়ের দোকানে তালা পড়ে যাবে।

বললাম, আপনি ফিরবেন কী করে? কেউ কি নিতে আসবে নাকি হেঁটে?

বললেন, আমি নিজেই যাব। পেছনে মোষ বাঁধা আছে। ওর পিঠেই যাতায়াত করি। আপনাদের গাড়ি দেখে ভিড়কে যাবে বলে পেছনের দিকে বেঁধে রেখে এসেছি। খড় খাচ্ছে।

# মিলিটারি নারকেল

## স্বপ্নেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

বাঁধানো খালের এ পাড় ধরে পায়ে পায়ে চল্লিশ বিয়াল্লিশটা খোড়ো চালা, টালির ছাউনি একেবারে জল অব্দি। জবরদখলী জায়গায় অপোক্ত ঘরবাড়ি। একটু নীচ দিয়ে বয়ে গেছে খালের নীল জল। মূল নদীর সঙ্গে খাল মুখে বত্রিশটা লোহার দরজা বসিয়ে জলস্রোত আটকানো বা চাষের জন্যে মাঠের পর মাঠে প্রয়োজনমতো জল ঢোকানোর আধুনিক ব্যবস্থা। লোকে বলে বত্রিশ দরওয়াজা বা লক গেট।

লক গেটটাকে বিপর্যয় থেকে বাঁচাতেই, খাল পাড় ধরে এ দিকটায় খোয়া পিচ ঢালাই ফেলে মসৃণ রাস্তা। মস্ত এরিয়া নিয়ে মিলিটারি ক্যাম্প। সুতরাং এ গেট দিয়ে সেনাবাহিনীর ভারি লরি, জিপ, সৈন্যবহনকারী জাল খাটানো গাড়িও যায়। ফলত সার্চলাইট লাগিয়ে চার খুঁটির উপর ওয়াচ টাওয়ারটাও খুব কাছে। দিন রাত রাইফেল বাগিয়ে ওয়্যারলেস সেট হাতে পাহারাদারি। নজর রাখে, নিচে। কাছে। দূরে....। আকাশেও.....

এদিকটা মিলিটারির নিজস্ব ভেহিকেলের পথ। কবে কোন মেজর ক্যাপটেনের বসানো ছ-সাতখানা নারকেল গাছ। ঢ্যাঙা হয়ে গাছগুলো অনেক উঁচু। পর পর ক'খানা গাছে কাঁদি কাঁদি ডাব রাঙা হয়ে নারকেলের চেহারায়। হাবিলদার জীপটা থামিয়ে বলেছিল, এই মৈকু—মৈকু কোন মোকামে?

জবরদখলে তৈরি বেয়াল্লিশ ঘর। সুমুখের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল রোগা লম্বাটে চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশের যুবক। ঠোঁটে পানের কষ। দু-চোখ লাল। মুখ থেকে কাঁচা চুল্লুর গন্ধ।

নোংরা পা প্যান্টে খালি পা। টলতে টলতে বলেছিল,—কৌন—আবে কৌন হ্যায়.....

কাছাকাছি হতে জীপ থেকে পেট্রলের গন্ধ। নাকে সেঁধিয়ে সে গন্ধ মস্তিষ্কে। লাল চোখ ছোটো হয়। জীপের সিটের কাছে এসে প্রায় হুমড়ি খায় মানুষটার পায়ে, স্যার—স্যার আপনি মাফ করবেন—

বড় গোঁফের নিচে ফিক ফিক হাসি, মৈকু

—সাহাব। কী কিনতে যাবো—খৈনি? সিগারেট? গলা নামিয়ে বলেছিল, দেশি এক বোতল?

—উঁহু। নেহি

—তব?

—এই নারিকেল গাছ তুমি ওয়াচ রাখবে, ঠিক হ্যায়?

—জী। জরুর।

এর কদিন পর তো মিলিটারির বাতিল জংধরা কাঁটাতার ক'বাণ্ডিল। নারকেল গাছগুলোর গোড়া থেকে প্রায় গলা অব্দি জড়ানো। মৈকু কাঁটাতারের বেড়ে গাছটার পায়ে একটা দুটো পেরেক মারে আর বিয়াল্লিশ ঘরকে শোনায়,...আবে যে শালে এই

নারকেল পাড়বে তো তাকে মিলিটারি রাইফেলের সামনে দাঁড়াতে হবে—একেবারে ফায়ার...

কথা শেষ করার আগেই খিক খিক হাসে। ঠোঁটে মাড়িতে পান খয়েরের কষ। চুন্নুর তীব্রতায় দাঁতের গোড়ায় খোর।

সদ্য ঘুম থেকে উঠে বাসি মুখে হাই তোলে ফুলি নামে মেয়েটা। মেয়েটা নয় বউটা। বাম হাতে পানের হাই ঢাকে। শাঁখা চুড়ির ঝম্ ঝন শব্দ এই ভোরে।

যেহেতু ভোর, ফুলির পিছনে মিলিটারির রোগা ঢ্যাঙা কটা নারকেল গাছের চেরা পাতায় ফুরফুরে বাতাস কাটার বাজনা। আলগা মাথার দু-চার গুছি বাসি চুল উড়ছে। একলা এমন ভোরে দাঁড়িয়ে চারপাশের নির্জনতা আরও বেশি প্রকট। নিজেদের চালার উঠোনে পড়ে থাকা নারকেলটা কুড়োতে গিয়ে আবার সোজা দাঁড়ায়। ভাবে, ...এটা তো আমরা পাড়ি নি। চুরিও করি নি। হাওয়ার দমকা বাতাসে কাঁদি থেকে খসে পড়েছে। সুতরাং বিচার সালিশি হলে অপরাধটা কি আমার ঘাড়ে চাপতে পারে....।

সবে রাত হটে গিয়ে সকালের আভাস। দু-চারখানা কাক পাখির ডাক। ওপাশে মৈকুর ঘর উঠোন একদম চুপচাপ। জেগে ওঠা, নড়াচড়ার শব্দ তেমন নেই। বরং ভোরের ঘুমে ডুবে আছে। পা রাঙিয়ে ঝুনো নারকেলটায় ফুলির চোখ। সে চোখ অন্তরে অন্য ইচ্ছে চারিয়ে তোলে। এক পা এগিয়ে আবার মিলিটারির ওয়াচ টাওয়ারটার দিকে তাকায়। ভাবে,....অতদূর থেকে....উঠোনের এই ছোট্ট ফলটাকেও কি দেখা যায়...! নজর চলে! দুস্...অত যদি দেখা যেত, তাহলে উড়োজাহাজ কী করে—সাহেবদের দামি দেশে কত উঁচু তলার অফিসঘর—ভেঙে দিলে....পুড়িয়ে দিলে...! কত...কত ছোট এই নারকেলটা...., বলেই কুড়িয়ে নেয় ফুলি।

দ্রব্যটা হাতে নিতেই ভারি। সেটিকে আঁচলে ঢেকে নেয়, ঘরে রাখবো। না, দিয়ে আসবো..., এই দ্বিধায় তাকায় শ্রীকান্ত পাত্রীর কলতলার দিকে। সেই কলতলাটা এখন ফাঁকা। অথচ এই নারকেল কুরিয়ে চিনি সঙ্গে চালের গুঁড়ি সে সব মিশিয়ে যে খাদ্যদ্রব্যটি মায়ের হাতে তৈরি হয়...এখনও জিবে লেগে। আদতে মা যে কত ভাবে লেগে থাকে..., এ টুক মনে করে ফুলি একবার নিজের বিছানার দিকে তাকায়। মশারির মধ্যে ঘুমে বিভোর মানুষটা।

মিলিটারি বাঁধের মসৃণ পাকা রাস্তার ঢাল বেয়ে নামে ফুলি। রাস্তাটা গড়িয়ে কলেজের পাশ দিয়ে শ্রীকান্ত পাত্রী ছুঁয়ে আরও অনেক দূর....। এই বাঁকটায় বসবাসের বারান্দা ঘিরে এসটিডি বুথ সঙ্গে জেরক্স মেসিন। সেই ঘরটার দরজা এখনও খোলে নি।

ডান পাশে ক'খানা বড় ইউক্যালিপটাস গাছ। তকতকে সাদা চামড়া কাণ্ড বেয়ে উপরের দিকে। হাতে ঝুনো নারকেলটার ভিতরে কলকল শব্দ। আর খানিক যেতেই এ বাঁকের রোগা সুপুরি গাছের গায়ে ছোট্ট টিনের বোর্ড, "মাত্র তিন মাসে কম্প্যুটার শিক্ষা। শিক্ষান্তে সার্টিফিকেট।"

পায়ে পায়ে যত পথ এগোয় ফুলি অবাক। ডাইনে সরকারদের পাঁচিল পরে বোস উকিলদের। আজ রাতের মধ্যে সব লেখা, "আগামী পৌরসভায়...." নির্বাচন কথাটা লাল কালো মিশিয়ে কারুকার্যময় লেখা। মাত্র থ্রি কোর অব্দি পাঠ ফুলির। তাই একটু দাঁড়িয়ে বানান বুঝে বুঝে দেওয়ালের কথা পড়তে চেষ্টা করে। খানিক পরে ইটের থামটায় ছবি আঁকা রঙিন পোস্টার সাঁটা, "যৌন জীবন সুরক্ষায় কন্ডোম ব্যবহার করুন। বিশদ জানতে বুলাদিকে ফোন করুন ১১৮...."

বোস, সরকারবাবুদের পাঁচিল পার হতেই রাস্তার এদিকটা আচমকা অনেক ফাঁকা। আঁচলের মধ্যে বাম হাতে নারকেলটা। গরম কড়ায় গুড় কোরা নারকেল নাড়াচাড়ার সুগন্ধ হঠাৎ বাতাসে। ফুলি কত সংগোপনে যে নারকেলটাকে পেট পাঁজরের ঠেকনোয় রেখে শৈশবে ফেরে উনিশ কুড়ি বছরে নতুন বউ হয়েও।

খশমস শব্দ।

ফুলি নারকেলটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে পিছনে তাকায় ভীষণ ধন্দে, মৈকু....মিলিটারির মৈকু...।

তখন কসাকদের শুকনো আমপাতাটা রাস্তার খোয়া ঘেঁষটে খসমস ওড়ে।

দিনের প্রথম সূর্য ওঠে মিলিটারি ক্যাম্পের ঝাউ খিরিস বনের মধ্যে থেকে। রোদ্দুরটা সোজা এসে পড়ে শ্রীকান্ত পল্লীর কলতলা ছাড়িয়ে পুবমুখো ঘর দাওয়ায়। ভিড়টা মল্লিনা বুড়িকে ঘিরে।

হাঁদুর মা বলে, তোর তো ভাগ্য ভালো রে মল্লিনা দি। ইনকুমারি হয়ে গেছে তোর সাত কুলে কেউ নেই। এবার পেনছান পাবি—মাস গেলে কত টাকা...।

মল্লিনা বুড়ি লালচে মাড়ি মেলে হাসে। বাসি মুখ তবু হাসিতে যেন ভোর। ভোরের আলো।

সুশীলা দাঁড়ায়, মাসি গো তুই একলা মানুষ। যেখেনে পড়বি সেখেনে মরবি। তোর অতো টাকা হবে—একটা মেসো কর না—

বুড়ি রেগে যায়। দন্তহীন মাড়ি খাপটে বলে, হ্যাঁরে মাগি—তোর গা-গতর বেশ ডাঁসা—এক বরে আর কত সোহাগ? দুটো চারটে ধর না, অনেক কাপড় গয়না পাবি—

হাজার ভাঁজে কোঁচকানো মুখে তোবড়ানো গালটা দু-হাতে ধরে বলে সুশীলা, ধরে এনে দে না মাসি। তোদের ছেলেটার তবু খাটুনি কমে। ঘরে বসিয়ে খাওয়াই—

—ভালো। সিধু কপাটি ছেলেটা ভালো—ওই তো ইনকুমারির ব্যবস্থা করালে, তাই না গো দিদি—, বলে হাঁদুর মা।

—ও বোধ হয় এবার নতুন ভোটটায় দাঁড়াবে..., আন্দাজ করে সুশীলাও।

কথার ধারা অন্য দিকে ঘুরে যায়।

দাঁত মাজতে মাজতে একটা বালতি নিয়ে হাজির ত্রিলোকেশ। ইটভাটাগুলোয় আনলোডিংয়ের সময় লরির ডালার ভাটার গাড়নে পোড়া ইটের রাবিশে পড়তি বাড়তি

কয়লা কুড়িয়ে খুঁটিয়ে আনে বস্তা ভরে। ভাঙা সাইকেলটার ক্যারিয়ারে টানতে টানতে। সেই কয়লা তো বেচে এই বত্রিশ ঘরে। কিংবা চা-পান বিড়ি দোকানটার ধারে বস্তা খুলে বসে...।

এ হেন ত্রিলোকেশ একটা মেয়েমহলে ঢুকে পড়েছে। মুখ ধুয়ে এক বালতি জল যে নেওয়া চাই। ত্রিলোকেশ একটু দূরে তামাকের পিক ফেলে বলে, এত সকালে কলতলা জুড়ে মিটিং করলে চলে?

সুশীলা খর খরে গলায় বলে, ও ব্যাপারি—আমরা ওরকম মিটিং করি। তোমরা বাবুদের নিয়ে কী করছিলে কাল রাতে? কত কাগজ ধরে কলম নিয়ে খেলা করছিলে?

—সুশীলাদি—তুমি চুপ মারো

—কেন? ভয় কীসের গো?

কণ্ঠস্বর একটু নামায় ত্রিলোকেশ, কিছু দিনের মধ্যে বুঝবে। ছিলুম তো আমরা পঞ্চায়েত এরিয়ায়—এবার তো ধীরে ধীরে ঢুকবো শহরে সুবিধেয়....

সুশীলা চেষ্টা করে কিন্তু আয়ত্তে আনতে পারে না। ফলত তার ভরাট মুখটা অনুজ্জ্বল। সেটা আন্দাজ পেয়ে ত্রিলোকেশ বলে, হরেন দা কাঠগোলায় বেরিয়ে গেছে?

—বাহ্‌রে ব্যাপারি? দরকার থাকে আমাকে বলো, খালি দাদা-দাদা? আমাকে দিয়ে হবে নে?

ত্রিলোকেশ হাসে। বত্রিশ ঘর সংসারে তবু একজন রঙ্গরসিকতার মহিলা। কোথাকার পোড়ো জমি দখল করে এত জন মানুষের বসবাস। পেঁপে কলাগাছ, দু-চারখানা ডাব নারকেলের চারা পুঁতে তুলসিতলা, রচনা করে এখন পাড়া-গাঁ। শুধু কি ভাত রান্না, দরজা এঁটে বউবাচ্চা নিয়ে শোওয়া বসা। আর রোজগারের জন্যে বেরিয়ে পড়া, ফেরা—এই নিশ্চিন্তির জন্যে এ বসবাস। ডেরা ঠাঁই পড়া। না—আরও কিছু?

বসাক বাড়ির বাঁক ঘুরতেই শ্রীকান্ত পল্লীর রাস্তাটা সোজা। ফুলির চোখে পড়ে কলতলার পাশে জল পেয়ে বেশ ডগমগে দুর্বো। পাউডার মাজনের পিক ফেলে সাদা দাগ।

ফুলিকে দেখে শেফালি চেঁচায়, ওই যে তিলোদা— তোমার মেয়ে আসছে গো? ঠোঁট গড়িয়ে পান তামাকের পিক পট করে ফেলে, এত সকালে...।

—নিজের মেয়ে। তার আবার সময় অসময়?

শেফালির কথা সমঝে ত্রিলোকেশ তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে এক বালতি জল ভরে নেয়। মেয়ের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে। বুকের মধ্যে খানিক উদ্বিগ্নতা। ক্ষ্যাপা জামাইটার সঙ্গে কিছু ঝগড়াঝাটি হল নাকি? না, এমনি ফাঁক টাকা দেখে সকালে চলে এল?

বসাক বাড়ির পাঁচিল কোনে ইলেকট্রিক পোস্ট শেষ। পোস্ট গোড়ায় চা-দোকানটায় সাদা-কালো টিভি-তে খবর বেশ জোরে জোরে। সে শব্দটা এখানে ত্রিলোকেশের কানেও।

নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরের খবর শুনতে বা দেখতে যাওয়ায় আগ্রহ থাকলেও সেটা দমিয়ে মেয়ের জন্যে চাপা উৎকণ্ঠা।

মলিনা বুড়িকে ঘিরে ভিড়টা একটু একটু পাতলা। হাঁদুর মায়ের গলা পড়িয়ে হঠাৎ বাক্যটা বাজে মলনাদিরে—সিধু মেম্বার এমন পেনছানের ব্যবস্থা যদি দু-পাঁচ বছর আগে করতো—, বলতে বলতে কথা সেঁধিয়ে যায় বুকের মধ্যে। সে কথার দানায় আরও কথার জন্ম ব্যথা,....নিজের বিধবা মা-টা...এক মুঠো ভাতের জন্যে তো অমন বুড়ো বয়েসে কত দরজা ঘুরে ঘুরে মরল। যদ্দিন একটু খাটতে খুটতে পারতো তদ্দিন লোকের চাল ধান কুলো পাছড়ে, বাটনা বেটে, গোবরনেতা দিয়ে এক বেলার এক মুঠো ভাত জোগাড় করতো...। তবুও তো মলনা মাসি অশক্ত হয়ে গেলেও শুকিয়ে মরবে নে...! মা...টা লোকের বার ঘরে মরে কাঠ...খবর পেলুম। শেষ খবর...। সিধু মেম্বররা তখন কেন এদিকটাকে শহরে ঢোকাবার ব্যবস্থা করে নি...। যত ব্যবস্থা...বিধবা পেনছান সব এখন...

পায়ে পায়ে ফুলি কাছাকাছি। সুশীলাদি বলে, হ্যাঁরা—তুই কি বাপকে খাবার জন্যে নেমতন্ন করতে এলি গো?

ফুলি হাসে। ফরসা মুখ। হলুদ রঙের সস্তা ছাপা শাড়ি লাল ব্লাউজে। উনিশ কুড়ির যুবতী।

কী প্রসঙ্গ নিয়ে যে মেয়ের সঙ্গে কথা শুরু করবে, বুঝে পায় না। এইটুকু পেরোলেই তো জামাই মেয়ের খবর। তবুও ত্রিলোকেশ বলে, তোরা সকলে ভালো আছিস তো?

—হ্যাঁ, উত্তরটা শুনিয়ে ঘুপ করে বাপের পায়ে হাত ছোঁয়ায়। প্রণাম সেরে বলে, মা কি ঘরে? না, ইটভাটায় কয়লা কুড়োচ্ছে?

ত্রিলোকেশ হাসে, ধুস্! এত সকালে...

তখনই দমকা বাতাসে শিল নোড়ায় চাল গুঁড়ো...গুড় নারকেল কোরায় ছাঁই মারার মিষ্টি গন্ধ ফুলির নাকে আসে। কী ভালোবাসায় যে নারকেলটাকে আঁচল আড়ালে পেট পাঁজরের ঠেকনোয় ধরে রাখে...।

মাঝখানে পুকুর। পুকুরের মাটি নিয়ে জায়গাটা ভরাট করে তো শ্রীকান্ত পাত্রীর ঠাঁই পাকাপোক্ত গড়ে উঠলো। নিজেদের ঘরটার কথা বেশ মনে পড়ে ফুলির। কত আর ছোটো? সাত আট বছর আগের ঘটনা। নিজেও কত পাঁক কাদা হাতে হাতে বয়ে এনেছে মায়ের সঙ্গে। বাপ ত্রিলোকেশ বাঁশ বাখারি আর গাঙপাড়ের জংলী গাছপালা কেটে এনে বাখারিতে গেঁথে গেঁথে তার তাল কাদা চাপিয়ে নিজেদের ঘেরাঘেরি ঘরটুকু।

পুকুরটার ডাইনে বামে দু-দিক দিয়ে চলা ফেলার রাস্তা। সুতরাং বাম দিক দিয়ে হাঁটে। একেবারে চোখের সামনে স্পষ্ট নিজেদের...না, বাপের ঘরটা। কত পুরোতন.....! কী সব যে জড়িয়ে আছে...। তবুও কেন যে ঘরটা আর নিজের নয়...!

বাপ ত্রিলোকেশ বালতি ভর্তি জল নিয়ে আগে আগে যায়। হাঁক দেয়, এই যে গো—ফুলি এসেছে।

পর পর কটা ঘর বামদিকে ফেলে এগিয়ে যায় ফুলি। রাঙচিত্তির বেড়ায় ক'খা
বড় বড় কলাগাছ কমলেশদের। কমলেশের বাবার সঙ্গে কী নিয়ে যে প্রায়ই ঝগড়া বাধে
তখন। কমলেশ আর ফুলির বয়েস প্রায় তো দুই দুই। কমলেশের বাপটা আর
ঝগড়াও নেই। কমলেশ দেওয়ানি কোর্টে সেরেস্তায় উকিলদের কাগজপত্র টাইপ কর
কটা ভাইবোন আর মাকে খাওয়ায়। কমলেশ মোবাইলটার বোতাম টিপে 'মেনু' ঘর থেকে
'মেসেজ'য়ে যায়। কনট্যাক্টয়ের পর সার্চ-য়ে গিয়ে থমকে অবাক। অনুসন্ধানের উদ্দে
বলে, ফুলি। এত সকালে...

—হলেই বা...।

—মায়ের কাছে?

—না। তোমাদের ঘরে

সমবয়সী যুবতীর মুখে এমন কথায় "সার্চ" বোতাম ঘর পায় না। শুধু তাকিয়ে উ
বোতামের চাপে মোবাইলটার আলো...আলো কমলেশের দু-চোখে। পুরোতন সূর্যে
অন্ধকার কিরণে পুরোনো সমবয়সী মেয়েটা। হলেও পরপুরুষের বউ? কমলেশের বুকে
মধ্যে ঢেউ তোলে যে এই সকালে। কমলেশের সোজাসুজি পথে দাঁড়িয়ে ফুলি।

মা দাওয়া থেকে উঠোনে নামে, শেষ রাত থেকে মনটা কেমন করছিল। ঘরে-
আয় গো ফুলি—আয়...

ঘরে ঢুকে একবার চারদিকে নজর ঘোরায়। ধীরে ধীরে নারকেলটা আঁচল থেকে
বের করে, এটা রাখো—

—কী করবো, মায়ের মুখে হাত চাপা দিয়ে মেয়ে মায়ের কন্ঠ দমায়।

—তুমি কি বোঝো নি...। সিদ্ধ পিঠে...ওড়ে বড় এলাচ বেশি দিয়ে মিলিটারির ঘা
গন্ধ একেবারে বদলে দিও—

—মিলিটারি..., জিনিসটাকে গুছিয়ে রেখে উঠোনে তাকায় মা। দূরে ওয়াচ টাওয়ারে
খানিক আভাস।

—ওরা যেন গন্ধ পায় মা..., কুড়ি বছরের যুবতী গলায় সাত আট বছরের শি
ফুলিটা। মায়ের কাছে ভীষণ আবদার নিয়ে হাজির।

দাওয়ার কোনে অনেকগুলো পোড়া বিড়ির টুকরো। প্রবল দ্বিধা। তবু বলে, বা
তো বিশেষ খায় না। তাহলে—কারা খেল এত?

—রাতে যে মিটিং হল। পিসুদা— লোকজন নিয়ে বসালো—এসব এরিয়া নাকি
মিউনিছিপালিটির হয়ে যাবে—তোদের খালপাড় বিয়াল্লিশ ঘর...ডাব নারকেল গাছগুলো—
মিউনিছিপলিটির হয়ে যাবে—মিলটারির সঙ্গে সেই কথা চলছে

—তাই..., ঘরের প্রলম্বতায় পাঁচ ছ' বছরের কন্যা শিশু হয়ে যায় ফুলিটা মায়ের
কাছে। এমন দুটো একটা চুরি যে দুঃখী ভাইবোন মা বাবার সংসারে কত গোপন আনন্দ
মধুর। সেখানে দামি মিষ্টান্নও হীন।

আকাশে রোদ্দুর। পুকুরটার মাঝখানে সূর্যটা জ্বলছে। ফুলি উঠোনে পা ফেলে নিজের খালপাড় ঘরের উদ্দেশে। মা চেঁচায়, ও ফুলি

ফুলি ঘাড় ফেরায়। মা শোনায়, ও বেলা আসিস

গলার জোরটায় ফুলির চোখ মুখে বিরক্তি।

মায়ের গলা নিচু, সিদ্ধ করে রাখবো। নিয়ে যাবি।

মাথার গায়ে রোদ। ইউক্যালিপটাসের শাখা প্রশাখা বেয়ে সে রোদ কাণ্ড গোড়ায়। এসে টিভি বুথ জেরক্স দোকানের ঝাঁপ খোলা। গড়ান বেয়ে মিলিটারির পাকা রাস্তায় উঠতেই চিৎকারটা কানে। আর দু-এক পা এগোয় ফুলি। ফুলির চালার সামনে নারকেল গাছটা ঘিরে দশ বারোজন মানুষের ভিড়। মৈকুর চিৎকার, কাউন্ট করো—কাউন্ট

মাছ ব্যাপারি পড়শি বলে, এ মৈকুলাল

—জী?

—সাতখানা নারকেল গাছের কাঁদিতে সব ডাব নারকেল তোমার কাউন্ট আছে?

—জরুর, খুব দম্ভ নিয়ে বলতেই মৈকুর মুখ থেকে গতরাতের একঝলক বাসি মদের গন্ধ।

—ঠিক আছে— সেই এক নম্বর গাছটায় কত?

—তিপান্ন। ফিফটি থ্রি— টোটাল ডাব নারিয়েল

—তারপরেরটায়

—কয়টি এইত্ত। থাকবে না মানে? মিলিটারি—আর্মির মাল...হাবিলদারকে....

—এইটা। ফুলিদের এইটা?

—দুই কাঁদির টোটাল একচল্লিশ—কয়টিওয়ান—

ফুলির বুক কেঁপে চকিতে শৈশব মুছে যায়। ফরসা মুখে ধুলো বালির ঝাপটা।

মৈকুলাল গোনে, এক দুই তিন....একত্রিশ বত্রিশ....। ছোকরাটা পাশ কাটিয়ে সামনে যাওয়ার সময় মৃদু ধাক্কা লাগে। তাতেই ছোকরাটাকে একটা খিস্তি দিয়ে অন্যমনস্ক। নতুন করে গোনে মৈকু, এক দুই...তিন....

মাছ ব্যাপারি পড়শির মস্তিষ্কে মৃদু ধাক্কা। ফুলির বরকে ডাকে, জগন্নাথ এসো আমার সঙ্গে। মৈকু

—জী

—আও মেরে সাথ

নারকোলমালায় কাঁচা নুন। আধলা ইটে পাছা ঠেকিয়ে মৈকুলাল। পলিথিন বা টিকটিকায় দুশো গ্রাম দশটাকায় দ্রব্যটি। প্লাসটিক গেলাসে ঢেলে দিতেই চুক চুক টানে। ব্যাপারি বিধবা মাসি নুনের মালাটা এগিয়ে দেয়।

মৈকু কাঁচা নুনের টাকনায় আর এক গেলাস চুমুকে শেষ করে। পর পর ফুরোতেই মৈকুর চোখের জমি লাল।

বিধবা চুন্নু ব্যাপারি নুন ভর্তি মালটা নিরাপদে স্থানে সরিয়ে বলে, দাম কে দেবে গো বাপেরা?

জগন্নাথ হাতের ইঙ্গিতে আশ্বাস জানায় বিধবা মাসিকে।

মৈকু গাছটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে কাঁদির দিকে তাকায়, এক দুই তিন....

নীল ডুমো মাছিটা গালের সামনে। হাত ঝাপটায় সরায়, এক... দুই... তিন....

মাছিটার গায়ে রোদ লেগে ডানাগুলো ভীষণ নীল। মৈকু কাঁদির দিকে তাকিয়ে পুনরায় গোনে, এক...দুই....তিন....চার...পাঁচ...ছয়....

লোকজন মেয়ে বউরা ঘিরে দাঁড়িয়ে। দু-চারজন ওয়ান টু তে পড়া বাচ্চা ছেলেমেয়ে।

মৈকু তখনও গুনে যায়, দশ....এগারো....

বাচ্চাটা বলে, এবারে সব গুনে ফেলবে

ফুলির বুকের ভেতর দমাস করে লাগে।

নীল মাছিটা আবার চোখের সামনে। হাত ঝাপটিয়ে সরায় মৈকু। মাছিটা এক পাক ঘুরে চোখের কাছে। রোদ্দুরে মাছিটার গায়ে নীল আভা। মৈকু মাছিটাকে দেখে। মাছিটা খানিক ডাইনে যায়। মৈকু সে দিকে পা বাড়ায়। নীল মাছিটা বাঁয়ে বাঁকে, মৈকু সে দিক পানে হাঁটে...।

মাছ ব্যাপারি গড়শি চেঁচায়, মৈকু কাউন্ট করো—জলদি

হাত ঝাপটায় নীল মাছিটা মৈকুর মুঠোয়, হাঁ মিল গিয়া।

# হুইল চেয়ার

## শচীন দাশ

পেপারটা নিয়ে বসেছিলাম। মিত্রা এসে কাছে দাঁড়াল। মিত্রার হাতে চায়ের কাপ। চা-টা নামিয়ে বলল, কী হবে এখন বল তো?

কীসের কী হবে।

কীসের মানে। এরই মধ্যে ভুলে গেলে? মিত্রার গলায় হঠাৎই ঝাঁজ। ঝাঁজটা তুলেই জানাল, দায়িত্ব কি সব আমার একার নাকি?

এই হয়েছে মুশকিল। মিত্রার এখন মেনোপজের সময়। কারণে-অকারণে সব সময়ই তাই হট হয়ে থাকে। সোজা কথাটাও তখন বাঁকা পথে ঘুরতে থাকে। ডাক্তার তাই বলেছে একটু মানিয়ে নিতে। তা মানাবার চেষ্টায় সবসময়ই আমি অ্যাডজাস্ট করি। মিত্রা রেগে উঠলেও চুপ করে থাকি।

এখনও তাই হল। চুপ করেই ছিলাম। মিত্রার গজগজানি কানে এল।

পাঁচটা নয় একটাই ছেলে। বিদেশ-বিভুঁইয়ে পড়ে আছে। অথচ সাত দিন হল কোনো খবর নেই....চমৎকার। ছেলেটা যে কীভাবে কী করে আছে....

বললাম, আহা চেষ্টা তো কালও করেছি রাতের দিকে। ওর মোবাইলে কোনো রেসপন্স নেই—

নেই কেন তা জানার চেষ্টা করেছ?

হ্যাঁ, কেন করব না। ওর বন্ধু রজতের মোবাইল নাম্বারটা কাল জোগাড় করেছি ওর বাবার কাছ থেকে—

তা করেছিলে ফোন।

না। মাথা নাড়লাম।

মিত্রা চোখ সরু করল, না কেন?

কী করে করব। জানালাম, নাম্বারটা দিয়েই রজতের বাবা বলল আজ আর যেন ফোন না করি। ছেলেটা এত রাতে ফিরে টায়ার্ড থাকে।

মিত্রা ঝাঁজিয়ে উঠল, তা ওর ছেলে টায়ার্ড থাকে আর আমার ছেলে থাকে না।

চায়ের কাপটা ঠোঁটে তুলে নিয়ে চুমুক দিয়েই বললাম, সে আর কী বলা যায়। বললে তো ঝগড়া করতে হয়।

মিত্রার গলার ধারটা তখনও মরেনি। বরং কাটার জিনিস পেয়ে নতুন খোলা ব্লেডের মতোই আবারও তা ধারালো হয়ে উঠল, আর ছেলেরও বলিহারি বটে। পইপই করে বলে দিয়েছিলাম ফোন করবি-কিন্তু সন্তু....একদিন পর একদিন অন্তর কথা বলিস। তা ছেলের কানে ঢোকে সেসব কথা।

সন্তু আমাদের ছেলে। জয়েন্টে ভালো র‍্যাঙ্ক করে ইলেকট্রনিক্সে ভর্তি হয়েছিল। পরে সেখান থেকেই ক্যাম্পাসিং হয়ে এখন ওই মালটি-ন্যাশানালে। ব্যাঙ্গালোরে পোস্টিং। মাস

দুইয়েক আগে এসে পাসপোর্ট করিয়ে গেছে। অপেক্ষা, যে কোনো মুহূর্তেই বিদেশের উড়ান ধরবে।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কাপটা রেখেই মিত্রার দিকে চোখ তুললাম, আজ অফিসে গিয়েই রজতকে ধরব। একই ফিল্ড-কোয়ার্টারে থাকে। পাশাপাশি। সন্তুর খবরটা ওই দেবে ভালো।

তাহলে আমাকে একবার জানিও—

হ্যাঁ হ্যাঁ। জানাব না কেন। আগে তো ধরি—

ধরলাম। প্রথমে কোনো সাড়া নেই। কিন্তু দু'তিন বারের চেষ্টায় একসময় কানে এল রিঙটোনের শব্দ। কী একটা মিউজিকের শব্দ বাজছে। প্রথমে মৃদু স্বরে এবং এরপরেই বেশ জোরালো হয়ে। আর উঠতেই ও-প্রান্তে একটি নরম কণ্ঠ।

হ্যালো—

হ্যাঁ, আমি সন্তুর বাবা বলছি।

হ্যাঁ, কাকু বলুন—

তোমাকে একটু বিরক্ত করছি।

নানা, একি...কী হয়েছে বলুন?

আচ্ছা, সন্তু কেমন আছে—!

কেন ভালোই তো। নো প্রবলেম। আপনাকে ফোন করেনি?

আরে, আমাকে কী....এক সপ্তাহ হয়ে গেল বাড়িতে কোনো ফোনই করে না। ওর মা তো পাগল প্রায়।

সে কি!

হ্যাঁ। এদিকে ওর মোবাইলে রোজই দু'তিনবার করে করছি কিন্তু নো রেসপন্‌স....

ও হো, হ্যাঁ হ্যাঁ...ওর মোবাইলে বোধহয় কার্ড ভরতে পারেনি।

কার্ড ভরতে পারেনি?

না। তাই তো বলছিল—

কেন?

তা বলতে পারব না কাকু।

তুমি একটু বলবে?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

বোলো একবার যোগাযোগ করতে। আমাকে না করুক ওর মাকে যদি একবার.....

না না, বলব। নিশ্চয়ই বলব—

আচ্ছা তাহলে ছাড়ি।

ঠিক আছে।

লাইনটা ছেড়ে দেয় রজত। এবং ওই তখনই আমি আমার মিত্রাকে। জানালাম যা যা কথা হয়েছে। বলা বাহুল্য কার্ডের কথাটাও তুলতে ভুললাম না।

মিত্রা শুনে রেগে কাঁই।

আশ্চর্য, কার্ড একটা মনে করে ভরতে পারে না। করুক একবার ফোন। কখন করবে দেখছে?

তা কী করে বলব। কথা তো হয়েছে রজতের সঙ্গে—

ও, তাও তো ঠিক। রজত বলবে তবে তো বাবু ফোন করবেন। মিত্রার গলায় স্পষ্টত বারে অভিমান।

সন্ধের পর অপেক্ষা করে আছি। সিগারেটের পর সিগারেট ধ্বংস করছি, এই সময়ে ঠাৎই ফোন। হ্যালো—

গলা শুনেই মিত্রাকে দিলাম। আর মিত্রা ফোনটা ধরেই যেন রিসিভারের ওপর হামলে ড়ল।

কী রে, কী খবর। সাতদিন কোনো ফোন নেই?

বুঝলাম ফোনের ও-প্রান্তে এ-রকমই কিছু সংলাপ। সঞ্জু বলছে যেন।

স্যরি মা, কার্ড ভরতে পারিনি—

কেন।

কী করব...সময় পাইনি—

সময় পাসনি? কেন, এতই ব্যস্ততা?

সত্যিই ব্যস্ত মা। সঞ্জু বলল কেটে কেটে, আর এ-ব্যস্ততা তোমাদের আমি বোঝাতে ারব না। তোমাদের বোঝার কথাও নয়। বুঝবে না তোমরা...

মিত্রার মুখ দেখি ভারী। বললও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, তা আমরাই যদি না বুঝি তাহলে ার বুঝবেটা কে। কাকে আর বোঝাতে পারবি তুই?

আহ্ মা। অমনি সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল তো—

মিত্রার ঠোঁটে একটু কৃত্রিম হাসি, না না—কী আবার হবে।

সঞ্জু যেন বোঝাবার চেষ্টা করে, সত্যিই মা......তোমাকে কী বলব....সারাদিন এখানে া...শুধু কাজ আর কাজ...এই কাজটা যে ধরতে না-পারে...যাক্‌গে, কী বলবে বল এখন?

মিত্রা হাসে শব্দ না-করে, কেন আমি কি শুধু বলার জন্যই ফোন করি...না, শুনতে াই—

না না, তা তো আমি জানি। তবুও ভাবলাম...বলতে বলতেই হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে ায় সঞ্জু।

তখন মিত্রাই আবার বলে, যাক্‌গে তুই কী ভাবলি না-ভাবলি জানি না....তবে আমি কিন্তু তোর গলাটাই শুনতে চেয়েছিলাম। আচ্ছা রাখি—

না না, শোনো। শোনো মা....

কিন্তু মিত্রা শুনল না। ফোনটা রেখে দিয়েই হনহন করে এগিয়ে গেল। এগিয়েই সোজা রান্নাঘরের দিকে।

রাতে খেতে বসেছি। পাশাপাশি আমি ও নীতা। মিত্রা চুপচাপ দিয়ে যাচ্ছে। কখনও ভাজি, কখনও ডাল কিংবা মাংস। নীতা বলল ঠিক এ-সময়েই।

তুমি কিন্তু কোনটা ছেড়ে দিয়ে ঠিক করোনি মা—

মিত্রা কিছু বলল না। নীতা বলল আবার তখনই, দাদার কিন্তু আরও কিছু বলার ছিল।

কিন্তু আমার আর কিছু শোনার ছিল না—মিত্রা জানাল এবার আস্তে আস্তে।

খেয়ে উঠে সিগারেট একটা ধরিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছি মিত্রা এসে দাঁড়াল পাশে।

শুতে যাবে না?

হ্যাঁ। এই যাচ্ছি—

আজ আবার এত সিগারেট ধরাচ্ছ কেন?

বললাম, না এত কোথায়...এই তো—

কী জানি বাবা, কী যে এত নেশা তোমাদের। গজগজ করতে করতে মিত্রা চলে যায়।

মিত্রা চলে যেতে আমি আবারও সিগারেটের ভেতরে। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কখন যে গ্রিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একসময় কখন যেন গ্রিলেরই বাইরে। শরীর যায়নি কিন্তু মন চলে গেছে দূরে। দূর থেকে আরও দূরে। আর যেতে যেতেই যেন টের পাচ্ছিলাম সময়ের উত্তাপ। মনে হয় যেন এই সেদিনের কথা। এই তো সেদিন। সঞ্জু নাইনে উঠল। এবং উঠতেই প্রস্তুতি। নিজে যেমন নজর রাখছি তেমনি প্রতি বিষয়েই টিচার। সঞ্জুর ইচ্ছে, জয়েন্ট দেয়। সঞ্জুর ইচ্ছে, ইলেকট্রনিক নিয়ে পড়ে। সঞ্জুর ইচ্ছে, ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার হয়। আর সে-ইচ্ছের সারাদিনই সে বইয়ের সামনে। পড়ছে। টিচারকে জিজ্ঞেস করছে। তার কাছ থেকে আদায় করে নিচ্ছে। সঞ্জুর উৎসাহ দেখে অবাক হয়েছি। সঞ্জুর উৎসাহকে মূল্য দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আর সে চেষ্টায় মেয়ের দিকে তেমন তাকাইনি। অবশ্য না-তাকালেও তার ইচ্ছে-অনিচ্ছের দাম দিয়েছি। তার মতো করে তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করেছি। কিন্তু করলেও সঞ্জুর বেলায় একটু ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম তার উচ্চাশার জন্য। এভাবেই একদিন মাধ্যমিক হল। উচ্চ-মাধ্যমিক হল এবং এরপরেই জয়েন্ট। জয়েন্টে ভালো র‍্যাঙ্ক করেই সঞ্জু তখন তার উচ্চাশার দিকে ছুটেছে। আর আমরাও, আমি ও মিত্রা তার সে উচ্চাশার ইন্ধন জুগিয়ে তাকে আরও গতিসম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু করে?

দিন গেল। মাস কাটল। মাঝে মাঝে ব্যাঙ্গালোর থেকে ফোন করে সঞ্জু। আবার আমরাও ফোনে খবরাখবর নিই। সঞ্জু তার উত্তরে নানা কথা বলে। নীতার সঙ্গেও চলে টুকটাক বাক্যবিনিময়। এভাবেই কলকাতা ও ব্যাঙ্গালোর। সঞ্জু ও আমরা।

এক সকালে উঠে বাজারে যাব। এই সময়েই একটা ফোন। সঞ্জু করেছে।

হ্যাঁ, বাবা—

বল। কী খবর।

আমি পরশু বাড়ি যাচ্ছি।

পরশু। মানে টেন্থ অক্টোবর।

হ্যাঁ।

খুব ভালো হল। বারো তারিখ থেকে পুজো। পুজোয় এবার তাহলে কলকাতায় এনজয় করতে পারবি—

না বাবা। সে আর সম্ভব নয়। আমি দু'দিনের জন্য যাচ্ছি।

সেকিরে! কেন?

ফোরটিন্থ আমি দেশ ছাড়ব—

দেশ ছাড়বি....কোথায় যাবি?

সানফ্রানসিসকো।

সানফ্রানসিসকো....মানে তো আমেরিকা।

হ্যাঁ কোম্পানি আপাতত ওখানে পোস্টিং দিচ্ছে—

তার মানে—থমকে গিয়ে বললাম, তুই তাহলে....

আমাকে শেষ না করতে দিয়ে সঞ্জু জানাল, আপাতত আমেরিকাবাসী—

কথাটার মধ্যে কি প্রচ্ছন্ন একটা গর্ব ছিল! ধরেও যেন ঠিক ধরতে পারি না। সঞ্জু বলে, ঠিক আছে বাকি সব কথা গিয়ে বলব। মাকে বোলো লাউ-চিংড়ি করে রাখতে।

কথাটা বলতেই দেখি মিত্রার মুখ গম্ভীর। আর সে গাম্ভীর্য উপরে দিল সে ছেলে আসতেই। বলল, কেন এ-দেশে কি চাকরি ছিল না।

এই দেখ, আরে এ-দেশেই তো ছিলাম...এখন কোম্পানি যদি পাঠায়...

তা পাঠালেই যেতে হবে।

না গেলে চাকরি ছাড়তে হবে—

কিন্তু সবাই কি ছেড়ে দেয়—মিত্রা বলল ভারী গলায়, অনেককে তো শুনেছি চেষ্টা-চরিত্র করে কলকাতারও পোস্টিং নেয়—

সঞ্জু হাসল ঠোঁট চেপে, কিন্তু আমার মতো সুযোগ পেলে কেউ ছাড়ত না মা। এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে!

মিত্রা চুপ।

খাওয়ার পাতে পরপর পদগুলো সাজিয়ে দিচ্ছিল সে। লাউ-চিংড়ি, ইলিশ ভাপে, জলছাড়া খাসির মাংস আর সর্ষে-পাবদা। খেতে খেতে সঞ্জুর মুখে বারবারই মিত্রার হাতের রান্নার প্রশংসা। কিন্তু মিত্রার মুখের মেঘ তাতেও কাটে না। তখন সঞ্জুই হঠাৎ হেসে ফেলে বলে উঠল, আরে বাবা আমি তো আছিই। রোজই তো দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে। কথাও তো হবে রোজ—

মানে! এই প্রথমই মিত্রা যেন একটু আগ্রহ দেখায়।

সঞ্জু বলে, মানে আর কী! কমপিউটার এনে দিয়ে গেছি। কালকের মধ্যে ইন্টারনেটও লেগে যাচ্ছে। নীতুকে আমি শিখিয়ে যাচ্ছি। ও রোজ রাতে চ্যাটিং করলেই আমাকে পাবে। আমার ছবি ভেসে উঠবে। তোমাদের সঙ্গে কথাও বলব তখন—

নীতা শুনছিল একমনে। হঠাৎই সে লাফিয়ে উঠল, নারে দাদা তুই যা। তুই গেলে তবু কলেজে বলতে পারব আমার দাদা আমেরিকায় আছে।

এই করে করেই বাঙালির বারোটা বাজল বলে—

মিত্রা বলতেই আমি তাকাই, বাজেনি যে তা কী করে বুঝলে?

সঞ্জু চোখ তোলে কিন্তু কোনো কথা বলে না। নিঃশব্দেই খেয়ে উঠে দাঁড়ায়। আর এর দু'দিন পরেই সে মুম্বাইয়ের ফ্লাইট ধরে। এরপর আমেরিকা।

দিন গেল এভাবেই। দিনগুলো কাটল এমনটা করেই।

সকালে উঠি। বাজারে যাই। বাজার থেকে ফিরে কাগজ পড়তে পড়তেই বেলা আটটা। তারপর রেডি হয়ে অফিস। অফিস থেকে দু'একদিন হয়তো এদিকেওদিকে। তাবাদে রাত আটটার ভেতরেই বাড়ি। বাড়ি ফিরে এটা-ওটা করতে করতেই প্রায় দশটা। নীতা তখন চ্যাটিং বসে। পাশে মিত্রা। বসে বসে সঞ্জুর সঙ্গে কথা বলে। খবরাখবর নেয়। মাঝেমধ্যে আমিও গিয়ে হাজির হই সেখানে।

এবং এভাবেই দিন পাল্টায়। দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। বছরের পর আবারও বছর।

একদিন অফিস থেকে ফিরেছি। মিত্রা এসে একটা ব্যাঙ্ক-ড্রাফট দেখাল।—এই নাও সঞ্জু পাঠিয়েছে। এখন থেকে নাকি প্রতি মাসেই এমন একটা করে ড্রাফট পাঠাবে।

কে বলল?

কে আবার বলবে। সঞ্জু ফোন করেছিল—

হাতে নিয়ে ড্রাফটা উল্টে-পাল্টে দেখতে দেখতেই বলি, একি এত টাকা।

কেন কত।

কত মানে তিরিশ হাজার। তুমি দেখোনি?

হ্যাঁ দেখব না কেন। তিরিশ হাজার আবার এই বাজারে টাকা হল—

হল না, বলছ কি তুমি। কলকাতায় দু'টাকায় মুড়ি-বাদাম খেয়ে এখনও লোকে দিন কাটায়। দশ টাকায় পেট ভরে ডাল-ভাত-সবজি পাওয়া যায়।

যায় যাক। ছেলে পাঠিয়েছে তুমি নাও—

তা নিচ্ছি তবে আমার আকাউন্টে জমা রাখতে পারব না। সরকারি চাকরি করি। ছেলে অবশ্য বুদ্ধি করে ব্যাঙ্ক ড্রাফটা সেভাবেই পাঠিয়েছে—

এবং এভাবেই পাঠাতে লাগল সঞ্জু।

এক রাতে খেয়ে উঠে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সবে সিগারেট ধরাচ্ছি নীতা দৌড়ে এসে বলল, বাবা দাদা তোমার সঙ্গে কথা বলবে—

ফোন ধরতেই সঞ্জু জানাল একটা ফ্ল্যাটের কথা। আড়াই-তিনহাজার স্কোয়ার-ফুটের একটা ফ্ল্যাট যেন বুকিং করি ভালো জায়গায়। আজকাল তো কলকাতায় কত ভালো ভালো ফ্ল্যাট উঠছে। সঞ্জু বলল আমি যেন দেখতে থাকি। পছন্দ হলেই যেন তাকে জানাই।

আমি চুপ। কোনো মন্তব্যই করলাম না। কিন্তু সন্তু ফোন ছাড়তেই মিত্রা বলল, যাক বা এতদিনে তবু হাত-পা মেলে একটু বসতে পারব। যা অবস্থা বাড়িটার। এদিকে এলে দিকের দেয়ালে ধাক্কা, আবার ওদিকে গেলে এদিকের দেওয়ালে শরীর ঠেকে। দু-জনের বেশি তিনজন এলেই শোওয়া-বসার অসুবিধে। তাবাদে দেওয়ালের প্লাস্টার ফাটা। জায়গায় জায়গায় চলটাও উঠে গেছে। এ-বাড়িতে কি আর থাকা যায় এভাবে...

তবু এভাবেই থেকে, এ-বাড়ি থেকেই কিন্তু সন্তু লেখাপড়া করেছে। ভালো চাকরি পেয়েছে। বিদেশে গেছে—

বললাম। এবং বলতেই মিত্রা জানায়, হ্যাঁ তাই বলে সারাজীবন ধরেই এখানে থাকতে হবে এমন কোনো মানে নেই। সন্তু যখন চাইছে...

চাইছে চাক...কিন্তু এ-বাড়ির একটা ঐতিহ্য আছে এটাও মনে রেখো। এ-বাড়িতে আমার বাবা জীবন কাটিয়েছেন...বাবার বাবা...তারও বাবা...কলকাতা তখনও ঠিক শহরের আদল পায়নি। তবু তারই ভেতরে কত লোক...কত বিপ্লবী...ঠাকুর্দার বাবা ছিলেন রমপন্থী। একদিন...

বাস, এই শুরু হল আবারও সেই বস্তাপচা গল্প—

গল্প নয় মিত্রা। এ-গুলোই সত্য। এ-সবই আমাদের ঐতিহ্য।

তবে আর কী...ওই ঐতিহ্য ধুয়েই জল খাও। মিত্রার উত্তেজনার পারদ যেন চড়ছে আস্তে আস্তে, এদিকে এ-বাড়িটা ভেঙে পড়ুক, চটে যাক...

কেন, ভাঙবে কেন। এবার ভেবেছি বাড়িটায় হাত দেব—

থাক। গত তিরিশ বছরে অনেকবারই দিয়েছ। এ-সব আর আমাকে শুনিয়ে লাভ নেই।

কী বলব। গত কয়েক বছরে ছেলের পেছনে ও মেয়ের জন্য যেভাবে জলের মতো টাকা খরচ হয়েছে তাতে জমি কিনে আলাদা একটা বাড়িই হয়ে যেত। কিন্তু তা করতে গিয়ে ছেলেটা হয়তো...। অথচ সব জেনেও মিত্রা যদি এমন কথা বলে...

চুপ করেই ছিলাম। মিত্রা দেখি খানিক পরেই হাই তুলতে তুলতে ভেতরের দিকে চলে গেল।

দিন চারেক পর।

মিত্রাই কার সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা ব্রোসিওর নিয়ে এসেছিল। এক সকালে আমার সামনে সেটা ফেলে দিয়ে বলল, এই দ্যাখ...খুব বড় একটা কনস্ট্রাকশান কোম্পানি। প্রোমোটিঙে নেমেছে। বাইপাসের পাশে ওদের নতুন আবাসন 'ইস্ট উইন্ড।' তিন হাজার স্কোয়ারফিট নাকি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকায় হয়ে যাবে বলছে। সন্তুকে জানাতেই বলল, ড্যাম চিপ। নিয়ে নাও। বাবাকে বল বুকিং করে ফেলতে।

আমার তখন মাথা ঘুরছে। পা টলছে। পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার ফ্ল্যাট। তাও কিনা বলে ড্যাম চিপ।

জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু কীভাবে পেলে এটা?

মিত্রা চোখ সরু করল, চেষ্টা থাকলেই পাওয়া যায়। নীতার এক বন্ধুর দাদা শুভাশিস ওই কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার। সে-ই নীতাকে দিয়েছে—

ও। তাহলে তো তোমরাই গিয়ে....

কেন, আমরা কেন। মিত্রা হঠাৎ ফোঁস করে উঠল, তুমি আছ কী করতে। এ-সব কাজ সংসারে পুরুষেরাই করে। তোমাকে দিয়ে তো কোনো কাজই হয় না। সময় পেলেই শুধু বই পড়বে। কী পাও ও-সব ছাইভস্ম পড়ে?

তা অবশ্য ঠিক। ছাইভস্মের মধ্যে যে মুক্তোর সন্ধান পাওয়া যায় তা আর এদের বোঝাব কী করে।

বললাম, কবে যেতে চাও?

কবে কী...আজই যাবে। দাঁড়াও শুভাশিসের মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি—

অগত্যা শুভাশিস। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে দেখাল, একদম গ্রীন....বুঝলেন মেসোমশাই। পলিউশান নেই। ডাস্ট নেই। তিরিশ বিঘা জমির ওপর এ-এক অন্য পৃথিবী। চার-পাশে গাছ আর গাছ। তারই ভেতরে গল্ফ কোর্ট, লেক, মার্কেট, ব্যাঙ্ক ও পোস্ট-অফিস। খুচরো মার্কেটিংও রিলায়েন্স থাকছে। আর দশতলায় উঠলে সুন্দরবন থেকে নয়াচর সবই আপনার হাতের মুঠোয়।

বুকিং হয়ে গেল। এবং সঞ্জুকেও জানানো হল। আর এর মাস চারেক বাদেই আবারও এক রাতে মিত্রা। বলাবাহুল্য, আমার হাতে তখন একটা বই। খুবই ধীর পদক্ষেপে বারান্দায় গ্রিলের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা শুভাশিসকে তোমার কেমন লেগেছিল?

ভালোই তো।

ওই শুভাশিসই নীতাকে প্রোপজ করেছে।

তবে আর কী....চারহাত এক করে দাও—

তা তো দেবই। এ-সংসারে আমি ছিলাম বলেই তোমরা উতরে গেলে। নাহলে আর....

ফাল্গুনের এক লগ্নেই নীতার বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু বলে বলেও শেষ পর্যন্ত আর এসে উঠতে পারল না সঞ্জু। তবে তাতে নীতা বা মিত্রাকে তেমন ভেঙে পড়তে দেখলাম না। কেননা সঞ্জু দিয়েছে অনেক। আমি যা দিয়েছি তারও ওপরে একটা ফ্ল্যাট এবং ছোটো একটা গাড়ি। আর সে গাড়িতেই এরপর মা-মেয়ে ও জামাই। কখনও নীতার ফ্ল্যাটে কিংবা কখনও সঞ্জুরই ওই দশতলায়। দিন কাটছিল এভাবেই, মিত্রার ও নীতার। নীতা আর শুভাশিসের। কিন্তু আর কাটল না।

এক সন্ধের ফোন করল সঞ্জু। মিত্রাই গিয়ে ধরেছিল। সঞ্জু জানাল সে বিয়ে করেছে। মেয়েটি আমেরিকান। এবং আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করায়, ও-দেশে সঞ্জুরই লাভ হয়েছে। এবার সে শিগগিরি বউ নিয়ে একবার আসবে কলকাতায়। কেননা রোজি একবার ইন্ডিয়া দেখতে চায়। বিশেষ করে কলকাতা।

শুনতে শুনতেই মুখটা কালো হয়ে গিয়েছিল। ফোনটা ছেড়েই হঠাৎ ধুপ করে বসে পড়ল।

কী হয়েছে?

সঞ্জু বিয়ে করেছে। মেয়েটি আমেরিকান। ছি ছি ছি, শেষ পর্যন্ত কিনা....

মনে মনে হাসলাম। এমনটা যে হবে এ তো আমার জানাই ছিল। কিন্তু বললাম না। না বলে চুপচাপই মিত্রার সামনে থেকে সরে এলাম। মিত্রার মুখেও কোনো কথা নেই। গুম হয়ে চুপচাপ বসে রইল।

কয়েক বছর পর। এখন আমি সেভাবে কোথাও বেরোই না। বছর কয়েক হল রিটায়ার করেছি। মিত্রারও বেশ বয়স বেড়েছে। তবে সে কথা বলতে পারে না। একটা হুইল চেয়ারে বসিয়ে বিকেলের দিকে এক আধটু ঘুরিয়ে আনি আমি। তারপর আমাদের বাড়ির সামনের বাগানে। যেখানে মায়ের হাতের লাগানো টগর। দাদুর হাতের গোলাপ। হুইল চেয়ারে বসে মিত্রা সেগুলোই দেখবে। আর শুনতে চাইবে এ-বাড়ির গল্প। আর ইশারায় বলবে আমাকে পড়তে। আমি তাই পড়ি। কখনও রবীন্দ্রনাথ কখনও বিভূতিভূষণ। কখনও তারাশঙ্কর কিংবা মানিক। মিত্রা মন দিয়ে শোনে। শুনতে শুনতে আবারও ইশারায় জানায় পড়তে। কিন্তু ভুলেও কখনও সঞ্জুর নাম তোলে না। কিংবা বলতে চায় না নীতা কিংবা শুভাশিসের কথা। কেননা তারাও এখন আর কলকাতায় নেই। পাছে ফোন করে, সেজন্য মিত্রার তাড়নায় ল্যান্ড-লাইনটা তুলে দিয়েছি আমি। কিন্তু মোবাইলটা ছাড়িনি। ফলে এই মোবাইলেই খবর আসে মাঝেমাঝে। কখনও সঞ্জু কখনও নীতা, কখনও শুভাশিস বা আমেরিকান বউমা। আমি তাদের খবরাখবর পাই। বলিও আমাদের কথা। শুধু বলি না, হুইল-চেয়ারের গল্পটি। যদি কখনও আসে বা এসে পড়ে হঠাৎ, তখন হয়তো দেখবে। কিন্তু ততদিনে এ-গল্পটি যদি অন্তত বেঁচে থাকে...।

# অনেক অনেক দিন

**পবিত্র মুখোপাধ্যায়**

অনেক অনেক দিন হয়ে গেলো, আজো বেঁচে আছি
এক দুর্গত সময়ে;
পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে। সবুজ সতেজ
ঘাসের ডগায় আর শরতের শিশির পড়ে না।
হয়তো আজও পড়ে, তবু
দেখা তো হয় না আর চোখ মেলে,
সবই হয়তো সেরকমই আছে
যেমন দেখেছি ছেলেবেলায়। এখন
সময়ের তাড়া খেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাস ছুটি দিনভর,
রাতটুকু দুঃস্বপ্নে কাটাই।

বিশ্বায়ন কেড়ে নিচ্ছে পৃথিবীর শান্তি। হিংস্রতাই
সম্রাট, শাসন করছে
অগণিত মানুষের প্রিয় বাসভূমি।
কোনোদিনই
শান্তির সহজপাঠ পড়ার অভ্যাস
দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিছুকাল
কয়েক মুহূর্ত হয়তো শান্তি বিরাজিত ছিলো,
আড়ালে ঘৃণার আয়োজন।
কে কার নিজস্ব মাটি সামান্য আশ্রয় কেড়ে নেবে
এই ষড়যন্ত্রে মাথা ব্যস্ত রেখে কাটিয়েছি দিন।

আজও অনুভব করি আজকের বাস্তবতা প্রধান—
অনেক অনেক দিন হয়ে গেলো;
এই চেনা মাটি
অচেনা এখনো কেন মনে হয়? কেন?

শিশিরে ভেজে না পা। রুক্ষ মাটি সরস হবে না?
হিংস্র চোখে বৃষ্টির নরম

ধোঁয়া কোনো দেবী আলো ফোটাতে পারে না?
হার্মাদের অরফিউসের বাঁশি শুনে
চোখের জলের ভাষা বুঝবে না কোনোদিন?
[হয়তো বুঝবে না।]
পৃথিবী কি চিরদিন রয়ে যাবে এমনই অচেনা?

## স্বপ্নের যৌতুক

নন্দদুলাল আচার্য

তোমার সদিচ্ছা তুমি একবার জাগাও কৃষক,
বলো, আর যুদ্ধ নয়,
আমরা শান্তিতে থাকতে চাই।
বলো, আমরা পরস্পর প্রতিবেশী ভাই।
রক্তমাখা ভাত নয়,
এসো হে, কষ্টের অন্ন সোনা মুখে খাই।

অবিশ্বাস মুছে যাক,
শান্তির মঙ্গল ধ্বনি উচ্চারিত হোক ঘরে ঘরে
প্রতিবেশী বন্ধু হোক,
তোমার সবাই থেকো সুখে।
তোমাদের ঘরদোর লক্ষীমন্ত হোক
প্রিয় স্বপ্নের যৌতুকে।

## মুখোশ

মৃণাল বসুচৌধুরী

ছিন্নভিন্ন করেছিল শরীরী মুখোশ

বোধ আর মননের
সম্মিলিত দীনতা ও পাপ
যে মুখোশ
সর্বদা আড়াল করে রাখে
যে মুখোশ

ঢেকে রাখে আত্মার পচন
তার জন্য ঘৃণা নেই
নেই প্রতিরোধ
তাকে কেউ কোনোদিন
আঘাত করো না
উন্মত্ত দু'হাতে শুধু
নষ্ট করো ছদ্মবেশী
মুখ ও শরীর

## বাইরে এখন

উৎপলকুমার গুপ্ত

তুমি কি আমাকে ডাকছ এখন বাইরে? বাইরে এখন দিন চৌচির
সন্ত্রাস আর জঙ্গি ঘুরছে
এর মধ্যেই জীবন পড়ছে
কী করে তুমি পদ্ম ফোটাবে
টলমল নীল জলের কসলে
পাঁক, কাদা আর ছাই।
আকাশে উড়ছে তখন থেকে কালো বাজপাখিটাই।

প্রেম-ভালোবাসা চুলোয় গিয়েছে, পাহাড় পাহাড় অস্ত্র জমেছে
আর. ডি. এক্সের বাহাদুরীটাই
দেখবার মতো জিনিস;
শাদা লাল নীল হলকা আগুন
দশটি বজ্র ভেঙে পড়ে যেন
উড়ে উড়ে যায় ছিন্নভিন্ন শরীরের সব অঙ্গ?
তুমি কেঁদে ওঠো, চাঁদ কাঁদে একা, কে দেবে তোমাকে সঙ্গ?

লুকানো মাইন-এ ফুলবাস ওড়ে, জিলেটিন স্টিক ওৎ পেতে থাকে
সর্বংসহা বসুন্ধরা
বেদনায় হয় নীল;
আত্মঘাতীরা সুযোগ খোঁজে, জীবনের মানে হারিয়ে ফেলে
ঘুরে ঘুরে তাই বিস্ফোরণে
চমৎকার নীল ঝিল—
তুমি এসে বসো তারই তীরে দেখো, পদ্মে-কেয়ার যদি কিছু পাও মিল।

## বিনির্মাণের খেলা

অনন্ত দাশ

সুখের সময় পড়ে না তোমার মনে
দুঃখের দিনে ডেকে ওঠে সেই পাখি
কোথায় ছিল সে কোন সে আকাশ জুড়ে
বাস্তবে তার কোন রূপ ধরে রাখি।

শূন্যতা, নাকি উজ্জীবনের আলো
অনুভবে তার রূপারোপ ফেলে ছায়া
নিসর্গ নয়, মানুষের শোক নিয়ে
বিষন্ন এক দুপুর ধরেছে কায়া

প্রস্তাবনায় বহু দিন গেছে চলে
এত তমিস্রা ঘন কালো অম্বরে
জীবনে যতই স্বপ্ন লুকিয়ে থাক
তোমাকে পাই না স্বাভাবিকতার স্বরে

সন্ত্রাসময় এই বিশ্বের রূপ
আমরা দেখতে চেয়েছি কী কোনোদিন
মানুষের পাশে মানুষ দাঁড়াবে এসে
ভালোবাসা দিয়ে শোধ হবে সব ঋণ

অনুভবে শুধু বিনির্মাণের খেলা
এভাবেই কাটে সন্ধ্যারাত্রিবেলা

## ছবিখানি পুরোনো হয়েছে

কৃষ্ণা বসু

আজ খুব মেঘ জমেছে। সরোবর-তীর। সেই সরোবর ছেলেবেলাকার। একটা পাখি শিস দিয়ে ডাকছে সমানে, সেই পাখি? সে তো মরে গেছে কবে। তবু সেই পাখি ডেকেই চলেছে। গুরু গুরু গুরু গুরু মেঘের ডম্বুর বাজে। বিদ্যুৎ চমক দিচ্ছে মাঝে মাঝে। সাদা যুঁই ফুলের মতো বৃষ্টি এসে ভরিয়ে দিচ্ছে

ঘর-দুয়ার। বড় সরোবর ভরে যাচ্ছে জলে। বাবা বাড়ি নেই। মা উদ্বিগ্ন
সামান্য। দিদি এসে পড়তে বসেছে। ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির মধ্য দিয়ে বড় লম্বা ছাতা
মাথায় বাবা বাড়ি ফিরলেন। ঘর-দোর ভরে গেল তাঁর গমগমে কণ্ঠস্বরে।
বাইরে মেঘ ডাকছে গুরু গুরু, গুরু গুরু। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বড় সরোবর
সেখানে পদ্ম-ও ফুটেছে। মেঘের ফ্রেমে বাঁধানো বৃষ্টির আশ্চর্য ছবি
সরোবর-তীরে আজো জেগে আছে। ঐ সরোবরে গাঢ় জলে গূঢ় অভিমান
নিয়ে এ পাড়ার বামুনবাড়ির বউ স্বামীতে নেয়নি বলে ডুবে মরেছিল।
তার মরা চোখের জলের মায়া লেগে আছে সরোবর-তীরে। তুই কিন্তু
তুচ্ছাতীত, সামান্য কিন্তু অসামান্য সেই ছবি রক্তের ভিতর ঢুকে তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে
আজ-ও বাঁশরি বাজায়। ছবিখানি পুরোনো হয়েছে, কিন্তু আজ-ও প্রাসঙ্গিক খুব।

## স্বপ্নরোপণ

**শুভ বসু**

পাটকিলে কোকিল বড় কিচলেমি করছে
ঘন বর্ষায় ভিজে ভিজে তার গানের গলাও বসে গেছে।
তবুও গাছটির ফাঁকটির থেকে উঁকি মেরে দেখে নিচ্ছে
এখনো শব্দে মশগুল এই মানুষটি কোন আবেগে
ব্যাপ্ত সজল শ্যামলে সে কোন স্বপ্নরোপণে মশগুল হয়ে আছে।

স্বপ্নরোপণ। সারাটা জীবনে সে তো এ যাবৎ অপূর্ণ সাধ।
সে সাধ দুইয়ে এখনো যে এই জীবনের টানে উদগ্রীব থাকি
সেটা যতখানি রহস্যময় মনে মনে হোক, আমাদের প্রিয় পৃথিবীর কাছে
পৌঁছে যাবার নিবিড় আর্তি অনুপম বলে মনে হয়, যেন এই জীবনের
এতকাল এত বিবর্তনের ভেতর গোপন ছিল শুধু এই অন্বেষাটিই।

সে অন্বেষাই সারা বুক জুড়ে জ্বালিয়ে জ্বলছে
পুবের আকাশে ওই ধ্রুবতারা, সেই জাগরণ আমাদের কাছে
প্রতীকী বলেই যদি মনে হয়, সেই প্রতীকের সম্মানে আজ
জাগতেই হবে, অন্ধ তামস তার সমস্ত বীজ নিয়ে যদি প্রবল ধমকে
দাস হতে বলে, বশম্বদ বা নেহাৎ বাচাল, তবু ইতিহাসে
অন্তত কোনো অর্থপ্রবল ভূমিকা খোঁজাই যথার্থ মানা জরুরি।

## স্বদেশ

অরুণাভ দাশগুপ্ত

এক

দুয়ার ঘুরে ফিরছিল হাত
হাতের পরে শূন্য থালায়
ভাতের স্বপ্নে কাঙাল দুচোখ
দুঃখী মানুষ স্বপ্ন দেখে?
দেখছিল বা এক চিলতে ন্যাতায়
বুকের কুসুম আগলে রাখে
                কন্যা চতুর্দশী
স্বদেশ আমার! জন্ম দিলে
উপরি বলতে যা দিলে তা
                নিত্য একাদশী

দুই

যে ডাকে সে আমি নয়
নিশি পাওয়া বিপন্ন স্বদেশ।

মধ্যরাতে সেই ডাকে
সন্ত্রাসে জেগেছে সারা পাড়া...
দোরগুলো বন্ধ হয়, আলো নেভে, ফুকরে ওঠে শিশু
আমার দেওয়ালে হাসে নিরুত্তাপ ক্রুশবিদ্ধ যিশু।

## বৃক্ষবেবুন

আনন্দ ঘোষ হাজরা

সংগ্রাম তো চিরদিন ছিল আছে, থাকবেই
বাঁচার আস্বাদ থেকে যাবে—
অথচ প্রগাঢ় এই সন্ধ্যাবেলা নিরন্তর ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে
আর কোনো শব্দ নেই;
আমি অকস্মাৎ দেখি আমার শরীর
                বৃক্ষশাখায় ঝুলে আছে।

নীচে জল, জলময় লবণ-লেগুন স্থির
মাঝে মাঝে জ্যোৎস্নায় জ্বলে;
কোথা থেকে ভেসে আসে সাপ, শবদেহ
পাখিদের পশুদের মানুষের এবং কোথাও কোনো
প্রাণচিহ্ন নেই
একটু আগেই ছিল বলে মনে হয়...
কারণ বেনিংগোদল উড়ে গেছে কোথায় কখন
সদ্যমৃতা কোনো এক প্রেমিকার শবে ফেলে রেখে।

বদ্ধজল স্তব্ধজল পচাজল লবণ-লেগুন
কেবল আমিই কেন বৃক্ষশাখা ধরে ঝুলছি
অনিশ্চিত বৃদ্ধ বেকুন!

## বাবা বলতে চাইতেন

রানা চট্টোপাধ্যায়

শেষ যাত্রার আগে বাবা চোখ বন্ধ ক'রে
কয়েক মাস কি যে ভাবতেন!
আজ ভেতরে-ভেতরে অজন্মায় ফুটিফাটা
যতবার ভাবি এ'বার ভাল একটা ফসল তুলবো
ততবারই বাবার পড়ন্ত বেলার মুখ মনে ভাসে,
মাঠ বোঝাই শুধু বুনো ওল আর দরকচা মারা পোকা বেগুন
মুড়ির চাল বস্তা ভর্তি হয়ে যাচ্ছে শহরের দিকে।

বাবা বলতে চাইতেন উদয়-অস্ত পরিশ্রম করেও
সংসারের হাল ফেরাতে পারেন নি
সাধুদের মতো নিষ্কর্মা শুধু দেখে গেছেন
সস্তা মানুষের উল্লম্ফন আর বিপুল বৈভব—
পিছিয়ে গিয়েছেন দুই হাত শূন্য ক্রমশ
বাসমতী ধানের গন্ধ নিয়ে বুকের ভেতর।

আজ আমি বাবার বয়সী হয়ে ভাবছি
কিন্তু বলতে পারছি না—কিছুই পারিনি,
সন্তানের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারছি না,

লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে রাখা ছিল স্বপ্নের বীজধান
সবটাই হারিয়ে গেছে দুর্যোগময় রজনীতে।
আমি ভাগ মানুষের মতো অসহায় বসে আছি
হয়তো আমারি ব্যর্থতা আমার ভুলের হরণ।
বাবার মৃত্যুর তিরিশ বছর পরও
সংসারের সরোবরে কমল ফোটেনি।

বাবা বলতে চাইতেন যা এখন আমি
চোখের জলে খানিকটা বুঝতে পেরেছি।

## এক মুঠো জুঁই ফুল

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

যা গিয়েছে গেছে, যে-টুকু যায়নি তাকে
খরায় জরায় দুটো জুঁই ফুল
নিরাশার মাঠে আশার মুকুল
জীবন লড়িয়ে চেষ্টা করছি, সে-টুকুই যদি থাকে

যা বলেছি তা সত্য বলিনি, কারণ
চোখের সামনে ছিল না সবুজ আলো
হঠাৎ যখন বিদ্যুৎ চমকালো
ক্ষণিক বলেই হৃদয়ে করিনি ধারণ

কথোগুলি যদি জমানো থাকতো গোলায়
বাইরে যদিও শূন্য মাঠের শব
মৃতকে কখনো বাঁচানো কি সম্ভব
তবু কিছু স্মৃতি থাকতো কাঁধের ঝোলায়

স্পষ্ট কথার তখনো ছিল না মূল্য
কারণ সত্য চিরকালই লাঞ্ছিত
বিশ্বাস ছিল মনের গভীরে স্থিত
আষাঢ় কি তাকে আবার জাগিয়ে তুলল

জমিয়ে রেখেছে অনুপম যত ভুল
বর্ষারাতের এক মুঠো জুঁই ফুল।

## চলো, এগিয়ে যাই

বাসুদেব দেব

দ্রুত বদলাচ্ছে দিনকাল পথঘাট ভাবনা চিন্তা
বদলে যাচ্ছে পতাকার রঙ মুখের ভাষা
দেরি হয়ে যাবার আগে চলো আমরাও এগিয়ে যাই
কাগজ আর দূরদর্শনের, পৌরসভা আর পঞ্চায়েতের এলাকা ছাড়িয়ে
চলো, আমরা হেঁটে যাই বিজ্ঞাপনের নজর এড়িয়ে

পাশাপাশি বসার মতো ঘাস-ও আর অবশিষ্ট নেই
স্বপ্নহীন এসক্যালেটর কখন ছিনিয়ে নেবে আমাদের
পরিচয়হীন নির্জনতার বিষ ঢুকে যাবে কোষে কোষে
যন্ত্রে পরিবেশিত হবে শিশুর কান্না মেঘের ডাক
চলো, তার আগেই আমরা এগিয়ে যাই আরো কিছুদূর...

পড়ে থাকুক কেতাবি বিপ্লব আর আদর্শহীন রাজনীতি
তেজস্ক্রিয়তাহীন শিল্প কাগজ মাটির খেলা
নোঙর ছেঁড়া ভলোবাসা
বহুতল বাড়ির সাজানো সব খাঁচায় ছেড়ে দিয়ে
বুনো হাওয়া
মরা শোলার মতো রাশি রাশি ভাঙা অক্ষরের
আবর্জনা ঝেঁটিয়ে দিয়ে
চলো, আমরা এগিয়ে যাই আরো অচেনা চাউনির
ছোবল খেতে খেতে

## কবির জন্য

বেণু দত্তরায়

কবিতা রোদ্দুর ভালোবাসে। ভলোবাসে
জল, মাটি ও আকাশ।
শিরা-টানটান তার আলো হেঁটে যায়
পৃথিবীতে।
মাথে উদ্ভিদের গন্ধ হাতে মাটিতে শিকড়ে
বারোমাস।

আনন্দে-আরোগ্যে তার কথামালা লেখা হয়
উজ্জ্বল অক্ষরে...
সে পেয়েছে কর্মময় অম্লান অক্ষয় অধিকার,
শোক নয়, দুঃখ নয়, অনন্তবিস্তার
তার ডানা।

আকাশ এসেছে নজরানা
তার জন্য। স্বর্ণশীর্ষ-আঁকা
দুর্গদুয়ারে তার বিজয়ী পতাকা।

কবি আজ হেঁটে যান। মাথা নিচু করে
দেখে ক্লীব ক্রীতদাস।
দেখে ভণ্ড-ভাঁড় অন্ধ ইতিহাস।
বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের চতুর সভ্যতা,
খোঁড়া রাষ্ট্রনীতি রাজপথে ক্লিষ্ট বিমর্ষতা।

কবির বুকের মধ্যে খুলে গেছে প্রসন্ন সুহাস
শ্বেত অট্টালিকা। খুলে গেছে সুবর্ণ দরজা।
নিভৃত অলিন্দে তার নীল দীপশিখা
চুঁইয়ে পড়েছে জলে।
রণডঙ্কা নয়, শিবিকাও নয়—
কবি আজ এ-পথে যাবেন—
একটি আকাশপদ্ম তুলে নিয়ে তাই আজ
রাজকন্যা পথে দাঁড়াবেন।
ঘনঘুম চোখ তার, নীরবনির্জন
গন্ধভরা গান। তাকে বলে পরমতা।
ওই তিনি চলেছেন—আকাশের দিকে
চোখ, স্নিগ্ধোজ্জ্বল। নক্ষত্রের দিকে
হেঁটে যান।
জরির পাগড়িতে তাঁর রোদ ঝলকায়।

## জীবন-ভাষ্য

শান্তি সিংহ

ধারাবাহিক বঞ্চনার ক্রোড়ে কেঁচো তোলে ফণা, মাটির মানুষও এ.কে.৪৭
ইতিহাসের শিক্ষা যারা ভুলে যায়, জীবন-ভাষ্যের সাদামাটা উপমায়
তাদের জানা জরুরি: সুদূর নায়গ্রা না-হোক, অম্বু-উগ্রির দুরন্ত ধারা

শয়তানের লাল চোখে আছে অসহায় অন্ধত্ব, ভুল হয় পথের নিশানা
রাশিয়ার জারতন্ত্র, হিটলার-মুসোলিনি কিংবা ভারতের গৈরিক সন্ত্রাস
অনিবার্য অপরিণামদর্শিতায় হারিয়ে যায় অতল আঁধারে

দাঙ্গার রক্তগঙ্গায় মুহূর্তে ডুবে যায় 'গঙ্গা'-নামের পবিত্রতা
রাতের শিশির ভেজা ঘাস, সকালের আলোয় অন্ধতামস মুছে ঝলমল করে
সন্ত্রাসের এক চক্ষু দানব সুযোগ পেলেই বোবা যুদ্ধে জাগায় আতঙ্ক

## জল যদি ভিজোয়

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোরুশিঙে ফোঁড়া বাচ্চাটার
কোন্ কষ্টটা পদ্যে লিখতে পারে? মেঘবাতাস নেই, দুর্বিপাকে —
কতটুকু বোঝা যায় কোষ্ঠীবিচারে, বা বিশ্লেষণে?
পাকা পেঁপেফালির প্লেটটাতে
পাখিরক্ত খুঁজিয়ে উঠেছে যে খালি! কিংবা ধরো
চাকুর কৌশল রপ্ত করতে গিয়ে ভাইয়েরা হঠাৎ মুখোমুখি—

যেন সব এমনটাই হওয়ার ছিল। সংসা-র গোপন
ছায়া জমে উঠবে সাঁবাদেয়ালে, শান উপড়ে
তোলা হবে ঘরের শেকড়—জানতুমই তো। তাকে তোলা
উজাড় করে ফেলা ফর্মালিনের বোতলে
জীয়োনো যাবে না সম্বচ্ছরের ঘরানা মাঠখানা—
আর ওই অমন অপঘাতের কষ্টও

পদ্য কি চেঁচিয়ে মাথা খেতে পারল একটা লোকেরও?

শূন্য চেয়ে তার গোড়ে-গাঁথা শব্দকটা
রঙ ধরল না বলে কারোকে না দুষে
এখনও সেভাবেই রয়ে গেছে বর্ণমালায় না ফিরে।
আর শত ক্ষতদাগ খুলে মাঠ নিঃশব্দে সইছে অপেক্ষাতে
জল যদি ভিজোয়, রোদ টানে।

## তিন সত্যি

পার্থ রাহা

এখানে নদীর ওপাড় জুড়ে আঁধার, কালো আঁধার
মাথার ওপর গাঁওবুড়ো আকাশ
আর
আকাশের নিচে পাড়ের মানুষগুলো
অন্য মানুষের চোখের আলো দেখে দেখে
দ্রুত পায়ে অরণ্য পার হচ্ছিল
হাতের তলায় ঝোলা লন্ঠনের আলো নিয়ে
পথ হাঁটছিল জোনাকিরা
গাঁওবুড়ো আকাশ গালে হাত ভাবছিল
এই মানুষগুলো
এই রাতগুলো
সময়ের দিকে পিঠ ফিরিয়ে
সকালের জন্য ঠায় বসে

রাত পোহালে
মানুষগুলোর হাতের লন্ঠন
বুকের জোনাকি হয়ে
জ্বলবে
জ্বলবে
জ্বলবে
গাঁওবুড়ো আকাশ ঠানদিদি নদীকে তিন সত্যি দিয়ে গেছে।

## একটি দুটি কালো দাগ

নীরদ রায়

এতো কিছুর পরেও লোকটার পেছনে
সাদা হয়ে থাকবে কিছুটা চমৎকার—
সাতদিন মুখ থেকে এক ফোঁটাও জল বেরোবে না যে টিউবওয়েলটির,
তার পাশেই নেটওয়ার্ক বিজি বলে সাতদিন কোনো কথা
পৃথিবীর মুখ দেখবে না,
শুধু বাঘবন্দি খেলায় দিন বড় হবে, চওড়া হবে রাস্তা
বাড়ি ফেরার পথে সেই বকুল বকুল গন্ধ—
গোপন থেকে উঠে আসবে আলো মাখা রাত
শব্দহীন নারীর কাছে—দুএকজন রঙিন পুরুষ—
এতো কিছুর পরেও লোকটার পেছনে—
জেগে থাকবে একটি দুটি কালো দাগ।

## নীরবতা

জিয়াদ আলী

বৃক্ষের ভিতরে তুমি থেকে যাও
ছায়াময় শাখায় পাতায়
স্বপ্নের মতোই দাও কিছু মায়া
মহিমাও দিও
তারাপদ ওষ্ঠ দিয়ে যতখানি জানো
সমস্ত শরীর শুষে নিও।

তুমি ঠিক যতখানি জানো
আমি তা জানি না
যেভাবে যতোটা তুমি মানো এই রীতিনীতি
আমি তা-ও মানতে পারি না।
কাছে থাকো,
তবু তাই কাছাকাছি
কখনও টানি না।

যখন সুখের হুড়োহুড়ি
ঝড়ের মতোই দ্রুত চলে যায় গৃহস্থ সময়
দুঃখময় হলেই সংসার
রাতগুলি ক্রমশই দীর্ঘ হয়
আরও দীর্ঘ হয়।
এমন অপেক্ষমান নীরবতা
তবু হয়ে ওঠে মোহময়।

## শ্যাওলার শরীর

**গণেশ বসু**

বাতাসে বাতাসে খড়কুটো হয়ে আজো ভাসি, ধুলোয় ধুলোয়
ছেঁড়া শিকড়ের কথা ঘুরে ঘুরে নদীর শরীরে
মেঘ চিরে কান্না হয়, ঘাসে ঘাসে আলোছায়া তারাদের রুপোলি ডানার
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে স্মৃতি টেনে তোলে, চিরকাল হারানো সুরেই
আমার পাঁজর বাঁধা, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত মুখে শোকার্ত দিনেরা
নীরবেই ঘুম কাড়ে, কোনোদিনই ভালোভাবে ঘুমোতে পারিনি
না রোদে, না নিজস্ব বর্ষায়।

শ্যাওলার শরীর যেন ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে গেছি ঘাটা-আঘাটায়।

অথচ আমার পায়ে মাটি ছিল। মাথার উপারে
বাসুকির ছাতা ছিল সেসময়ে। পৃথিবীও মাধবী যেদিন
ফসলে ফসলে ফুলে, দৃষ্টিপথে কল্পলোকে, সত্য ছুঁয়ে অসীমে আশ্রয়।

শ্যাওলার শরীর যেন ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে গেছি ঘাটা-আঘাটায়।

অথচ আমার মুখে বলিষ্ঠ সৌন্দর্যে বুলি স্বাধিকারে ছিল।
ছায়া হতে হতে নিজস্ব ভাষাও কবে স্মৃতি হয়ে যায়
মান্যতার আগ্রাসনে, লোকায়ত শব্দাবলি হিমবাহ, ধ্বংসের থাবায়
শোকার্ত রাতের মতো সবার আড়ালে বড়ো একা একা, সাজানো বাগানে
ডাঁই করা ঝরা পাতা এক কোণে, আমার ঘরোয়া ভাষা বিবাদে বিন্দাস।

শ্যাওলার শরীর আমি ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে গেছি ঘাটা-আঘাটায়।
মা কি কারো কখনো হারায়?

## বুনো হাঁস

আশিস সান্যাল

পুরোনো পাথের রেখা
মুছে ফেলে
বুনো হাঁস উড়ে আজো পথের সন্ধানে।
এ চলার শেষ নেই
ক্লান্তি নেই
স্থিতি নেই পৃথিবীর জানি কোনখানে।

সর্বত্র চলার শব্দ
প্রতি রাতে
নতুন সংকল্প নিয়ে চলে সবে নতুন সংঘাতে।
রক্ত ঝরে—
বুকের শোণিতে তবু প্রবল উল্লাস,
বিপ্লবে সংগ্রামে মাতে
লেখা হয় জন্মান্তের অন্য ইতিহাস।

প্রতিক্ষণ মৃত্যু-ঝড়
গর্জে ওঠে অন্ধকারে প্রবল তুফান।
সমুদ্র উত্তাল হয়
উড়াল পাখির কণ্ঠে তবু শুনি গান।
কারো বা মাস্তুল ভাঙে
কারো বা হৃদয়
বুনো হাঁস উড়ে যায়
জেনেছে রাতের শেষে আছে সূর্যোদয়।

## মূলে জড়িয়ে যাবো

**দীপেন রায়**

আগুন খুঁচিয়ে চিনে নেবো—ফিরে গেছে যে আনমনা
হাত ধরে ডেকে, পাশাপাশি, মূলে জড়িয়ে যাবো।

ছাই বানিয়ে তুলতে—এসেছি এখানে কি অকারণ।
সদ্য রাত্রির গভীরে ফুটে ওঠে অজস্র লতাপাতা।
নেহাৎ অন্ধকার বলে কথা—ফিসফাস আঁকিবুঁকি
পিলসুজ জ্বেলে মধ্যযামিনী সন্ধিপুজোয় ব্যস্ত।
দেখ, অসংখ্য ডিন্ডিম, বাঁধ ভেঙে ঢুকছে জল
হাওয়ায় তাড়িয়ে নিয়ে গেছে গুচ্ছের লোকজন।
না-কি, কে কোথায় ভেসে গেল মানববিগ্রহ?
অবসাদ খঁড়ে পারো তো ওদের ভিতরে আনো।

আগুন খুঁচিয়ে চিনে নেবো—ফিরে গেছে যে আনমনা
হাত ধরে ডেকে, পাশাপাশি, মূলে জড়িয়ে যাবো।

## মেঘ সর্বনাশী

**প্রবীর ভৌমিক**

শুশ্রূষা, তুমি দূরে থাকো।
রাত্রের জলের গেলাস আমি অন্ধকারে
কাল রাত্রে হারিয়ে ফেলেছি—
জলের গেলাস তুমি দূরে থাকো
আজ রাত্রে জলকষ্ট হোক।

প্রবল শরীর বড়ো দীর্ঘকাল পরে
করুণা ধারার মতো মোহময়।
বারান্দায় দাঁড়িয়ে, কেঁদুলি মেলায়।
প্রচণ্ড শরীর আমি তৃপ্ত—
আজ দূরে যাও।

হাতের তালুর থেকে দীর্ঘকাল
গড়িয়ে পড়েছে জল
জল নাকি মেঘ, মেঘরাশি!
দূরে যেতে যাও-যাও
আমি আসি।

ত্রুটি ও বিচ্যুতির জন্য, আমার
মাংস ছিঁড়ে খায় তোমার নিকট প্রতিবেশী।
তুমি দ্যাখ, আমি যাই, আমি আসি।

একটি হাতের কথা মনে আছে,
সারারাত নেমেছিল শুশ্রুষা-আদিম
এই হাত, তুমি দূরে যেতে চাও, যাও
আমি আসি।

মেঘ বর্ণমালা তোমাকে নিকট ভেবে
আজ এই বর্ণবিপর্যয়।
মুগ্ধবোধে আজ মনে হয়। তুমি সম্মোহন
তুমি সর্বনাশী।

## কাউকে, একা করা

**ব্রত চক্রবর্তী**

যাকে মন নেওয়া আর যাবে না কিছুতে,
তাকে উদাস খাওয়ানো।
এমত রেওয়াজ। আগে অল্প ছিল। বেড়েছে, এখন।
ঢের নাড়াচাড়া হল, ওকে। প্রেম প্রীতি যথেষ্টই
দেওয়া গেছে। প্রতিক্রিয়া, জানায়নি। গলা তুলে,
গলা খুলে, আমাদের কথা কই কোথাও বলেনি।
ফলে, রাগিয়েছে, আমাদের। আঙুল ওঠানো ওর
প্রখর অভ্যাস। আগে অল্প ছিল। বেড়েছে, এখন।
আগে চর্চায় রেখেছি, এখন মনোযোগ পায় না ওর
ওঠানো আঙুল। এত তর্জনিশাসন কেন, প্রশ্ন উঠে গেছে।

আমরাই দিই ধুই তবু আমাদের দেওয়ায় ধোওয়ায়
সন্দেহ এনেছে কেন, প্রশ্ন রাখা যায়। ভাল কি
লাগেনি কিছু? বলেনি, কখনও। আমরাই ঘিরে থাকি
তবু আমাদের ছায়া দেখে চমকায় কেন, বলেনি,
কখনও। সাদা দাঁতে কখনও হাসেনি। মেদুর ভঙ্গির
মানে তবে পরে বোঝা গেল ভেতরে নেয়নি কিছু,
আমাদের। তো, ছবি করা যাক এইবার ওকে। যদি আর
কোনও কিছু ওর জন্য নয়, ওকে বোঝানো দরকার। একা
দাও, ওকে। মৃদু টোকায় টোকায় ফ্রেমের ভেতরে ভরো,
ফটোফ্রেম, ছবি করো।

## তিমিরে

**অনির্বাণ দত্ত**

বাণে নয়, বাক্যে তোলো ঝড়।
জোড়া শব্দ-স্বর, কণ্ঠক আগুনের ধ্যানে—
পোড়াও শরীর।

অবসাদ অজ্ঞানতিমির, ধ'রে আছে কুষ্ঠের বিকার। সর্ব অঙ্গ
স্থির-মগ্ন, হিম সম্মোহনে।

ডাকো।
আলোর ওপার থেকে
পতে দাও সাঁকো। বিছিয়ে রাখো গন্ধের ফুল।
বেপথু আশায়...
কখনো না-আর হয় ভুল।

মানুষের করধৃত দায়—
মানুষের জন্য যেন আবার জাগায়...।

পার হই ত্রিকাল-লোত্তর ঃ
দয়াময়ী, হাতে দাও
তসবিমালা, তালুবন্দি জপের অক্ষর।

## পাওয়ার ওপারে

অজিত বসু

কে যায়?...কে আসে?...
কে বলে কি?... কে বলে না?...

একটি দোলনা দুলতে থাকে, দুলতেই থাকে—

তোমার কপালে ও কী ভাঁজ?
কোন্ গিঁটে নেমে এসেছে অন্ধকার?

পাকে পাকে খুলতে খুলতে কতকাল।—
ক্রমে বন্ধহীনতা—ফুরফুরে স্বাধীন বাতাস।
দুঃখ, দীর্ণ অন্ধকার সরিয়ে সরিয়ে আলো—
গভীরের ভেতর পর্যন্ত চকচকে।...

হে সংগ্রামী, হে স্থির পাষাণ-সাধক
পাওয়া পেরিয়ে কতো দূরত্ব পার হ'য়ে
তুমি কে নিঃশব্দ পথিক
পূর্ণপাত্রের মত চলোথছল?

জানি, অতলে লেগেছে টান,
লক্ষ অতলান্ত নিরন্তর ভাষা।

## কলাবিদ্যাবিদ

শ্যামল সেন

সাজিয়ে রেখেছো নৈবেদ্য দেবীর পুজায়
অগ্রভাগে তার আমি ধার্মিক কলা
বহুবিধ কলাবিদ্যা জানি।

আকাশে অন্ধকারে চাঁদের উদয় আমি
আমাকে নজরবন্দী রাখো তোমার সেবায়
অধিষ্ঠানে স্বৈরতন্ত্র মানি।

মন-মেজাজ রঙ্গকথা গানে-গানে বলি
মাননীয় বন্ধুরা শুনেছেন অমৃতবাণী
সবকিছু মানুষের জন্য।

খুনির গৌরবে আমি পাগল-পূজারী
আরতির ঘন্টা নেড়ে দেবো আহুতি
দেবী দেবে দানা-পানি-অন্ন।

বঙ্গদেশে তুমিই শেখালে ভৈরবীর মন্ত্র
শ্মশান-চণ্ডাল আমি গায়ে মাখি ছাই
গোলান্তরে প্রগতির গতি,

শবসাধনায় সঁপেছি তোমাতে মন-প্রাণ
পতনের আগে সখেদে বলবো ঃ
আমি দীনভিক্ষু; ছিন্নমতি।

# নতি দীক্ষা

অজয় চট্টোপাধ্যায়

তুমি কি কেবলই নষ্ট ফসল?
কেবলই কী আততায়ী?
এবারে তোমার নিজেরই কীর্তি
ভাঙার সাহস চাই।

—বিভূতি। শঙ্খ ঘোষ।

নিজস্ব ছাদ। প্রশস্ত বিস্তার। মন বিহার এবং প্রাতভ্রমণ উভয় চাহিদা পূরণের পক্ষে উৎকৃষ্ট পরিসর। অমিত এই ছাদে পায়চারিতে রত, স্বাস্থ্যচর্চার অঙ্গ হিসেবে এই অভ্যেস তার নিত্য কর্মপদ্ধতি। এই অভ্যেস, তিনি ফল পান বিবিধ। ক। শরীর ঝরঝরে লাগে। খ। মন প্রসন্ন থাকে। মাথা সাফ থাকে। গ। কাজের ছক কষে ফেলা যায়। ঘ। কোষ্ঠ কাঠিন্যও দূর হয়। অর্থাৎ হরেক আরোগ্য অথচ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া শূন্য। এভাবে বললে শুনতে সালসার বিজ্ঞাপনের মতো শোনায়। কিন্তু পরনিন্দা ধর্তব্যে না এনে তিনি রোজ প্রাতে পায়চারির ধাত বজায় রাখেন।

পায়চারি করতে করতে অমিত নজর করেন তার বসত ভিটের উঠোন, চশমার আড়ালে দৃষ্টি ঝকঝক করে। নিকোনো চৌকো উঠোন। বেড় দিয়ে আছে টানা বারান্দা। বারান্দার দেওয়াল ঘেঁষে পরপর ঘর। এক ছাঁদ নয়। প্রয়োজন এবং অর্থানুকূল্যের সাথে সাথে সঙ্গতি রেখে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেপে গড়ে উঠেছে। ফলে আকৃতি এবং নকশায় বৈচিত্র্য। রুচিতে জবরজং আদল। উঠোনটা নজর করেন। আর ভাবেন এই সেই উঠোন, যে উঠোনে একদা তোলা উনুনে আঁচ পড়ত দু-বেলা। একপাশে বাঁধানো তুলসি মঞ্চ ছিল। নিত্য সন্ধ্যা আঁচল জড়ানো বধূর মঙ্গল দীপে আলোকিত হত মঞ্চ। সে প্রথায় নির্বাস, অনেক ভাঙন সহে তুলসি মঞ্চটি টিকে আছে। গাছ নেই। মঞ্চ ভগ্নস্তূপ। ব্রাত্যের শিকার, শুধু সন্ধ্যারতি নয় আরো অনেক পুজো পার্বণ এবং সামাজিক উৎসবে টগবগ করত প্রাঙ্গণ। বস্তুবাদী ধারা পত্তনের পর এ সকলি ফুরিয়ে যায়।

বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের প্রেক্ষাপটে সম্পন্ন গৃহস্থের প্রতিচ্ছবি। সম্পন্ন উত্তরাধিকারের ছাপ কোঠার বহিরঙ্গ আদলেও বিদ্যমান। রক আছে। সে রকে রকবাজি হত। এখন হয় না। রকবাজি উঠে গেছে। চল হয়েছে মস্তানির। দেওয়ালের আস্তর গাঁথনি থেকে আলগা হয়ে স্থানে স্থানে খসে পড়ছে। সামর্থ ক্ষয়িষ্ণু। শানিত দৃষ্টিতে অমিত প্রত্যক্ষ করেন বসত ভিটের আঙিনা। শব্দ দৃশ্য এবং বৈভবের সংবেদন মনে গড়ে তোলে এক স্মরণ। সে স্মৃতিমহল সুন্দর এবং সুন্দরের সমাধিতে বিধুর।

চোখ টাটায় না অথচ সবকিছু স্পষ্ট হয় এমন প্রদোষে অমিত উঠেছিলেন ছাদে। াখন সূর্যকে রাজ্যপাট সঁপে দিয়ে ভোর পাততাড়ি গুটিয়ে উধাও। অমিতর সম্বিত আসে াহ্যবিধি মানা হয়েছে ঢের। এবার কর্মনীতির পালা। সিঁড়ির আলসেতে হাত রেখে নামতে দ্যত। থমকে যান। সামনের দিকে চোখ পড়তে দৃষ্টিতে ছায়া ঘনায়। ওই যে সরু রাস্তা দূরের সড়ক থেকে হঠাৎ বাঁক নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। বাড়ির গা ঘেঁসে বয়ে গছে সোজা। কিছুটা গিয়ে লীন হয়েছে আর এক সড়কে। দুই সড়কের বিভাজনে যাজকের মতো জুড়ে আছে এই গলি। সংকীর্ণ। কুণ্ঠিত। কিন্তু বহু বহু বছরের জনপদ। ই গলিতে আলোর প্রপাত নেই। আলোর ছলনা আছে। টিম টিম করে বাল্ব জ্বলে। ার শীর্ণ ধারা দিশা দেয় না। মোহ সৃষ্টি করে। পদব্রজী, যান আরোহী বিভ্রমের শিকার য়। এবড়ো খেবড়ো পথ। খানা খন্দে ভরা। জলে কাদায় প্যাচপ্যাচে। পাথর-বালি-পিচ রস্পর লগ্নতা থেকে বিযুক্ত। উপেক্ষার বলি। উদাসীন পৌরপরিষেবা। ফলে জল কাদা াঁধারের স্বেচ্ছাচারিতা চরমে। দুর্ঘটনায় রমরমা, পাকা ড্রেন নেই। জল সরবরাহ নেই। াস্তায় নেই, ঘরে নেই। পৌরপরিষেবার উন্নয়নে জোয়ার। এ অঞ্চল বরকটে।

ঢ্যাড়া পিটিয়ে ঘোষণা হয়নি। কিন্তু বার্তা রটে গেছে। এই বঞ্চনা-র গর্ভগৃহে বৃত্তান্ত াছে। বৃত্তান্ত ছোট। কোনো এক নির্বাচনে ফাঁস হয়ে যায় এলাকার গুরু অংশ ভোট য়েছে শাসক পার্টির বিপক্ষে। সেই থেকে আকচা আকচি। পক্ষের ভোটাররা জামাই াদের ভাসমান ভোটাররাও খাতির যোগ্য। চিহ্নিত বিপক্ষ ভোটার শত্রু শিবির। এদের পর আরোপ করা হয়েছে অনুশাসন পর্ব। নিষ্ঠুরতা উপেক্ষা যার অঙ্গ। চাপে রাখার কৌটিল্য চাল। প্রতিক্রিয়াও আছে। মানুষ ক্ষুব্ধ হয়েছে। জোটবদ্ধ হয়ে বিধায়ক এবং বোরো অফিসে ধর্না দিয়েছে। নেতৃত্ব নির্বিকার। হেলদোল নেই। অবহেলার অভিযোগ খণ্ডন করে াল্টা আশ্বাস দিচ্ছে : প্ল্যান হয়েছে। বাজেট হচ্ছে। মঞ্জুর হবে। বুঝতেই পারছেন কাষাগারে টান আছে। টাকা এলেই কাজ শুরু হবে। টার্গেট করে অবহেলা? দূর মশাই! জিভ দিয়ে বলে আমাদের রাজ্য নেতা আপনাদের পাড়ার বাসিন্দা। অবহেলা করা মানে াকে দুর্দশার মধ্যে রাখা। পারা যায়!

ভাবুকতা স্বভাব চঞ্চল। কড়া শাসনে গুটিসুটি থাকে। রাশ আলগা হলেই শৃঙ্খলা ন ছন্ন হয়ে যায়। এক ভাবনা পিছলে যায় অন্য ভাবনার আশ্রয়ে, এক্ষণে, অমিত বহু াতিমুখী ভাবনার খপ্পরে। ভাবনা নিয়ে চলে দুলুনি। অবশেষে এক অনন্য ভাবনা স্থির য়। চিন্তাটা কেবলই মাথায় ঘুরপাক খায়। ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা গোষ্ঠীবদ্ধ ীবনের প্রথা রীতিনীতি কেমন দ্রুত লোপ পাচ্ছে। কালের কষ্টিপাথরে স্বাভাবিক অন্ত্যেষ্টি াও ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে জোর করে বদলে দেওয়া হচ্ছে প্রাচ্য রীতি প্রথা মন্ত্রী স্বত্বর যাবতীয় মূল্যবোধ। অমিতর খটকা লাগে এই প্রক্রিয়া কি মানুষে মানুষে স্পর্ককে গাঢ় করছে। সামাজিক বন্ধন কি দৃঢ় হচ্ছে। না-কি রাজনীতির খাল বেয়ে বহে াসছে অবিশ্বাস রেষারেষি সংঘাত।

প্রশ্ন উথলোয়। পায়কারি হারে রাজনীতিকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে যেতে তার কিং কিন্তু লাগে। অন্তর্গতে সায় নেই। আবার প্রতিবাদ করবে সাহস নেই। এ এক অদ্ভুত দোলাচল। প্রশ্নগুচ্ছ বিতর্ক বিশ্লেষণের খোরাক। কিন্তু যুক্তি তর্ক গল্পে টগবগ করবে কোথায় সেই উর্বর পরিবেশ।

অম্বিত অসহায় বোধ করেন। ভাবুকতার খপ্পরে পড়ে নিজেকে মনে হয় সংখ্যালঘু একেই কি বলে একাকিত্ব? সংযোগহীনতা? সব গুলিয়ে যায়।

সংযোগ প্রথার খোঁজে নিভৃতে অম্বিত নানান প্রশ্নে জর্জর হন। জর্জরতা যে হালে অবদান তা নয়। অনেকদিন ধরেই লালন, সম্প্রতি পেকেছে। আজ ২১ শে জুন। গতকাল নিরঙ্কুশ শাসনের ৩০ বছর পূর্তি হয়েছে। রাজনীতির প্রথম চোদ্দ বছর কেটেছে ঘোরে সরল চিন্তার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন ছিল মন। যা কিছু পুরাতন তাই জীর্ণ। ব্যর্থ প্রাণে আবর্জনা পুড়িয়ে দাও। তীব্র জেহাদ ছিল। পণ ছিল নতুন শিল্প শিল্পনীতি এবং ভূমি সংস্কারের। ভূমি সংস্কার হয়। যার মূল তাৎপর্য কৃষিতে চাষির স্বত্ব। বর্গাদারদের স্বত্ব ফসলের ওপর চাষির অধিকার ৭৫ শতাংশ। মালিক ২৫ শতাংশ। বড়াই করবার ম গণ্য হতে পারে কৃষি সংস্কার। উন্মাদনার জোয়ারে খুঁটিনাটি নজর পড়েনি। থেকে গেছে ফাঁক ফোকর। ইতিমধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। তিরিশ বছরের উত্তরণে তটে অনেক পলি পড়েছে। পরিস্থিতি থিতিয়েছে। উদ্ভব হয়েছে নতুন পরিস্থিতি। স্বচ্ছ হয়েছে চিত্র। দেখা যাচ্ছে ফসলের ওপর ভাগাভাগিতে চাষির ভাগ মুখ্য। কিন্তু জমি মালিকানার ওপর স্বত্ব মাত্র ২৫ ভাগ। অর্থাৎ ফসলের ক্ষেত্রে যে নীতি সম্পত্তির ক্ষেত্রে সেই নীতি পালটি খেয়ে যায়। নীতির মুখ ২ ফলা হয়ে যাচ্ছে না। দরদ একবার চাষির কোর্টে একবার মালিকের কোর্টে একাদোকা খেলছে। জমিদারি প্রথা বিলোপের সময় এ বিভ্রাট হয়নি। সেখানে জমির ওপর জমিদারদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ লুপ্ত। ক্ষতিপূরণ বিনিময়ে ভূমিসংস্কারের ত্রুটিপূর্ণ দিকে পার্টি দৃষ্টি দেয়নি। কৃষকসভা নজর দেয়নি। অবস্থার বিবর্তে জমি থেকে কৃষিপ্রথা যখন উচ্ছেদের মুখে কৃষক রুখে দাঁড়িয়েছে। রুজি রোজগার বিনা প্রতিরোধে। অথচ কৃষকরা যদি জমি না ছাড়ে শিল্প প্রতিষ্ঠা হবে কোথায়। এক সূত্রে গ্রথিত উন্নয়ন বিষয়ক অনেক জিজ্ঞাসা। কর্মসংস্থানের সাশ্রয়ী দিক, কোন শিল্পজাত পণ্যে জনগণের সার্বিক চাহিদা—চাহিদার স্বরূপ, কল্যাণ-তৃপ্তি বিষয়ক ইস্যুসমূহ হামলে পড়ে বিশ্লেষণ দাবিতে। উঠে আসে ইতিহাস। ইতিহাস জানান দিচ্ছে নদীর উপকূলে আবাদি জমি গ্রাস করে লোকালয় উৎখাত করে মন্দির মসজিদ গির্জা প্রভৃতি ধ্বংস করে শিল্প নগরের পত্তন হয়েছে। দেখা যাচ্ছে একটা ব্যবস্থার পতনের মধ্য দিয়ে আর একটা ব্যবস্থা পত্তন সূচিত হওয়া একপ্রকার ধরতাই।

আবার ইতিহাস নির্দিষ্ট ধরতাইকে কলাও দেখায়। বহু অভিমুখে তার যাত্রা বক্র জটিল এবং খলবলে। তারই অন্যতম এক অভিমুখ এক্ষণে উঁকি দিচ্ছে। যে সময়ে শিল্পায়নের প্রাথমিক অভিযান সংগঠিত হয়েছিল সে যুগে মানুষ ছিল অসহায়। প্রতিবাদের ভাষা অর্জন করেনি। খেলাটা ছিল একপেশে। চাকা ঘুরে গেছে। এখন খেলার ওয়াকওভা

নেই। মুখে শুরু করেছে প্রতিবাদের ভাষা। ভাষায় না কুলালে প্রতিরোধের রণকৌশলও দারস্থে। হাতে এসেছে অস্ত্র। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার চরে মানুষের বসবাস। দু-পক্ষের মুখোমুখিতে খেলা জমজমাট। খেলাটাও একপ্রকার যুদ্ধ। কৃষকরা বুঝছে জমিচ্যুত হওয়া মানে ভিটেচ্যুত। ভিটেচ্যুত মানে সাংস্কৃতিক পরম্পরা থেকে ছিন্ন হওয়া। এই যে ক্রম শূন্যতা—যার পরিণাম আইডেনটিটির হরিবোল। বিবর্তিত সমাজে আউটসাইডার বনে যেতে কৃষক সমাজ আর রাজি নয়। সুতরাং হাতাহাতি লড়াই। চাষির সচেতন ভাবকল্প মার্কসবাদী তত্ত্বের পরিচর্যার ধন্য ছিল। অথচ আজ সরকারি মার্কসবাদ চাষির সেই সংগ্রামমুখর জীবনের শুশ্রূষা নয়। সেবা নয়। আঘাত হানতে উদ্যত। গণতান্ত্রিক সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ক অবস্থান শান্তিপূর্ণ সহবস্থান মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আলাপ-আলোচনার গণতান্ত্রিক উপায়ে সমস্যা মীমাংসায় যোগ্য। স্তালিনীয় পথ বেকার। হানাহানি স্বদেশকে মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত করে।

পরিচারিকা উঠে আসে ছাদে। তার হাতে ট্রে। ট্রের ওপর তিনটি পাত্র। ১টা গ্লাস। ১টা বাটি। ১টা প্লেট। গ্লাসে গুলঞ্চের বাকল ভেজান নির্যাস। অখিল এক চোঁকে রস পান করেন। প্লেটে নয়নতারা ফল। তালুতে রেখে মুখে পোরেন। গিলে নেন। রক্তে চিনির দৌরাত্ম্য টিট করতে টোটকা প্রয়োগ। এর সঙ্গে গ্লাইনেস খান। রক্তে চিনির স্তর থামে। কমে। স্থিতিশীল হয়। কোনটা যে কার অনুদান রহস্যাবৃত। ওষুধ পর্ব শেষ হলে অখিল খাদ্যে ঝোঁক দেন। বাটিতে অঙ্কুরিত ছোলা। দু-আঙুলের চিমটিতে একটি দুটি করে মুখে ছুঁড়তে থাকেন। চিবিয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে-সহ পেটে চালান করেন। পেট পরিষ্কারের দাওয়াই। স্বাস্থ্য বিধিপালন হলে ফের চিন্তার খেই ধরেন।

'কৃষি আমাদের ভিত্তি
শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ
মাটিতে পা রেখে মাথা তুলবে আকাশে।'

হোর্ডিং মাধ্যমে সরকার প্রচারে উৎসুক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি প্রচলনে। যদি তাই হয় তাহলে কৃষকদের মন্ত্র মান্য করে শিল্প প্রকল্প নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি আলোচনা জরুরি হয়ে ওঠে। শক্ত নয়। নিরপেক্ষতার বাতাবরণে আদান প্রদান গ্রহণ বর্জন মানসতার অখিল প্রয়োগ অনিবার্য।

ক্ষিপ্র গতি এবং মন্থর গতি। দ্বৈত প্রক্রিয়ায় পায়চারি হয়েছে ঢের। এবার অখিল শ্রান্ত। ভাঁজ খোলা দৈনিকে মুদ্রিত সংবাদে অলস দৃষ্টি বুলিয়ে যাচ্ছেন। একটা সংবাদে এসে তার কপালের ভাঁজ প্রকট হয়। পীড়া হয় সংবাদটা পড়ে। একজন কৃষক নেতা বিরুদ্ধ একটি দলের প্রতিবাদ কর্মসূচীর পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে জানাচ্ছেন : শিল্প স্থাপনে মহিলাদের সঙ্গী করে প্রতিরোধ এলে এবার কলসি কাঁধে বধূরা শয়ে শয়ে পাছা দেখিয়ে পাল্টা প্রতিবাদ জানাবে। ভাবা যায়! গাঁয়ের বধূ কলসি কাঁধে জল তুলতে যায়। সুন্দর চিত্রকল্পের কী অপপ্রয়োগ। শরীরী আবেদনের কী কদর্য প্রয়োগ। বধূরা কি হয়ে যাচ্ছে না অপমানের অংশ?

তিনি মনে করেন মানুষকে কুটুম করতে চাইলে সংযোগের ভাষা পদ্ধতির প্রকর হওয়া উচিত ভদ্র মার্জিত। শ্রদ্ধেয়। আঘাত লাগে ব্যথা পায় এমন কোনো ব্যবহা কুটুম্বিতার সাঁকো ভেঙে দেয়। নেতা টু ক্যাডার এই শিক্ষায় দরিদ্র। শুধু তাই নয় এ শিক্ষা নিয়ে জিজ্ঞাসারও অনটন।

চিন্তার প্রকৃতি নদীর মতো। নিরন্তর বহতা। এই মুহূর্তের চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলবে অন্য চিন্তার উদয় অস্তিত্বকে কুট কুট করে বিদ্ধ করে। শাসনের তিরিশ বছর পূর্তিতে এমন এক সমাজের উপস্থাপন—যে সমাজে মানুষের দুঃখে দুঃখ পেয়ে মানুষ কাঁদে এম মানুষের সংখ্যা তলানিতে। সমাজে মানুষ অসামাজিক হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক মহলে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসার অভাব অস্তিত্বকে বিচলিত করে। তার মনে হয় প্রশ্নশীলতার অনট সংকট গাঢ় করবে। বোধের শূন্যতা মানুষে মানুষে সংযোগ আলগা করে দেয়। তাই ক কটু আশ্বাসে অনর্গল হতে কুণ্ঠা আসে না। কারখানা হলে ভূমিহারা পরিবার থেকে অধি সংখ্যক নারীরা পেয়ে যাবে পরিচারিকার কাজ। পরিচারিকার কাজ ছোট কি বড় সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল ঘোষণার মধ্য দিয়ে অপরকে হেয় করা হচ্ছে। দম্ভ এব অহং প্রকাশ পাচ্ছে। ওইসব নারীরা যেন পরিচারিকার কাজেই একমাত্র যোগ্য। এব প্রতিকার্যী। নিজস্ব আইডেনটিটি খোয়া গেলে যে হাহাকার আসে সেই বেদনাতুর স্বরকে স্পর্শ করতে দলতন্ত্র ব্যর্থ। মুখের ভাষাকে আবোলতাবোল গণ্যতায় বদিবা বাঁট দেওয়া যায়—ক্ষমার অযোগ্য ভিন্ন এক দৃষ্টান্ত। যা তত্ত্বের দীনতা। বিপক্ষ শিবির ভূমি রক্ষা আন্দোলনে বাইরে থেকে জড়ো করেছে অনেক নেতা-কর্মী-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে। এই সমাবেশকে বহিরাগত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এটা প্ররোচনামূলক এবং দাম্ভিক।

প্রকৃতপক্ষে কে ভূমিপুত্র, কে সাময়িক কে পরদেশি কে স্বদেশি এর কি কোনো বৈ উত্তর আছে। মানুষ স্বভাব যাযাবর। আদি গর গেরাস্থি বাস্তুভিটের উৎসে লতাগুল্মময় জঙ্গল বিস্তর খননে খোঁজাই সার হবে। খোঁজ মিলবে না। কোথায় কার স্বদেশ তার নির্ণয় সোজা কথা নয়। জন্মভূমি না বাসভূমি; পাঠশালা না কর্মশালা; কোথায় যে নিহিত তার সত্তা আদি তার নির্দেশ নির্ভর করে ব্যক্তিগত অনুভবে। সাংস্কৃতিক বোধে। তাছাড়া স্বদেশ ন জোটবদ্ধতাই মানুষের পাদপীঠ। স্বদেশ ধারণা এসেছে সভ্যতার এক পর্বে। প্রথমটা স্বভা ধর্ম। দ্বিতীয়টা অর্জন। গঠন। যে গঠন পাশ্চাত্যে যতটা প্রাচ্যে ততটা পরিস্ফুট নয়। অর্জনকে স্বভাব ধর্মের ওপর আরোপ করার চেষ্টা একপ্রকার রাজনীতিকরণ। জাতপাত-ধর্ম-নৃতাত্ত্বিক অবস্থান-সৌর সম্পর্ক-লোকগাথা-উৎসব-পুজোপার্বণ সমবায়ে ভালমন্দর পাকে যে সমাজ নৈকট্যের বন্ধনে জড়াজড়ি করেছিল তার ওপর রাজনীতিকরণ প্রক্রিয়া চলছে। অশনি সংকেত। কারণ সামাজিক খোল নির্বিচার বিধ্বস্ত হচ্ছে। বাছবিচার নেই। ফলে কল্যাণমুখী দিকগুলি লাঞ্ছিত হচ্ছে। মূল্যবোধের মুখ্য নিরিখ হয়ে উঠছে দলীয় আনুগত্য। যার পরিণতিতে মানুষ আজ ছিন্নমূল নয় শূন্যমূল। আমার সমাজ আমার অনাত্মীয়।

I am a stranger and afraid
I am a world I never made

অদ্ভুত অনুভব। বড় সুখের অনুভব নয়। পুথি চর্চায় উপলব্ধি আসেনি। অভিজ্ঞতা এবং ঠেকে শিখছে যা চলছে তা একদিকে অখিল রাজনীতিকরণ অপরদিকে রাজনীতির বন্ধ্যাকরণ। না হলে মনে থাকত শিল্প স্থাপনের প্রাক্কালে ইংলন্ডে শ্রমজীবীর মুখ্য অংশ নিযুক্ত ছিল কৃষিকর্মে। শিল্পায়ন হওয়ার পর কৃষিতে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা কমে হয় দেড় শতাংশ। বেকার কৃষিশ্রমিক কারখানায় কাজ পেয়ে যায়। এই যে সমাধান-তার জন্য ব্রিটিশকে স্থাপন করতে হয়েছিল কলোনি অর্থনীতি। ভারতবর্ষ যার শিকার। ভারতের পক্ষে সেই প্রক্রিয়ায় উদ্ধার সম্ভব? না। কাজেই ইউরোপ অনুকরণে সংখ্যালঘুর উজ্জ্বল সমাজ হতে পারে—গণসমাজ থেকে যাবে তিমিরে। যা কাম্য নয়। সমগ্র মানুষকে বণ্টন ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। নিরঙ্কুশ মানুষের আটপৌরে সংস্থান হক সামাজিক কাঠামোর। তার জন্য চাই কর্মসংস্থান। উন্নত প্রযুক্তির যুগে শ্রমশক্তি হেলাফেলা। হিউম্যান আর্কাইভাল উপযোগিতা নিম্ন প্রায়। উৎপাদনের কোনো পর্যায়ে খাওয়ানো যায় না। সর্বভূমে বাড়তি। সোনার তরী কবিতাংশের মতো"—ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী। /আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।/—চাকরি? "কূলে একা বসে আছি/নাহি ভরসা।/ মানুষকে নিয়ে কারবার। অথচ মানুষের জগৎ সংসারে মানুষের ঠাঁই ভোগে। পরবাস অনতিক্রান্ত বৃত্ত। যেন অনেকটা সেই গানের কলির মত : তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।

চিন্তায় গিট পড়ছে। গিট খুলতে অন্বিত ভিন্ন চিন্তার সহায় নেন। মাথা খেলাতে মাথায় খেলে যায়; অর্থনৈতিক ঘোরপ্যাঁচের চক্করে পড়ে খাবি খাচ্ছে দলতন্ত্র। ধাক্কা থেকে মুক্তি পেতে থাবা বসাচ্ছে স্বনিযুক্ত প্রযুক্তির ওপর। মানুষের নিজস্ব উদ্যোগ ভোটব্যাঙ্ক গঠনের খপ্পরে। একটা অভিজ্ঞতা থেকে থেকে চাগাড় দেয়। সময়টা এপ্রিলের গোড়া। কারেন্ট ইয়ার। হাওড়া থেকে ৪০ কি.মি. দূর মুন্সিরহাট। সভা হবে। পুরুষ এবং মহিলা ৮০ জনের মতো সদস্য জোট বেঁধে সমবায় গঠন করেছে। তাদের কাজ সিফন-জর্জেট-সিল্ক শাড়িতে জরির কাজ বসানো। চুমকি বসানো। বংশ বংশ ধরে জাত ব্যবসা। কাজ করে ফুরনে। এখন তারা নিজেরা নিজেদের নিয়ন্ত্রক হতে উদ্যোগী সংঘবদ্ধ হয়েছে। কাঁচামাল জোগাড়—অর্ডার সংগ্রহ—নির্মাণ—বাজার-দাম-মজুরি-লাভ-পুঁজি গঠন—পুঁজি বিনিয়োগ হয়েক বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় নিজেরা যুক্ত। সংগঠন আগেই তৈরি। সভায় আনুষ্ঠানিক রূপ নেবে। সভা মানে জনসভা। জনসভায় যোগ দিতে আমার যাওয়া। সভা শেষ হলে যেমন হয়, জনতা ছত্রভঙ্গ। হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে বি.ডি.ও-র সঙ্গে কথা হচ্ছে। সহসা তিনি অসহিষ্ণু। বিরক্ত। বলেন—এই সব সংস্থা গোড়ায় খুব আঁটসাট থাকে। উৎসাহ-নিষ্ঠা-সততায় টইটুম্বুর। কিছুদিন পর বিকলাঙ্গ। প্রশাসন স্বাধীন থাকে না। নিষ্ঠা সততায় ঘুণ ধরে। দুর্নীতি বাসা বাঁধে। ঋণে গোলমাল, হিসেবে কারচুপি, আদায়ে গাফিলতি, মাথাভারি প্রশাসন, খরচের স্ফীতি; কিছুদিনের মধ্যে ব্যালেন্সশীটে মুমূর্ষু চিত্র ফুটে ওঠে। ব্যবসা যে ব্যবসা বাণিজ্য-সে কনসেপ্ট ডকে। প্রশাসক-কর্মী-সদস্য সকলেই অধিক নিরাপত্তায় গা-ছাড়া। দুর্বলতার প্রশ্রয় পঞ্চায়েত।

অম্বিত অন্য এক কৌতূহল প্রকাশ করেন,—সামাজিক নিগ্রহ রোধ করতে, কোঁদালে ন্যায় বিচারে; সর্বোপরি কুসংস্কারের বলি মূলত যে নিম্নবর্গ তাদের রক্ষাকবচ হিসেবে পঞ্চায়েত কি সক্রিয় নয়।

স্পষ্ট জবাব—না। শুনুন একটা ঘটনা। বলে তিনি জানান এই ব্লকে পাতিহাল বলে এক গ্রাম আছে। সেই গ্রামে পক্স মহামারি আকার নিয়েছে। গ্রামবাসীরা বলে মায়ের দয়া। মহামারির মূলে তারা এক বিধবাকে সনাক্ত করেছে। সে নাকি ডাইনি অবতার। মোড়ল নির্দেশ দিয়েছে বিধবাকে গ্রামছাড়া করতে হবে। মহামারি দূর করতে দাওয়াই। খবরটা পেয়ে আমি ছুটে যাই। পঞ্চায়েত প্রধান এবং উপপ্রধানকে ডেকে বলি পঞ্চায়েত বসান এবং এর প্রতিবাদ করুন। প্রশাসন মদত দেবে। তারা পাল্টা দাবি জানায় যা করবার প্রশাসনিক স্তরে করতে হবে। আমি বলি বেশ পঞ্চায়েত বসিয়ে মোড়লের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিন। বাকি কাজ আমার। পঞ্চায়েত রাজি হয় না। কারণ কি জানেন? জনরুচির প্রতি আনুগত্য। অগ্রসর প্রথাকে জনপ্রিয় করার চাইতে জনপ্রিয় প্রথাকে টেকসই করার দিকে ঝোঁক। ফলে ভেঙে যায় খেলা ভাঙার খেলা। ভেঙে যায় খেলা গড়ার খেলা।

দূর থেকে একগুচ্ছ শব্দ বিধুর এবং ক্লান্ততায় ক্রমোক্রমে বাতাসে ভর করে ভেসে আসছে। শব্দ বহন করছে আর্তি। অভিমুখ অম্বিতর কান। কানের কাছে এসে অভিমুখ শান্ত হয়। প্রার্থনার ভঙ্গিতে নিবেদন করল; কৃষি উন্নয়ন পরিষদের টপে থেকে তুমি বিকল। কৃষির উন্নতি হয়েছে। কৃষক কৃষি জমি থেকে কমত ছিটে থেকে উদ্বাস্তু। সৃষ্টি স্রষ্টাকে গ্রাস করছে। কেন তুমি উদাসীন? ঘুরে দাঁড়াও। পদ ছাড়ো। অপদস্থ হও।

হৃদয় খুঁড়ে একপ্রকার সন্দেহ অন্তর্লোক আলোড়িত করে। তাহলে কি যে কেন্দ্র থেকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া চালনা করা হয় তাদের বোধে নতুন এক বোধ জন্ম নিয়েছে! যে বোধের শিক্ষা নিম্নরূপ :

এক কালে সাবেকি দলগুলো ছিল বিশ্বায়ন চারিয়ে দিতে যোগ্যবাহক। কারণ আদর্শ নিয়ে শুচিবাই ছিল না। ব্যবসা প্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। নমনীয় মনোভাব থাকায় সংগঠনের বিস্তার ছিল। এখন চিত্র উলটো। সাবেকি দল সমাজে অসংগঠিত। তাত্ত্বিক ভিত নড়বড়ে। সংগঠন ঢিলেঢালা। জনসংযোগ ক্ষীণ। তুলনায় বামপন্থার খোল মজবুত। সংগঠন আঁটসাট। তাত্ত্বিক আবরণ আছে। গণসংযোগ নিবিড়। আদর্শগত ছুৎমার্গী উপবীত খসা। অতএব নয়া পুঁজিবাদ গ্রামে গ্রামে চারিয়ে দিতে গণ্য করছে; বামপন্থার খোলই উৎকৃষ্ট বাহক।

ধারণাটা বিশ্বাসভূমে স্থান দিতে অম্বিতর প্রতিরোধ আসে। আবার যে গলাধাক্কা দেবে প্রেরণা পায় না। অদ্ভুত কষ্টে দীর্ণ হতে থাকে। কানের কাছে মহাকাল গুঞ্জন করে। বর্তমান পটভূমি থেকে সরে দাঁড়াও। তোমার কিছু দেওয়ার নেই। পথ ছেড়ে দাও তাদের। যাহাদের ক্লান্তি নাই। অবসাদ নাই। হৃদয়ে আলোড়ন নাই।

মনন ছিন্ন হয়। কাজের মেয়ে রাধা উঠে এসেছে। কাপ প্লেট বাটি সাজাতে সাজাতে বলে,—মামা বেলা হয়েছে। অনেক পায়চারি করেছ। এবার নিচে এসো। চা জলখাবার রেডি।

॥ দুই ॥

আকাশে মন্ত্রের মতো, বৃক্ষ যেন একক প্রার্থনা,
আমি আকাশের নিচে ব্যর্থ, ভিন্নমনা
নিজেকে করেছি ক্ষয় তুচ্ছ অনুরাগে।
সত্তার প্রগাঢ় দাবী তাই শেষে জাগে :
আমাতেই আমি যেন হই সমর্পিত।

তাই প্রার্থনার মন্ত্র শান্ত ও নিভৃত
—সত্তার দাবী। সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

পোশাকি কথা সতর্ক মতামত বৈঠকের ধর্ম। সভা মানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায় থাকে। হার জিতের প্রশ্ন জড়িয়ে যায়। ফলে সভার পরিবেশ উত্তেজনায় টানটান থাকে। কিন্তু বৈঠকের অগ্রজ পরিবেশ প্রকৃতিতে বিপরীত। কথা চালাচালি মতামত আদান প্রদান তামাসা সবই চলে। কিন্তু বজায় থাকে ঢিলেঢালা ভাব। প্রাক সভার আলগা ভাব এখন ঘরে বিদ্যমান। সিগারেট থেকে নির্গত ধোঁয়া বায়ুমণ্ডলে পাক খাচ্ছে। সেদিকে চোখ রেখে একজন বলল, সেণ্ট্রাল ৬ কিস্তি ডি.এ. ঘোষণা করল। মুখ রক্ষা করতে স্টেটকে অন্তত ৪ কিস্তি ঘোষণা করতে হবে। এমনিতে কোষাগারে মা ভবানীর পদধ্বনি। তার ওপর একস্ট্রা চাপ। কোনো মানে হয়!

দ্বিতীয় জন ফোড়ন কাটল : কী আর করা যাবে। শিক্ষিত লোকদের মুখতো বন্ধ রাখতেই হবে।

তৃতীয় জন : আর শিক্ষিত মারিও না। শিক্ষিতরা মুখবন্ধ করেই আছে। অবশ্য বন্ধ থাকাটাই মঙ্গল। মুখ খুললেই দুর্গন্ধ ছড়াবে।

দ্বিতীয় জন : তবু ওরাই কথা বলে। মতামত দেয়। প্রতিবাদ করে। মুখিয়া ক্লাস। ভোট কুড়োনি। ভোট বন্ধ বন্দিন আছে সমীহ না করে উপায় নেই।

অজিত ঘরে ঢুকতে কথোপকথন খেই হারায়। অজিত লক্ষ করেন জমায়েত ছোট। নেতা, এবং নেতাপদপ্রার্থী কয়েকজন বাছাই কমরেডকে ডেকেছেন। কারণটা ব্যক্তিগত। পরিবারের একজন অসুস্থ। রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে এই উদ্যোগ।

লম্বাটে ঘর। ঘরে যেমন আসবাব—ভোগ্যপণ্য থাকলে মনে হয় গৃহস্থ বাড়ি, সে সবের সমাহারে ঘর ভর্তি। আসবাব এবং ভোগ্যপণ্য চাহিদা এবং সামর্থ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে কেনা। ফলে রুচি এবং এবং দামে ঐক্য নেই। জবরজং আদল। মা ও ঠাম্মার সম্পর্ক আড়াআড়ি। কিন্তু দেব ভক্তিতে ঐক্যবদ্ধ। অসংখ্য দেবদেবীর ফটো এবং গুরুদেবের ফটো ফ্রেমে বাঁধাই হয়ে দেওয়ালে ঝুলছে। বাবার ২ জন। ছিল অনেক। ছাঁটাই হতে হতে ২ জনে ঠেকেছে। কার্ল মার্কস এবং লেনিন। বৃহত্তর বিশ্বাসের স্বার্থে ছোট বিশ্বাসের সঙ্গে বাবার আপস।

দেওয়াল ঘেঁসে খাট। খাটের প্রান্তে ভাঙাচোরা হয়ে ঠাম্মা শুয়ে আছেন। অসুস্থ। তিনি এ বাড়ির প্রকৃত কর্ত্রী ছিলেন। শাশুড়ি এবং আদি মাতৃরূপের আদলে গড়া। যে কারণে মা বধূ ছিলেন কিন্তু গিন্নি হতে পেরেছিলেন ঠাম্মা জরাগ্রস্ত হলে। প্রচারে তো আছেই, সেটা বাদ দিয়েও বাবা নিজেকে সামাজিক সত্তা গণ্য করতে পছন্দ করেন। ফলে যে ক্ষুদ্র পরিধি বাবা ও মেয়ের মধ্যে নৈকট্য আনে তার অভাব ঘটেছিল। সে জন্যে প্রতিভা কোনোদিন বাবার মেয়ে হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু সংসারে আড়আড় থাকলে কী হয় খুঁটি পোতা আছে সংসারে। ফলে অনেক বিরল মুহূর্ত আসে, বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে প্রেক্ষিত বাবা ও মেয়ের মধ্যে গড়ে তোলে গোপন বোঝাপড়া। মনোজ্ঞ টান। যার ঝলক প্রকাশ কারো কারো চোখে পড়ে যায় এবং প্রচার হয় বাপসোহাগি মেয়ে বলে।

আজকের সভায় এসেছেন দলীয় লোক। ঠাম্মার রোগচিকিৎসা নিয়ে আলোচনা হবে। একমাত্র অদলীয় মা এসে পড়বেন আঁচলে হলুদ মাখা হাত মুছতে মুছতে। প্রতিভাকে কেউ ডাকেনি, স্বয়ংপ্রবৃত্ত হয়ে প্রতিভা চা—ওকমার আয়োজন রেখে ঘর ছাড়তে ছাড়তে ছাড়েনি। থেকে যায়। ঝাঁকিয়ে বসে থাকবে বলে।

জুত করে আসন নেবার পর অশ্বিতর নজর পড়ে মেয়ের দিকে। শুধোন,—কীরে মুখ শুকনো কেন। লোহার ঘাটতি মনে হচ্ছে। পেট ভরে খাচ্ছিস তো—খাদ্যে প্রোটিন থাকছে তো—।

যৌবনের পৃষ্টপোষকতা আছে। বিকশিত অঙ্গ সম্ভারে স্বাভাবিক সুন্দর প্রতিভা। তাতেও তার আশ শান্ত হয় না। প্রখর সুন্দরী বলতে সাজতে ভালবাসে। সজ্জায় আভরণে সর্বদা পরিপাটি। এমনকি হাসিটাও পরিপাটি। পরিপাটি হেসে বলল,— প্রোটিন কম খাই। বেশি খেলে মুটিয়ে যাব।

তাড়া আছে। খেজুড়ে আলাপ ত্বরিতে থেমে যায়। জমায়েত অনুষ্ঠানিক রূপ নেয় : সংক্ষিপ্ত টু দি পয়েন্ট মতামতে পরিবেশ ভাবগম্ভীর। সূচনাতেই বিতর্ক—চিকিৎসার বিষয়টি ধর্ম সংকটের প্রকৃতি পায়। বাবা পার্টির অন্নদাস। তিনি চান ঠাম্মাকে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করতে। অন্যদের মত অন্য ধারায়, চলে যুক্তি নিয়ে মাকু ঠেলাঠেলি। সকলের হয়ে অবশেষে মুখপাত্র হন শ্যামল।—দেখুন মেসোমশাই সরকারি হাসপাতালে দেওয়া মানে মৃত্যুকে হাতছানি দেওয়া। রুগীর এক পা খাটে এক পা বেডে। সওয়া যায়। বেসরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমের খোঁজখবর আমি নিয়েছি। তার মধ্যে বেছে কোনো একটায় ভর্তি করা হোক। খরচের দিক আপনাকে ভাবতে হবে না। হয়ে যাবে। কমরেড উনি শুধু আপনার মা নন, আমাদের মাসিমা। আমাদের সঙ্গে মাসিমার মতের মিল ছিল না। কিন্তু দুঃসময়ে তাঁর পরিচর্যায় বেড়ে উঠেছি। ইতিহাস কি ভোলা যায়! যেভাবেই হোক সুচিকিৎসা দিয়ে মাসিমাকে বাঁচাতে হবে।

সতীর্থদের প্রস্তাব অশ্বিত নাকচ করে দেন।—ঘরে এবং বাইরে আমার অনেক বিশ্বাস পরাজিত হয়েছে। মায়ের ক্ষেত্রে চাই না আমার বিশ্বাস অপমানিত হোক। জীবনের শেষ

পর্যায়ে অর্জিত ভাবমূর্তি খোয়াতে রাজি নই। তোমরা পি. জি-তে ভর্তির ব্যবস্থা করো। উঠবার্নে স্বাস্থ্য পরিষেবা খুব উন্নত।

প্রতিভা আহত বোধ করে ভেবে যে বাবা ঠাম্মাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধার্য করছে। মায়ের কথা ছাড়ু। উপোস এবং দেবদেবীর পরিধি বাদ দিলে বাবার মতামত পতিব্রতাই তার জগৎ সংসার। বাবা একবারও ভাবলো না ঠাম্মা আমারও। শুধু বাবা নয় আমিও ঠাম্মার কোলেপিঠে মানুষ। শুধু তাই নয় বাবার চেয়েও আমার সঙ্গে সখ্যতা অধিক। প্রতিভা শঙ্কা বোধ করে ভেবে যে আদর্শের আপ মার্কা স্বত্বের টানাপোড়েনে ঠাম্মা চলে যাচ্ছে ভোগে।

আরও একপ্রকার যা প্রতিভাকে ছিন্নভিন্ন করে। ঘরে ও বাইরে যে পরাজয়ের উল্লেখ বাবা করলেন তার মধ্যে আফসোস আছে। ঠেস আছে। ইঙ্গিত দিচ্ছেন বাড়ির কাউকে তিনি সহযাত্রী হিসেবে পাননি। অর্থাৎ দলীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেননি। একবারও ভাবলেন না এই পরাজয় একতরফা নয়। পরাজয়ের শরিক পারিবারিক সদস্যরাও। দলীয় সমাজ সর্বস্ব আঙিনা থেকে আলগা করে বাবাকে আত্মীয় সমাজে সংযুক্ত করতে আমরাও ব্যর্থ হয়েছি।

কেউ মতামত চায়নি। যেচে প্রতিভা মতামত দিল।—ঠাম্মাকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করান। নয়তো বাঁচবে না।

বাৎসল্য উপেক্ষিত। মতামতে প্রকৃত যুক্তি আছে কিনা সে প্রশ্ন গুরুত্ব পেল না। পরামর্শে নো এফেক্ট। শুধু একজন দীপেন প্রতিক্রিয়া জানাল রঙ ছুঁড়ে,— তোমারও বুঝি সরকারি ব্যবস্থায় এলার্জি। মুক্ত বাণিজ্যে আবেশ।

প্রতিভা খর চোখে তাকায়। বিরুদ্ধতা। তবু তার ভাল লাগে। অবজ্ঞা নয়। অন্তত একজন তার কথা শুনেছে। প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। একজন বাদ এই যে গণ উপেক্ষা— তার মধ্য দিয়ে সে কি হয়ে যাচ্ছে না অপমানের অংশ।

জানুতে প্রতিভার মুখ নেমে আসে। একপ্রকার সখ্যতার তাড়না ভেতরটা তোলপাড় করে। বন্ধুত্ব বিরহে কোষসমূহ ছারখার হতে থাকে। সম্পর্কের আঙিনায় নারীসত্ত্বা ঠাঁই না দেওয়া—বৈশিষ্ট কি সমকালীন। না-কি বহু যুগের উত্তরাধিকার। প্রতিভার চেতনায় বাসা বাঁধে বিষণ্ণ জবাব। কোনোকালেই নারীর মর্যাদা ঠাঁই পায়নি। না হলে এমন যে রামায়ণ; ধর্মীয় তত্ত্বের অনুপ্রবেশ অংশ ছাড় দিলে পড়ে থাকে যে সাহিত্য বিপুলতা, সেখানে কি ভেসে ওঠে না নারীসত্তা সে যুগেও ছিল বিবর্জিত। সীতা অপহৃত। পরিণামে দীর্ঘ বিরহ। ঘটনার ঘনঘটা শান্ত হলে রাম ও সীতার মিলন হয়। মিলন ঘটলে কী ঘটল। রাম সীতাতে অন্বিত হতে বিরাগী। ভাবা যায়। সে কিনা যুক্তি সাজিয়ে প্রত্যাখ্যান করে এই বলে,—"যাও বিদেহী। তুমি মুক্ত।" শুধু তাই নয় নারীর প্রতি অন্যায়ে অবতারেরও রাশ নেই। তাই সন্দেহ নির্ভর অপবাদ আরোপ করে রাম বলে,"—তুমি সচ্চরিত্রই হও বা দুশ্চরিত্রই হও, মৈথিলী, তোমাকে আমি আজ ভোগ করতে পারি না, তুমি এখন সেই ঘিয়ের মতো যা কুকুরে লেহন করেছে।"

যাচাই নেই। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেই। কী ও কেন জিজ্ঞাসা নেই। আছে সন্দেহ প্রসূত অহং প্রতিষ্ঠা।

প্রতিভা জানু থেকে মুখ তোলে। গাঢ় বিষাদ তাতে।

সভার মেজাজ অমিতর মেজাজে খাপ খাচ্ছে না বুঝতে পেরে অমিত শেষ ব্যাখ্যা প্রয়োগ করেন।—আসলে তোমাদের বিশ্বাসে চিড় ধরেছে। না হলে বুঝতে কর্মী-নেতা-মন্ত্রী-আমলারা যদি সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা বয়কট করে তো মানুষের কাছে বার্তা পৌছে যায় সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা রুগ্ন। বিশ্বাসের ভগ্নস্তূপে আশ্বাসের ঘোষণা—আশা ঘাতক ভগু আশ্বাস হয়ে যায় না। না-না, তোমরা পিজি-তে রওনা দাও।

বিতর্কে শেষ পেরেক ঠুকে দিলেন অমিত। সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে যায়। তদনুসারে এ্যাম্বুলেন্স প্রথম বিবেচনায় স্থান পেলেও এতে আরোহন মানে রুগীর মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি বিবেচনায় খারিজ হয়। হাতের ভেলায় ঠাম্মাকে গাড়িতে তোলা হয়।

পাঁচ মিনিট আগুপিছু দুটি গাড়ি ছোটে। একটি ঠাম্মাকে নিয়ে পি জি মুখী। অপরটি অমিতকে নিয়ে রাজ্য দপ্তর অভিমুখী।

॥ তিন॥

আমার প্রতিভা ভেঙে ফেলে তুমি চলে গেলে কবে।
সেই থেকে অন্য প্রকৃতির অনুভবে
মাঝে মাঝে উৎকেন্দ্রিত হ'য়ে জেগে উঠেছে হৃদয়।
না হ'লে নিরুৎসাহিত হতে হয়।
জীবনের, মরনের, হেমন্তের এ-রকম আশ্চর্য নিয়ম;
ছায়া হয়ে গেছো ব'লে তোমাকে এমন অসম্ভ্রম।

—প্রেম অপ্রেমের কবিতা। জীবনানন্দ দাশ।

রাজ্য দপ্তরের সামনে গাড়ি থামে। উদ্বেগ এবং বিধুরতায় অমিতর মুখ মাখামাখি। সে জানে আজকের বৈঠক মামুলি আলোচনা নয়। তাকে রগড়াবে। কাঠের সিঁড়িতে পা রাখেন অমিত। এই সেই প্রশস্ত সিঁড়ি—সংখ্যাহীন পদপাতে লাঞ্ছিত। বার্মাটিক, কারুকার্যময় আদলে। ইউজ এন্ড থ্রো সংস্কৃতির পূর্বসূরী। জাহাজে ট্রাকে কাঁধে জল স্থল তেপান্তর পার হয়ে প্রমশিক্ত হয়ে কলকাতায় কোনো এক মহাজনের হাউসিতে আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর কোনো এক দক্ষ কারিগরের হাতের আদরে স্থানি বাটালির প্রযত্নে সৃষ্টি হয়েছে অনবদ্য সোপান। মন্থর পদপাতে ধাপ ভেঙে ভেঙে তিনি তিনতলার ল্যান্ডিংয়ে পা রাখেন। ঈষৎ শ্রান্ত। বুক ভরে দম নিলেন। অভ্যস্ত পরিবেশ। দম নিয়ে ভেতরে ঢোকেন। খোঁজ নিতে।

দীর্ঘ অপেক্ষা নয়। ডাক এল। অমিত উঁকি দিতেই,—আসুন। বসুন কমরেড। আপ্যায়নে স্বাগত। অমিত বসেন। বসে হাঁফ ছাড়েন। সামান্য বিরতি দিয়ে কোনো পাঁয়তারা না করে সম্পাদক সোজাসুজি কথা পাড়লেন।—কী ভেবেছেন! পার্টি হচ্ছে মই।

যার যখন যেমন যেমন স্বার্থ তেমন কাজে লাগাবেন। ব্যবহার করবেন। কাজের সময় কাজি। কাজ ফুরলে পাজি।

সমকা আক্রমণ। প্রথম চোটে অমিত ক্যাবলা বনে যান। সম্পাদকের হাতে রোল করা একটা কাগজ। গুটনো কাগজটা উন্মোচন করেন। "বিপন্ন স্বদেশ" শিরোনামে তার লেখা প্রবন্ধ চোখে পড়ে। চকিতে রহস্য ছিন্ন হয়। আতঙ্কে অমিত অপেক্ষার্থী।

গদ্যের অংশবিশেষ বন্ধনীতে চিহ্নিত। বাক্যের নিচে মোটা সবুজ কালির দাগ টানা। যা তার পাঠক্রম। সম্পাদক টেবিল থাবড়ান।—চটপট পড়ুন। হাতে সময় কম। বুক দুর দুর করে নিজের বাসি লেখার অংশ নিজে পড়তে মন্দ লাগছে না :

চারিদিকে নগর পত্তন হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে গ্রাম পতনের শব্দ। মাচায় পুঁই চালে লাউ জমিতে ধানের শীষ—বাতাসের ভারে দোল দোলদুলুনির শোভা অস্তে।

মামি কাঁদে পিসি কাঁদে চালে আছে ঝিঙে
পুঁটিমাছটা গীত গায় নেওলে বাজায় শিঙে।

ছড়া ও চিত্রকল্পের দিন শেষ। উন্নয়নের বিনিময়ে গ্রামীণ সমাজ এবং স্বনির্ভর সৃজন পুরোহিতের হাতে মূল্য বাবদ উৎসর্গ। কোনো বিচেল যজমান যদি শুধোয়। স্যার উন্নয়ন মালটা কী যদি খোলসা করে বুঝাইয়া দ্যান—।

ক্রুদ্ধ পুরোহিত প্রাক ভর্ৎসনার পর অভয় দেন; নোকরি করে করে মাথাটা তোর ধান হট হয়ে গেছে। ওরে মূর্খ গোলা ব্যক্তি বড় কথা নয়। জাতীয় আয় চচ্চড় করে বাড়বে। মানসাঙ্ক বুঝিস? কিছু লোকের মোট আয় সমস্ত লোক দিয়ে ভাগ করলে গড় আয় ফুটে ওঠে। সেই আয় বেড়ে যাবে। উন্নয়ন মানে বাড়া। ছোট বাড়ি, ছোট বাজার, ছোট খেত, ছোট শিল্প—যা কিছু ছোট তার নাশ। গাছপালা বনানীর অন্ত্যেষ্টি। ফ্ল্যাট বাড়ি, প্রাসাদ, শপিংমল, মোটর গাড়ি, বৃহৎ কারখানা ইত্যাদি বড় বড় কাণ্ড প্রভৃতি সম্পন্ন হচ্ছে উন্নয়ন। যা কিছু বিরোধে সব মস্ত মস্ত। উন্নয়নের ঢোলাই তন্ত্রে পার্টিও বাছবিচার শূন্য সংহার যজ্ঞে যুক্ত হয়ে পড়ছে। পৃথিবীতে এমন ভয়াবহ দিন আসতে পারে যার আতঙ্কিত পূর্বাভাস দিয়েছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো কবি :

পৃথিবীর কোথাও আর নদী পাহাড় আকাশ
কোথাও আর ঘুমিয়ে থাকার দু ফুট জমি নেই
একটি পাখির বাসা গড়ে তোলার মতো সামান্য আশ্রয়
একটি ঘাসের দাঁড়িয়ে থাকার মাটি
আজ আমাদের অতীত ইতিহাসের স্বপ্ন, ঠাকুরমার মুখের রূপকথা।
মিছেই মানুষ বেতারে টেলিভিশনে সাংবাদিকের গোলটেবিল বৈঠকে
পরস্পরকে নিন্দা করার উজ্জ্বলতায় নিজের মুখে ফেলতে চায় আলো।
মিছেই মানুষ নিজের দেশের নিজের দলের গর্ব করে।
আসলে তার পায়ের নীচে কোথাও আর মাটির কোন চিহ্ন নেই
দু ফুট জমি মেপে নিয়ে সেখানে উপনিবেশ গড়া যায়।
চলো আমরা চাঁদের দেশে যাই।

অনিবার্য ধ্বংসের; প্রগতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে শুধু একান্ত ভাবেই টাকার ক্রমাবর্তন। খুবই পীড়াদায়ক দৃষ্টান্ত যে, ধনতন্ত্র থেকে রেঁনেসা, রেঁনেসা থেকে কলোনি উপস্থাপন—এই যে টাকার ক্রমঅভিসার প্রত্যেকটি স্তর আঘাত এবং আক্রমণের মাছচোখ নিবদ্ধ রেখেছে ভূমি-সংলগ্ন মানুষদের দিকে। তারাই বাস্তুচ্যুত জীবিকাচ্যুত হয়েছে। ছারখার হয়েছে সম্পর্কের প্রাচ্যভূমি। খণ্ডিত হচ্ছে সর্বপ্রাণবাদ। সময়ের শূন্য সিংহাসনে নায়ক হয়ে যাচ্ছে পুঁজি। সরকারের তাঁড়ারে পুঁজির ভাটা। পুঁজিপতি ঢালবে পুঁজি। বিনিময়ে সরকার দেবে পরিকাঠামো। জমি শ্রমশক্তি জল বিদ্যুতে যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি। আদান প্রদান পরস্পর সহযোগিতায় গড়ে উঠবে সমৃদ্ধি। স্বাভাবিক যে পক্ষ যেখানে দুই-এসে যায় বোঝাপড়া চুক্তির খেলা। দর কষাকষিতে নিজের পসরা সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান থাকলে তবেই শর্তের পাল্লা তুল্যমূল্য হয়। আক্ষেপ আসে যখন সি.এম বলেন "আমি জানতাম সিঙ্গুরে এককলা চাষ হয়। জানতাম না সেচকেচ করে ওখানে দু কলা তিন কলা চাষ হয়। একদিকে নিজের সত্তার সম্পর্কে অজ্ঞতা; অন্যদিকে পুঁজি সংগ্রহের কাড়াকাড়ি খেলে অত্যধিক সক্রিয়তা; সরকার ঢেঁপো বনে যাচ্ছে। হেরে যাচ্ছে। নিজের কোলে ঝোল টানতে সমর্থ হচ্ছে না। ভাগ বাঁটোয়ারায় বালাই নেই। বাটি ভর্তি ক্ষীর একপক্ষ সাবাড় করছে।

পাঠ শেষ। অম্বিত অপেক্ষায়। এবার রগড়াবে। হল না। অন্য একটা পাতা উলটান অন্যতম সম্পাদক। শেষ পাতা। উপক্রমণিকায় সমস্যার স্বরূপ। ক্রমে ব্যাখ্যার বিস্তার। উপসংহারে যুক্তির বিন্যাস গুটিয়ে এনে সার সন্নিবদ্ধ। এই হচ্ছে প্রবন্ধের কাঠাম। সার অংশের খণ্ডাংশ যার নিচে মোটা ডবল লাইন দাগ দেওয়া। তার ওপর আঙুল ঠাক করে বলেন,—পড়ুন।

অম্বিত ফের পাঠে মগ্ন। "আসলে রাজনীতির সামনে এখন শত্রু মিত্র একাকার। ভেতর অভ্যন্তর কোলাকুলি। পরিস্থিতি ঘোলা। বামপন্থার টেক্সট নেই। হিন্দু ধর্মের খোল। যার যেমন খুশি করে যাও। সব সহনীয়। এমন সহিষ্ণু আধার। এ বড় দুঃসময়। এক অদ্ভুত আঁধার নেমেছে সমাজে। দল সংরক্ষণের চাহিদা নিয়ে প্রশ্ন উত্থলোয়।"

অম্বিতর মুখশ্রীতে ধমক আছড়ে পড়ল,— পেয়েছেন কী। প্রত্যেকটি পয়েন্টে পার্টিকে নিয়ে হ্যাটা পলিসি নিয়ে মসকরা। ওপার কুড়বেন ওপরেরটা পাড়বেন। আমরা আছি আঁটি চুষতে।

অম্বিত হতবিহ্বল। ফের যাতানি।—একটু ইসারা দিলে কেস খেয়ে যাবেন। এমন ক্যালাবে পোঁতায় হুলো ঢুকে যাবে।

কৃষি সেলের চার্জে পার্থ জানা। তিনি ফেটে পড়েন।—আমি গ্রাম থেকে উঠে আসা কমরেড। রাতে সাপকে যারা লতা বলে তাদের দলে নেই। স্পষ্ট কথার লোক। গদিতে বসে বসে আপনারও পাছার কড়া পড়ে গেল। আপনিই বা কি বাল ছিঁড়লেন এদ্দিন?

আক্রমণের ফাঁদে পড়ে অম্বিত থতমত। প্রথম ধাক্কা সামলে ফোঁস করতে উদ্যত। পর মুহূর্তে নেতিয়ে পড়ে। অভিযোগ ফাঁপা নয়। সার আছে। সার সম্বল করে র‍্যাকমেল।

আপাতত কথা বিরাম মাগে। অমিত বোঝেন সাময়িক স্থগিতাদেশ। জোট দলের চেয়ারম্যান মানব পালিত তথ্য বিষয়ে বিজ্ঞ। তিনি খবর রাখেন রাজনীতিতে শিক্ষিত লোকের আকাল। জোগান নেই। যারা আছে একে একে কেটে পড়ার তাল করছে। এদিকে শত্রুর সংখ্যা বাড়ছে। বাইরের শত্রু শ্রেনীশত্রু। তার সঙ্গে টক্কর দেওয়া সহজ। কিন্তু বিভীষণ পুষে যুদ্ধে জয়লাভ কঠিন। চিন্তিত চেয়ারম্যান দাড়িতে হাত বোলান, মাথা সাদা। দাড়ি সাদা, কথা কম। হাসি হাসি মুখ। ভঙ্গিতে আকৃতিতে গুরু গুরু আদল। গুরুসুলভ সহিষ্ণুতার তিনি বুদ্ধি ধরেন, এই সন্ধিক্ষণে আপস চাই। তিনি নরমে-গরমে লাইন নেওয়ার পক্ষে। ভর্ৎসনা-ভয়-লোভ বিবিধ প্রকৃতির রসায়নে চেয়ারম্যান মুখর হন মুখটা ঝুঁকিয়ে:

— দেখুন কমরেড আপনি পার্টির সেবায় করে খাচ্ছেন। আমরাও পার্টির সেবায় বেঁচে বর্তে আছি। খামোকা নিজেরা ক্যালাকেলি করে মরি কেন।

টুকল। অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অপমানের কুৎসিত চাবুক পড়ল বুকে। সমগ্র কোষ ব্যেপে বিদ্রোহের ঝড় ওঠে। ছিন্ন করো নতি বন্ধন—তাড়না আসে।

রগড়ানি শেষ। বল অমিতর কোর্টে। প্রতিক্রিয়ায় প্রতি নজর রাখছেন চেয়ারম্যান। ক্রোধে ছটফট করে অমিত। ক্রোধ স্থায়ী হয় না। অদ্ভুত শান্ততায় ছেয়ে যায় মুখ। বাড়বুক। প্রতিবাদ মানে নেতৃত্ব থেকে অবসর। তার মানে প্যাকেজ ডিল হাতছাড়া। প্যাকেজ ডিলে আছে সুষম খাদ্য, আরামদায়ক বিহার, স্বাস্থ পরিষেবা, দাদাগিরি; প্রভৃতি গুচ্ছ গুচ্ছ নিরাপত্তামূলক পরিষেবার পুর। নেতা থাকলে পাবে। নেতা থাকো ভোগ করো।

কত সাধ সাধ্যে করা কল্লা গেছে। খোকাগিরিতে খোয়া যায় এমন কাজিদাসী বনে যাওয়া কি সাজে। প্রচুর বার্ধক্যে এসে বিনষ্ট অভ্যেসের নবীকরণ। বড় কষ্টের অনুভব। শিরশির করে গা। নিঃশব্দ চরণে কখন শীত এসে হানা দেয়। শীত হাড়ের ভিতরে ঢোকে। কাঁপুনি জাগায় সর্বাঙ্গে। কানের কানে ভ্রমর গুঞ্জন তোলে; যে পথ গিয়েছ ভুলে সে পথ আর মাড়ায়ো না। অতএব একমাত্র ত্রাণ নেতৃত্বের চরণে সেবা লাগে। সেলাম নিরাপদেষু;

সমবেত নেতৃত্ব প্রত্যক্ষ করল তুর্কি শিরে ধার্য করেছে আনুগত্য। কোলে স্থান দিয়েছে প্রয়োগবাদ। ভাবনার কোনো ক্ষতি নেই। মাথায় নেই। কোলে নেই। চমৎকার। এই তো কাম্য। পোষ মেনেছে। বনে গেছে আশ্রমিক।

॥ চার ॥

হায়, আত্মভরি,  
তার অর্থ পশিল না, তোমার মানসে :  
যৌবনের নির্বোধ সাহসে  
প্রাপ্য ভেবে, সে-নৈবেদ্য তুমি নিলে তুলি,  
দেখলে না কাঁধে শূন্য ঝুলি,

চ'লে যায় লোকান্তরে মৈত্রীর দেবতা,—
প্রত্যাখ্যাত আশীর্বাদ, প্রতিহত অমৃত বারতা।।

—ধিক্কার। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

না বিষণ্ণ না প্রসন্ন—খেলা হয় হলে যেমন হয়, শূন্য অনুভবে অমিত নামতে থাকেন। ঈষৎ টলমলো পায়ে অমিত সিঁড়ি ভাঙতে থাকেন। সিঁড়ির যা সংখ্যা তা ডিঙিয়ে সমতলে নামতে সময় লাগার কথা জোর ৫ মিনিট। লাগল প্রায় ১০ মিনিট। এতটাই উদাসীন এবং মন্থর পদপাত। কোঁচা পকেটে পুরে বিলম্বিত পদক্ষেপে গাড়ির ভেতর ঢোকেন।

সোফায় শ্রান্ত শরীর এলিয়ে দিতেই বুকে বাজনা বেজে ওঠে। মোবাইল বার করে নম্বর পড়েন। মেয়ের ফোন। ফোনটা ধরেন। শুরু হয় কথপকথন :

—বাবা আমি বলছি।

—বল।

—বাবা ঠাম্মা আর নেই।

—কখন?

—পিজিতে ভর্তি হয়েছে ১২টা নাগাদ। ওটে পর্যন্ত ছিল বেওয়ারিশ। সাড়ে তিনটে নাগাদ ডাক্তার এসে দেখে ডেড। সোয়া তিনটেয় নাকি মারা গেছে।

ধারাভাষ্য স্তব্ধ। কয়েক দণ্ড বিরতি। ফের শুরু।—বাবা তুমি তোমার ভাবমূর্তি টেকসই রাখতে ঠাম্মাকে মেরে ফেললে—। সুইচ অফ।

বুকটা ছ্যাং করে ওঠে অমিতর। আমার মা আর নেই। নিজের মুখটাকে মনে হয় কলঙ্কিত। কলঙ্কিত এ মুখ রাখব কোথায়—বোধে অমিত অঞ্জলিতে মুখ ঢাকেন।

গাড়ির নির্জন কোঠরে জননেতা হাউ হাউ করে কাঁদছেন। হৃদয়ের ক্ষণিক। একে নেতা তায় চালক সাক্ষী। কান্না প্রশ্রয়যোগ্য নয়। জ্ঞানটা উদয় হতেই চকিতে কান্নার অবসান।

ভাবমূর্তি জয়ী হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে বিশাল অনুভব।

জিতেছে। জয়ের উল্লাসে অমিত হাসলেন। হো হো হাসি। হাসি হাহাকার হয়ে ফেটে পড়ল।

# হলুদ পাখির পালক

## লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

াকেল হলেই আমাদের এই আড়াইশো বছরের সাতমহলা বাড়ির প্রকাণ্ড ছাদটা আমাকে
ানতে থাকে। দোতলা তিনতলার সারি সারি ঘরের পাশ দিয়ে আধো অন্ধকার সিঁড়ি
ভঙে ভেঙে যখন খোলা ছাদের চাতালে পা রাখি মনে হয় আমি যেন বিরাট পৃথিবীর
াঝখানটায় এসে দাঁড়ালাম। চোখ মেললেই সামনের গাছপালা হলুদ ফসল ভরা মাঠ,
ছলেদের ছুটোছুটি, দূরে রেললাইন আর খড়ের ঘরবাড়ি—ইতস্তত দু একটা দালান
কাঠা—পেছনদিকে নদী আর নদীপাড়ের জঙ্গল—আমার মনটা সবুজ ঘ্রাণে ভরে
ায়।

শরৎ এসে গেছে। আকাশে কখনও গভীর মেঘমালা কখনও ঝলমলে রোদ্দুর। নিরন্তর
পাখিদের ওড়া। বাতাসে টান। প্রকৃতিতে হলুদ ফসল। হঠাৎ হঠাৎ মন কেমন করে ওঠে।
বুঝতে পারি না কেন। অনেক দূরে থাকা কাউকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে। যেন মনের
নব কথা লিখে ফেলতে পারলেই এক নিমেষে মন ভাল হয়ে যাবে আমার। কিন্তু কাছে
এবং দূরে কোথাওই তো কেউ আমার চিঠির অপেক্ষায় নেই। মন যে কী চায় বুঝতে
পারি না ভাল করে। গুম হয়ে থাকি। মার সঙ্গেও কথা বলি না ভাল করে। অথচ আমাদের
এই ভাঙাচোরা রাজপ্রাসাদে এখন থাকবার মধ্যে আমি আর মা-ই তো। মার মেজাজ-
ও তিরিক্ষি হয়ে থাকে বেশির ভাগ সময়। দুই দাদা বিদেশে আছে। সেখানে তাদের ভরা
সংসার। দিদিদের বিয়ে হয়ে গেছে। আগে পুজোর সময়ে সবাই আসত। এখন তাও আসে
না। সবাই সবার সংসার ছেলেমেয়ে নিয়ে ব্যস্ত। মার মনের ওপর এসব নিয়ে চাপ পড়ে
আমি বুঝতে পারি। মা আমার জন্য খুব ভাবে। কখনও মন ভাল থাকলে আমার কোমর
ছাড়ানো এক মাথা কোঁকড়া চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে বলে—এ একরকম ভালই আছি।
আমি আর তুই। সংসার যারা করছে দেখছি তো তাদের। নানা অশান্তি নানা বন্ধন।
এর ভেতরে একটা না বলা কথা লুকিয়ে থাকে আমি টের পাই। মার সাধ্যমতো মা
অনেক চেষ্টা করেছে তবু সবদিকে মেলেনি বলে আমার বিয়েটা হয়নি।

আমার মুখ ভার থাকলে মা কখনও কখনও আমাকে সান্ত্বনা দেয়—দেখিস এত তো
চেষ্টা করছি। তুই আমার এমন লক্ষ্মী মেয়ে, ঠিক একটা ভালো পাত্র পেয়ে যাবো। সত্যিই
তো তোর সমবয়সী সবার বিয়ে হয়ে বাচ্চা কাচ্চা হয়ে গেল অথচ তোর এখনও...মার
কথা শুনলে মনে হয় কোনও একদিন হঠাৎ কোনও এক অলৌকিক উপায়ে আকাশপথে
নেমে আসছে এক রাজপুত্তুর যে আমার মতো সুলক্ষণা রাজকন্যেটিকে আবার হ-শ করে
আকাশপথেই নিয়ে চলে যাবে।

সকাল থেকেই আজ বাড়িতে বড্ড তাড়াহুড়ো। অন্যদিকে বাসবদাদা হেলতে দুলতে বেলা
আটটার সময় মার কাছে আসে—কর্তা মা বাজারের ট্যাকা দ্যান। বাসন্তীমাসী আটটার

সময় দ্বিতীয় রাউন্ডের চা নিয়ে আলিস্যি কাটায়। বলে—এতো বড়ো বাড়ির এদিকে সেদিকে ছুটতে ছুটতে হাঁপ ধরে যায় বাবা। সকালে দু-কাপ চা না খেলে কাজে নামতে পারি না। তবু তো এখন দোতলার মাত্র চারখানা ঘরেই আমার আর মায়ের সংসার। আজ দেখলাম বাজার হাট শেষ করে বাসবদাদা তরকারি কুটতে বসে গেছে। আর মায়ের ডিরেকশনে বাসন্তীমামীর এখন তিন নম্বর আইটেম চলছে। আমাকে দেখে মা বলল—কাল পই পই করে বললুম তবু এত বেলা করে উঠলি। অপালা পল্টুদের তো বেলা দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে এসে পড়ার কথা। যা যা ওদের জন্য একখানা ঘর চাবি খুলে পরিষ্কার করে রেখে আয়।

কাল রাত্তিরে আমার মাসতুতো ভাই কলকাতা থেকে টেলিফোন করেছিল কী একটা কাজেও নাকি আজ আর একজনকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। শোনার পর থেকেই মায়ের সাংঘাতিক উত্তেজনা। কী খাওয়াবে, কোথায় কোন ঘরে রাখবে...পুকুরে জাল ফেলা হবে কিনা। এই সংসারটা একদিন অনেক মানুষের ভিড়ে গম গম করত। সেদিন মানুষজনের আসা-যাওয়া থাকা নিত্যনৈমিত্তিক ছিল। আজ শূন্য এই বাড়িটাতে তাই অনেকদিন পরপর হঠাৎ কারুর আমার কথা থাকলেই মায়ের মনে বুঝি পুরনো দিনগুলো ভিড় করে আসে।

অথচ এই পল্টুকে নিয়ে আমাদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বেশ একরকম অবজ্ঞার ভাব আছে। পল্টুর দাদারা ভাল ভাল চাকরি করে। শুধু পল্টুটারই কিছু হল না। আর কিছু হল না বলেই ও সিনেমা লাইনে ঢুকে গেছে। মাও অনেক সময় দুঃখ করেছে রেণুর সব ছেলে মানুষ হল শুধু পল্টুটাকে নিয়েই ওর যত চিন্তা।

তবু এখন এই পল্টুর আমার খবরেও মায়ের উৎসাহ অসীম। আমারও ভেতরে ভেতরে কম উত্তেজনা হচ্ছে না। আমাদের রোজকার নিঝুম বাড়িটাতে তবু তো একদিন অন্যরকম কিছু হবে। পল্টু একটু উজ্জ্বল হাসিখুশি আমুদে ধরনের। ও এলে বন্ধ বাড়িটার অনেক বছর পর তবু তো একটু আলোবাতাস ঢুকবে।

মা বলল—হ্যাঁরে পল্টুর সঙ্গে কে আসবে সেটা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি। তোকে কিছু বলেছে নাকি?

আমি তখন জানলার বাইরে আমাদের কাঠচাপা গাছটার ডালে নাচানাচি করা হলদে পাখিটাকে দেখছিলাম। মাঝে মাঝেই একরকম আসে আর এলে অন্য কোনও গাছে নয় সেই কাঠচাঁপা গাছেই বসে। পালকগুলো ভারি সুন্দর। হলদে রঙের পালকে বিন্দু বিন্দু নীল ফোঁটা। বাসবদাদার খুব অহংকার। ও নাকি পাখি চেনে। আমি অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি পাখিটার নাম কী গো? বাসবদাদা একবারও বলেনি জানি না। বরং এক একবার এক একরকম নাম বলেছে। কখনও বলেছে হলদিবেনো কখনও বলেছে ইস্টিকুটুম কখনও অন্য কিছু। বাসবদাদা এ ঘরে কী একটা রাখতে এসেছিল। বললাম—দেখেছো কাঠচাঁপার ডালে ফের এই পাখিটা এসে বসেছে। কী যে সুন্দর ওর পালকগুলো। বাসবদাদা বাচ্চা-ভোলানোর গলায় বলল—ওই পালক চাই তোমার? একদিন ঠিক এনে দেবো। বাসবদাদার

লায় সবসময়েই প্রতিশ্রুতি। সবসময়েই অসম্ভবকে সম্ভব করার জোর। মানুষটা আসলে ব্ব ভালবাসে আমায়। মা আবার বলল—সকাল থেকে কী এক পাখি নিয়ে পড়লি! রা এই এল বলে। পল্টুর সঙ্গে কে আসবে শুনেছিস কিছু? খুব উদাসীন গলায় বললাম া। মা ঝেঁঝে উঠল—অমনি না। জিজ্ঞেস করতে হয় তো। আমার না হয় বয়স হয়েছে ময়মতো সবকিছু খেয়াল থাকে না। মাকে বোঝানো যাবে না যে পল্টুর সঙ্গে যেই াসুক না কেন তাকে যখন আমরা চিনিই না তখন আগে থেকে জেনে না থাকলে ী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে। মা মুখে মুখে কথা বলা একদম পছন্দ করে না। ইসময় বাসন্তীমামী এল—ওমা ভেনারা আসছেন যে। মা হন্তদন্ত হয়ে ঘর ছেড়ে বারান্দার িকে গেল। আমি কের বাগানে পাখিটাকে দেখতে গিয়ে দেখি দুপাশের ফুলগাছগুলোর ধ্যে দিয়ে পল্টু আসছে। সঙ্গে চাপদাড়িআলা কাঁধে ঝোলা ব্যাগ জিনসের প্যান্ট আর লুদ রঙের পাঞ্জাবি পরা একটা লোক। লোকটা থেমে থেমে এদিক ওদিক তাকাতে াকাতে আসছে। ওরা কাঠচাঁপা গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল আর অমনি মানুষের পায়ের ব্দ পেয়েই কিনা কে জানে আমার হলদে পাখিটা উড়ে পালালো।

থমে যখন পল্টু প্রস্তাবটা দিল মা একেবারে আঁতকে উঠল। বলল—না না এসব ঝামেলায় ামাকে ফেলিস না বাবা। তোরা বেড়াতে এসেছিস যে কদিন ইচ্ছে থাক, দেখ শোন ন্তু ওইসব সিনেমা-টিনেমার ব্যাপারে আমাদের জড়াস না। কিন্তু দুপুরটুকুর মধ্যে যে ী এমন ঘটে গেল মা ওই পল্টুর সঙ্গে আসা লোকটার সঙ্গে কথা বলে এমনই মোহিত য়ে গেল যে একমাসের জন্য আমাদের বাড়ির বয়মহলটা ওদের সিনেমার স্যুটিঙের ন্য দিয়ে দিল। পল্টু আমার ঘরে এসে বলল—মাসী যে এমন বোকামি করবে ভাবতে ারিনি। আরে একদিন দুদিনের ব্যাপার না। একমাসের ব্যাপার। বাড়িটা এমনি এমনি য়ে দিল। অথচ এর জন্যে আমাদের বাজেট ধরা আছে। ওই ডিরেক্টরও নাকি অনেক লেছে মাকে যে অন্তত কিছু টাকা অগ্রিম রাখুন। মার ওই এক কথা— দেখো বাবা োমার সঙ্গে কথা বলে আমার ভাল লেগেছে। তুমি একটা কাজ করতে চাইছ তাই লাম। না হলে আমার তো বাড়িভাড়া দিয়ে পয়সা রোজগার করার কোনও প্রয়োজন েই।

মায়ের এই রাজি হওয়ার খবর শুনে আমি এতোই অবাক হলাম যে পল্টুকেই জিজ্ঞেস য়ে বসলাম কী ব্যাপার বল তো? তোদের ওই ডিরেক্টর ভদ্রলোক কি তুক জানে?

ডিরেক্টারের প্রসঙ্গ ওঠায় পল্টুর আর কোনও মাত্রাজ্ঞান রইল না। ওর চোখে এমন ারফেক্ট ম্যান আজকের দিনে দেখা যায় না। অসম্ভব ব্যালান্স আর কাজপাগল মানুষ। ল্টু বলল সামনের সোমবার থেকে শ্যুটিং। আমরা প্রায় পনেরো দিন ধরে লোকেশন েখে বেড়াচ্ছি। শৈবালদার কোনওটাই পছন্দ হচ্ছে না। খুব খুঁতখুঁতে মানুষ তো। অথচ ামাদের বাড়িটা দেখে এমন পছন্দ হয়ে গেল যে মামীকে বলল আমি মনে মনে ঠিক েমন বাড়ি চাইছিলাম এ বাড়িটা অবিকল তেমন। এখন আপনি যদি আপনার বাড়িটি

ব্যবহারের অনুমতি না দেন তাহলে আমার পুরো মাইণ্ডসেটটাই বদলে যাবে। পল্টু হাসছে হাহা। হাসিতে জয়োল্লাস। ডিরেক্টারের কাছে ওর প্রেসটিজ বাড়ল। পল্টুর মাসির বাড়ি বলে কথা। বাগান জুড়ে সন্ধে নামছে। ঠাকুরমশাই মন্দিরে শাঁখ বাজাচ্ছেন। সন্ধের আবছা আঁধার আর শাঁখের আওয়াজ এই দুই মিলে মিশে আমার গায়ে হঠাৎ কাঁটা দিয়ে উঠল।

আমাদের বাড়িটাতে যেন উৎসব শুরু হয়ে গেল। লোক লস্কর লাইট শট ক্যামেরা রেল ট্রলি হাসি কথা ভারি ভারি পায়ের আওয়াজ। রিনরিনে মহিলা কণ্ঠ। মাঝরাত অবধি এই চড়া চড়া আলো। তবে মানুষগুলোর ধরন ধারণ কথাবলা সব যেন কেমন। আমাদের সঙ্গে মেলে না। আবার মাঝে মাঝেই এই হই হল্লা একেবারে চুপ হয়ে যায়। তখন যেন গাছের পাতা পড়লেও শোনা যাবে এমনই নৈঃশব্দ্য। অবশ্য তার আগে একজন লোক খুব ভারি গলায় জোরে জোরে বলবে—সাইলেন্স। এরপর অন্য একজন কখনও কখনও পল্টুও বলে রোল-রোলিং আর তারপরই ডিরেক্টার তার গম্ভীর গলায়—অ্যাকশন। আমার ঘরের দক্ষিণের জানলা দিয়ে মাঝে মাঝে ওদের সুটিং দেখা যায়। পল্টু ঠিকই বলেছিল কাজের সময় লোকটা একদম অন্য মানুষ। টেলিভিশনের থেকেও একটা ছোট জিনিসে চোখ রেখে বসে থাকে আর মাঝে মাঝেই বলে ওঠেন কাট্। পল্টু বলেছে ওই জিনিসটার নাম মনিটর। আবার কখনও কখনও কী প্রচণ্ড ধমক। আর্টিস্ট ক্যামেরাম্যান টেকনিসিয়ান এমনকি যে পল্টু এত বড়ো একটা উপকার করল লোকটার তাকেও রেয়াত করে না। ভারি অদ্ভুত তো। একদিন দেখতে পেলাম নায়িকা বকা খেয়ে চোখের জল মুছছে। অথচ রাতে যখন রোজ একবার আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে তখন একেবারে অন্যরকম। ধীর স্থির শান্ত। কত সাধারণ কথাবার্তা, মায়ের শরীরের খোঁজ নেওয়া মা যা কিছু খেতে দেয় সোনা মুখ করে খেয়ে নেওয়া। সেদিন চলে যাবার পর মা বলল—ছেলেটার চোখ দেখলেই বোঝা যায় খুব সৎ ছেলে। এতদিন এখানে আসছে তুই একটা সোমত্ত মেয়ে অথচ কখনও কোনো কৌতূহল নেই চোখে। সিনেমার লাইন সম্পর্কে আমার ধ্যান ধারণাই বদলে গেছে এ-কদিনে।

মা লোকটার চোখ দেখেছে। আমার সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে আসতে যেতে। আমি কখনও ওর চোখের দিকে তাকাতে পারিনি। শুধু যে মেয়েলি লজ্জা তাই নয় কেন কেন আমার মনের ভেতর থেকে এক নিষেধ মাথা তুলে দাঁড়ায়। কেন কে জানে।

লোকটা যে সরাসরি এরকম একটা প্রস্তাব মায়ের মুখের ওপর করে ফেলল কী করে এটা ভেবেই আমার অস্থির অস্থির লাগছিল। মা কিছুক্ষণ অবাক তাকিয়ে থেকে বলল—তুমি কি আমার মেয়ের কথা বলছ? লোকটা নির্ভীক। বলল—হ্যাঁ। আপনার কাছে তো আমি আপনার মেয়ের কথাই বলব। মা কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে রইল। ইতিমধ্যে পল্টু হাত পা নেড়ে অতি উৎসাহে বোঝাতে শুরু করেছে—এতদিন আগে থেকে সিডিউল দেওয়া হয়ে গেছে। পরশুদিন শুটিং। অথচ আজকে জানাচ্ছে বিশেষ কারণে এই কাজটা

করতে পারবে না। ...নিশ্চয়ই মুম্বাইতে কোনো অফার পেয়েছে। আসলে এইসব মেয়েরা সিরিয়ালে কাজ করে করে...লোকটা হাতের ইশারায় পল্টুকে থামিয়ে দিল। মাকে এবার খুব অনুনয়ের গলায় বলল—মাসিমা অনেকদিনের স্বপ্ন ছিল এই ছবিটা বানানোর। প্রডিউসারের টাকা। এখন যদি স্যুটিংটা ক্যানসেল করে দিই অনেকগুলো টাকা নষ্ট হবে। তাছাড়া কো-আর্টিস্টের ডেট পাওয়াও মুশকিল হবে। বেশি নয় মাত্র কদিনের কাজ। মার যেন শরীরে বাতাস কমে আসছে। কীরকম বেহাল গলায় বলল—অন্য কাউকে খুঁজে নাও না। এবার পল্টু মুখর এত তাড়াতাড়ি কাউকে পাওয়াই তো মুশকিল তাছাড়া আমরা পুরো ইউনিট কলকাতায় থেকে এত দূরে আছি।

এ ঘরে যেন আর কেউ নেই এমনভাবে লোকটা এবার শেষবারের মতো মাকে কোনও সিদ্ধান্ত জানাচ্ছে এভাবে বলল—অন্য কাউকে খুঁজে নিশ্চয়ই পাওয়া যেতে পারে কিন্তু আমার ওঁকেই এখন মনে হচ্ছে এই রোলটার জন্য বেস্ট।

মার যেন কথা বলার ক্ষমতা কেউ কেড়ে নিয়েছে অথবা মার ভেতর এ যাবৎকাল শিখে ওঠা শব্দ ভাণ্ডারে টান পড়েছে তাই মা থেমে থেমে নতুন কথা বলা শেখার মতো করে বলল—ও কি পারবে?

এবার ডিরেক্টার আরো বেশি সপ্রতিভ। বলল—আমি তৈরি করে নেব। কাল স্যুটিং অফ রেখেছি। কাল সারাটা দিন ওকে সময় দিতে হবে।

ডিরেক্টর উঠে পড়ল। যেন ফাইনাল কথা হয়েই গেছে। সঙ্গে পল্টুও। বারান্দায় আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। নিশ্চল। এই প্রথম চোখাচোখি হল। পরিকল্পনাবিহীন, আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। পায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। চলে যাচ্ছে বারান্দা পার হয়ে হয়ে। আমার অনুমতির তোয়াক্কা না করেই। যেন আমি নিজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারার মতো সাবালকত্ব অর্জন করিনি এখনও।

চরিত্রটা ঠিক তোমারই মতো একটা মেয়ের। খানিকটা আভিজাত্য আর রক্ষণশীলতার মোড়কে ঢাকা। নায়িকার ছোটবেলার বন্ধু। তুমি প্রকৃতি ভালবাসো। গাছ ভালোবাসো নির্জনতা ভালবাসো। আর ভালোবাসো অপেক্ষা করতে। তোমাকে একজন কথা দিয়ে গেছে একদিন ফিরে আসবে। অনেক বছর পার হয়ে গেছে। সে আসেনি। তবু তুমি অপেক্ষা করে থাকো। তোমার বন্ধু মানে নায়িকা তোমাকে অনেক বোঝায় প্র্যাকটিক্যাল হতে বলে। কিন্তু তুমি...কাশবনের বাগান দিয়ে আমার একটু আগে আরো লম্বা লম্বা পা ফেলে ফেলে হাঁটছিল মানুষটা। খানিকটা আত্মমগ্ন। চরিত্রটাকে আমার মধ্যে দিয়ে মনে মনে ফেলতে চাইছে। হঠাৎ কী মনে পড়ায় থেমে গেল। তোমাকে তুমি করে বললাম। আসলে এতে কাজের সুবিধে হয়। কমিউনিকেশনটা...থেমে গেল কী যেন দেখছে অপলক। আমার শরীর এই শরতের মনোরম বিকেলেও ঘামে ভিজে যাচ্ছে। বলল—ফুল তোলো...ফুল তোলো। কাশবনের ফাঁকে মাথা তুলে তাকালাম। আধবোজা চোখ। মাথার ওপরে নিরন্তর আকাশ। আমার গালে হাত বোলালো—আরে তোমার গালে একটা

তিল রয়েছে। এই তিলটাই তোমার মুখটাকে এতো সফট আর ইনোসেন্ট করেছে। আমা পা হাত পা কাঁপছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। ও হাত সরিয়ে নিল। আকাশে টুকরো টুকরে যেন ভাসছে। এই মুহূর্তে আকাশ জুড়ে সব টুকরো টুকরো যেন মিলে মিশে এক আকা শীতল পাখা হয়ে গেছে।

রাতে বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিলাম। পিঠের তলা ঘামে ভিজে জবজব করছে। হঠা বড্ড গুমোট হয়ে গেছে চারপাশ। আমার পাশে মা শুয়ে। ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ এখন কত রাত কে জানে। একটা মালগাড়ি চলে যাচ্ছে বাঁশি বাজাতে বাজাতে। উঠে জল খেলাম। আবার শুলাম। এপাশ ওপাশ করছি। মা বলল—খুব টেনশান হচ্ছে তোর নারে? আমি চমকে উঠলাম। মাও তা হলে ঘুমোয়নি। তাহলে এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি কেন মা। এবার একেবারে অপ্রাসঙ্গিকভাবে মা বলল—তুই তো অনেকক্ষণ শৈবালের কাছে শট বুঝেছিলি। আমি আর পল্টু অনেকক্ষণ গল্প করলাম। পল্টু বলছিল— মানুষটা এতো কাজপাগলা অথচ খুব নিঃসঙ্গ। ওর বিয়েটা টেকেনি। ডিভোর্স হয়ে গেছে বছর চারেকের একটা মেয়েও নাকি আছে। বউ মেয়েটাকেও নিয়ে গেছে। শৈবাল নাকি বাচ্চাটার জন্য পাগল একেবারে। ঈশ্বর যে কার জন্য কী কষ্ট তুলে রাখেন। অথচ কতটুকু বয়স। এই বয়সে তো কতজনের বিয়েই হয় না।

এইসব খাট বিছানা জানলা দরজা সবাই মিলে যেন উলু দিয়ে উঠল। আর এই উলুর শব্দ শুনতে শুনতে কখন দু-চোখ লেগে এল। মাঝরাতে স্বপ্ন দেখলাম আমার কাঠচাঁপা গাছের ডালে বসে থাকা একলা হলুদ পাখিটা আমার ঘরে ঢুকে পড়েছে।

আমার শটটা কিছুতেই ওকে হচ্ছে না। বারবার এন-জি হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি ইউনিটের লোকজন বিরক্ত হচ্ছে খুব। পল্টুও খানিকটা হতাশ ভাবে বলল, শৈবালদা মনে হচ্ছে ছোড়দিকে দিয়ে হবে না। লোকটা কী ভাবল খানিকক্ষণ। দু-চারবার পায়চারি করল ফ্লোর জুড়ে। আমার খুব অসহায় লাগছে। দু-লাইনের ডায়লগ। অথচ বার বার বলার সময়ে ভুল হয়ে যাচ্ছে। এক্সপ্রেশন আসছে না। ওর সত্যিই চেষ্টার ত্রুটি নেই। এবার আমার কাছে এল। বলল, তোমার কি আমার সঙ্গে কাজ করতে অসুবিধে হচ্ছে? বুঝতে পারছি অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীরা হাসছে আমার অবস্থা দেখে। আর ওসব ভেবেই আমি মনে মনে আরও বেশি নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। কোনো কথা বলতে পারছি না। চোখ ফেটে জল আসছে। ভেতরটা অপমানবোধে পুড়ে যাচ্ছে, হঠাৎ ও বলল—এই তোমরা সবাই একটু ফ্লোরটা খালি করে দাও তো। কুইক। সবাই চলে গেল। বিশাল বড়ো হলঘরে আমি আর ও মুখোমুখি। ওর চোখ মুখ একদম পাল্টে গেছে। চোখের তারায় গভীর চ্যালেঞ্জ। বলল—মনে করো কেউ কোথাও নেই। তুমি একটা একা মেয়ে। তোমার প্রেমিক অনেক দূরে থাকে। তোমাকে এতবছর অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে সে। আজ এতবছর পর ফিরে এসেছে তোমার কাছে। এসে বলছে আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। তোমার ভেতরকার সমস্ত অপেক্ষা জমাট অভিমান হয়ে বেরতে

চাইছে এবার। তাকাও আমার দিকে তাকাও। মনে করো আমি তোমার সেই প্রেমিক। আমি তোমার অপেক্ষাকে মিথ্যে করে দিয়ে বলছি—আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম অপালা। তোমার চোখ ফেটে জল আসছে। অথচ সেই জল তুমি আমাকে দেখাবে না। আমার কাছে অপেক্ষার খেলায় তুমি হারবে না কিছুতেই। তুমি আমাকে বলো — মুক্তির মানে তুমি জানো? বলো...এই তো আমি তোমার সেই প্রেমিক...এই তো আমি যাকে নিয়ে তুমি এক আকাশ স্বপ্ন দেখো...। ওর কথাগুলো দূরাগত ঢাকের আওয়াজের মতো কানে আসছে আমার। আর সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে আসছে। বুকের ভেতর দমচাপা কষ্ট...একফালি জলভরা মেঘ যেন হয়ে আটকে ছিল। এতক্ষণে প্রবল ধারাপাতে বর্ষণ আনল। কান্না কান্না কান্না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ডুকরে ডুকরে ওর বুক খামচে ধরে কেঁদে চলেছি আমি। আমার ঘোর ভাঙল, ওর উল্লাসে—একসেলেন্ট। ঠিক এইটা...এইটাই চাই আমি। ক্যামেরা লাইট...হেয়ার ড্রেসার...

কাল ওরা চলে যাবে। আমাকে পল্টু ডিরেক্টারের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। রাশ দেখাবে। এখন অনেক রাত। আজ বিকেল পাঁচটার মধ্যে সুটিং প্যাক আপ হয়ে গেছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কতদিন পর বাড়িটা আবার আগের মতো শান্ত। এই কদিনে ও আমার সঙ্গে অনেক গল্প করেছে। কখনও অনেকের মধ্যে, কখনও একা।

আমাকে এ ঘরে পৌঁছে দিয়ে পল্টু মায়ের কাছে গেল। মা ওর সঙ্গে কথা বলবে। কী কথা বলবে আমি জানি। আজ সমস্ত সন্ধেটা মা আমাকে নিয়ে ছাদে বসেছিল। তারা ভরা আকাশের নিচে বসে বসে মা মায়ের ইচ্ছে পূরণের গল্প শোনাচ্ছিল। মা বুঝতে চাইছিল আমার কোনও আপত্তি আছে কিনা। নানারকম যুক্তি বিস্তার করে মা আমাকে বোঝাচ্ছিল যে কী কী কারণে মা শৈবালকে এত পছন্দ করে ফেলেছে। এরকম একজন কাজপাগল মানুষের নাকি আমার মতো একটা শান্ত স্বভাবের মেয়েই দরকার। যে সংসারটা গুছিয়ে টানতে পারবে। মানুষটাকে একটু যত্নআত্তি করতে পারবে। আমি মায়ের কথার পিঠে কোনও উত্তর দিইনি। ভয় করছিল কথা বলতে গেলেই যদি আমার ভেতরকার উত্তেজনা মায়ের কাছে ধরা পড়ে যায়। না না সে ভারি লজ্জার কথা হবে। মা আজ গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। আর পুজোর মন্ত্রোচ্চারণের মতো নিষ্ঠা আর বিশ্বাস নিয়ে বলছিল, তোকে আমি বলেছিলাম না যে তোর মতো লক্ষ্মী মেয়ের জন্য হঠাৎ একদিন ভালো পাত্র পেয়ে যাবো আমি। জোটালি তো। আমাকে অনেকক্ষণ চুপচাপ দেখে মার কি সন্দেহ হল। বলল—হ্যাঁরে তোর কি পাত্র পছন্দ নয়? হ্যাঁ একবার হয়েছে বটে। তা সে তো শুনলাম পল্টুর কাছে সব। সে-ও এই লাইনের মেয়ে। নায়িকা। দিনরাত ব্যস্ত থাকতো। অনেক ওপরে উঠতে চাইতো সেসব নিয়েই নাকি খিটিরমিটির তা থেকে...মা আমার হাত ধরে বলল—তোর মত আছে তো মা? আমি তখন বুকের কাছে দুহাত জড়ো করে বসেছিলাম। ঠিক যেভাবে ধান

দুব্বো নিয়ে ব্রতকথা শোনে সেইভাবে। মা কি ভুলে গেছে ব্রতকথা শোনার সময় উচ্চারণ করে কোনও কথা বলতে নেই।

রাশ দেখতে দেখতে ও আমাকে অনেক কিছু বোঝাচ্ছিল। অ্যাঙ্গেল শট ডিভিশন আলো...এই সবই আমার কাছে এক অন্য দুনিয়া। অন্য ভাষা। তবু ও এমন বিশ্বাস নিয়ে বলছিল যেন আমি সবটা বুঝতে পারছি। আর ওর এই বিশ্বাসকে সম্মান দেখানোর জন্য আমি আপ্রাণ বোঝবার চেষ্টা করে যেতে লাগলাম। পর্দায় নিজেকে দেখছিলাম। ও বলে যাচ্ছে—বেশ তো করেছো। প্রথমবার হিসেবে মন্দ হয়নি। তবে আর একটু হলে আরও ভাল হত। আবার এই যে তোমার একটা আড়ষ্ট ভাব একটা সংকোচ, সবসময়ে একটু দ্বিধা এটাই তোমার ইউ এস.পি। ইউ এস পি শব্দটা আমার অজানা। তাকালাম। ও বুঝতে পারল। বলল মানে আমি বলতে চাইছি। এটাই তোমার ক্যাপিটাল। এটার মধ্যেই চরিত্রটা খুব গ্রহণীয় আর বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে।

আমার এসব কথা মাথায় ঢুকছিল না। আমার মনে হচ্ছিল ও অন্য কথা বলুক। অন্য কিছু বলুক। ও ওসব কী কী বলে যাচ্ছিল আর আমি সেসব উপেক্ষা করে শুনতে পাচ্ছিলাম প্রথম দিন শট নেওয়ার আগে নির্জন ফ্লোরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওর বলা কথাগুলো। ওর সেদিনের অভিব্যক্তি ওর গলা আমার কানে ভাসছে—আমি আমিই তোমার সেই প্রেমিক। আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল ওকে আঁকড়ে আমার আকুল কেন্না। হঠাৎ আমার হাতে ওর স্পর্শ। চমকে উঠলাম। ওর মুখে স্মিত হাসি—আমার কথা কিছু শুনছ না তুমি। কী ভাবছ?

সকালবেলা চা খেয়ে ওরা চলে যাবে। পল্টু নাকি মাকে বলেছে কলকাতায় গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলে ওর মতামত মাকে ফোনে জানাবে। মার দৃঢ় বিশ্বাস আমার মতো লক্ষ্মীমেয়েকে প্রত্যাখ্যান করার কোনও সাধ্যই ওর হবে না। তাছাড়া আমি ঠিক কেমন সেটা নাকি ও ভালই বুঝেছে। তা নাহলে ওই চরিত্রটার জন্য বেছে বেছে আনকোরা আমাকে নিয়ে পরীক্ষা করতে যেতো না। এই সুযোগে ও ওর চেনাটাকে পাকা করে নিল।

অন্যদিন বাসবদাদা ওর চা নিয়ে যায়। মা বলল—অপালা আজ তুই চাটা দিয়ে আয়। আমার পা দুটো চঞ্চল হয়েই ছিল। শুধু মায়ের বলার অপেক্ষা। কাল রাত থেকে মাঝেমাঝেই আনমনা হয়ে যাচ্ছি। বারবারই মনে পড়ে যাচ্ছে ওর স্পর্শের কথা। গোটা শরীর শিরশির করে উঠছে ভাবলেই। স্পর্শ যে এমন বিদ্যুৎবাহী হতে পারে জানতাম না আগে। ওর ঘরে গেলাম। কথা বলছে পল্টুর সঙ্গে। ঘরে ঢুকব কি একরাশ লজ্জা যেন আমার পা জড়িয়ে ধরল। শুনতে পাচ্ছি ওর গমগমে গলা। কী যেন বলছে পল্টু কান খাড়া করলাম—কাল মায়ের প্রস্তাবের উত্তর কিছু? বুকের ভেতর—টিপটিপ। হৃৎপিণ্ডটা বুঝি ফেটে যাবে এবার। ও বলছে—এবার থেকে এভাবেই এক্স্‌পেরিমেন্ট

করতে হবে আমাদের। এই ছবিতে সেই নায়িকা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করলাম। পরের ছবিতে ভাবছি কোনো নায়িকা নিয়েই করব। আনএক্সপোজড কোনো ফ্রেশ মুখের একটা ব্যাপার থাকে। ছবির ব্যবসার দিনদিন যেভাবে মন্দা আসছে তাতে এরকম কিছু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা না করলে টিকে থাকা মুশকিল।... তোর জন্যই এটা হল।

পা দুটো আটকে গেল মাটিতে। অথচ তখন আমি এক খাঁ খাঁ প্রান্তর ধরে রোদ পোড়া আগুন গায়ে মেখে ছুটে যাচ্ছি। সারা গায়ে আগুন ধরে গেছে আমার।

কিছুক্ষণ আগে ওরা চলে গেছে। বাড়িটা এমন শ্মশানের মতো শূন্য। নিঃস্ব। কে যেন বাড়িটার সব মাধুর্য হরণ করে নিয়ে চলে গেছে। দক্ষিণের জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। এখান থেকে আমাদের বাগানের অনেকটা অংশ দেখা যায়। এতদিনের জমা জঞ্জাল ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করছে বাসবদাদা। এ বাড়ির প্রত্যেকটা গাছ প্রত্যেকটা লতাপাতা আমার জন্ম চেনা। গাছপালায় ঘেরা বাড়িটা আমাদের ঠিক একটা দ্বীপের মতো। বাগানে কোন কোন গাছের নিচ দিয়ে খরগোশ খেলা করে বেড়ায় সব আমার জানা। কোন গাছে কোন পাখিটাও আসবে তাও।

অনেকদিন কাঠচাঁপা গাছের ডালে আমার হলুদ পাখিটা এসে বসেনি। অথবা বসেছিল কখন উড়ে গেছে আমি টের পাইনি।

বাসবদাদা ঝাঁট দিতে দিতে কী যেন কুড়িয়ে নিল। ঝাঁটা নিয়ে ছুটে আসছে ওপরে। আমার ঘরের দরজায় এসে হাঁকডাক—ছোট খুকি...শিগগির এসো। দেখো কী এনেছি তোমার জন্য। আমি মনে মনে হাসছি। আমার মতো একটা অপয়া মেয়ের জন্য কেউ কিছু এনে দিতে পারবে না। কিছু সইবে না আমার। দরজার বাইরে গেলাম। বাসবদাদার একমুখ হাসি—নাও। ধরো। বলেছিলাম না একদিন ঠিক এনে দেব তোমায়। আমি হাত বাড়ালাম। বাসবদাদা আমার হাতে দিল। আমার হলদে পাখির পালক। উড়ে চলে গেছে। হয়তো নিজের অজান্তেই ফেলে গেছে।

# আলো অন্ধকারের গল্প

## অভিজিৎ সেনগুপ্ত

সারারাত কাল কারেন্ট ছিল না। কালবৈশাখীর ঝড়ে কোথায় নাকি হাইটেনশন লাইন সব ছিঁড়েখুঁড়ে একশা। তারই মেরামত চলছে সমস্ত রাত ধরে। কবে কারেন্ট আসবে কে জানে? এখানে অন্ধকার এমনিতে কখনোই থাকে না। লোডশেডিং বা অন্য কোনো কারণে যদিও বা কখনো আলো চলে যায় সব বাড়িতেই জেনারেটরের আলোর ব্যবস্থা আছে—আলো এসে যায় তৎক্ষণাৎ। কিন্তু জেনারেটরের তারও এই প্রবল ঝড়ে ছিঁড়েখুঁড়ে গেলে আর কী করার থাকতে পারে? অন্ধকারের মুখদর্শন তখন তো করতেই হয়।

দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে বসে ছিল মানস। অন্ধকার যে এমন ভারি নিরেট পাথরের মতো বুকের উপর চেপে বসতে পারে দশ বছর পর যেন তা নতুন করে আবিষ্কার করল মানস। বহুদিন তো এরকম নিকষ অন্ধকারে মুখোমুখি বসে থাকতে হয় নি তাকে যাতে আকাশের তারা ছাড়া আর কোনো কিছু দৃশ্যমান হয় না। আকাশের তারা আর কতক্ষণ ঘাড় উঁচু করে দেখতে পারে মানুষ।

তিরিশ বছর আগে কোনোমতে একটা মাথা গোঁজার আস্তানা তুলে যখন ওরা উঠে এল এই বীরপুরে তখনো এ-জায়গা ছিল বড় বড় পুকুর, বাঁশঝাড় আর আমবাগানে ভর্তি। কারেন্ট আসে নি তখনো এখানে। রাত হলেই মনে হত পৃথিবীতে কোথাও যেন কোনো আলো নেই, অন্ধকারের হাঁ সব গ্রাস করে নিয়েছে।

লতা প্রথমদিকে প্রায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল—এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে বলো তো? এ তো দেখছি আন্দামানের জঙ্গলের অন্ধকার। এ-অন্ধকারে আমাদের জারোয়াদের মতো পড়ে থাকতে হবে নাকি।

মানস মিনমিন করে বলেছিল—কেন জারোয়াদের মতো পড়ে থাকতে হবে? আমাদের দেখাদেখি আরো লোকজন এসে গেলেই দেখবে অনেক উন্নতি হবে এ-জায়গার।

লতা বলে—ছাই উন্নতি হবে। বড় রাস্তা থেকে এত ভিতরে এরকম নিচু ধানী জমিতে তোমার মতো পাগল ছাড়া আর কেউ আসবে বাড়ি করতে?

মানস চুপ করে থাকে। মিথ্যে বলে নি লতা। খুবই সস্তায় এই নিচু ধানী জমি পেয়েই এখানে উঠে এসেছিল মানস কিন্তু এখন কেমন একটা সূক্ষ্ম ভয় যেন মাঝে মাঝ তিরতির করে বুকের ভিতর—এত ভিতরে শেষ অবধি আসবে তো লোকজন? যদি না আসে তাহলে তো সত্যই এই অন্ধকারে কতদিন পড়ে থাকতে হবে তার কোনো ঠিক নেই। আর এই চিন্তাটা মাথায় এলেই অন্ধকারটা আর যেন নিছক অন্ধকার থাকে না। ভারি পাথরের মতো বুকে চেপে বসে যেন শ্বাসরুদ্ধ করে দিতে চায়—মনে হয়, এর হাত থেকে সত্যই যেন আর মুক্তি নেই। তাদের।

কথাটা একদিন বলেছিল লতাকে—দ্যাখো লতা, তোমার কথা শুনে শুনেই বোধহয় একটা অদ্ভুত মানসিক রোগে ধরেছে আমাকে—অন্ধকার এখন একদমই যেন সহ্য করতে

পারি না— কেমন যেন খাবড়িছাড়া করতে থাকে বুকের ভিতরটা একটু আলোর জন্য— মনে হয় যেন দমবন্ধ হয়ে যাবে। ভয় হয় কখনোই যদি আর আলো না আসে! সত্যিই যদি না আসে?

লতা বলে—এটা আবার অসুখ হতে যাবে কোন্ দুঃখে? সভ্য মানুষেরা তো অন্ধকারে ভয় পাবেই। অন্ধকারে তো ভয় পায় না অসভ্য আরোয়ারা। তুমি তো আর আরোয়া নও। স্ত্রীর কথায় খানিকটা সান্ত্বনা পেয়ে যেন চুপ করে যায় মানস। মনে পড়ে কোন্ জার্নালে যেন একবার পড়েছিল—সভ্য মানুষ যেহেতু আলোতেই অভ্যস্ত—আলো মানেই যেহেতু সভ্যতা উন্নতি, কোনো কোনো মানুষের মনে অন্ধকারের ভয় প্রকট হয় দেখা দিতে পারে যাকে বলে নিকটোফোবিয়া শেষে তাকেও এই রোগে সত্যি ধরল কিনা জানে না মানস কিন্তু অন্ধকার যে সে সত্যি আজকাল একদমই সহ্য করতে পারে না তা আবিষ্কার করতে বেশি পরিশ্রম করতে হয় না তাকে। খালি মনে হত আলো যদি সত্যি কখনো না আসে কী হবে তাহলে?

তবে এ জায়গায় উন্নতি না হবার ভয়টা যে ওদের নেহাৎই অমূলক তা তো ক্রমশই প্রমাণিত হতে থাকে। সভ্যতার বিস্তার আটকে থাকে কখনো? আস্তে আস্তে মানুষ আসতে শুরু করল। ভরাট হতে থাকল পুকুর আর ধানীজমি, কাটা হতে লাগল বনজঙ্গল— বছর দুয়েকের মধ্যেই ইলেকট্রিক পোস্টও পড়ে গেল তারপর গত দশ বছরের মধ্যে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের ছোঁয়ায় যেন একটা ছোটখাটো উপনগরীর চেহারাই নিয়ে নিল জায়গাটা। অন্ধকার হঠে গিয়ে মুহূর্তে যেন সব আলোয় আলো। দশ বছর আগের ভুলে যাওয়া সেই অন্ধকারটাই মনে হচ্ছে যেন ফিরে এল আবার সেই দমচাপা অনুভূতিটা নিয়ে।

—শুনছ? খোকা ফোন করল না এখনো? পাশের ঘর থেকে লতার উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙে মানসের। রুগ্ন শরীরে লতা জেগে বসে আছে জয় কখন ফোন করবে তার অপেক্ষায়। জয় আজ সারাদিন একবারও ফোন করেনি।

লতা বিড়বিড় করে বলে—হ্যাঁ গো, যা গণ্ডগোল হচ্ছে ওদিকে খোকা আবার কোনো বিপদে টিপদে পড়ল না তো?

মানস বলে—কী যে বলো? গণ্ডগোল তো নন্দীগ্রামে চাষা-ভুষোদের জমিজমার ব্যাপার নিয়ে। খোকার সেখানে কী? খোকা কি লাঙল চষে?

—খোকা তো বলছিল নন্দীগ্রাম যাবে কীসের কাজে—কিন্তু কেন ফোন করে না বলো তো ও? আমরা ভেবে মরি সেটুকুও বোঝে না? কেমন অভিমান বেজে ওঠে লতার গলায়।

এই এক দুরারোগ্য অসুখ লতার। বাইরে থাকলে দিনে যে কতবার জয়কে ফোন করে জানাতে হবে যে সে ভালো আছে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই।

লতার এই মাত্রাছাড়া উদ্বেগে মাঝে মাঝে রীতিমতো বিরক্তিই বোধ করে জয়। মাঝে মাঝে দু একদিনের জন্য ফোন করা বন্ধও করে দেয়। স্ত্রীর অনুরোধে মানসকেই তখন

ফোন করতে হয়। কিন্তু মানস বেশ অস্বস্তি বোধ করে তাতে। লতাকে কী করে সে বোঝাবে যে জয় আর তার সেই খোকা নেই যে পিঠে স্যাচেল বেঁধে, টলমল পায়ে হাঁটতে হাঁটতে মায়ের হাত ধরে পড়তে যেত রাস্তার ধারে সদ্য গজিয়ে ওঠা একটা কে জি স্কুলে। তখন ও-অঞ্চলে ওই একটাই কে জি ছিল। ওকে স্কুলে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে রাস্তার ধারে একটা কদম গাছের ছায়ায় অন্যান্য বাচ্চাদের মায়েদের মতো লতাও ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করত কখন স্কুল ছুটি হবে, জয়কে সে নিয়ে আসবে স্কুল থেকে।

মাঝে মাঝে মানস আপত্তি জানাত—ছেলেকে ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে তুমি বাড়ি চলে আসতে পারো তো—এভাবে গাছের নিচে বসে থাকার কোনো মানে হয়? স্কুল ছুটি হলে আবার আনতে গেলেই হয় খোকাকে।

জবাবে লতা বলত—কী যে বলো? আমি একা? দূর দূর থেকে কত ছেলে আসে জানো? তাদের মা-রাও তো বসে থাকে। ছেলেকে বড় করতে গেলে এটুকু কষ্ট তো স্বীকার করেই নিতে হবে। বড় হওয়া খুব সোজা নাকি? বাবারাই এরকম গা ছাড়া দিয়ে থাকতে পারে। মায়েরা পারে না।

তা সেই খোকা সত্যি যেন এখন খুবই বড় হয়ে গেছে। যত না বয়স তার চেয়েও অনেক বড়। অফিশিয়াল ডেজিগনেশনটা জানে না মানস কিন্তু ভুবনেশ্বরের একটা বিখ্যাত আই টি কনসালটেন্সি ফার্মে খুবই উঁচু পোস্টে যে আছে খোকা সে-জানাটা নিশ্চয়ই ভুল নয় তার। প্রবেশন পিরিয়ড শেষ হওয়ার এক বছরের মাথাতেই কোম্পানি ওর কাজের নিষ্ঠা, আর তৎপরতায় খুশি হয়ে ওকে একটা প্রজেক্ট টীমের লীডার করে পাঠিয়ে দিয়েছিল সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুর গভর্নমেন্টেরই একটা টাউন প্লানিংয়ের প্রজেক্ট। দুবছর ছিল সেখানে জয়। সেখান থেকেই ফিরে এসেই যেন আলাদা একজন মানুষ সে। গম্ভীর, স্বল্পভাষী। মানস বেশ অবাক হয়ে দেখে চোখের চাউনিও খোকার কেমন যেন পাল্টে গেছে। আগে কেমন একটা অস্থিরতা ছিল দৃষ্টিতে এখন তা যেন স্থির নিবদ্ধ সামনের কোনো অদৃশ্য লক্ষ্যের দিকে। নিজের ছেলেকে নিজেই বুঝে উঠতে পারে না মানস। শুধু একটা জিনিস বোঝে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো তুচ্ছ একটা জীবন কাটাতে চায় না খোকা। এতদিন ধরে যা সে শিখেছে তা সে কাজে লাগাতে চায়। সে বড় হতে চায়, উন্নতি করতে চায় জীবনে।

সারাজীবন ধরে গোপন একরকমের হীনমন্যতায় ভুগে আসা মফস্বল স্কুলের সামান্য বাংলা টিচার মানস ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে খুব সূক্ষ্ম একটা কৃতার্থতা যে অনুভব করে না এমন নয়। অনুভব করবেই বা না কেন? সে আর লতা দুজনে মিলেই তো সন্তানের বুকে রোপণ করে দিতে সক্ষম হয়েছে এই উচ্চাশার বীজ। ছোটবেলায় ঘাড় নিচু করে কেমন মাটির দিকে মুখ রেখে হাঁটার অভ্যাস ছিল খোকার। কে জি স্কুলে নিয়ে যাওয়ার পথে ধমকাতো লতা—ও আবার কীরকম হাঁটা তোমার খোকা? মাথা নিচু করে থাকলে কেউ বড় হতে পারে? তোলো, উঁচু করো মাথা। মনে রেখো তোমাকে বড় হতে হবে। আর যেন কখনো এভাবে হাঁটতে না দেখি তোমাকে। সবাই তো মাথা তুলে তোমার দিকে তাকাবে।

কদমগাছের ছায়ায় যে-সব মায়েরা বসে থাকত তাদের নিজের নিজের ছেলেদের বড় হওয়াটা দেখতে তাদের কজন বড় হয়েছে জানে না মানস কিন্তু খোকার মতো বড় কি কেউ হয়েছে? এত বড় যে বাবা হয়েও ছেলের কোনো কিছুই আর ধই করতে পারে না মানস। নিজের ছেলেকে প্রায় একটা অচেনা দেশের মতোই মনে হয়, মানসের।

বইয়ে পড়া সিনেমায় দেখা প্রায় ইন্দ্রপুরীর মতোই আলোকিত সুখী এক নগররাষ্ট্রে দু বছর কাটিয়ে দেশে ফিরে আসা জয়ের মুখের দিকে কিছুটা গর্ব আর কিছুটা কুণ্ঠার সঙ্গে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে মানস—খোকা, তোদের কাজের নেচারটা ঠিক কী রে? এখনো ঠিক বুঝলাম না।

খাটের উপর একটা ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করছিল জয়। সারাদিন এটা নিয়েই থাকে সে। কী বোর্ডের চাবি টিপতে টিপতে গম্ভীরভাবে বলে জয়—বললে বুঝবে কিছু তুমি? একটা সফটওয়্যার ডিজাইন করছিলাম আমরা সিঙ্গাপুরের ট্রানস্পোর্ট সিস্টেমের ব্যাপারে, যেভাবে শহরের পপুলেশন, ভেহিকলস্ বাড়ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নতুন নতুন ফ্লাইওভার কীভাবে ডিজাইন করতে হবে, কীভাবে মিনিমাম সময়ে ম্যাক্সিমাম গাড়ি পাস করানো যায় তার একটা ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড যাতে ট্রাফিক জ্যামের সময় মিনিমাইজ করা যায়—এক এক মিনিট ট্রাফিক জ্যামের জন্য কত কোটি কোটি টাকা জাতীয় আয়ের ক্ষতি....

মানস আর যেন কিছুই শুনছে না। এসব তার জ্ঞান বুদ্ধির অনেক বাইরের জিনিস। সে শুধু খানিকটা অবাক হয়েই তাকিয়ে থাকে ছেলের মুখের দিকে। সূক্ষ্ম সেই হীনমন্যতা বোধহয় যেন ফিরে আসে আবার। কী উন্নতি করেছে মানুষ। কী বিশাল তার জ্ঞান আর কাজের জগৎটা। অথচ সে নিজে কী করল? সারাজীবন শুধু কিছু অনিচ্ছুক ছাত্রের কাছে বকবক করে বাংলা কবিতার ব্যাখ্যা আর টীকা আউড়ে গেল। কার কী লাভ হল এতে? কে জানে? এই যে বিপুল উন্নতি করেছে মানুষ তাতে তার অবদান কতটুকু? শূন্য?

ল্যাপটপ বন্ধ করে জয় দরজার দিকে পা বাড়ায়। —মা, এই মাত্র অফিস থেকে ফোন এসেছে—আমি যাচ্ছি বাইরে কোথাও খেয়ে নেব—

লতা বলে—এক্ষুনি অফিসে যাবি, বলিস নি তো, বকফুল ভাজা ভালোবাসিস বলে উনি আজ অনেক খুঁজে বাজার থেকে বকফুল নিয়ে এসেছেন—গরম গরম ভেজে দিচ্ছি—তাই অন্তত খেয়ে যা।

দরজার দিকে হাঁটতে হাঁটতে খানিকটা রুক্ষ অপ্রসন্ন গলায় বলে জয়—কতবার বলেছি তোমাকে মা এরকম আদিখ্যেতা করবে না—অফিসের জরুরি কাজ ফেলে রেখে এখন আমি বকফুল ভাজা খেতে বসব? আমাকে কী ভেবেছ? কেরানি? যখন তখন অফিসে গেলেই হল?

—আহা রাগ করিস কেন? বেশ, কখন ফিরবি বল—তখনই না হয় ভেজে দেব গরম গরম।

—কতবার বলিনি তোমাকে ফেরাটা আমাদের হাতে নেই, বলে বলে তোমাদের আর পারা গেল না। কিছুতেই আমাদের কাজের গুরুত্বটা বুঝতে চাও না তোমরা।

জয় চলে গেলে লতা বলে—কী কাজ বুঝি না বাপু, দিনরাত কানে একটা ফোন লাগিয়ে বসে আছে—যত কথা ফোনের সঙ্গে—ঘরের মানুষগুলি যেন কেউ নয়।

মানস শান্তভাবে হেসে বলে—চাকরিতে উন্নতি করতে গেলে তো চাকরির শর্তগুলি মানতেই হবে লতা, না মানলে তোমার ছেলে আজ উঠতে পারত এখানে? বলো তো কোথায় উঠেছে ও।

লতা হঠাৎ মুহূর্তে গলা পালটে কেমন আদুরে খুশি খুশি গলায় বলে—খোকা খুব বড় চাকরি করে তাই না গো? কত মাইনে পায় বলো তো? সেদিন জিজ্ঞেস করছিল একজন—আমি তো বলতে পারি নি।

মানসও সত্যই ঠিক জানে না, কত মাইনে পায় জয়। সঙ্কোচবশত এ কথা কোনোদিনও জিজ্ঞেসও করতে পারেনি তাকে। ছেলে বড় হয়ে গেলে সব কথা কি আর তাকে জিজ্ঞেস করা চলে?

তবে সিঙ্গাপুর থেকে কোম্পানি ওকে বছর দুয়েকের জন্য ঘুরিয়ে আনলেও মাইনে দেওয়ার বেলায় নাকি উপুড়-হস্ত নয় তাই জয় অন্য কোম্পানিতে মাঝে মাঝেই পার্সোন্যাল রিজিউম পাঠায় চাকরির জন্য। অসতর্কতাবশত তারই একটি টেবিলে ফেলে রাখায় চোখ পড়ে গিয়েছিল মানসের। আর প্রায় চমকেই উঠেছিল সে। প্রেজেন্ট স্যালারির জায়গায় লেখা—চল্লিশ হাজার। সত্যি এত টাকা পায় খোকা নাকি বাড়িয়ে লিখেছে নিজের দর বাড়াবার জন্য। কিন্তু তবুও একটা বিশ্বাসযোগ্যতা তো থাকবেই। সবাই না পাক কেউ কেউ তাহলে এত টাকা মাইনে পাচ্ছে আজকাল—চ-ল্লি-শ হা-জা-র? এই বয়সে? আবার বুকের মধ্যে সেই সূক্ষ্ম গর্ব, পাশাপাশি হীনমন্যতার সেই অদ্ভুত অনুভূতি।

মনে পড়ল চল্লিশ বছর আগেকার কথা। স্কুলে যখন অ্যাসিট্যান্ট টিচার পোস্টে ঢুকল—মাইনে পেত সাকুল্যে দুশো পঞ্চান্ন টাকা। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে নিজেকে মনে হয়েছিল যেন আকবর বাদশা। সমস্ত পৃথিবীটা যেন কিনে নিতে পারে। চা সিঙাড়া খাইয়ে দিয়েছিল সবাইকে—স্কুলের দপ্তরী থেকে শুরু করে হেড মাস্টার অবধি। তা তার ছেলে এখন প্রায় দেড়শো গুণ মাইনে পায় তার। এত বিপুল উন্নতি হয়েছে তাহলে চারপাশের এই পৃথিবীটার? অথচ মানস কেন এখনও তা ঠিক স্পষ্টভাবে উপলব্ধিই করতে পারে না!? কেন এত পিছিয়ে আছে সে?

কথাটা ঠারেঠোরে একবার সে জিজ্ঞাস করেছিল জয়কে—আজকাল ঢুকেই সব তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে নাকি রে খোকা?

জয় একটু বিরক্ত হয়েই বলেছিল—সবাই পাবে কেন? যাদের শিক্ষা আর যোগ্যতা আছে তারা অনেকেই পাচ্ছে—আর পাবেই বা না কেন বলো তো—ইকোনমিক গ্রোথের সঙ্গে সঙ্গে মাইনে বাড়বে না? আমরা চিরকাল তিনশো চারশোতেই পড়ে থাকব নাকি? সভ্য মানুষ আর হব না?

অন্ধকারে দমচাপা শারীরিক কষ্টটা হয় বলে একটা মোম জ্বালিয়ে দিয়েছে ঘরে লতা। এই আলো কোনো কিছু দেখার জন্য ততটা নয় যতটা শুধু আলো আছে এই নিশ্চয়তাটাই

মনের মধ্যে অনুভব করার জন্যই শুধু। মনে পড়ল মানসের সিঙ্গাপুর থেকে যখন ফিরে এল জয় তখনো বীরপুরের ভিতরে আলো আসে নি। অনেক দূরে রাস্তার মাথায় শেষ খুঁটি বসেছে। রাতে দূর থেকে তারও একটু আলোর আভা দেখা যেত মাত্র। অনেক দূরের আকাশ একটু আলোকিত হয়ে থাকত শুধু।

জয় বলেছিল—বাবাঃ, কী যে ভূতুড়ে অন্ধকার এদেশে—সিঙ্গাপুর থেকে না ফিরে এলে বোধহয় বুঝতাম না। ভাবতাম বেশ আলোতেই আছি।

মানস মিনমিন করে বলেছিল—কিন্তু এটা তো মফস্বল রে খোকা—

জয় বলে—হ্যাঁ সমস্ত দেশটাই তো মফস্বল হয়ে আছে—কলকাতাও তো আসলে একটা বড় গ্রামই বাবা—অন্য দেশের শহরের তুলনায় একে শহর বলা চলে?

অজ্ঞতা না প্রকাশ পায় তাই মানস একরকম ভয়ে ভয়েই বলে—সিঙ্গাপুরে বুঝি অন্ধকার নেই খোকা?

—না, অন্ধকার পাবে না তুমি সেখানে, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, শপিং মলের ঝকঝকে আলোর, আকাশের অন্ধকার অবধি অনেকদূর অবধি লাল হয়ে থাকে।

অন্ধকারে কেমন একটা শারীরিক মানসিক অস্বস্তি হয় মানসের। জয়ের বর্ণনায় এক লহমায় যেন একটা আলোকিত নগরীর ছবি ভেসে ওঠে চোখের উপরে। কত সভ্য উন্নত সেই পৃথিবী—যেখানে কোনো অন্ধকার নেই।

মানস বলে—এখানেও এত অন্ধকার থাকবে না রে খোকা, আমরা চেষ্টা করছি যাতে এ অঞ্চলটাও মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে চলে আসে। তখন দ্রুত ডেভেলপমেন্ট হবে এসব জায়গায়।

জয় বলে—আমি তো আর এখানে থাকছি না, আমি ভুবনেশ্বর চলে যাচ্ছি সামনের মাসেই।

তা জয় ভুবনেশ্বর চলে যাওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই সত্যি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে চলে এল বীরপুর। বাঁশবন আমবাগান ভর্তি অন্ধকার কাটা পড়ল....বিদ্যুতের লাইন চলে এল সব জায়গায়.....বছর খানেক ঘুরতে না ঘুরতেই খোয়া গলি পড়তে লাগল রাস্তার পাশে, দেখতে দেখতে মাথা তুলতে লাগল একটা দুটো ফ্ল্যাটবাড়িও।

চিঠি লেখার অভ্যাস একেবারেই নেই মানসের। জয় সিঙ্গাপুরে থাকতে লতাই মাঝে মাঝে চিঠি লিখত তাকে। কিন্তু বাংলার টিচার মানস রায় কয়দিন পর যে নিজের সন্তান জয়কে বাংলায় চিঠি লেখবার লোভ আর সম্বরণ করতে পারে না। নিকষ অন্ধকারে এই আলো আসার আনন্দ চিঠির ভাষা ছাড়া আর কীসেতেই বা ব্যক্ত করা যায়?

কল্যাণীয়েষু,

......যদি পারো ছুটি নিয়ে একবার এসে দেখে যেও বীরপুরের সেই অন্ধকার এখন যেন বিগত দিনের কোনো দুঃস্বপ্নের মতো......রাস্তায় জোরালো ভেপার ল্যাম্প, বাড়িতে বাড়িতে আলো, আকাশের তারা ম্লান সেই আলোয়, মাঝে মাঝে হয়তো কল্পনা করেও নেওয়া যায় আমরা সিঙ্গাপুরেই আছি.....

লতা বলে—কী ভাবছ বসে অন্ধকারে? খোকার ফোন তো এল না এখনো। হ্যাঁ গো, নন্দীগ্রামে সত্যি কিছু ঘটল নাকি? খোকা তো হলদিয়া থেকে মাঝে মাঝেই যায় নন্দীগ্রামে—

মানস বলে—ধ্যুৎ, নন্দীগ্রামে কী আর হবে? কাগজ বিক্রি করার জন্য মিডিয়া এসব খবর ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ছাপছে এখন। চ্যানেলগুলোও তাই করছে। আর যেন কোনো খবর নেই কোথাও।

লতা বলে—জানো, বাঁধের উপর সেই ডাঁ্যাপোল গাছটা আর আরতি বেরা, বলে আমার সেই বন্ধুটাকে আবার কালকেও স্বপ্ন দেখলাম। পাকা ফলে হলুদ হয়ে আছে গাছটা। আমরা ডাঁ্যাপোল কুড়ুচ্ছি। কালো ডেও পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফলগুলির গায়ে।

নন্দীগ্রামের নাম যখন সবে উঠতে শুরু করেছে খবরের কাগজের পাতায়। তখন থেকেই নন্দীগ্রামের কথা বলতে শুরু করেছে লতা। নন্দীগ্রামের কথা আগেও অবশ্য লতার কাছে শুনেছে কয়েকবার মানস, ক্লাস সিক্সে পড়ে যখন লতা তখন ওর বাবা কয়েকবছরের জন্য বদলি হয়ে গিয়েছিলেন নন্দীগ্রাম বিডিও অফিসে। আরতি বেরা বলে ওখানকার একটি মেয়ের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়েছিল খুব। আরতিই ওকে প্রথম ডাঁ্যাপোল ফল আর তার গাছ চিনিয়েছিল। স্কুল ছুটির পর ওরা দুজনে কত ডাঁ্যাপোল কুড়োতো। এতদিন পরও সে কথা মনে আছে লতার। মনে পড়ে লাল ডোরাকাটা একটা ফ্রক পরত আরতি। লম্বা চুলের বিনুনি ছিল। পা দুটোও ছিল ডাঁ্যাপোলের মতো হলুদ। হঠাৎ এতদিন পর ভুলে যাওয়া সেইসব ছবিগুলি মনে পড়তে শুরু করেছে কেন লতার কে জানে।

কিন্তু আলো বোধহয় সত্যি আজ আর এল না। ঝড়ের কোনও নয়। একটা কয়েকঘণ্টার ঝড় তাদের এমন অন্ধকারেই কেন নিক্ষেপ করল যে-অন্ধকার কতদিন হল তো পেরিয়ে এসেছে ওরা। মানস বসে থাকে। আর অপেক্ষা করে কখন আসবে আলো যে-আলো ছাড়া সত্যই বেঁচে থাকতে পারে না সভ্য মানুষ। যে-আলো না থাকলে ভয় করে বড় মানসের। অন্ধকারের ভয়। মনে হয় যেন আলো সত্যই আর আসবে না।

ঘুম ভেঙে গেল চোখে জোরালো আলোর আঘাত লেগে। ধড়মড় করে উঠে বসে মানস। সারারাত কাল সে এক আলোর ঝলমল না-দেখা সিঙ্গাপুরের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু এ তো সিঙ্গাপুরের রাতের আলো নয়, বীরপুরের সকালের হলুদ আলো ঝকঝক করছে পাশের সাদা ফ্ল্যাটবাড়ির গায়ে। নিচে টিভিতে অনেক মানুষের উত্তেজিত গলার আওয়াজ। রাতেই কারেন্ট এসে গেছে তাহলে? কিন্তু এত শব্দ কীসের?

লতা দুদ্দাড় সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে। হাঁপাচ্ছে।

—ফোন পেলে খোকার?

—না। সুইচ অফ করে রেখেছে। নিচে কীসের গণ্ডগোল বলো তো।

—দ্যাখো এসে। কী কাণ্ড হচ্ছে। পুলিশ কী মারছে গ্রামের লোকগুলিকে। গুলি খেয়ে পড়ে গেছে একটা লোক—তাকে যে-বৌটা তুলতে গেছে তাকেই লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে পুলিশ। লোকজন যে টিভিতে দেখছে সে হুঁশও নেই ওদের।

ঘটনার নিষ্ঠুর আকস্মিকতায় গলার স্বর কাঁপছে লতার।

গণ্ডগোল থামে নি তাহলে? খোকা কি সত্যি এই গণ্ডগোলেই পড়ল তাহলে? দ্রুত নিচে নেমে আসে মানস। টিভির ঘরে ভিড়। অনেকেরই কেবল লাইন বন্ধে ছিঁড়ে গেছে বলে তারাও এসে জড়ো হয়েছে ওদের টিভির সামনে। হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সবাই টিভির স্ক্রীনের উপরে যেন কোনো রোমাঞ্চকর সিনেমার দৃশ্য দেখছে। লাঠি হাতে সার দিয়ে দাঁড়ানো মেয়ে বৌরা। পিছনে কী মরকত সবুজ গাছগাছালি, খেত-খামারি, বাঁধের পাশ দিয়ে লাল মেঠো রাস্তা ঢুকে গেছে গ্রামের ভিতরে। মানস দ্যাখে হাঁ করে কী যেন দেখছে লতা। কী দেখছে? নন্দীগ্রাম? শৈশবের লুপ্ত হয়ে যাওয়া এক গ্রাম?

মানসের হাত ছুঁয়ে হঠাৎ ফিসফিস্ করে বলে লতা—দ্যাখো দ্যাখো ওই সেই বাঁধটা গো যার উপর দিয়ে আমি আর আরতি হেঁটে যেতাম। ওই বোধহয় সেই ড্যাংপোল গাছটা গো।

মানস চুপ করে থাকে। জানে এটা লতার এক ধরনের অদ্ভুত অবসেশন। সব কিছুতেই নিজেকে প্রতিস্থাপন করা। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগের একটা ড্যাংপোল গাছও সে চিনে বসে আছে স্বপ্নে।

হঠাৎ একটা হৈ হৈ শব্দ। মানস দ্যাখে লাঠি আর উদ্যত বন্দুক হাতে ছুটে যাচ্ছে এক দঙ্গল পুলিশ সামনে। আচমকা গুলি ছোঁড়ার কেমন ভোঁতা একটা আওয়াজ—স্ক্রীনের ডানদিকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে নীল রংয়ের ধোঁয়া—ডানদিকে বাঁধের পারে যেখানে গাছটা দাঁড়িয়ে সেখানে ধপ্ করে পড়ে গেল একটা রোগা, গেঞ্জি আর প্যান্ট পরা লোক উপুড় হয়ে—পাগলের মতো ছুটে যাচ্ছে কিছু পুলিশ, পড়ে থাকা লোকটার দিকে হাতের লাঠি আর বন্দুক উঁচিয়ে।

পাশের বাড়ির ছেলে পুষণ খুবই ব্রাইট ছাত্র এ-অঞ্চলের। কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে থার্ড ইয়ারে পড়ছে বি ই কলেজে। টিভির সামনে স্থির হয়ে বসে সে দেখছিল আর সবার মতোই। কিন্তু আর সবার চোখেমুখে যেমন একটা উৎকণ্ঠা, উত্তেজক কৌতূহল, ঘটনা কোনদিকে গড়ায় তা জানার একটা উদগ্র শিশুসুলভ আগ্রহ—পুষনের তা না। পুষণ এসব সাধারণ মানুষদের চেয়ে বুদ্ধি আর শিক্ষাদীক্ষায় অনেকটাই উন্নত। ঠান্ডা নিষ্কম্প দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিল টিভির দিকে। হঠাৎ এতক্ষণে যেন একটা শারীরিক উত্তেজনায় লাফিয়ে ওঠে পুষণ—এসব কী পাগলামির ব্যাপার হচ্ছে বলুন তো কাকু—কী চাইছে এরা? ছেলেখেলা পেয়েছে সব?

ওর প্রশ্নটা সঠিক বুঝতে না পেরে ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাবে পুষণ তখন লতা প্রায় চিৎকার করে ওঠে—দ্যাখো, দ্যাখো বৌটার চুলের মুঠি ধরে কীভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মাটির উপর দিয়ে—বুঝলে ও হয়তো তাহলে সেই আরতি—খুব বড় বড় চুল ছিল ওর।

মানস বলে—কী আশ্চর্য। নন্দীগ্রামে কি তোমার আরতি ছাড়া আর কোনো মেয়ে নেই? একটু চুপ করো তুমি। নন্দীগ্রাম একটা ছোটো জায়গা নাকি?

দৃশ্যটা আর একবার ক্লোজ শটে দেখায় টিভিতে। একটা শব্দ নীল ধোঁয়া....পড়ে গেল একটা মানুষ.....পা ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ.....

হঠাৎ ঘরের কোণে রাখা ফোনটা তীব্র শব্দে বেজে ওঠে।

—ধরো ধরো....খোকা নিশ্চয়ই....লতা প্রায় পাগলের মতো করে।

জয়ই। ওপাশ থেকে জয়ের ক্লান্ত বিরক্ত কণ্ঠস্বর.....কাল থেকে ফোন করে যাচ্ছ কেন তোমরা বলো তো? আমি এখন হলদিয়ায়—অত্যন্ত জরুরি মিটিং চলছে দুদিন ধরে কোম্পানির, তাই মোবাইলের সুইচ অফ ছিল। কোম্পানির নির্দেশ ছিল তাই। একজনের ফোন বেজে উঠেছিল বলে তাকে শোকজ করা হয়েছে। যাক্ কী হয়েছে বলো।

মিনমিন করে বলে মানস—হলদিয়ায় তুই? তোর মা পাগলের মতো ছটফট্ করছে এদিকে টিভি দেখে—নন্দীগ্রামে কী হচ্ছে ঠিক জানাতে পারিস—

তিক্ত গলায় বলে দেয়—কেন? টিভি দেখে বুঝতে পারছ না? বিপ্লব হচ্ছে। আগে রাজনৈতিক নেতারা করত এখন পাবলিক করছে। কলকারখানা বাড়িঘর, শপিং মল, রাস্তাঘাট কোনো কিছুরই দরকার নেই আমাদের, আমরা শুধু বিপ্লব করব। এইটুকু একটা দেশ সিঙ্গাপুর আলো দিয়ে মুড়ে দিতে পারল ওরা নিজেদের শুধুমাত্র ট্রেডিং করে আর আমরা ঠিক করেছি অন্ধকারেই পড়ে থাকব গুহামানুষের মতো। উন্নতির তো আর দরকার নেই আমাদের।

তীব্র ব্যঙ্গের কণ্ঠস্বর জয়ের। হঠাৎ কেমন হতাশার খাদে নেমে যায়—নন্দীগ্রামের এই প্রজেক্টটা হলে আমাদের কোম্পানি প্রায় কয়েক কোটি টাকার একটা কনসালটেন্সির কাজ পেত—গেল সেই কাজটা। আমি ছেড়ে দিচ্ছি বাবা—ভালো লাগছে না।

মানস বলে—ছেড়ে দিবি কী? তোর মার সঙ্গে একটু কথা বল।

লতা ছুটে গিয়ে ফোনটা ধরে কেমন অবুঝ শিশুর মতো গলায় কাঁদতে থাকে—খোকা তোদের যন্ত্রে তো সব কিছুরই ছবি পাওয়া যায়—টিভি দেখছি তো—বাঁধের গায়ে একটা গাছের নিচে পড়ে গেল একজন লোক গুলি খেয়ে ওটা কী গাছ তুই বলে দিতে পারবি খোকা—হ্যালো—তুই শুনছিস বাবা—হ্যালো—মনে পড়ে ছোটোবেলা তোকে আমি একটা ড্যাপোল গাছের গল্প করতাম—

এমন পাগলের মতো করে লতা যে মানস তাকে বারণ করতেও ভুলে যায়। মানসের মনে পড়ে যায় অফিস থেকে যেদিন প্রথম ল্যাপটপটা বাড়ি নিয়ে এসেছিল মানস সেদিন মজা করে কীবোর্ড টিপে টিপে ল্যাপটপের স্ক্রীনে একটা অদ্ভুত দৃশ্য তুলে নিয়ে এসেছিল—বীরপুরে ওদের বাড়ি, বাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তা, রাস্তার বাঁকে একটা গাছ তার পাশেই একটা ফ্ল্যাট সবসুদ্ধু সিনেমার ছবির মতো ফুটে উঠেছে স্ক্রীনে। মানস ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল। জয় গম্ভীর হয়ে বলেছিল—সব স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কে নাসা-র তোলা ছবি বাবা। পৃথিবীর যে-কোনো জায়গার ছবি এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেকনোলজিক্যাল উন্নতি ওদের কতদূর হয়েছে বুঝতে পারছ? বীরপুরের এই অন্ধকারে পড়ে থেকে আমরা এর কীই বা বুঝতে পারব? পৃথিবীর সব কিছু ওরা এখন নখের ডগায় দেখতে পায়।

না, কিছুই বোঝে না মানস। পৃথিবী কোথায় যে এগিয়ে যাচ্ছে তার কোনো কিছুরই ই পাচ্ছে না সে। বড্ড পুরানো বাতিল হয়ে গেছে যেন সে এই পৃথিবীর পক্ষে।

লতা পাগলের মতো বলছে—খোকা, তোর সেই যন্ত্রে ড্যাপোল পাছের ছবি আসবে বাবা?

মানস ধমকে বলতে যাবে—কী পাগলামি করছ তুমি লতা? কিন্তু তা আগেই ওপার থেকে জয়ের প্রায় ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা যায়—এর জন্য তোমরা আমাকে ফোন করছিলে ? তোমাদের মাথাটাথা কি সব খারাপ হয়ে গেছে? জরুরি মিটিং আছে আমাদের ছেড়ে ছি। ফোনের সুইচ অফ থাকবে আমার।

ফোন ছেড়ে দেয় জয় আর তখনি ছবিটা আর একবার রিপ্লে করে টিভির স্ক্রীনে। ার এই প্রথমবার যেন দৃশ্যটা ঠিকমতো দেখল মানস আর এই প্রথমবার একটা হিমস্রোত য়ে যায় তার মেরুদণ্ড বেয়ে। ছুটতে ছুটতে উপুড় হয়ে লোকটা পড়ে গেল মাটির উপরে পাশে ডানার মতো হাত দুটো ছড়িয়ে। সত্যি কি একটা মৃত্যুদৃশ্য দেখছে সে চোখের ামনে? সত্যি কি একটা লোক মারা যাচ্ছে তার চোখের সামনে? নাকি এখনো—এখনো ন্তত বেঁচে আছে সে? হাতের আঙুলগুলো কি নড়ছে? বুঝতে পারে না মানস। কিন্তু তো নিছক মৃত্যু নয়— এ তো হত্যা। চোখের সামনে তাহলে সে যেটা দেখল সেটা কটা হত্যাদৃশ্য। এও কি তাহলে সম্ভব? সবার চোখের সামনে একটা হত্যা।

আর কোনো কিছু করতে না পেরে পূষণকেই সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করে মানস—ষণ, মারা গেছে লোকটা? দ্যাখ তো হাতের আঙুলগুলি কি নড়ছে? আমি ঠিক বুঝতে ারছি না রে। পাওয়ারটা গণ্ডগোল করছে বড্ড—

কেমন তাপউত্তাপহীন গলায় বলে পূষণ—জানি না কাকু, কিন্তু কেমিক্যাল হাবটা ন্ধ করে দিয়ে কার কী লাভ হবে বলো তো—

পূষণের ঝকঝকে উজ্জ্বল চোখের কোণে কেমন একটা ক্ষমাহীন কাঠিন্য ঝিলিক দিয়ে ঠল বলে যেন মনে হয় মানসের। কিন্তু পূষণ আর জয়ের মুখভঙ্গি একই রকম মনে চ্ছে কেন? মানস যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

লতা হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে— দ্যাখো, এখনো মরেনি গো লোকটা। ঠোঁট নড়ছে। ষ্ট তাকে টেনে নিয়ে গেল গো—জল চাইছে গো জল চাইছে। মরার সময় জলতেষ্টা ায় মানুষের তাই না গো? একটু জল দিল না গো কেউ ওকে।

লতা প্রায় অবুঝ শিশুর মতো আচরণ করতে থাকে। একই কথা বলতে থাকে বারবার।

ন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সারাদিন ধরেই টিভির পৌনঃপুনিক আর্তনাদ আক্রমণ আর ক্তপাতের দৃশ্য। টিভি একসময়ে বন্ধ করে দোতলার বারান্দায় এসে চুপচাপ বসে মানস।

চারদিকে এখন চারতলা পাঁচতলা সব ঝকঝকে ফ্ল্যাটে আলো জ্বলে উঠেছে। কত ন্নতি হয়েছে এসব জায়গার। উন্নতি মানেই তো আলো। মাঝে মাঝে সত্যিই যেন মনে য় বীরপুর নয়, সিঙ্গাপুরেই বসে নেই তো সে। সব বাড়িতে আলো জ্বলে উঠলে এখানেও নে হয় আকাশের অন্ধকার বোধহয় আর নেই। সেখানেও যেন তৈরি হচ্ছে এক ালোকিত স্বপ্নের নগরী।

লতাও কখন চুপচাপ উঠে এসে বারান্দার এক কোণে এসে বসে ছিল টের প
নি মানস। হঠাৎ লতা আবার শিশুর মতোই বলে ওঠে—লোকটা যে মরার আ
শেষবারের মতো জল চাইল তাও খোকার এই যত্নে উঠে গেছে তাই না গো? ও-ক
নাকি সব উঠে যায়। কিন্তু খোকা কেন কিছু বলল না গো?

বিড়বিড় করে মানস, হয়তো লতার এই ছেলেমানুষি প্রশ্নের কিছু একটা উত্তর দি
যাচ্ছিল তার আগেই হঠাৎ আবার লোডশেডিং। চরাচরব্যাপী আবার সেই অন্ধকার। কি
আজ তো আর কোনো ভয় নেই। আজ তো জেনারেটর আছে। লতা আস্তে উ
জেনারেটরের লাইনটা দিতে যাবে মানস ওর হাত ছুঁয়ে যেন গভীর কোনো গুহার অ
খাদ থেকে বলে ওঠে—থাক, আজ অন্তত আলো থাক লতা—

—কেন গো?

—এই আলোয় যে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না—

—কিন্তু অন্ধকারে যে তোমার বড় ভয়—

—না অন্ধকারে আর আমার ভয় নেই কোনো—অন্ধকার আর কী ভয় দেখাবে

লতা কোনো কথা না বলে মেঝেতে নিঃশব্দে বসে পড়ে মানসের হাতে ওর হ
গুঁজে দেয়।

তারপর মাতৃগর্ভের মতো আদিম এক অন্ধকারে যেন চুপচাপ বসে থাকে দুজন
বসেই থাকে। নতুন জন্ম নিতে থাকা কোনো ভ্রূণের মতোই যেন।

# আমার কথা, আমাদের কথা

## মলয় দাশগুপ্ত

### আমার বাবা

এখন মাঝেমাঝেই মরণের হাতছানি দেখতে পাই। নির্জন বাড়িটায়, নির্জন অন্ধকার ঘরে চোখে ঘুম না এলে মৃত্যুভয় চলে আসে। এসব সময়ে আমি স্পষ্ট আমার বাবাকে দেখতে পাই। ছায়াছায়া ভাবে বাবার উপস্থিতি আমার সকল ভয় দূর করে দেয়। অথচ আমি বাবার বখে যাওয়া ছেলে, বাবার মাথা উঁচু করার বদলে বাবাকে মুখ নিচু করে চলতে বাধ্য করেছি। এখন অনুতাপ হয়, মনে হয় সারা জীবন যে পাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে বাবার সামনে হেঁটমুণ্ডে দাঁড়াতে পারলে ভাল হতো।

আমার সেই বাবার কথা দিয়েই আমাদের কথা শুরু করি।

বাবা ছিল লম্বা, মজবুত চেহারা আর একরোখা দৃঢ় মনের মানুষ। সাধারণ ছা-পোষা আর পাঁচটা বাঙালির থেকে একটু আলাদা। অথচ বাবা ছা-পোষাই ছিল। আমরা আট ভাই, কোনও বোন নেই, ছিলই না। বাবার উপার্জনও ছিল সাধারণ মধ্যবিত্তের মতই। ডাক বিভাগের কেরানি, শেষ জীবনে সাব-পোস্ট অফিসের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। লোকে পোস্টমাস্টার বলে ডাকত, বাবা জানতেন তিনি আদৌ-পোস্টমাস্টার নন। অস্বস্তিবোধ করতেন। পরপর আটটি ছেলের জন্ম দিতে মায়েদের যে ধকল পোয়াতে হয় মাকে শারীরিক আর মানসিকভাবে সে ধকল পোয়াতে হয়েছে। গ্রামের মেয়ে আমার মায়ের শরীরের গঠন ছিল ভাল, গড়নও অনেককে টেক্কা দেওয়ার মতই। দেহগতভাবে মা একেবারে বাবার বিপরীত ছিল। বাবার রঙ মন-কালো তো মা বেশ ফর্সা, বাবা লম্বা একহারা তো মা বেঁটে মোটাসোটা। অথচ আনন্দে আমরা আট ভাই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম। মায়ের চেহারা আর গঠনের সঙ্গে আমার আর বড়দার অসম্ভব মিল, মেজদা আর একেবারে ছোট কুটু বাবার মত, অন্য চার ভাইকে এক কথায় মিশেল বলা যেতে পারে। কেন এমন হয়, বাবা-মা কেন এমন ভাবে আমাদের মধ্যে নিজেদের ভাগ করে নিয়েছে তা বোঝার মত বিদ্যে-বুদ্ধি আমার নেই। দাদা বেঁচে থাকলে ওকে উস্কে দিয়ে কিছু জানা যেত হয়তো। দাদা আমার মস্ত পণ্ডিত, দেশের মুখ উজ্জ্বল করা বিদ্বান, আমেরিকায় কাটিয়ে আসা ডক্টর-অধ্যাপক।

বলছি তো বাবার বিষয়ে, আট ছেলের মধ্যে তার ভাগ হয়ে যাওয়াটা এলো কোত্থেকে। এসে যখন পড়েছে আসুক, আবার বাবাকে ধরা যাক। আমার বাবা খুব খাটতে পারত। প্রথম জীবনে লেখা-পড়ার সঙ্গে ক্ষেতের কাজও করেছে। কথা কইতে ভালবাসত বাবা, হাতের পাঞ্জা দেখিয়ে বলত, এই হাতে নাঙল ধরেছি। ছেলে চাষি বললে বাবা খুবই খুশি হতো। বিড়ি-সিগ্রেট খেতনা, পান খেত, পানের ডিবে নিয়ে অফিসে যেত বাবা। আমরা যখন শোভাবাজারে ছিলুম তখন বাবা পাড়ার সমবয়সীদের সঙ্গে আড্ডা

দিত, সুযোগ পেলে মোহনবাগানের খেলা দেখে হৈ হৈ করত, আর তারই সঙ্গে ঘরে কাজে মাকে সাহায্য করত। ভাবুন পরপর জন্মানো আট আটটা ছেলে সামলানো যে চাট্টিখানি কথা নয়, যতই হেল্পিং-হ্যান্ড থাকুক না কেন। বাবা মায়ের দুঃখটা বুঝতো যতটা পারত নিজের হাতে কাজ করত। সে কাজের অভ্যাস বুড়ো বয়স অবধিও বজায় ছিল তার।

আমাদের দেশ-বাড়ি বর্ধমান জেলার শক্তিনগর, বহড়ু ছাড়িয়েও অনেকটা যেতে হয় আমার সেজদা অসিতাভ পর্যন্ত দাদাদের জন্ম ওখানেই। আমি জন্মেছি কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে। আমি বাবার চৌথা সন্তান। যে কোনও কারণেই হোক বাবার আর দেশের বাড়িতে থাকা সম্ভব হয়নি। জমিজমা, শরিকী, বাবার বদলির চাকরি এসবই দেশ ছাড়ার কারণ হতে পারে। বিষয়টা কোনোদিনই আমাদের কাছে স্পষ্ট ছিল না, আজও স্পষ্ট নেই। আমাদের ভাইদের কাছে দেশের বাড়িটা ক্রমশ একটা স্বপ্নপুরী হয়ে রয়েছে যে বাবা গল্প করতে খুব ভালবাসতেন তিনিও কোনো সময়ে এ নিয়ে কিছু বলেননি

আমরা যখন বড় হয়ে উঠছি। দাদা প্রেসিডেন্সি থেকে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে, মেজদা কলেজে আর সেজদা স্কুলে ক্লাস নাইন-এ পড়ে আমি পড়ি ক্লাস সিক্স্-এ তখন শোভাবাজারের ভাড়াবাড়ি ছেড়ে বাগুইআটির নিজেদের বাড়িতে উঠে আসা। আট ছেলে আর জনক-জননীতেই আমরা সংখ্যায় দশ, গ্রামের বাড়ি বা গ্রামের মামা বাড়ি থেকে কেউ এলে ঠাসাঠাসি করেও রাত কাটানো যেত না। আমাদের চালান করা হতো পড়শির বাড়ি, পাড়া-কিলিংটা জোরদার ছিল বলে অসুবিধা হতোন ঠিকই, কিন্তু বাসাবাড়িতে থাকার এ গ্লানি বাবা মেনে নিতে পারত না। তাই কুড়িয়ে কাচিয়ে টাকা জোগাড় করে বাবা নিজের বাড়ি তৈরি করল। পরপর সারি দেওয়া ছ'খান শোবার ঘর, মাঝখানে লম্বা-চওড়া উঠোন। তারপর রান্নাঘর, কিছুদূরে পায়খানা, বাঁধানো চাতালে টিউব-ওয়েল, একটা কুয়ো। তখন বাগুইআটি গ্রামই ছিল, দু-চারটি গাছ-গাছালি পেয়েছিল বাবা। শোভাবাজারের পাড়া ছেড়ে আসাতে আমাদের সবারই কষ্ট হয়েছে সবচেয়ে বেশি অসুবিধা ছিল বড় দুই দাদার, আর অবশ্যই বাবার। এখানে এসে বাবা আড্ডা একেবারে বন্ধ, নতুন করে আলাপ করার বয়স বাবা পেরিয়ে এসেছিল। দমদমে সাব-পোস্ট অফিস আর বাড়িই তার সর্বস্ব হয়ে দাঁড়ায়। বাবাকে অনেক কিছু ছাড়তে হয়েছিল তার আট সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবেই।

বাবা বাবার মত করে এই ভবিষ্যৎ ভেবেছিল। পরপর ছ'খানা ঘর ছিল আমাদের আরো দু'খানা করার মত জায়গা ছাড়া ছিল ঘরের লাগোয়া। বাবা কি আট ছেলে জন্য আটখানা ঘরের কথা ভেবেছিল? ভাবনা যাই থাক, লম্বাটে বাড়িটা এলাকায় ব্যারাক বাড়ি নামে পরিচিত হয়ে যায়। আমাদের বাড়িটার পাশেই বড় রাস্তা, রাস্তার দিকে পিছন করে দেয়াল গাঁথা, ভেতর দিকে লম্বাটে ছোট বারান্দা আর সেই বারান্দার দিকে পিছন করে দেয়াল গাঁথা, ভেতর দিকে লম্বাটে ছোট বারান্দা আর সেই বারান্দার দিকে প্রত্যে ঘরের দরজা। ব্যারাক-বাড়ি নামটা কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল কেউ তা জানে না

তবে নামটা যে লাগসই একথা বাবাও মেনে নিয়েছিল। বাইরের আড্ডা না থাকায় নতুন করে সংসারে মন দিতে, সংসারটা সাজাতে সময় পেল বাবা। ঘরদোর সাফসুরত করা, আগাছা জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজটা বাবাই হাতে নিয়ে নেয়। বড় ছেলে তখনই ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট বয়, মেজোও দাদার পিছুপিছু চলতে ভালবাসে। অন্যরা আর কী করবে, ছেলেদের গায়ে আঁচড়টি লাগতে দিত না বাবা। ফলে অফিসের পর আরো অনেক বেশি লোড নিতে হয়েছে বাবাকে। ছেলেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কুটোটি পর্যন্ত নাড়তে দেয়নি বাবা। খাটাখাটনিতে আনন্দও কম পেতেন না।

একটা ঘটনা এখনও আমাদের সবার মনে আছে। দাদার ইউনিভার্সিটির বন্ধুরা একদিন আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসে। বাবা তখন গামছা পরে বাড়ির সামনের আগাছা-জঙ্গল পরিষ্কার করছিলেন, হাতে দা আর নিড়ানি, খালি গা, রোদ বাঁচাবার জন্য মাথায় আর একটা গামছা। দাদার বন্ধুরা বাবাকে এভাবে দেখে যা ভাবার তা-ই ভেবে বসল। 'এটা কি ব্যারাক বাড়ি?' একজন জিজ্ঞেস করে।

'লোকে তো তাই বলে।'

'তোমার বাবু বাড়ি আছে?'

'তা, আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?' বুঝতে পেরেও বাবা জিজ্ঞেস করেন।

'ইউনিভার্সিটি, মানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।'

'দাঁড়ান, ডেকে দিচ্ছি।' বলে বাবা বাড়ির ভেতরে এসে দাদাকে ডেকে দেন।

এই আমাদের বাবা।

বাবা চেয়েছিল নিজের শ্রম আর উপার্জন দিয়ে নিজের ছেলেদের জন্য সুখের ভবিষ্যৎ গড়তে। এই চাওয়ার বদলে কি কিছু পাওয়ার ব্যাপার ছিল। ছিল তো অবশ্যই, নইলে দাদার মুখ-উজ্জ্বল করা রেজাল্ট তাকে আনন্দ দেবে কেন, কেনই বা তার বখে যাওয়া চতুর্থ পুত্রটির জন্য দুঃখ এমনকী লজ্জাও বুকে চেপে চলতে হয়েছে। তখন পরোয়া করিনি, এখন তো বুঝি বাবা আমাদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা চায়নি। আমরা ভাল হই, পাঁচটা লোকে ভাল বলুক বাবার পাওনা ছিল সেটাই। আমি তার চৌথা পুত্তুর এ অর্থে নিরাশই করেছি তাকে। আমি, যাকে ইংরেজিতে বলে 'স্পয়েল্ট চাইল্ড', তাই।

বিষয়টা বুঝেছিলাম একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে।

আমি আমার ঘরে শুয়েছিলাম। মেজাজ ঠিক ছিল না। আগের রাতে কুমকুম ঝগড়া করে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে। কুমকুম আমার বৌ, সকাল হলে বুঝতে পারছিলাম রাতে মালের মাত্রাটা বেশিই হয়ে গিয়েছিল। চেঁচামেচির সময় আমরা কে কী বলেছি, কে কী করেছি সকালে তা মনে ছিল না। একটা কথাই মনে ছিল কুমকুম রাগ দেখিয়ে বাপের বাড়িতে চলে গেছে। আমার মাথাটা বেশ ভারি হয়েছিল, কোথা থেকে একটা মাছি এসে বারবার মুখের ওপর বসছিল। বেলা ক'টা বোঝার উপায় না থাকলেও বাইরের শব্দ বুঝিয়ে দিচ্ছিল রোদ চড়ছে, খিচড়ে যাওয়া মনে আর আলস্যে উঠতে পারছিলাম না, খোয়াড়ি যাকে বলে তাই চলছিল আর কী। এমন সময় টের পাই বাবা মাকে নিয়ে

আমার ঘরে ঢুকেছে, দরজা ভেজিয়ে জানালা খুলে দিয়ে একবার আমার মুখের ওপর চোখ রাখল দু'জনেই। তারপর বাবা মাকে বলল, 'তনুর খাটের পাশেই বসো।'

মা আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে?'

'এর চেয়ে নিরিবিলি আর কোথায় পাবে তুমি?'

বুড়োবুড়ি কী বলছে ভোঁতা মাথায় তার কিছুই বুঝতে পারি না। যতদূর সম্ভব কান খাড়া রাখি তবু। কুমকুমের সঙ্গে আগের রাতের দুর্ব্যবহারের গ্লানি ছাপ ফেলেছে মনে, তার ওপর নেশার রেশটা একেবারে কাটেনি, রাতে টেনে ছিলাম একটু বেশিই।

বাবা বলল, সতুর বিয়ের সম্বন্ধ, বিপিনবাবুরা চিঠি দিয়েছে। আমি তার উত্তরে কী লিখলুম পড়ে তোমায় শোনাতে চাই।

'যা লিখেচ, লিখেচ, আমি শুনে কী করবো?'

'তুমি ছেলের মা, তোমায় শুনতে হবে না, তোমার একটা মত আছে না?' বাবার এ কথার পরে মা আর কিছু বলে না।

জানালার কাছে বসে বাবা বিপিনবাবুকে লেখা চিঠি পড়ে শোনায়। মাকে শোনাবার জন্যে পড়া, তাই গলা বাড়িয়ে পড়ছিল বাবা। আমিও পুরোটা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলুম। বাবা প্রথমে নিজেদের বংশ পরিচয় জানিয়েছিলেন, কুলিন-কায়স্থ কথাটা লিখতেও ভোলেননি। চৈতন্যদেব কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নেবার পরে নবদ্বীপ ফিরে যাওয়ার পথে আমাদের পূর্বপুরুষের ভিটেয় পা দিয়েছিলেন এই চলতি গল্প বলতেও ভোলেনি। তারপরে সংক্ষেপ নিজের কথা বলে বাবা তার বড় ছেলের পরিচয় লিখেছেন অনেকটা জায়গা জুড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন বড়দা যে দিল্লিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক এসব কথা সগর্বে জানিয়েছে বাবা। বড় ছেলের কথা পড়তে পড়তে বাবার গলার স্বর, কেঁপে কেঁপে উঠেছে। এরপর মেজদার কথা, সেও যে কলেজে পড়ায়, বড় আর মেজো দু'জনেই যে সম্পন্ন—শিক্ষিত পরিবারে বিয়ে করেছে তার ফিরিস্তি আছে চিঠিতে। তবে বড়দার কথাই বেশি, থাকা স্বাভাবিকও। তারপর বাবা লিখেছে, পাত্র আমার তৃতীয় পুত্র অমিতাভ, কেন্দ্রীয় সরকারে স্থায়ী চাকরি, উন্নতির সম্ভাবনা প্রচুর। আমার ছেলে বলে বলছি না, ছেলে হিসেবে এমন সৎ, নম্র, সচ্চরিত্র খুঁজে পাওয়া ভার। অবশ্য, ওর খোঁজ খবর নিলে জানতে পারবেন।

এরপরে বাবা অন্য ছেলেদের সম্পর্কে লিখেছেন, স্কুল-কলেজে পড়া আমার আরো চারটি পুত্র আছে। আমাদের কোনো কন্যা-সন্তান নেই। ছেলেমেয়েদের বিষয়ে জানানোর পর পাত্রের মাতৃকুলের পরিচয়ও বেশ জায়গাজুড়ে ছিল। মামা ও মামার ছেলেরা মেমারি-অঞ্চলে একনামে চেনা সম্ভ্রান্ত-মানুষ, এ কথা লেখার পর বাবা বিপিনবাবুর কাছে পরবর্তী পদক্ষেপের প্রার্থনা জানিয়েছে।

চিঠি পড়া শেষ করে বাবা বলল, 'কী, ঠিক আছে তো?'

মা খুব আস্তে আস্তে কী বলল শুনতে পাই না। তবে মা তো আর বাবার কথা অমান্য করবে না, এ তো জানাই।

ঘোরের মধ্যে থাকলেও একটা কথা মনের মধ্যে বিঁধে রইল। বাবা তার অন্য সাত ছেলে সম্পর্কেই কিছু না কিছু জানিয়েছে। তার সাংসারিক হিসাবে চৌথা ছেলের কোনো জায়গা নেই। সামাজিক মঙ্গল-কাজে আমাকে বাদ দিয়েই চলতে হয়। অকম্মা, বেকার, মা-বাপের গলগ্রহ হয়ে থাকা, বখা ছেলের এ ছাড়া আর গতি কী? তবু, ওই চিঠিটা শুনে সেদিন খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। এমন সরাসরি ছাঁটাই হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা মনকে একেবারে হাল্কা করে দেয়। বাবা হয়তো বাধ্য হয়েই আমার পুত্র-পরিচয় গোপন করেছিল, কিন্তু বাবা তো আমারও বাবা, তার কাছ থেকে পাওয়া এই আঘাত আমি আজও তো ভুলতে পারলাম না।

## আমার মা

আমার মা দেখতে খুব সুন্দর ছিল, বাঙালি ঘরের সুন্দরী বৌ। মার বাপের বাড়ির অবস্থাও বেশ ভাল। পুকুর, ধানী জমি, গাছপালার সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়তির দিকেই ছিল। মায়ের বাবা, মানে আমার দাদু ধনী বলেই গণ্য হতো। তার ওপরে ছিল মোড়লি করার অভ্যাস, মোড়ল বলে গাঁয়ের লোক মানতও তাকে। মায়েদের তুলনায় আমাদের অবস্থা একেবারেই ভাল নয়। জমিজমা, শরিকী এসব মিলিয়ে মধ্যবিত্তও বলা যায় না। কিন্তু কুলের গর্ব ছিল, লেখা-পড়া জানার গৌরব ছিল, আর বাবার ছিল একটা বাঁধা সরকারী চাকরি। দাদু তার মেয়েকে বি.এ পাস, স্থায়ী চাকুরে ছেলের হাতেই সঁপেছিল। চাকরি করা, যে কোনও কাজে জড়িয়ে থাকার কী যে মূল্য তা আমার বাবাকে দেখলে বোঝা যায়।

বড়লোকের মেয়ে বলে আমার মায়ের কোনো গুমর ছিল না। তবে একটু আহ্লাদি টাইপের ছিল আমার মা, বড়ঘরের মেয়ের ওই সুখী, আহ্লাদে ভাবটা ছাড়তে পারেনি কোনো দিন। বাবা তা জানত, তাই যতটা পেরেছে বৌকে সুখে রাখার চেষ্টা করেছে। এ সবই ঠিক, কিন্তু মা কোনো দিনই বাবার ওপরে উঠতে চায়নি, বাবাকে খুব মান্য করত আমার মা। কষ্ট সইতে পারত, কিন্তু বাবার কাছ থেকে আমাদের সইতে পারত না।

আমার মা খুব ভাল ছিল। কিন্তু এখন বুঝি, আমাদের প্রাণ দিয়ে ভাল বাসলেও শাসন করতে জানত না। এ ব্যাপারে খুব ঢিলে ঢালা ছিল না। এতগুলি ছেলে, একটু বড় হলেই যে যার মত চলতে শুরু করত। ন্যায়-অন্যায়, ভালমন্দর ব্যাপারটা ছেলেরা নিজেরাই ঠিক করে নিত। শাসনের ব্যাপারটা ঢিলে ঢালা ছিল বলে আমরা অনেক স্বাধীনভাবে চলতুম। এই স্বাধীনতা এক এক ভাইয়ের পক্ষে সে এক এক রকম হয়েছে তা আমাদের দেখলেই বোঝা যায়। বাবাও বাইরের কাজকর্মে দর-ছিল, এতগুলো ছেলেকে সুস্থ-সমর্থ রাখার ব্যাপারে হিমশিম খেতে হতো তাকে, ফলে সাধ থাকলেও সামাল দেওয়ার সাধ্য ছিল না। আমাদের মা গায়ে গতরে খাটায় পটু ছিল না, তবু ঘরকন্নার কাজ করতে হতো তাকে। হাতের দোসর কাজের লোক থাকলেও আট আটটা ছেলেকে মানুষ করে তোলার শারীরিক অভ্যাসও ছিল না, মানসিক শৃংখলাও না। ভালমানুষ মা কেবল ভালবাসতেই জানত। সবার ওপরেই তার দরদ ছিল, মমতা ছিল। মার গুণ ছিল—কালো

কথা বলতে পারত না, তাকে কঠিন কথা শোনালে তার পালটা জবাব দেওয়া আমাদের মার স্বভাবেই ছিল না।

আমি যখন কুমকুমকে এনে ঘরে তুলেছিলাম, মা যে খুব খুশি হয়েছিল তা' নয়। মায়ের মুখ দেখেই বুঝেছিলাম সে কথা। আমি তো আসলে কুমকুমকে ফুসলেই এনেছিলাম। তবু মা কিছু বুঝতে দেয়নি, শাঁখা-সিঁদুর পরিয়ে ঘরে ঠাঁই দিয়েছিল। আমি কিন্তু মায়ের লুকনো দুঃখ দেখতে পেয়েছিলাম। কুমকুম অন্যঘরে চলে যাবার পরে মায়ের চোখে জল দেখেছিলাম আমি। এই প্রথম মাকে কাঁদতে দেখা, একটুক্ষণের জন্য সবকিছু ভেঙে গেল আমার, এই একটুক্ষণের জন্য নিজেকে নিজের ছোট মনে হয়। ভেতরকার কান্নাকে আমি আর বাধা দিতে পারি না, মায়ের বুকে মুখ রেখে কাঁদতে থাকি, কাঁদতেই থাকি। মা নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, আমাদের মুখে জুটলে ওরও জুটবে, কাঁদিস না বাবু। এর পরের কথা আরো কঠিন হয়ে বাজে আমার বুকে, 'বাবু, তুই এবার মানুষ হ', আমার তো আর সারা জীবন থাকব না, তখন তোর কী হবে?'

মানুষ হওয়া বলতে মা কী বোঝাতে চেয়েছিল তা না বোঝার মত নির্বোধ আমি নই। বাসন্তীকে ওর বাবার বাড়ি থেকে যেদিন বার করে আনি সেদিন আমিও বাপের হোটেলে খাই। রোজগার বলতে কিছু নেই, ভাল ফুটবল খেলতুম, দূর দূর জায়গায় খেপ খেলতে যাই, দু-চার পয়সা এ ভাবে হাতে আসে। তা দিয়ে নিজের ফুটানি পর্যন্ত চলে বৌ-পোষা চলে না। মা আমার বেকারত্ব নিয়ে কথা বলেছে। সেদিন খুব আঘাত পেয়েছিলাম, অভিমান হয়েছিল, আজ কিন্তু স্বীকার করি মা ষোল আনা ঠিক কথা বলেছিল। মার আক্ষেপ বুঝলে আজ আমার এমন একটা হেঁট-মুণ্ড জীবন কাটাতে হয় না, সবার কাছে ঝাঁটা পেটা হয়ে মৃত্যুর, অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না।

তুমি তো খুব শাসন করতে না মা, মারতে ধরতে পারতে না, তবু তুমি যে আমার জন্যে চিন্তা করতে তা তো সত্যি। আমি তোমার বড় ছেলের মত হতে পারিনি, তোমার অন্য ছেলেদের মতও না। আমি তোমার বাবু নানা নেশার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে অপদার্থ হয়েছি। মারধর করলে ছেলেরা বিগড়ে যায়, এমন কথা অনেক শুনেছি। আমার তো তোমরা কেউ কোনও দিন গায়ে হাত দাওনি, তবু আমি কেন বিগড়ে গেলাম, কেন মা?

### আমার বড়দা

বাবা মায়ের পরেই যার কথা সবার আগে আসে সে আমার বড়দা। বাবা মায়ের প্রথম সন্তান অমিতাভ। মেজদা অসিতাভর চেয়ে পাকা পাঁচ বছরের বড়। সে হিসেবে বলতে গেলে বাবা-মায়ের ভালবাসা সবচেয়ে বেশি পেয়েছে বড়দা। ছোট সংসারে একটি দু'টি ছেলে পর্যন্ত স্বচ্ছল থাকা যায়, বড় জোর তিন, তারপরেই বিপত্তি। আমার বড়দা আমার থেকে দশ বছরের বড়, আমি যখন স্কুলে যেতে শুরু করি বড়দা অমিতাভ তখন বি.এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। তার মানে অমিতাভ রায়ের ভিৎটা ছিল পাকা। লেখা-পড়া, স্নেহ-ভালবাসা, মা-বাবাকে নিরিবিলি কাছে পাওয়া, এসবই বড়দা সবচেয়ে বেশি ভোগ করেছে,

ভোগকে কাজেও লাগাতে পেরেছে সে। তা ব'লে এ কথা মনে করার কারণ নেই যে কেবল সুযোগ-সুবিধা ও আদরযত্নই তাকে পড়াশোনায় ভালো করেছে দশটা মানুষের মধ্যে একটা হয়ে উঠিয়েছে। দাদার ভেতরে কিছু না থাকলে, ক্ষমতা না থাকলে ও কি এতটা বড় হতে পারত?

আমার বড়দাকে আমরা সবাই খুব, যাকে বলে শ্রদ্ধা করা, তাই করি। ওর জন্য আমাদের গর্বের শেষ নেই, অন্যরা যখন বলত, 'অমিত একটা ব্যাটার মত ব্যাটা।' অমিতের ভাই পরিচয় দিতে তখন নিজেরও বুক ফুলে উঠত। 'অমন দাদার এমন ভাই তুই, ভাবাই যায় না' এই তিরস্কারও দাদার বড়ত্বকেই মনে করিয়ে দিত। আমাদের পুরো পরিবার, আত্মীয়-স্বজন সকলে বড়দাকে মাথার মণি করে রেখেছিল। রাখার মতো মণি-তো বটেই।

ফলে হলো কী। দাদার সঙ্গে আমাদের মনের মিলটা সরতে লাগল, দাদা যে আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে এ তো জানতামই, কিন্তু বড়ভাইয়ের কাছ থেকে যে ভালবাসা তাও যেন পেতাম না। এক মেজদা অসিতাভর সঙ্গে দাদার মনের মিল ছিল, মেজদা দাদাকে টোটো কপো করত। বড়দার ছিল মায়ের গড়ন—নাদুস-নুদুস, উজ্জ্বল গায়ের রঙ, পাতলা ঠোঁট, মায়ের ঠোঁটের কোণের হাসিটি পর্যন্ত লেগে থাকা। মায়ের ঠোঁটের সঙ্গে বড়দার ঠোঁটের অমিলও ছিল, বড়দার ঠোঁট দেখলে ওকে একটু দাম্ভিক মনে হতে পারে, মার ঠোঁটে ওই দম্ভটুকু ছিল না। মেজদার গড়ন বাবার মত, লম্বা পেটাই করা শরীর, মাজা কালো গায়ে রঙ, ঠোঁটে চাপা হাসির বদলে সারা মুখে ছড়ানো সরল হাসি। তবু, এত পার্থক্য সত্ত্বেও মেজদা হাঁটত দাদার স্টাইলে, চুল আঁচড়াতো দাদার মত, বড়দার ছিল সত্যিকারের চশমা। মেজদার চোখের পাওয়ার কম ছিল না, তবু বড়দার আদলে একটা চশমা করে নিয়েছিল। বড়দা এই ভাইটির সঙ্গে কথাবার্তা বলত, হাসি-মস্করাও করত, ও একাই যেন ছিল একমাত্র ভাই। আমরা অন্য ভাইরা দূর থেকে প্রতিমা দেখার মত দেখতাম আমাদের পরিবারের গৌরব অমিতাভ রায়কে।

আমাদের সংসারে, আমাদের পরিবারে থেকেও বড়দা ধীরে ধীরে অন্য একটা জগতের মানুষ হয়ে গেল। বাবা চেয়েছিল অন্য ভাইদের, মানে আমাদের লেখাপড়াটা অন্তত দেখুক বড়দা। কিন্তু বড়দা তা করতে পারেনি, লেখাপড়ায় উঁচু ধাপে উঠতে উঠতে তার আর নিচুতে তাকানোর সময় হয়ে ওঠেনি। কেবল মেজদাকেই বড়দা সাহায্য করেছে, মেজদাও বড়দার সাবজেক্ট্ নিয়ে পড়েছে, ফলে নোট দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে মেজদাকে নিজের মত করতে তার অসুবিধা ছিল না। মেজদা বড়দার মত রেজাল্ট করতে পারেনি, তবে দাদার ছায়ায় থেকে থেকে দাদার সব অনুগ্রহই পেয়েছিল সে। এম.এ পরীক্ষাতেও দাদা হেভি রেজাল্ট করেছিল, হৈচৈ পড়া ফল পরীক্ষায়। তারপর তো রিসার্চ-এর পরে রিসার্চ, গবেষণার পর গবেষণা। বড়দার সঙ্গে মনের তফাৎ তো হয়েইছিল, এখন হাতের বাইরেও চলে গেল সে। বাবা-মাও বড় ছেলেকে সমীহ করে চলতে থাকে, একটা আলাদা সম্ভ্রম।

বাবার বয়স বাড়ছিল, চাকরির বয়সও কমে আসছিল, তবু গায়ে খাটুনির কাজ ছাড়েনি। বাবাই বাজার করত, দুধ আনত, কয়লা আনত। আমার বড়দাকে আমি একদিনের

অন্যও বাজারে যেতে দেখিনি। বরং সেজদা বড় হয়ে বাবার হাতের দোসর হতে পেরেছিল। বাবাও সেজদার হাতে গম ভাঙানো, মুদির দোকানটা করার মত কাজগুলি ছেড়েছিল। বড় দুই ছেলেকে কখনও ওসব ঝামেলায় জড়াতে চায়নি বাবা। বড়দা আর মেজদাও মেনে নিয়েছিল এই ব্যবস্থা, ফলে ঘরদুয়ারের কাজে নিষ্কর্মা হয়েই রইল ওরা। আমিও নিষ্কর্মা, কারণ আমার জীবনটা তো একেবারেই অন্যদিকে চলে গিয়েছিল। বাইরের টানটা আমার সবচেয়ে বেশি, মারাত্মক সে টান। ফলে বাবার কর্মময় জীবনে আমি একেবারেই খরচের খাতায়। বাবা আমাকে বিশ্বাস করতে পারত না, আমিও নিজেকে অকম্মা বলেই মনে করে এসেছি চিরকাল।

আমরা যখন শোভাবাজারের বাসা ছেড়ে বাগুইআটির ব্যারাক-বাড়িতে উঠে আসি তখন দাদা ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট বয়। নতুন মানুষেরা নতুন নতুন বাড়ি করে তখন কেবল বসতি গড়ছে। গড়ে উঠছে এক একটি পাড়া, গ্রাম্য সে পাড়ায় শহরের নানা জায়গা থেকে উঠে আসা মানুষজন। এদের মধ্যে বাঙালের সংখ্যাই বেশি। আমাদের সেসময়ের শোভাবাজারের মত পাড়াভাবটা দানা বাঁধেনি খুব। শহুরে উদ্বাস্তুদের এই গ্রাম্য পরিবেশে দাদা মেশার মত একজনও পায়নি, এখানে একজন বন্ধুও হয়নি তার। শোভাবাজারেও যে বন্ধু ছিল তা নয়, তবে লাল্টুকে ভালবাসত পাড়া প্রতিবেশীরা, দু-চার জনের সঙ্গে কথাবার্তাও বলত বড়দা। বাগুইআটিতে একেবারেই না, এখানকার তরুণতীর্থ ক্লাবেও কোনোদিন পা দেয়নি। ওর বয়সী ছেলেদের সঙ্গে ভুলেও একটা কথা বলেনি। অথচ সেসব সমবয়সীরাও পড়াশোনা করত, খেলাধুলা এমনকী সাহিত্যচর্চাও, রবীন্দ্রজয়ন্তীতে গান গাইত দল বেঁধে, নাটক করত উৎসাহ নিয়ে। দাদাকে এরা দাম্ভিক ভাবত, ভাবতেই পারে। দাদা এই নতুন পাড়ার লোকদের কাছে অহংকারই দেখাত। একবার রবীন্দ্রজয়ন্তীতে আমাদের ক্লাব তরুণতীর্থের দাদারা পাড়ার গৌরব অমিতাভ রায়ের কাছে এসে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার কথা বলে। দাদা তখন বই পড়ছিল। ওরা খুব আশা নিয়ে বলল, 'আপনি থাকতে আমরা আর কার কাছে যাব বলুন। আপনি আমাদের পাড়ার—।'

দাদা বই থেকে চোখ না তুলেই বলল, 'আমি আপনাদের পাড়ায় থাকি। সে জন্যই সভামঞ্চে উঠতে হবে?'

একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল সকলে, 'না, তা না, আপনি এলে আমাদের ছোটরা উৎসাহিত হবে। আমরাও অনেক বেশি জানতে পারব।'

অমিতাভ রায়, আমার বড়দা এবার চোখ তুলে বলেছিলেন, 'সভা করে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জানা যায় না, পড়াশোনা করতে হয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজেই তো নির্জনে থাকতে ভালবাসতেন। আমাকে ডেকেছেন ভাল, তবে আমি যেতে পারব না। ওটা আমার ধাতে সয় না।'

পাড়ার বড়রা, মানে বড়দার বয়সীরা বড়দাকে দেমাকি, দাম্ভিক বলেছিল, এ কথা সেদিন আমাকেও শুনতে হয়েছে। আমারও মনে হয়েছে দাদার এই না আসার পেছনে আমাদের গ্রামের যুবকদের প্রতি অবজ্ঞাই ছিল, দাদা ওদের নিজের স্ব-গোত্র মনে করেনি

বলেই ফিরিয়ে দিয়েছিল, অন্য সবটাই ভাল ছিল। বড়দার এই হাবভাব আমারও ভাল লাগেনি, সে দিন না আজও না। আমি তখন চুটিয়ে ক্লাব করছি, ক্লাবের হয়ে খেলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে, বেস্ট-প্লেয়ারের প্রাইজ নিয়ে বাড়ি ফিরছি। এলাকার নানা অনুষ্ঠানে মঞ্চে উঠে গান গাইছি। সকলে বাহবা দিচ্ছে, জীবনটা কেমন হাল্কা ফুরফুরে ছিল। এক ডাকে সবাই আমাকে চিনত। বড়দার ঠিক বিপরীত স্বভাব ছিল আমার। বাড়ির অন্ন ধ্বংসাচ্ছি, স্কুলে টেনেটুনে পাসের দলে, কিন্তু খেলোয়াড় তনুকে নিয়ে সবাই লোফালুফি করত। এই লোফালুফি করতেই তখন খেলার মেতে গেলাম। মধ্যমগ্রাম, বিরাটি এমনকী বারাসত থেকেও ডাক আসত। খেলা প্রতি পাঁচ টাকা, যাতায়াত ফ্রি, খেলার সময়ে চুইংগাম আর খেলার শেষে চা-সিঙ্গারা—এর চেয়ে বেশি কী চাই। নাইন-টেন-এ পড়ার সময় থেকেই আমার তখন খেপ খেলা শুরু।

আমার খেলা নিয়ে এই মাতামাতি বাবাকে অসহায় করেছিল। বাবা চাইত আগে লেখাপড়া করি পরে খেলাধূলা। দু'টো যে একসঙ্গে হয় বাবা তা বুঝত না। আমার বড়দার এ ব্যাপারে জ্ঞান খুব টনটনে, 'দ্যাখ বন-গাঁয়ে শেয়ালরাজা হয়ে কোনো লাভ নেই। পারিস যদি কলকাতার মাঠে যা, ওখানে কারো নজরে পড়ে গেলে তোর ছিস্রে হতেও পারে।' বড়দার সাফ-সাফ কথা বুঝতে অসুবিধা হয়নি, মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু তেমন লোকের নজরে পড়া আর হয়ে ওঠেনি। আমার খেলায় হৈচৈ মাতামাতিটাই বড় ছিল, হিসেব করে সাধনা করার ব্যাপারটা ছিলই না, ফলে দাদার উপদেশ মাথায় নিয়ে না-ঘরকা না-ঘাটকা হয়েই থাকতে হলো। বাবা শাসন করতে জানতই না, মাও বুঝত না লেখাপড়া না খেলা কোনটা আমার পক্ষে খাটে ভাল। বাড়ির ভেতরে একমাত্র বড়দা বিষয়টা বুঝতো, কিন্তু খেলার ব্যাপারে তার কিছু করার ছিল না বলে আমার নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে চাইত না। তবু বড়দা যদি আমাকে গাইড করতে চাইত, যদি বলত, 'পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে অত হৈচৈ না করে, ক্লাব ক্লাব করে না মেতে লেখাপড়ায় মন দেত্তো'। তবে আমি সত্যিই বিপাকে পড়ে যেতাম। বড়দা একদিনও অমন দাদাগিরি করেনি, করলে কি আমি অমান্য করতাম? এখন এই বুড়ো বয়সে, নিঃস্ব একটা মানুষের মনে এ প্রশ্ন আসার কোনো মানে হয় না।

বড়দার ভাই হওয়ার যোগ্যতা আমি দেখাতে পারিনি, থার্ড-ডিভিশনে এস.এফ পাস করার পর কলেজে ভর্তিও হয়েছিলাম। তারপর আর এগোয়নি পড়ার পাঠ। সে তো আমার কথা, আমার না হওয়ার কথা। কিন্তু দাদার হওয়ার কথা যে এখন এই মুহূর্তে বড় বলতে ইচ্ছে করছে। সেটা ছিল বড়দার এম.এ পাস করার দিন। ফল বেরোবার আগেই বড়দা জেনে গিয়েছিল, ইউনিভার্সিটির অনেকেই জানত অমিতাভ রায় রেকর্ড নম্বর পেয়ে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। তবু ফল বেরোনোর দিনটার কথাই আলাদা।

বাবা সেদিন অফিস ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে। মা গন্ধ সাবান মেখে স্নান সেরে সুন্দর একটা কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে। সেদিন রাতে বিশেষ খাবার লুচি আর লম্বা করে কাটা বেগুন-ভাজা, সঙ্গে কষানো আলুর দম। বাড়ি

ফিরতে দাদার দেরিই হয়, রাত হয়ে যায়। মেজেঘষে প্রায় নতুন চিমনি করা হ্যারিকেনের আলো। বড়দা এসে জামা-কাপড় না ছেড়েই মাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে, 'আমি পেরেছি মা।' মায়ের চোখ চিকচিক করে, বাবা বলে, 'একটা গান করবে আজ, ছেলের পাসের আনন্দে?' মারও কি গান গাইতে ইচ্ছে করছিল?

অতবড় ছেলে, আমাদের বড়দা, আদরে গলে গিয়ে মার কাছে আবদার করে, 'আমারও ইচ্ছে করছে তোমার গলায় গান শুনতে।'

তারপর তক্তপোষের তলা থেকে হারমোনিয়মের বাক্স বেরোয়। আমরা জানতামই না ওই পাতলা কাঠের বাক্সটায় একটা হারমোনিয়াম আছে। এতদিন মার খালি গলার গানই শুনেছি, আজ মা বিশেষ করে গাইবে। ঘরে আমরা আট ভাই আর বাবা, আমরাই শ্রোতা। আমাদের সবচেয়ে ছোটভাই কুটুর বয়স চার-পাঁচ বছর, ও বয়সে কী আর বুঝবে, তবু হাততালি দিয়ে ওঠে। আমাদের সবার আনন্দ মায়ের গানের সঙ্গে মিলে যায়। মা গেয়েছিল রবিঠাকুরের গান, দাদার পছন্দের গান। গানটার কথা আজ আমার মনে নেই, বিষয়টা আনন্দের ছিল এ কথা মনে আছে। মার গান শেষ হলে আমি বলি, 'দাদা আমি একটা গাইবো।' তখনও আমি পাড়ায় পাড়ায় গান গেয়ে বেড়াই না। কিন্তু আমার খুব গাইতে ইচ্ছে করছিল। দাদা বললে, গা। মেজদা বললে, 'তুই তো মার গান, মার গলা নকল করে গাইবি।'

'গাইব তো, তা-ই একটা গাই।' মেজদার ফুটকাটা আমার ভাল লাগেনি। বড়দা আমাকেই সাপোর্ট করে, 'মার-গলার গানই তো গাইবি, তাই শোনা সত্ত।'

কী গান ছিল সেটা, আজ তা মনে নেই। গান শেষ হওয়ার পর আমার মনের মধ্যটা কেমন করতে থাকে। আমিও বড়দার মত লেখাপড়া করে বড় হবো, এই কথাটা মনের ভেতর ঘুরপাক খায়। বড়দাদার বড় হওয়া আমাদের সবাইকে তার উপযুক্ত হওয়ার তাগাদা দিয়েছিল। অন্য ভাইদের কথা থাক, আমি নিজে বড়দার ভাই বলে পরিচিত হওয়ার যোগ্যতা দেখাতে পারিনি। পারিনি এটাই সত্য, কেন পারিনি তা ভেবে লাভ নেই।

আমি যখন কলেজে ভর্তি হই, আমাদের বড়দার তখন বিয়ে হয়। এ বিয়েটা আমাদের আনন্দ দেয়নি। এম.এ পাস করার পর বড়দা কিছুদিন একটা কলেজে পড়িয়েছে, কলকাতার আশপাশের কলেজ, তার ওপর একটা টিউশনও করত এ সময়ে। বৌদিই ছিল এই টিউশনের ছাত্রী। যেমন হয় আর কী, সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে বড়দা ডোবায় এসে ডুব দিল। বৌদিকে বি.এ পাস করিয়েই দাদা বিয়ে করে ফেলল তাকে। দাদাদের বিয়েটা ছিল রেজিস্ট্রি-ম্যারেজ। বন্ধুদের নিয়ে সই-সাবুদ, ফুলের মালা, রজনীগন্ধার স্টিক এবং নতুন বৌয়ের সিঁথিতে সিঁদুর। বিয়ের পর দাদা বাড়িতে কথাটা ভাঙে, বাবা এমনকী মাও হঠাৎ খবর পেয়ে থমকে গিয়েছিল। হয়তো অমিতাভ রায়ের বিয়ের ব্যাপারে তার বাবা-মার অন্য রকম আশা ছিল—থাকতেই পারে। কী আর বলা, বড়দার বিয়েতে ঘটাপটা কিছুই হলো না, আমরা আনন্দ করার কোনো সুযোগই পেলুম না।

আমাদের বড় বৌদির লেখাপড়া আর এগোয়নি, তবে সত্যিকারের সুন্দরী সে। বড়দা সুন্দরীকেই বিয়ে করেছিল, যার ফলে ট্রেন হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। আমাদের বড়দা ট্রেন কিনা তা বলার মত সাহস আমার নেই। একটা বিষয় বলতে পারি, আমাদের অভাবের সংসারে মানিয়ে চলা সম্ভব হয়নি বৌদি চিত্রলেখার। বিয়ের ছ'মাস পুরতে না পুরতে দাদা দিল্লির ইউনিভার্সিটিতে পড়ানোর ডাক পায়। বৌদি বাবা-মা আমরা সবাই যেন একটা দমবন্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি পাই। এরপর বাবা-মা যতদিন বেঁচেছিল দাদা বছরে একবার আসত, কলকাতায় কোনো কাজে বা সেমিনার টেমিনারে আসতে হলে দু-চার দিনের জন্য বাড়িতে থেকে যেত। বৌদি একদিনের জন্যও আর পা দেয়নি এ বাড়িতে। এই বিচ্ছেদ বড়দা কেমন ভাবে নিয়েছিল তা আমার জানার কথা নয়, জানিও না। কিন্তু বাবা-মা যে আঘাত পেয়েছিল তা বুঝতাম।

## আমার বৌ কুমকুম

কুমকুমের বাবা ছিল পুরুত, ওদের পরিবারটাই পুরোহিত পরিবার। আমি যখন কলেজে ভর্তি হই তখন আবার আমাদের পুরানো পাড়ায় যাওয়া আসা শুরু হয়। মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ থেকে শোভাবাজার হেঁটে চলে যেতুম। আমার সমবয়সী যারা তারাও এতদিনে বড় হয়েছে, ক্রমে রকবাজিটায় জমে যাই। লেখাপড়ায় আমার খুব টান কোনোদিনই ছিল না, এবার পাড়ার আড্ডায় মজে গেলুম পুরো দমে। আমাদের যে দলটা ছিল তারা রঙবাজ নামে পরিচিত ছিল। সেই রঙবাজদের একজন তরুণের সঙ্গে আমার ইন্টিমেসিটা বেশ জমাট বেঁধে যায়। ওই তরুণেরই খুড়তুতো বোন কুমকুম, ডাকনাম টেঁপি।

শোভাবাজারের খাস লোক ওরা, তায় পুরুত বংশ। মেয়েদের ওপর কড়া শাসন ছিল। শাসন ছিল, কিন্তু কুমকুমকে ইস্কুলে যেতে দিয়েছিল ওর বাবা। কলেজ পালিয়ে এসে রোয়াকবাজি করতে করতেই একদিন নজর পড়ে ওর ওপর। বুকে বই চেপে মাথা নিচু করে চলে যেত। মাথা নিচু করে হাঁটত ঠিকই, হঠাৎ চোখের চাউনি দিয়ে একবার আমার দিকে তাকাতেও ভুলত না। এই লুকোচুরি খেলাকেই প্রেম বলে এমনটা ধরে নিয়ে মনের মধ্যটা অন্যরকম হয়ে যেত আমার। একেই কি আকুপাকু করা বলে?

আমি আমার পুরনো পাড়ায় এমন সেঁটে গেলাম যে বাগুইআটির বন্ধুরা একে একে দূরে সরতে লাগল। সরল না কেবল লালু, আমার বাবা-মা বলত আমার জীবনের শনিঠাকুর ও। লালু সত্যিই ভাল ছেলে ছিল না, তখন বুঝিনি, পরে যখন বুঝতে শুরু করি তখন আমার ফিরে আসার সব রাস্তা বন্ধ। ওই লালু এঁটুলির মত আমার সঙ্গে লেগে থেকে শোভাবাজারের রকের হদিশ পায়। ও যখন এখানে আসে তার মধ্যে আমি শোভাবাজারের হিরো। আমার হিরো হওয়ার একটা অস্ত্র ছিল আমার গান, রকে বসেই মাৎ করে দিতাম। পাড়ার বড়রাও স্বীকার করত, 'মহিনবাবুর ছেলেটা বখে গেলেও ওই গানের গুণেই বেঁচে যাবে।' আমার কাছে কথাটার কোনো অর্থ ছিল না, বিশেষ করে ওই বেঁচে যাওয়া কথাটার।

এরই মধ্যে টেঁপি একটা কম্মো করে বসে। তখন সে ক্লাস টেন-এর ছাত্রী, সবদিব দিয়েই বড় হয়েছে। আমাদের প্রথম দেখার পরে দু'বছর কেটে গেছে, এই দু'বছরে তার শরীরের বাড় দেখেই আমি আনন্দ পেয়েছি, কড়া শাসনে থাকা উত্তর কলকাতার প্রায় পর্দানশীন সমাজে থেকে হাসি আর চাউনি দিয়ে যতটা আস্কারা দেওয়া যায় তা ও আমায় দিয়েছে। এবার ক্লাস টেন-এর টেঁপি একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে ইশারায় আমায় ডাকে। প্রথমে আমি বুঝতে না পেরে ভ্যাবলাকান্ত হয়ে যাই। পরে ওর পাশে যেতেই কাঁপা হাতে একটুকরো কাগজ, একটা চিঠি আমার হাতে দিয়েই প্রায় দে ছুট। ওর হাত কাঁপছিল, চোখ কাঁপছিল, মুখে কোনো কথা বলেনি, তবু ঠোঁট কাঁপছিল।

সিনেমা দেখে দেখে, অন্য বন্ধুদের কাছে গল্প শুনেশুনে প্রেমপত্র সম্পর্কে আইডিয় হয়ে গিয়েছিল। টেঁপির সেই চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দুনিয়া বদলে যায়। কুমকুম লিখেছিল, তুমি আজকাল এতো কম এসো কেন? তোমার গান আমার ভাল লাগে তোমাকেও। ইতি পেমিকা কুমকুম।

কুমকুম 'পেমিকা' লিখেছিল, কেন? তাড়াহুড়োতে? এর আগেই লালু শোভাবাজারে আমার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ জমাতে চেয়েছে। সুবিধা করতে পারেনি, নর্থ-ক্যালকাটার আড্ডা, এমনকী রকবাজিরও একটা নিজস্ব ঘরানা আছে, সে ঘরে বাইরের মানুষের ঢোকা খুব সহজ না। এরা লালুর সঙ্গে গপ্পো করেছে, সিগারেট উড়িয়েছে, দু-চারটা খিস্তি-খাস্তাও হেসেওছে, কিন্তু আসল দরজা খুলে অন্দরমহলের খবর জানতে দেয়নি। লালু যেমন ধূর্ত তেমন নোংরা স্বভাবের ছিল। দেখেশুনে ও কুমকুমের ব্যাপারটা বুঝে যায়, 'মেয়েটা পটেছে, তনু তোতে মজেছে ও।'

আমার ভেতরটায় ধক্ করে উঠেছিল, 'যা তা বলবি না লালু। সবাইকে সমান ভাববি না।'

'আচ্ছা সে দেখা যা-বে।' ইতরের মত মনে হয় লালুকে।

'তবে মাল ভাল, ঠকবি না।' বলতেই লালুর মুখে এমন একখানা পাক্ক বাড়ি যে নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোতে থাকে। লালু হতভম্ব হয়ে যায়, 'তনু, তুই আমাকে মারলি?' বলে পকেট থেকে রুমাল বার করে নাকের ওপর চেপে ধরে। হঠাৎ রাগের মাথায় মেরে আমারও কেমন খারাপ লাগতে থাকে, নাকের রক্ত বন্ধ করার জন্য আমি তখন ব্যস্ত।

এসবই কুমকুমের চিঠি পাওয়ার আগের ঘটনা।

কুমকুম তো লেখাপড়ায় ভালই ছিল। অন্তত আমার চেয়ে ভাল। কিন্তু ওর বাবা স্কুল ফাইন্যাল পাসের পর আর কলেজে ভর্তি করতে চাইল না। ঘরে থাকো, সময় মত বিয়ে হয়ে যাবে—এই ছিল বাবার মত। তবু কেঁদেকেটে কুমকুম বেথুন কলেজে ভর্তি হয়, পুরনো দিনের মেয়েদের এ কলেজেও হেভি ডিসিপ্লিন ছিল। আমি কুমকুমের সঙ্গে দেখা করার জন্য হেদোয় দাঁড়িয়ে থাকতাম হাঁ করে, অনেক দিন বিবেকানন্দ-স্ট্যাচুর নীচে আমার দুপুর কেটেছে, কিন্তু সুবিধা করে উঠতে পারিনি। কুমকুম বন্ধুদের সঙ্গে আসে, আবার বন্ধুদের সঙ্গেই চলে যায়। আমায় যে দেখে না তা নয়, কিন্তু চোখের তারা আর

থা বলে না। এমন আর কতদিন চলে, আমার মনের ভেতরটা রাগে ফুঁসতে থাকে, লেজে ভর্তি হয়ে তবে লাভটা কী হলো। আর এমন একটা কলেজে ভর্তি হওয়ার কথা ম বলল?

আমি তো তখন, যাকে বলে মরিয়া, তাই। একদিন আর সইতে না পেরে, সারাদিন াকোনন্দর স্ট্যাচুর নীচে বসে বসে রাগ চড়ে যায়। আজ 'এসপার কী ওস্পার' ভেবে সম্ভব সব ভাবনা ভাবতে থাকি। সারাটা দু'পুর কেটে যাওয়ার পর কুমকুমের ছুটির ন্টা বাজে। গেট পেরিয়ে কুমকুমকে বেরোতে দেখি আমি রাস্তা পার হই, কুমকুম আমাকে খতে পায়, কিছু বলে না। আমি ওর পাশে দিয়ে শরীরে সব শক্তি, মনের সব বল লায় এনে বলি, 'শোনো, একটু কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

কুমকুমের চোখে ভয়, কুমকুমের চোখে বিরক্তি, চাপা স্বরে বলে, 'বড্ড বাড়াবাড়ি য়ে যাচ্ছে।'

'একটা কথা, একটাই মাত্র।'

'আর এগিয়ো না।' আমায় কোনো পাত্তা না দিয়ে হনহন করে হেঁটে যায় কুমকুম।

লে বাবা, তবে কি কুমকুম তার মত পাল্টেছে? আমার মত একটা রঙবাজকে আর াল লাগছে না? সেদিন সেই বিকেলে বেথুন কলেজের সামনের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে াড়িয়েই আমার প্রেমের সমাধি দেখতে হলো। মনটা খুব দমে গিয়েছিল। আর শাভাবাজারের রোয়াক নয়, পাড়ায় ফিরে লালুর সঙ্গে ঠেকে গিয়ে বসলুম।

মনটা কেমন ভেঙে যায়। শোভাবাজারে যাওয়া বন্ধ করে দিই, কুমকুমই যখন তাড়িয়ে দল তখন শোভাবাজারে যাওয়াটা বেকার। বরং লালুর সঙ্গে থেকে দু'পয়সা ইন্‌কামের ান্দা করা যাবে। মনের যখন এমন অবস্থা, কুমকুমের কাছে থাপ্পড় খাওয়ার হপ্তা পুরতে া পুরতে তরুণ এসে উপস্থিত। তরুণ আমার বন্ধু আর কুমকুমের ভাই। তরুণ বললে, টেঁপি—তোর সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

'না ভাই, সব চুকেবুকে গেছে। আমায় আমার মত থাকতে দে।'

'কেস্ খুব সিরিয়াস, টেঁপি তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

আমার মনে হয় কেসটা তরুণ জানে, 'তুই তা'লে কেসটা জানিস। কী হয়েছে বল।'

তরুণ তবু ভাঙতে চায়নি, 'না, টেঁপিই বলবে। আমার বলাটা ঠিক হবে না।'

'তা'হলে ফোটো, অনু কারো হুকুম মানে না।'

'তুই যাবি না।'

'ব্যাপারটা বল, তারপর ভাবব।'

তরুণ তখন বাধ্য হয়ে ঘটনা জানায়। বেথুন কলেজের সামনে আমাদের কথা বলতে দেখেছে নন্দখুড়ো। সে কুমকুমের বাবাকে সে কথা জানায়। সেদিন থেকে কুমকুমের কলেজ যাওয়া বন্ধ, কুমকুমের বাবা বলেছে, এতবড় আস্পর্ধা, ওকে হাতের কাছে পেলে হাত ভেঙে দিতাম। শোন টেঁপি, অমন ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক করার আগে তোকে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব। এ পাড়ায় একবার দেখি লোফারটাকে।

তরুণের কথা শুনে আমার রক্ত মাথায় চড়ছিল, তরুণকে তা বুঝতে দিই না, শুধো
'তারপর?'

'পরের ঘটনা আরও রোমহর্ষক। কাকাবাবু টেঁপির বিয়ের বর ঠিক করে ফেলেছে
'বিয়ের বর? এরসপে বিয়ে কথা এল কোত্থেকে। কুমকুম কী বলে?'

'আরে টেঁপি তো বেঁকে বসেছে, একে দোজবর তায় টেঁপির তুলনায় দ্বিগুণ বয়স
কাকাবাবু মেয়েটাকে গলায় পাথর বেঁধে গঙ্গায়ই ফেলে দিচ্ছে।'

আমার তখন মাথা কাজ করছে না। টেঁপির সঙ্গে কথা বলা, টেঁপির সঙ্গে প্রে
প্রেম করা, এ এক জিনিস, আর ওর বিয়ের ব্যাপারে নাক গলানো অন্য। তালে কুমকু
কি আমার বিয়ে করতে চায়? কথাটা মনে আসতেই আমি বোকা হয়ে পড়ি। এখন আমি
কী করবো?

তরুণের সঙ্গেই পরামর্শ করি। কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া আর গলায় পাথর বেঁধে
গঙ্গায় ডুবিয়ে দেওয়ার মধ্যে যখন তফাৎ নেই তখন টেঁপির কথা শোনায় দোষ কী
ঠিক হলো কুমোরটুলির গঙ্গার পাড়েই টেঁপির সঙ্গে কথা হবে, ওর সঙ্গে তরুণ থাকবে
আমি ঠিক সময়ে যাব।

সেই কুমোরটুলির গঙ্গার পাড়েই কুমকুমের বিসর্জন হলো। মনস্থির করেই এসেছি
ও, সঙ্গে জামা-কাপড়ের পুঁটুলিও ছিল। আমায় খুব বেশি ভাবতেই দেয়নি, কান্নার মুখ
ভাসিয়ে তরুণের সামনেই আমায় চুমু খেতে থাকে। সারা মুখ যেন গর্জন তেলমাখা দুর্গা
প্রতিমা। ওই চুমুতেই আমাদের বিয়ে, ওই চুমুতেই আমার মনের বাঁধ ভেঙে যাওয়া
না কোনো মন্ত্র, না শাখা, না সিঁদুর। আমি আমার বৌ কুমকুমকে নিয়ে বাড়িতে এসে
উঠি। বুঝেছিলুম এ বিসর্জন, তবু উপায় ছিল না।

### বন্ধু লালুর কথা, আমার কফিনের শেষ পেরেক

কুমকুমের সঙ্গে পরিচয়ের অনেক অনেক আগেই লালুর সঙ্গে আমার পিরিত। লালু আমার
বাল্যবন্ধু। আমার জীবনের রাহু, আমার জীবনের শনি। আমার বাবাও তা-ই বলত,
ঘটকবাড়ির লালুটা তোর জীবনের শনি, ও তোকে ডোবাবে। দাদা লালুকে দেখলে থুথু
ফেলবার মত মুখ করে বলত, তনু বখাটে ছেলেটার সঙ্গে মিশে ভবিষ্যৎ নষ্ট করিস
না। যখন এসব বলাবলির শুরু তখন জল অনেকদূর গড়িয়ে গেছে, লালু আর লালুর
দলবলের নেশা পাকাপাকিভাবে আমায় পেয়ে বসেছে।

ঘটকবাড়ির লালু, যাকে বলে উচ্ছৃংখল, তাই ছিল। ওদের জয়েন্ট ফ্যামিলির আনাচে
কানাচে পাপের ঘটনা ছিল, নোংরা সম্পর্ক ছিল। ওর যুবতী কাকিমা ওকে ভোগ করা
শিখিয়েছে। ওপর ওপর সুখী, শিক্ষিত, ঘটকরা সমাজের মান্যও ছিল। কিন্তু ভেতরটায়
অনেক পচন ছিল। লালু ওই পাপ ওই পচনকে বাইরেও নিয়ে এসেছিল। সেই লালুই
ছিল আমার জিগরি দোস্ত। আমার বাবা বা বড়দা ওর সম্পর্কে প্রায় কিছুই না জেনেও
সতর্ক করেছিল। যখন বাবা-দাদার নজর পড়ল তখন যে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে,

আমি বোঝাই কী করে। ততদিনে লালুর হাত ধরেই আমি ঠেকাই-এর ঠেকে গিয়ে বসতে শুরু করেছি। মদ আমাকে খেতে শুরু করেছে।

বাবা বা বড়দার হুঁশিয়ারিও আমাকে ফেরাতে পারেনি। বরং এরপর থেকে আমি ওদের এড়াতে শুরু করি। দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জন্য বাড়ি আসি, মাথা নিচু করে বাড়িতে ঢুকি, মাথা নিচু করে বেরোই। আমি সবার থেকে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি, আমার বিদ্বান বড়দা, আমার অন্নদাতা বাবা, আমার মা কারো চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারি না। বয়স বাড়ছে, ঘরের কোনো কাজে লাগি না, এক পয়সা উপার্জনের চেষ্টা করি না, সবকিছু থেকে সরতে সরতে ওই লালুর সঙ্গ।

যেদিন লালু শোভাবাজারের রোয়াকে আমায় দেখে সেদিনই জীবনে আর একটা পর্দা খোলার ঘটনা। ঠেকে আর না যাওয়ার জন্য প্রথমে খুব কথা শোনানো, তারপর হাতধরে টেনে তোলে লালু, 'চল, কাছেই একটা জায়গায়।' আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু লালুর হাতে পড়লে কে তোমায় ছাড়ায়? জায়গাটা হাঁটা পথের মধ্যেই ছিল। পথে হাঁটতে-হাঁটতে লালু জানায়, 'আজ মীরার কাছে যাচ্ছি।'

'কে মীরা, তোর মুখে আগে তো ওর নাম শুনিনি।'

লালুর চোখে নোংরা হাসি, 'সোনাগাছির নাম শুনেছিস?'

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম, নামটা তো আমার জানাই। আমি আর এগোতে চাইনি। লালু কি ছাড়ে, শক্ত করে হাত ধরে রয়েছে ও, 'কলেজে পড়ার সময় থেকেই ওর কাছে আমি।'

'লালু, তুই—'

'একেবারে নষ্ট হয়ে গেছি? শোন, সোনাগাছির মীরাকে দেখলে তোর মাথা ঘুরে যাবে, তুই বুঝতেই পারবি না ও যে এ পথের মেয়ে।'

লালুর সঙ্গে গেছিলাম। সাজানো ঘর, একেবারে ঘরোয়া ভদ্রলোকেরই মত। মীরা আমাদের চেয়ে বয়সে অনেকটাই বড়, হেসে কথা বলে, কথায় কোনো ইতর শব্দ ব্যবহার করেনি। কেবল একবার, আমি বেরিয়ে আসার আগে বলেছিল, 'তা তোমার বন্ধুর সামনেই কি হবে, মনে রেখো আমি অমন বেবুশ্যে নই।'

আমি সেদিন বেরিয়ে এসেছিলাম, বন্ধু লালুর পাঞ্জর ছেড়ে। কেন পেরেছিলাম সে নিয়ে কাঁটাছেঁড়া করার সময় আজ নয়। তবে পেরেছিলাম, আমার ধাতে, আমার জীবনের অভিজ্ঞতায় ওই পাঁক ছিল না বলেই কি, না কুমকুমের মুখটা বারবার মনে ভেসে উঠছিল বলেই। যাই হোক, লালুর ওপরে খুব রাগ হয়েছিল সেদিন।

লালু তো বড় লোকের ছেলে। ওর মামা-কাকারা বড় চাকুরে, ওর হাত খরচার টাকা জোগাত তার সেই কাকিমা। লালু তাকে 'ব্ল্যাকমেল' করত কীনা আজ আর মনে করতে পারছি না। তবে যতদিন ও আমাদের ঠেকে বসেছে ততদিন বেশির ভাগ টাকাই ওর পকেট থেকে গেছে। বছর তিরিশ বয়স পর্যন্ত আমরা কেউ কোনো কাজই করতাম না, চাকরি-বাকরি করা আমাদের পোষাতো না। আমাদের বাড়িঘর বলতে রাতে ঘুমোবার

জায়গা, দু-বেলা মুখে দেবার জায়গা। আমাদের কোনো দাদা-ভাই-আত্মীয় নেই। একসময় পাড়ায়, ক্লাবে যাদের সঙ্গে খেলতুম, গান গাইতুম, জলসায় মাততুম তারা অনেকেই পরীক্ষা পাস করে, বা না-পাস করে বড় চাকরি, ছোট চাকরিতে ঢুকে পড়েছে। আমাকে দেখলে অতিকষ্টের হাসি মুখে ফোটে, চারদিকে তাকিয়ে কেটে পড়ে। আমি বুঝতে শিখেছি, ওরা আমায় আর বন্ধু বলে মানতে চায় না।

মাঝে কেবল দু'টো বছর, কুমকুমকে ঘরে তোলার পরের দু'টো বছর সংসারী হতে চেয়েছি। দু'বছরের প্রেম আমায় অনেক মধু দিয়েছে, মধু এবং মধুমাস। বাবা-মাও একটু আশার আলো দেখতে পেয়েছিল, কুমকুমকে আদরও করত তারা। এই দু'বছরে মধ্যেই আমার ছেলে বাবাইয়ের জন্ম। বাবাইকে নিয়েই আমাতে আর কুমকুমে বিরোধ—ঝগড়াও। আমার মদ খাওয়াটা আবার শুরু হয় বিয়ের দু'আড়াই বছর পরে। সঙ্গী ওই লালু, পলা, পটলা আর বিবেক। কুমকুম আমার মদ খাওয়া একেবারে বরদাস্ত করতে পারত না। নিত্য ঝগড়া, নিত্য ঝগড়া। প্রেমের ফুল তখন ঝরে পড়ে গেছে, কিন্তু ফলটা তো আছে। কুমকুম মনে প্রাণেই চেয়েছিল বাবাইকে নিয়ে আমাদের সংসারেই থাকতে। কিন্তু যাকে নির্ভর করে এই পরিবারে আসা তাকে ধরে থাকার কোনও অর্থ সে আর খুঁজে পায় না। তাই, যে বাপ একদিন কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবার কথা বলেছিল, সেই বাপের কাছেই সারেন্ডার করে কুমকুম। ও কোনো বিবাহ বিচ্ছেদ-টিচ্ছেদ করেনি। কেবল ছেলে নিয়ে বাপের বাড়িতে উঠে ছেলেকে মানুষ করেছে। কুমকুম বা বাবাইয়ের সঙ্গে জীবনে আমার আর দেখা হয়নি।

### আমার কথা, নষ্ট গাছ মুড়োনোর খাতিরে

আর কী কথা থাকতে পারে। এর পরেও আমার কথা কিছু বলার থাকে? অনেকেই বলেছে লালুই তনুর জীবনটা নষ্ট করেছে। এখন, এই বুড়ো বয়সে এসে আমি বলি, এ কথাটা ঠিক নয়। কেউ কারুকে নষ্ট করতে পারে না, নষ্টের বীজ আমার মধ্যে ছিল। লালু তাতে জল ছিটিয়েছে, সার দিয়েছে মাত্র। আমি মদে না ডুবলে, জুয়ার আড্ডায় রাত না কাটালে জোর করে আমায় কেউ ওসব করাতে পারত? পারত না।

যাক, শেষ কথাটা না বলা রেখে মরতেও পারি না। আমি তনু রায় এখন ভেঙে ফেলা ব্যারাক বাড়ির কঙ্কালের মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘরটাতে শুয়ে আছি। আমাদের বাড়িটাকে প্রমোটারের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বড়দার মৃত্যুর আগেই সব ব্যবস্থা। ভাইরা নগদ টাকা নিয়ে যে যার মত গুছিয়ে নিয়েছে। আমার ভাগের টাকা আমার ছেলে বাবাইকে কিছু পাঠানো হয়েছে। বাকি টাকা ব্যাঙ্কে রেখে তার সুদে দু'বেলার খাবার জোটাই। মদ খাওয়ার পয়সা পাই না, পেলেও আর খাবার ইচ্ছে নেই। প্রমোটার দয়া করে এই লম্বা ঘরটায় থাকার অনুমতি দিয়েছে। আমার বয়স এখন পঁয়ষট্টি, চোখে ছানি পড়েছে, কাটাতে ভয় পাই, হাঁটুতে জোর নেই, হাঁটতে ভয় পাই। বন্ধু বলতে কেউ নেই, না একজন আছে, তার কথা বলা হয়নি। বলা যখন হয়নি তখন আর নাইবা বললাম।

এই পরিত্যক্ত, নির্জন বাড়িটার মধ্যে পরিত্যক্ত নির্জন মানুষটাও শেষের দিন গুনছে। দিন গোনার আগে অন্তত ছেলেটার মুখ দেখতে চায় সে, কোথায় আমার ছেলে?

# নদীর সঙ্গে ডেটিং

## সোহরাব হোসেন

দু'চোখে তন্দ্রা নামলে আজকাল নদীর স্বপ্ন দ্যাখে অন্বিতা। জোয়ার-পর্ভা ভরাট অ্যাক নদী ছলাৎ-ছল ঢেউ নাচিয়ে তার চোখ-গড়িয়ে সটান বিছানার ওপরই য্যানো উঠে আসে। আগেও যে দেখতো না তা নয়। দৈবি-সৈবি মামা-বাড়ির পুব-ধার ঘেঁষে পুষি বিড়ালের মতোন বয়ে যাওয়া শান্ত নদীটিকে ঘুমের মধ্যে দেখতো। কিন্তু অ্যাখনকার দ্যাখ্যাটা অন্যরকম। বিশেষ করে সুকেশের সঙ্গে বিয়ের পরের এই ছ'মাস নদীর সঙ্গে মিলনটা য্যানো রুটিন হয়ে গেছে। সন-তারিখের হিসেব নিলে বলতে হয় যেদিন স্বামীর সঙ্গে তার নদী-বাতিক নিয়ে মনান্তর হয়েছিলো সেদিন থেকে তন্দ্রা নদী তার বিছানায় আসতে শুরু করেছে। আসলে অ্যাক ছুটির রবিবারে নদীর স্বপ্ন নিয়ে কথা বলতে গিয়েই বিপত্তি বেধেছিলো :

—আমাকে নদীর কাছে নিয়ে যাবে সুকেশ। —অন্বিতা আব্দার জানিয়েছিলো।

—না। —সুকেশ ল্যাপটপে কীসের য্যানো অ্যাকটা হিসাব মেলাতে-মেলাতে জবাব দিয়েছিলো।

—না ক্যানো? —অন্বিতা সুকেশের বাহু টেনে নাড়িয়ে দিয়েছিলো—নদী-সহবাস আমার দারুণ লাগে, বুঝলে?

—আমার লাগে না।

—নদী ভালো লাগে না?

—না।

—তবে কী ভালো লাগে?

—নারীর সঙ্গে সহবাস। বিশেষ করে পরনারী।

—মানে?

—মানেটা বুঝছো না? —সুকেশের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ও কাঠিন্য ঝরেছিলো—বিয়ের আগে কখনও কারও সঙ্গে ডেটিং করো নি? হেভি? আমি করেছি। সে কথাই বলছি। নদী নয় নারীই আমার পছন্দ।

—এসব বলছো কী তুমি? —অন্বিতা আকাশ থেকে পড়েছিলো।

—যা সত্যি তাই বলছি। বিয়ের আগেও করেছি। অ্যাখনও করি। পরেও করবো।

—না তুমি ওসব করো নি। অন্বিতা প্রতিবাদ করেছিলো—তুমি আড্ডা মারছো। এসব মিথ্যে। বানানো।

—না অন্বি। সব সত্যি। —ল্যাপটপ থেকে চোখ তুলে গাঢ়ো-স্থির চোখে তাকিয়ে যোগ করেছিলো সুকেশ—মাস গেলে পঞ্চাশ হাজারের বেশি বেতন পাই। সকাল আটটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত ডিউটি করি। বিনোদনের অন্য পথ নেই। এসব তো করতেই

হয়। না-করলে বাঁচবো কী করে? তুমি তো আগে এ দুনিয়ায় ছিলে না। তাই অবাক হচ্ছো। কদিন যাক, তুমিও অভ্যস্ত হবে এতে।

—চুপ করো প্লিজ। —অঙ্কিতা দু'কানে আঙুল দিয়েছিলো।

—না। —সুকেশ অঙ্কিতার হাত টেনে কান থেকে নামিয়ে দিয়েছিলো—শোনো তুমি শুনে রাখা দরকার। না-হলে ভুল বোঝাবুঝি বাড়বে; এটাই আমার লাইফ-স্টাইল তোমাকে মানিয়ে নিতে হবে।

—ঠিক আছে!

বলেই অঙ্কিতা দৌড়ে ঘর ছেড়ে বাথরুমে চলে গিয়েছিলো। দরজা এঁটে বমি করার চেষ্টা করেছিলো। পারে নি। চোখে-মুখে জল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখেছিলো ততোক্ষণে কাজে ডুবে গেছে। স্বাভাবিক।

এর দিন পনেরো পর সুকেশ অফিসের কাজে বাইরে, বাঙ্গালোরে চলে গিয়েছিলো। আর একা-একা অঙ্কিতা নদী-সর্বস্ব হয়ে পড়েছিলো। কী আলাতন কী অফিসে, কী তার ফ্ল্যাটে, কী অফিস যাওয়া-আসার পথে গাড়িতে, তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেই নদীর স্বপ্ন দ্যাখে। নদী এসে ভাসিয়ে দ্যায় সব। ঘর-দোর, বিছানা-পত্তর, এমনকী তার দেহও। য্যামন অ্যাখন হলো। স্বপ্ন-জলে ভিজে সম্বিত ফিরতে সে শুনলো একটি শিশু হাসছে।

হ্যাঁ একটি শিশু হাসছে। বারবার।

অঙ্কিতা তাকে হাসতে দেয়। অনেকক্ষণ। সে জানে শুনে-শুনে বারো বার হাসবে মেয়েটি। তারপর থেমে যাবে। হাসিটা শোনার লোভ অঙ্কিতার বুকের ভেতর থেকে উজিয়ে ওঠে। তাই বাচ্চাটি হাসতে শুরু করলে সে আকুল শুনতে থাকে। ন'বারের পর দশবারে পড়লে সুইচ-টিপে হাসিটাকে থামিয়ে অঙ্কিতা আদুরে গলায় ডায়ালগ শুরু করে :

—হ্যালো। কে বলছেন।

—আপনি কে বলছেন? —ওদিক থেকে গাঢ় এক পুরুষকণ্ঠের পাল্টা জিজ্ঞাসা স্বর ভেসে আসে।

—আমি যেই হই, আপনার পরিচয় দিন। —অঙ্কিতা সামান্য বিরক্ত হয়—ফোনটা তো আপনিই আগে করলেন।

—বাহ্ রে! মজা তো! —ওপারের গলায় যেন মজা-নেওয়ার আভাস—রিং-টোন শুনে আমিই তো আপনার নাম্বার রিসিভ করলাম।

—তা কী করে হয়!

—আমারও তো একই প্রশ্ন। কে আপনি?

অঙ্কিতা আর কথা বাড়ায় না। পুটুস করে বোতাম টিপে মোবাইলের কণ্ঠরোধ করে। কেমন একটা অলস দৃষ্টিতে যন্ত্রটার দিকে এক-লহমা তাকিয়ে খাটের ওপর ছুঁড়ে ফ্যালে। তারপর চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়ে। দেয়ালে সেঁটে থাকা ঘড়ির দিকে তাকায়। রাত

এগারোটা বেজে পঁয়তাল্লিশ। চমকে ওঠে অঙ্কিতা। রাত যে অ্যাতোটা গাঢ়ো হয়েছে ভাবেনি। তাই চটপট উঠে পড়ে। অ্যাখনও অনেক কাজ বাকি। জামাকাপড় ছাড়তে হবে। খাবার-দাবার গরম করতে হবে। ড্রেসিং-টেব্‌ল-এ বসে, দীর্ঘদিনের অভ্যাস, একটু রূপটান করতে হবে। শুতে যাওয়ার আগে টুকিটাকি দু'একটা ফোন করতে হবে। —মনের মধ্যে এক-দুই-তিন করে সব ছকে নিয়ে যেই-না অঙ্কিতা বাথরুমের দিকে পা ফেলেছে অমনি মোবাইল শিশু ফের হাসতে শুরু করল। অঙ্কিতা তড়িত পিছন-ঘুরে ফোনটা তুলে নিলো। খর-চোখে দেখলো আগের নম্বরটা থেকেই 'কল'-টা এসেছে। মুখ কুচকে গ্যালো। একবার ভাবলো কেটেই দেবে লাইনটা। পরক্ষণে মতি-বদলে ফোনটা ধরলো—'হ্যাঁ বলছি।'

ওপর থেকে কোনও প্রত্যুত্তর এলো না। বরং শোনা যেতে লাগলো দুই নারী-পুরুষের অনর্গল ডায়ালগ-বিনিময়। কলকল কথা বলে যাচ্ছে নারীকন্ঠ। পুরুষটিও। এক লহমা শুনেই অঙ্কিতা বুঝে ফেললো গাঢ় পেমালাম চলছে। না, প্লেটনিক বা রোমান্টিক নয়; তুমুল দেহ-বাজনের মাদল-বোল উঠছে ডায়ালগে। অঙ্কিতা আবারও বার-কতক 'হ্যালো-হ্যালো' করলো। না অন্য-দুপ্রান্তে তার সামান্যতম অভিঘাতও পড়লো না। প্রেমিক-প্রেমিকা ঘ্যামন চালাচ্ছিলো ত্যামনই চালিয়ে যাচ্ছে দেহলীলার বিশ্লেষণ।

অঙ্কিতা বুঝলো ক্রশ-কানেকশন হয়ে গেছে। কান থেকে নামিয়ে লাইনটা কেটে দিতে গিয়েও দিলো না সে। দেহরসের বোধহয় অদ্ভুত একটা মাদকতা আর কৌতূহলোদ্দীপক আকর্ষণ-ক্ষমতা থাকে। থাকে সঞ্চারী ক্ষমতাও। অঙ্কিতার মধ্যে, দেহের শিরায় আর কামনা-কেন্দ্রে, ক্যামন য্যানো একটা শিরশিরে অনুভূতি নেচে গ্যালো। সে পুনর্বার যন্ত্রটা কানে তুললো। শুনতে পেলো আদম-ইভের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের স্পর্শ-পাওয়া সব কথাকলি :

—আমার সঙ্গে শুয়ে তুমি সুখ পেয়েছো মণি? —পুরুষ কন্ঠ জানতে চাইলো।

—ধ্যাস। —মণি নাম্নী নারীটি সেক্সি-কন্ঠে শব্দ তুললো।

—ক্যানো ধ্যাস ক্যানো?

—এসব আবার মুখে তুলে বলতে হয় না বলা যায়?

—ক্যানো বলা যায় না ক্যানো?

—মেয়েরা এসব বলে না।

—বলে। খুব বলে। বারবার বলে। ডায়নার ডায়রি পড়ো নি। ও মহিলা তো তার সঙ্গে শোওয়া পুরুষদের সুখ-প্রদান ক্ষমতার গ্রেডিং পর্যন্ত করে দিয়েছে।

—ওসব বিদেশী নারীরা পারে। আমরা পারি নে।

—নারীর কোনও দেশ-বিদেশ হয় না। নারী নারীই। —পুরুষটি হঠাৎ কথার বাঁক ঘুরিয়ে দ্যায়—তা ছাড়া এই আই.টি.—বিশ্বায়নের নারীরাও পিছিয়ে নেই। বস্তাপচা মূল্যবোধ আর সেন্টিমেন্টে কেউ আর আটকে নেই। বিছানার খ্যালায় তোমরাই তো অ্যাখন অগ্রণীর ভূমিকা নিচ্ছ। ঠিক তো?

—তা ঠিক।

—তবে অ্যাতো দ্বিধা ক্যানো? কথা বলো। বোল ফোটাও মুখে।
নারীটির মুখে ক্যামন বোল ফোটে তা শোনার আর ধৈর্য দ্যাখালো না অঙ্কিতা। বে জোরের সঙ্গে 'ক্যানসেল'—বাটমে চাপ দিয়ে মোবাইলটা বন্ধ করে দিলো। তারপর এক আগের কায়দায় যন্ত্রটাকে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিলো। কানটা ঝাঁ-ঝাঁ করছে। হৃদপিণ্ডে গতিটা অনেকখানি বেড়ে গেছে। ভরাট স্তন সমেত বুকের ওঠা-নামায় তার প্রমাণ পাচ্ছে অঙ্কিতা। চোখ বুজে পরিস্থিতিটা সামাল দিতে চাইলো। এবং চোখ বুজতেই বিপত্তি চোখের পর্দায় ভেসে উঠলো সুকেশের মূর্তি। পেশিবহুল হাত-পা-পিঠের দুধে-আলত রঙের ওপর স্বাস্থ্যের রেশম-নরম লোমরাজির কেয়ারিতে সমৃদ্ধ স্বামী তার সমস্ত মং জুড়ে হাজির হলো। কামনার গন্ধে ভরে যেতে লাগলো অঙ্কিতার সারা-দেহ-মন। মাথায় উঠলো জামা-কাপড় ছাড়া, মাথায় উঠলো খাওয়া-দাওয়া। অঙ্কিতা আবার ফোন নিয়ে মেতে উঠলো। পটাপট বোতাম-টিপে ধরলো এ মুহূর্তে অফিসের কাজে বাঙ্গালোরে থাক সুকেশকে—'শোনো, তুমি এক্ষুনি বাড়ি এসো।'

—ক্যানো? —সুকেশ প্রাথমিক বিহ্বলতায় জানতে চাইলো—কী হয়েছে? কোনং বিপদ?

—না। —অঙ্কিতা দ্রুত বলে ওঠে—না-না বিপদ-টিপদ না।

—তবে?

—তোমাকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছা করছে তাই। কালই চলে এসো, প্লিজ।

—ওহ্, এই কথা। —সুকেশ ওপার থেকে হেসে ফেলে—বাঙালিনীর সেন্টিমেন্ট।

—সেন্টিমেন্ট ক্যানো সুকেশ। এটা আমার ইচ্ছা। স্বামীর কাছে স্ত্রীর দাবি। তোমাকে আসতেই হবে।

—আপিসের কাজটার কী হবে? যে বিশাল কনট্রাক্টের দায়িত্ব নিয়ে আমি এখানে এসেছি তার কী হবে?

—জানি নে।

—জানিনে বললে তো চলবে না। আমি-তুমি দু'জনেই কর্পোরেট দুনিয়ার লোক। এ জগতে ব্যক্তিগত ইচ্ছার থেকে কোম্পানির দায়িত্ব অগ্রাধিকার পায়—এটা জানো তো?

—জানি।

—তবে ছেলেমানুষি ক্যানো?

—বেশ ছেলেমানুষি করবো না। কিন্তু তোমাকে যে এ মুহূর্তে খুব পেতে ইচ্ছা করছে।

—কিচ্ছু করার নেই। আমার ফিরতে অ্যাখনও মাসখানিকের ধাক্কা।

—তোমার মন নেই সুকেশ? দেহ?

—আছে?

—তা'লে?

—তা'লের উপায়টাকেই তো হোটেলের ঘরে বসে সাজাচ্ছি।

—কী রকম?

—লাইম আর ভদকা নিয়ে বসেছি। কেব্‌ল্‌-লাইনটা খুলবো এবার। বেশি রাতে নীলছবির দরজা খুলে যায়। দেখি ঢুকতে পারি কিনা।

—কী বলছো তুমি?

—এতে আশ্চর্য হবার কী আছে। যুগ বদলেছে অঙ্কি। —সুকেশ গম্ভীর গলায় বলে—ছাড়ো এসব। রাত বেড়েছে। শুয়ে পড়ো। বাই।

ওপার থেকে লাইনটা কেটে দেয় সুকেশ। অঙ্কিতা কোনও কথা বলতে পারে না। পারে না নয় বলে না। ক্যামন ্যানো পাথর-পাথর দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের মাস-ছয়েকের দাম্পত্য-জীবনে আজ এ-মুহূর্তে সুকেশকে একটু অন্যরকম লাগলো তার। একটু ্যানো অচেনা লাগলো।

কপালে দুশ্চিন্তার বলি ফুটলো কি তার? কী জানি। ফুটুক-না-ফুটুক ঠোঁটে ফুটলো ফিসফিসানির বোল—'যতো নষ্টের গোড়া ঐ ক্রশ-কানেকশনটা। যন্ত্রগুলো কোথা থেকে যে কী ঘটায়...!' —কথা থামিয়ে অঙ্কিতা স্নানঘরে ঢুকে গ্যালো।

ক'দিন অফিসে খুব মন-মরা অঙ্কিতা। ক্যামন ্যানো উদাসীনতায় পেয়ে বসেছে। ফলে কখনও যা হয়নি অ্যাখন তাই হচ্ছে। অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আগে ন'টা-টু-নটা ডিউটি সে কাঁটায়-কাঁটায় পালন করতো। অ্যাখন পারছে না। তার ওপর রোজ রাতে ঐ এক জ্বালা হয়েছে। রাত বারোটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি যখন ঠিক তখনই তারই মোবাইলে ঐ ক্রশ-কানেকশনটা আসবেই। আর অঙ্কিতা বশ-হওয়া প্রাণীর মতো সেটা ধরবেই। নেশার মতোন হয়ে গেছে ব্যাপারটা। তারপর শুনতে থাকবে দুই নারী-পুরুষের দেহ-মিলনের খোলম্যালা আলাপচারিতা। শুধু দুই নারী-পুরুষের ক্যানো তাদের একাধিক সঙ্গী-সঙ্গিনীর সঙ্গে বিছানা-বিলাসের ধারাবাহিক খাবর-কাটার বিবরণ কোনও-কোনওদিন শেষরাত পর্যন্ত জেগে থেকে শুনেছে অঙ্কিতা। শুনতে-শুনতে তাদের চিনেও ফেলেছে সে। পাত্রপাত্রী দু'জনেই তার অফিস-কলিগ—মণিকুন্তলা ও হিতেশ। চিনে ফ্যালার পর থেকেই অঙ্কিতা দু'জনের চলাফেরার দিকে গোয়েন্দাগিরি নজর দিতে শুরু করেছে। যতো নজর দিয়েছে ততোই বিস্মিত হয়েছে। না অফিস-চত্বরে তাদের রাত্রি-আলাপনের কোনও ছায়াটি পর্যন্ত তারা পড়তে দ্যায় না। আর পাঁচজনের সঙ্গে য্যামন হাই-হ্যালো করে কাজে ডুবে যায় নিজেদের মধ্যেও ত্যামন। না কোনও হেলদোল অন্তত অঙ্কিতার নজরে পড়েনি একটি মাত্র ক্ষেত্র ছাড়া। গত ক'দিন ধরে দ্যাখা যাচ্ছে হিতেশ নানা-অছিলায় তার কাছ-ঘেঁষতে চাইছে। দিনে অন্তত একটিবার হিতেশ তাকে ডাকবেই। ডেকে একটু চটুল আড্ডা মারবেই।

এতে অবশ্য অঙ্কিতা ঘাবড়ায় না। এ দুনিয়ায় ঢুকলে এটা যে ফেস্‌ করতে হয় তা জানে। জানে কীভাবে পাশ-কাটাতে হয়। তার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু কথা খরচও করতে হয়। সেই কথা খরচের সূত্রে সে অ্যাখন আঁচে নিতে পেরেছে যে, মণি হিতেশ জেনে-বুঝেই বোধ হয় রাতের ক্রশ্‌ কানেকশানের কাণ্ডটা ঘটায়। ব্যাপারটা নিয়ে

সুকেশের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আশাভঙ্গ হয়েছে তার। এসব ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা না-ঘামিয়ে মন দিয়ে অফিস করতে বলেছে সে। স্বামীর কথামতো বেশ ক'টা দিন করে অফিস করেছে। ফের সেটা করতে গিয়েই পড়েছে আরও বড়ো একটা গাড্ডায়। লেডিস-কমন-রুমে একদিন মণিকুন্তলার মুখোমুখি হয়ে গালে থাপ্পড় খেয়েছে। সুকেশের সঙ্গে মণিকুন্তলার এক সময়কার মাখামাখির কথা শুনতে বাধ্য হয়েছে। কথা শুরু করেছিলো মণিই—'হাই অঙ্কিতা ক্যামন আছো?'

—আছি অ্যাকরকম! —অঙ্কিতা পাশ কাটাতে চেয়েছিলো।

—তার মানে? —মণি অঙ্কিতার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিলো—অ্যাতো হতাশা কীসের সিস্টার?

—হতাশা ক্যানো হবে? আসলে তোমার ডায়নমিক জীবনের পাশে আমারটা পাত্তা পায় না বলে অমন বললাম।

—তাই বলো। —মণি নিজের দু'কাঁধ ঝাঁকিয়েছিলো—চৌকস লোকের কাঁধেই তো বন্দুকটা রেখেছো অঙ্কিতা। সুকেশদা আমাদের কোম্পানির সব থেকে ব্রাইট পুরুষ।

—বলছো?

—হ্যাঁ বলছি। বলছি সুকেশদা সব দিকেই তুখোড়। জিনিয়াস। বিছানায় তোমাকে যা মজা দেবে...সেটাও যথার্থ।

—তাই নাকি? —মুখ ফসকে অঙ্কিতা বলে ফেলেছিলো—অভিজ্ঞতা আছে নাকি তোমার?

—বিলকুল। —মণি স্মার্ট জবাব দিয়েছিলো—প্রমাণ নেবে?

—নেবো। —স্বামীর প্রতি অগাধ-বিশ্বাসী অঙ্কিতা আবারও বলে উঠেছিলো।

—শোনো তবে।

মণিকুন্তলা ক'সেকেন্ড চোখ বুজে ছিলো। তারপর শরীর নাচিয়ে বলেছিলো—'শৃঙ্গার পর্ব শেষ করে নারীদেহে নীত হবার চরম মুহূর্তে সুকেশদা' নিজের বুকে 'নিপিল' দু'টো ধরে নিজে-নিজে একটু চাগিয়ে ওঠে তাই না?'—বলেই চলে গিয়েছিলো মণি। অঙ্কিতা বোবা হয়ে গিয়েছিলো। মণি যা বলে গেছে তা যথার্থ। অভ্রান্ত। তার মানে...! দু'হাতে চোখ চাপা দিয়ে ভিতরের আলোড়ন সামলেছিলো অঙ্কিতা। সে-রাতেই ফোনে সুকেশের কাছে এ প্রসঙ্গ পাড়তেই হুকা হাঁকিয়েছিলো সুকেশ—'দেহ নয় ভারতীয় নারীদের অ্যাখন মনের সতীত্বে বিশ্বাস করা উচিত।'

—আর পুরুষদের? —অঙ্কিতা ফুঁসে উঠেছিলো।

—আমাদের ক্ষেত্রও একই কথা।

—ঠিক আছে।

বলেই লাইন কেটে দিয়েছিলো সে। সুইচ-অফ করে মোবাইলটাকে স্তব্ধ করেও রেখেছিলো। ল্যান্ড-ফোনটাকে অনবরত বেজে যেতে দিয়েছিলো। ধরেনি। শুধু ভেবেছে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো অফিস করেছে। ইচ্ছা করে 'লেট' করেছে। শেষতক, খ্যালাচ্ছলেই ফোন-

মেমোরিতে থাকা বন্ধু-বান্ধবের নামের তালিকায় চোখ বোলাতে-বোলাতে সপ্তদীপার নামে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। তার এক সময়ের প্রাণ-সখী। ছাত্র জীবনে অ্যাকদিন না-দেখলে একে-অপরের প্রাণ-ওষ্ঠাগত অবস্থা হতো। সাত-পাঁচ না-ভেবে অম্বিতা তাকেই ধরলো। ধরামাত্র প্রাণের সুরে বেজে ওঠা রিং-টোন—'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও হে!' — রবীন্দ্র সঙ্গীতের আহ্বান। সেকেন্ড কয় বাজার পরই ওপারের উচ্ছ্বাস'—'বল অম্বিতা। ভালো আছিস তো?'

—না! —একটুও না-ভেবে সত্যি কথাটাই বলে দিয়েছিলো অম্বিতা।

—ক্যানো? কী কষ্ট তোর?

—ফোনে বলবো না। অ্যাকদিন সময় দিবি একটু?

—অবশ্যই! —সপ্তদীপা আগ্রহ দেখিয়েছিলো—আজই আয় না!

সেদিন অফিস কামাই করে দুই বন্ধুতে মিলেছিলো। মিলেছিলো সপ্তদীপার অফিসে। একটি বে-সরকারি এন.জি.ও-তে কাজ করে সপ্তদীপা। শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে থাকে সারাদিন। সংস্থাটির নাম সংগ্রামশীলা। মূলত বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর শিক্ষা-সেলের থেকে অনুদান নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করে সংস্থাটি। সপ্তদীপারা পিছিয়ে পড়া শ্রেণির ছেলেমেয়েদের মধ্যে কাজ করে। অ্যাকপলক দেখেই অম্বিতা বুঝে নিয়েছিলো বেশ মজাতেই কাজ করে সপ্তদীপা। তবু নিশ্চিত হবার জন্য প্রশ্ন রেখেছিল সটান—'তুই বেশ মজাতেই আছিস, বল, দীপা?'

—তা আছি! —এক ঝলক হেসে জবাব দিয়েছিল সপ্তদীপা—রাজ্যের সব ছেলেপিলে নিয়ে কারবার তো। বেশ আনন্দ পাই।

—কী রকম?

—এটা তো অ্যাক কথায় বলতে পারবো না। না-দেখলে বুঝতে পারবি নে। অ্যাকদিন নিয়ে যাবো একটা স্কুলে। দেখবি কতো বিচিত্র আমাদের এ বাংলা।

—সে যবে যাবো-যাবো। অ্যাখন একটু আন্দাজ দে।

—শোন তবে। ...আমরা অ্যাখন মাদ্রাসা-স্কুলগুলোতে কাজ করছি। বোর্ডের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। দশটি মাদ্রাসাকে মডেল করার দায়িত্ব আমাদের। মূলত গ্রামের মাদ্রাসা গুলোতেই চলছে কর্মকাণ্ড।

—কী ধরনের কাজ?

—'জয়ফুল-লার্নিংয়ের কাজ। শিক্ষা যাতে শিশুর কাছে বোঝা না হয়, শিক্ষাকে সে যাতে ভয় না করে আমরা সেটা দেখি। বলতে পারিস বিকল্প একটা পথে শিক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছানো।

—এতেই মজা পাস?

—পাই তো! এতে তো যান্ত্রিকতা নেই। আমাদের ক্লাশগুলোতে মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করি। লেকচার মেথড্ বাদ দিয়ে ইন্টারাক্শনের মাধ্যমে ছাত্রের সামর্থ্যকে বুঝে নিই। এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে বুঝে নিই অ্যাক-অ্যাক এলাকায় অ্যাক অ্যাক রকম

সমস্যা। আমরা গবেষণা করে এলাকা-অনুযায়ী নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিই। সফল হলে আনন্দ পাই।

—শুধু পড়িয়েই আনন্দ?

—না। জানারও আনন্দ আমরা পাই। আমাদের বাঙালি জীবনের অ্যাকটা অং সম্পর্কে আমরা যে কতো অজ্ঞ ছিলাম তা মাদ্রাসায় কাজ না করলে জানতাম না ভাই সীমাহীন দারিদ্র্য, অবহেলা আর অভিমান নিয়ে অ্যাক দল বাস করছে। অথচ...—যাব সে কথা। এসব বাদ দে। বল তোর কথা বল? কী সমস্যা?

সপ্তদীপার কথাগুলো গোগ্রাসে গিলছিলো অঙ্কিতা। বুঝতে পারছিল চিন্তাচাপহীন নির্ভার সহজ জীবনের আনন্দ চলে যাচ্ছে তার জীবন-নৌকা। তারপাশে নিজের জীবনট তার টালমাটাল অবস্থায় সংসারসমুদ্র সাঁতার দিচ্ছে। তুলনা করতে-করতে একটা হোঁচা খেলো অঙ্কিতা। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সব বললো। ধীরে ধীরে।

সপ্তদীপা সুগভীর মনোযোগ সমস্তটা শুনলো। অনেকক্ষণ চুপ মেরে থাকলো। অ্যাকট সময় একটু চোখ বুজেও কী সব ভেবে নিলো। তারপর আনমনেই কিছু কথা বলে গ্যালো—'কর্পোরেট দুনিয়ার টাকা অনেক। সুখও অনেক। অনেক হাই-কাই ব্যাপারও আছে। পাশাপাশি ভোর থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত চাপ আছে। অনিশ্চয়তা আছে। অসম্ভব প্রতিযোগিতা আছে। কিন্তু শান্তি নেই। ব্যক্তিগত জীবন বলেও তোর কিছু থাকবে না রে অঙ্কি!'

—নেই তো। —অঙ্কিতা লাফ-মেরে উঠলো—অফিস থেকে মাঝরাতে বাড়ি ফিরেও নিজেকে নিয়ে একটুও থাকতে পারি নে।

—ক্যানো? —সপ্তদীপা কৌতূহলে জানতে চায়।

—অফিসের দুই কলিগ, আমার মনে হয় ষড়যন্ত্রই এটা, মোবাইলে নিজেদের মধ্যে যাচ্ছেতাই আলোচনা করে। আর আমি সেটা শুনতে বাধ্য হই।

—ক্যানো বাধ্য হোস ক্যানো?

—ওদের লাইনের সঙ্গে আমার লাইনটা ক্যামন করে য্যানো জুড়ে যায় দীপা। ওরা শোওয়া-শুওয়ি, মানে শৃঙ্গার-টার নিয়ে কথা বলে।

—তুই শুনিস ক্যানো? ফোন বন্ধ করে দিস নে ক্যানো?

—দিতে চাই। কিন্তু পারি নে। নিষিদ্ধ নেশার মতোন হয়ে গেছে ব্যাপারটা।

—অ্যামন চললে তো তুই পাগল হয়ে যাবি অঙ্কি।

—আমি বিপর্যস্ত দীপা। —হঠাৎ অঙ্কিতা সপ্তদীপার কাঁধে মাথা রাখে—ওদিকে সুকেশের ঐ ব্যবহার...!

হাউ-হাউ কেঁদে ফ্যালে অঙ্কিতা। ফুলে-ফুলে ওঠে তার শরীর। দমকে-দমকে কাঁদে। সপ্তদীপা নীরব থাকে। ক'মুহূর্ত কাঁদতে দ্যায়। তারপর দু'হাতে ঝাঁকিয়ে সোজা করে বসায় অঙ্কিতাকে। চোখের জল মুছিয়ে দ্যায় আলতো করে। পিঠে আদরের চাপড়ও মেরে দ্যায় ক'টা। তারপর বলে—'শান্ত হ। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

—নারে দীপা। কিছু ঠিক হবে না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। ক্যামন য্যানো অ্যাকটা অসুস্থতার গন্ধ কেবলই নাকে ঢুকে যাচ্ছে।

—ধ্যাস পাগলি। সুকেশদার অতো বড়ো চাকরি। তোরটাও মন্দ নয়। অসুস্থতা কোথায়?

—মনে।

—মনের সুস্থতা চাই তোর?

—চাই।

—তবে মনস্থির কর।

—কীসে?

—আমাদের সংগ্রামশীলায় 'জয়েন' কর। দেখবি জীবনটা কত আনন্দের হয়। আসবি আমাদের সঙ্গে?

না, তৎক্ষণাৎ কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি অঙ্কিতা। মনে তখন প্রবল দ্বন্দ্ব। একদিকে কর্পোরেট দুনিয়ার ঝাঁ-চকচকে স্থিতি। স্মার্ট জীবন। অন্যদিকে অনাবিল আনন্দ। নির্মল শান্তি। একদিকে সুকেশের মতামত অন্যদিকে হাজারো শিশু-কিশোরের কলরোল। অঙ্কিতা বাড়ি ফিরে এসেছিলো। বিকেল থেকে মাঝরাত্তির পর্যন্ত দীর্ঘ-সময় ভাবনার কাটাকুটি খ্যালায় ডুবেছিলো। শুধু ডুবে ছিলো না শতরঞ্চ-খ্যালার গলি-ঘুজিতে যাতায়াতও করছিলো। করছিলো আর কান শুনছিলো। ঘড়িতে বাজতে-বাজতে ঠিক বারোটা বাজতে পনেরো হলে মোবাইলটার বাজনা শোনার জন্য উদগ্রিব হচ্ছিলো। বলতে-বলতে ফোনটা বেজে উঠলো। ছোঁ-মেরে ধরলো অঙ্কিতা। বোতাম টিপে কানে ধরা-মাত্রই ক্রশ্-কানেকশনের-সেক্সি-সেক্সি ডায়ালগ। অঙ্কিতার কান গরম হলো। হওয়ামাত্রই সজোরে ক্যানসেল-বাটম টিপে ধরলো। বেশ খানিকক্ষণ। য্যানো গলা-টিপে হত্যা করছে কাউকে। অতঃপর সব কিছু চুকে-বুকে গেলে বোতাম-টিপে সুকেশকে ধরলো—'শোনো আমি আই.টি. সেক্টরের চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছি।'

—হঠাৎ? —সুকেশ বোধ হয় খানিকটা অপ্রস্তুত কথা ছাড়লো—ক্যানো কী হয়েছে?

—কিচ্ছু হয়নি। এমনিই।

—তো কী করবে?

—এন.জি.ও.-তে, মানে অ্যাকটা শিক্ষামূলক সংস্থায়, জয়েন করবো।

—আমি রাজি না। আমার মত নেই।

—তোমার মত মেনে চলাটা কি জরুরি, খুব?

—হ্যাঁ।

—ক্যানো?

—ক্যানোর উত্তর দেবো না।

—দেবে না মানে?

—দেবো-না মানে দেবো-না।

—পৌরুষে লাগছে?

—ভাবতে পারো।

—বেশ ভাবলাম। ভাবলাম এবং জানিয়ে দিলাম—যা ভেবেছি তাই করবো। লাইন-কেটে সত্তদীপাকে ফোন করলো অঙ্কিতা। সটান জানিয়ে দিলো সব। তারপর বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকলো। অনেকসময়।

দু'দিন যেতে-না-যেতেই কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গ্যালো। অফিস-কলিগরা শুনে বললো—'মাথাটা গেছে'। পড়শিরা, গ্রামার-জগতের চাপ নিতে পারলো না, বলে মত দিলো। সুকেশের সঙ্গে ফোন বারকতক ঝগড়াই হয়ে গ্যালো। শেষ বার তো কাটাকাটিই হলো অ্যাক চোট :

—আমি তোমাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি অঙ্কিতা, ওসব ছেড়ে দাও। —সুকেশ ঝাঁঝালো গলায় হুকারই দিয়েছিলো।

—ওসব মানে? —অঙ্কিতা পাল্টা দিতে গিয়ে হিমশীতল কণ্ঠ ছেড়েছিলো।

—ওসব মানে ওই ওদের সমাজে মেলামেশা।

—মানে?

—ওদের জাতটাকে তো জানো, বজ্জ সমাজবিরোধী, সন্ত্রাসী অপরাধী সব।

—না-জেনে কারও সম্পর্কে এসব বলতে নেই।

—যা সত্যি তাই বলছি।

—সত্যির নানা মুখ, অনেকগুলো পিঠ। সব কথা না-জেনে কিছু বলা-কওয়া অনুচিত।

—তুমি কি সব জেনে ফেলেছো নাকি?

—না। তবে জানতে চাইছি।

—বেশ জানো। —ওপার থেকে সুকেশ বাণটা মেরেছিলো—সঙ্গে-সঙ্গে এটাও জানো ত্যামন হলে তোমার সঙ্গে আমি আর থাকবো না।

—সুকেশ।

অঙ্কিতা আহত শব্দ ফেটেছিলো। মুহূর্ত কয় স্তব্ধ হয়ে গেছিলো। ফের যখন কথা শুরু করেছিলো তখন যন্ত্রটা মরে গেছে। ফোন ছেড়ে দিয়েছিলো সুকেশ। তারপর বেশ কদিন চেষ্টা করেও সুকেশের সঙ্গে কথা বলতে পারেনি অঙ্কিতা। পারেনি বলে বসে থাকেনি। সত্তদীপার সঙ্গে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শুরু হওয়া কর্মশালায় গেছে। মাটির গন্ধমাখা শিশুদের মধ্যে মিশেছে। মা-বাবার সঙ্গে পরামর্শ করেছে। বাবা-মা একাকী থাকার বিপদের সঙ্কেত দিয়েছে। সে-সব নিয়ে বিস্তর ভেবেছে। ডিভোর্স নিয়ে একা-থাকা ক'জন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছে। দেশে-থাকা রাগা-সহেলা ও বিদেশে থাকা অনিমার জীবনের আদ্যোপান্ত শুনেছো। যতো শুনেছে ততোই নিজের মতো করে চলার জিদটা একরোখা হয়েছে। ফের অনিমা যা বলেছে তাতে উৎসাহিতই হয়েছে। উৎসাহে-উৎসাহে সেদিন রাতে ফের-অ্যাকবার ক্রশ-কানেকশনে কান পেতেছে :

—দেহের ব্যাপারটা তোমার কাছে খুব যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে মণি।

—মানে?

—ক্যামন য্যানো রুটিন-রুটিন হয়ে যাচ্ছে। তোমার মন নেই মণি?

—না।

—শুধুই দেহ?

—না তাও না।

—তালে?

—যন্ত্র আছে, যন্ত্র।

—মানে?

—যৌনতার দাবি তো অ্যাখন প্রথম-দুনিয়ার নারীপুরুষ যন্ত্র দিয়ে মেটাচ্ছে। লিভ-টুগেদারের স্টেজ পেরিয়ে যন্ত্র-টুগেদার। বুঝেছো? চাহিদা হলে মেশিন চালিয়ে আনন্দ করে নিচ্ছে মানুষ। আমরাও নেবো।

—বলছো কী?

—বলছি দেহ নাই, মন নাই কেবল যন্ত্র আছে হিতেশ।

ক্রশ-কানেকশনের ডায়ালগ শুনে অ্যাতোদিনে ক্যামন প্রফুল্ল লাগে অঙ্কিতার। সে সুকেশকে ফোন করে। পায় না। সুইচ-অফ্। থাকগে। পাত্তা দ্যায় না অঙ্কিতা। ঘরের টুকিটাকি কাজগুলো সেরে নেয়। আরাম করে খায়। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যায়। আগামী কাল একটা নতুন স্কুলে যেতে হবে। হাসনাবাদে। টানা পাঁচদিনের ক্যাম্প শুরু হবে। প্রথম-দিনেই নিতে হবে একটা বেজ-লাইন কম্পিট্যান্সি টেস্ট। তার মূল্যায়নের ভিত্তিতে নিরাময়মূলক-পরিকল্পনা। শেষ দিনে ফের এন্ড-লাইন টেস্ট। অতঃপর তুল্যমূল্য পাঠ।

প্রতিদিন কাজে বেরোবার মুখে অ্যাকটাবার মেল চেক করা অঙ্কিতার অভ্যাস। আজও করলো। তিনটে মেল এসেছে। অ্যাক লহমা চোখ বুলিয়ে তৃতীয়টিতে ওপেন ক্লিক করে অঙ্কিতা। মেলটা সুকেশের ডিভোর্সের নোটিস দিয়েছে উকিল মারফত। দ্রুত পড়ে নিলো। ক'মিনিট কম্পুটারের সামনে বসে থাকলো। দমে গ্যালো কি একটু? কী জানি। তারপর অ্যাক সময় দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে পড়লো। বেরিয়ে পড়লো দ্রুত।

বেজলাইন-টেস্ট সবেমাত্র শেষ হয়েছে। অঙ্কিতারা পাঁচজনে অ্যাখন মূল্যায়নে ব্যস্ত। খাতা দেখতে-দেখতে অ্যাকবার বাইরে তাকালো অঙ্কিতা। অসম্ভব সবুজ সারাটা এলাকা। ইছামতির পাড়ে স্কুল। ওপারে বাংলাদেশ। মাঝে নিরবধি পুণ্যতোয়া নদী বয়ে যায়। নদীতে ঢেউ নাচছে। স্মার্ট। তার আই.টি. দুনিয়া, সুকেশ, হিতেশ মণি কি অ্যাতোটা স্মার্ট?

প্রশ্নটা মনে-মনে করেই ফিক করে হেসে ফ্যালে অঙ্কিতা। মূল্যায়নপত্রে মন দ্যায়। দ্যায়-কী-দ্যায় না সপ্তদীপা তার শাড়ির আঁচল টেনে ধরে—'অ্যাই অঙ্কিতা পড়েছিস?'

—কোনটা? —অঙ্কিতা জানতে চায়।

—তোমার যদি দু'টো শিং থাকতো তালে কী হতো? —এই প্রশ্নের উত্তর।

—না।

—দ্যাখ কী লিখেছে। অ্যাকজন লিখেছে—তালে আমি ছাগল হয়ে লাফালাফি করতাম। আর অ্যাক জনে—তালে আমি গোরু হয়ে হাম্বা-হাম্বা করতাম। আর অ্যাকটা দেখছি—শিং উঁচিয়ে ইংরাজি স্যারকে তাড়া করতাম।

সপ্তদীপা এবার সোল্লাসে হেসে ওঠে—'উহঃ এরা পারেও বটে।' হাসি অম্বিতার দেহতেও সঞ্চারিত হয়। প্রাণখুলে হাসতে-হাসতে অম্বিতা বলে—'দাঁড়া আমার খাতাগুলো দেখি।' খাতা খুলে সে ধাঁ করে শিং-য়ের প্রশ্নে যায়। জোরে-জোরে পড়ে—'মানুষের শিং উঠলে মানুষ পশু হবে আর পশু মানুষ।' পড়ার পর খাতা ওল্টায়—'শিং দিয়ে পেটমোটা শেয়ালের মতো পঞ্চায়েত-মেম্বারের ভুঁড়ি হসকে দিতাম।' হাসিটা অ্যাতোক্ষণে থম-মেরে যায়। শ্লথ হয় হাতের গতি। তবুও পড়ে—'শিং উঠলে বেশ ভালো হতো। শুধু চরে বেড়াতাম। কষ্ট করে পড়াশুনা করতে হতো না।'

আরও একটা খাতা ওল্টাতে যাচ্ছিলো অম্বিতা। সপ্তদীপা বারণ করলো। হাসি থামিয়ে তার চোখে চোখ রাখলো—'শরীর শরীর তোমার মন নাই নারী?'

—আছে? —অম্বিতা বললো।

—মন মন তোমার শরীর নাই সখী?

—আছে।

—আর? আর কী আছে তোমার?

—দু'টো শিং আছে।

—বলো কী সখী শিং আছে তোমার।—সপ্তদীপা উচ্ছ্বসিত হাসিতে জানতে চায়—ওই শিং দিয়ে তুমি কী করবে?

—গুঁতোবো।

—কাকে?

—নদীকে?

—নদীকে?

—হ্যাঁ। নদীকে গুঁতিয়ে, নদীর পেট ফেড়ে দেবো। বের করে আনবো রাজ্যের...।

খুব আবেগ দিয়ে কথা বলতে-বলতে হঠাৎই থেমে যায় অম্বিতা। সপ্তদীপার দিকে স্থির নজরে তাকিয়ে থাকে। বেশ কিছু সময়। তারপর ফিসফিস করে বলে—'আমি নদী হয়ে যাচ্ছি দীপা। আমার দেহ নদীর মতোন তরল হচ্ছে। গলে যাচ্ছে দেহ। নদী পেঁচিয়ে ধরেছে আমায়। ক্যামন য্যানো সহবাসের স্বাদ পাচ্ছি।' —বলতে-বলতে অম্বিতা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। সপ্তদীপাকে জড়িয়ে ধরে। হেসে গড়িয়ে পড়ে। পরক্ষণে ছেড়ে দ্যায়। দিয়েই দৌড় লাগায়। অ্যাক দৌড়ে নদীর পাড়ে যায়। চিৎকার ছেড়ে জানতে চায়—'নদী নদী তোমার মন নাই নদী? শরীর?

নদী কোনও উত্তর দ্যায় না।।

# লৌকিক, অলৌকিক
## সুদর্শন সেনশর্মা

আমার বাবা এখন অনেক দূরে থাকেন। অ-নে-ক দূরে। বহুদিন তাই দেখা হয় না। একক্ষেত্রে ফোনে কথা হতে পারে। চিঠিতে যোগাযোগ হতে পারে। বাবার এবং আমার সে সুযোগও নেই। মানুষ তো কত দূর দূরান্তরে যাতায়াত করে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়। এ যুগে কোন দূরত্বই তো আর দূরত্ব নয়। মুহূর্তের মধ্যে ফ্যাক্স চলে যাচ্ছে, ই-মেল চলে যাচ্ছে। আমার মুস্কিল হয়েছে কী বাবাকে আমি ফ্যাক্স, ই-মেল কিছুই পাঠাতে পারছি না। নিজের ইচ্ছায় বাবার কাছে যেতেও পারছি না এখন। সে ক্ষমতা আমার নেই। বাবা যাবার সময় সঠিক কিছু বলে যেতেও পারেন নি। দরজার বাইরে আকাশ এখন ঘন নীল। অসীম থেকে একটা পাখি এদিকে আসছে। একটু একটু নামছে আর বড় হচ্ছে। আমার ঘরের বাইরে পুকুর। পুকুর ছাড়িয়ে মাঠ। আর মাঠের ওধারে আবাদা। মাঠের ওধার থেকে কত রকম নাম না জানা পাখি উড়ে এসে পুকুরপারের বাতাবিলেবু গাছটায় বসে, বসে মন খারাপ করা স্বরে ডাকে। পুকুরপারের শিরীষ গাছের ডাল থেকে মাছরাঙা উড়ে এসে পুকুরের জলে ছোঁ মেরে মৎস্য শিশু ধারালো ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে যখন সীমানার নিম গাছটার ডালে বসে তারিয়ে তারিয়ে শিকার গলাধঃকরণ করে তখন আমার শরীরে কেমন একটা হয়, সমস্ত সত্তায় এক তোলপাড় ঘটে। তখনই হয়তো কচুরি পানার জঙ্গলে উড়ে এসে মেছো বক হেলিকপ্টারের মত ল্যান্ড করে। কোয়াকোয়া কক কক বিচিত্র ডাকে, ডানার কাঁপুনিতে হেলিপ্যাড-এর জলজে সবুজ আন্দোলিত হয়। বাতাবি লেবুর ডালে পুকুরে ছায়া ফেলে। বুড়ো মাছরাঙা ঘাপটি মেরে বসে আছে, পয়া মাছরাঙা। স্নানের সময় দেখলে সারাটা দিন ভালো যায়। মানে যাব। লাল গামছাটা?

ধু-স্। আমি দেয়ালে বাবার ছবির দিকে তাকাই। বাবা সুস্মিত মুখের হাসিটি নিয়ে আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে যেন আগের মত বলছেন—তোর আর ভালো দেখা এজীবনে আমার হোল না বোধ হয়। একই রকম রয়ে গেলি। বাবার সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করে তখন আমার। কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো আর হলো। বাবা এখন যেখানে আছেন, সেখানে ল্যান্ড ফোন, মোবাইল ফোন চালু হয়নি। হলেও সে নাম্বার আমি জানি না। বাবার জন্যে খুব মন খারাপ হলে বাবার পুরোনো ফোনের নম্বরে আমি অনবরত ডায়াল করি। অন্যদিকে ফোন বাজে না। একটু নীরবতার পরে গম্ভীর গলায় কেউ বলে দুঃখিত এ নম্বরটির কোন অস্তিত্ব নেই। কিম্বা হায়ে খেদ হায়.....

এই বাড়িতে একদম একা হয়ে গেলে খুব বেশি খারাপ লাগে। মন মানতে চায় না। আজ যেমন। ছেলেটা যেমন বাবা আমরা যাচ্ছি, একা একা ঘরে বসে একদম দুষ্টুমি করবে না বলে মায়ের হাত ধরে বেরিয়ে গেল। বৌ-ছেলে বেরিয়ে যাওয়ার আধঘন্টা বাদে আমাকেও কেউ ঘরের বাইরে জবরদস্তি নামিয়ে দেয়। স্টেশনে এলাম। ট্রেনে চেপে

একদম শেয়ালদা। শেয়ালদা এখন আগের মত নেই। ডাইনে, বায়ে অনেকটা হাঁটলে তবে বাস রাস্তা। লাল রঙের দোতলা তিন নম্বর বাস এখন নেই। আমার ছেলেবেলার মত দোতলা বাসের বদলে একটা একতলা তিন নম্বর বাসে উঠে হাজরায় নামি। নেমে একটুখানি দাঁড়িয়ে একটা ছ' নম্বর বাসে আবার উঠে পড়ি। তিরিশ পর তিরিশ মিনিট বাদে একটা মাঠের কাছে নেমে পড়লুম। মাঠটা এখনও আছে। লাইব্রেরিটাও। হাইস্কুলটায় এখন শেষ পিরিয়ড-এর ক্লাস চলছে। এই মাঠে প্রায় চার যুগ আগে চুনী, বলরাম, পিকে নিখিল সরকার-এর খেলা দেখেছিলাম। সে ছবি আমার কাছে বহুদিন ছিল। মাঠটার চারপাশে আমি একটু বিবশ হেঁটে বেড়াই, আবার বাস রাস্তা ধরে কৃষ্ণা স্টুডিও। স্টুডিওর পাশ দিয়ে সোজা রাস্তা। নতুন জলের ট্যাঙ্কের আগে শেতলা মন্দির। প্রতি বছর কত্রেব ইঞ্চি মাথায় বাড়তেন তিনি। দাদা মতির দোকানটা কোথায়? জিজ্ঞেস করতেই সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। শেষে একজন বৃদ্ধ বললেন সে তো অনেকদিন আগের কথা মতি নেই। নাতিরা অন্য ব্যবসা করে। রামলালের বাগানের কথাও জিজ্ঞেস করলাম বৃদ্ধ হাসি মুখে বললেন এরা সব জানে না। কতকাল আগের কথা। রামলালরা জমি জায়গা বেঁচে কবে চলে গেছে। সেখানে এখন বিরাট ব্যাপার স্যাপার। শপিং মল হয়েছে। নতুন সিনেমা হল। বৃদ্ধ চোখ ছোট করে বললেন আপনি কোথায় চলেছেন এতদিন বাদে। কিছুই মেলাতে পারবেন না। যাবেন কোথায়?

—এই তো একটু অরবিন্দ কলোনিতে যাবো।

বৃদ্ধ হা হা করে ওঠেন। কলোনি বলবেন না, কলোনি বলবেন না.....লোকজন রেগে যাবে। নাকতলা সেদিনের এখন হাইটেক শহর। কোন বাড়ি?

ঐ তো এদিকে বলেই রামগড়ের রাস্তার মোড়ের আগের গলিতে আমি ঢুকে যাই। গলির প্রান্তে একটা দোতলা বাড়ির লোহার গেট ঠেলে আমি দাদু দাদু বলতে বলতে এগিয়ে যাই। আত্মহারা আমি যেন ছুটছি। বয়সটাও একলাফে অনেক কমে গেল।

ভেতর থেকে অচেনা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে আমাকে অবাক চোখে দেখেন, দাদু কে? কোত্থেকে আসছেন।

আজ্ঞে অবীর সেনগুপ্ত—আমি বলি—তিনি কে?

আমি আবার বলি দিগম্বর সেনগুপ্তর বাবা, আমার দাদামশায়।

লোকটি আর একটু এগিয়ে আসেন। দুই ভুরুতে জিজ্ঞাসা, দৃষ্টিতে বিস্ময়—তিনি তো বহুকাল মারা গেছেন। হ্যাঁ তাই তো। ভদ্রলোক তো ঠিকই বলছেন। দাদামশাই এর মৃত্যুর পর এসেছিলাম তো। অবশ্য পৌঁছনর আগেই দেহের দায়িত্বে থাকা মাতব্বরেরা দেহ শ্মশানে নামিয়ে ফেলেছিল।

আমাকে এবার একটু কায়দা করতেই হয়। মাতব্বরের গলায় বলি আমার মামাকে একটু ডেকে দিন....মামি দেখুন হয়তো টিউবকলের ওখানে আমার দিদার মত জল ঘাঁটছে।

মধ্যবয়স্ক লোকটি এবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসেন—আসুন একটু ভেতরে আসুন—সেই এলেন বাড়িটা মামাবাড়ি থাকতে থাকতে আর আসতে পারলেন না। একটু

বসুন, বোধ করি অনেক দূর থেকে আসছেন—চা খাবেন তো। ভদ্রলোক হাত কচলে বলছেন আপনি জানতেন না.....দেখুন তো....এমন কত হয় এ বাড়িটা তো দিগম্বরবাবু বিক্রি করে দিয়েছেন। যতদূর শুনেছি বিক্রির টাকা ভাগ বাটোয়ারাও হয়ে গেছে। সে সব মিটিয়ে তিনি এখন শ্বশুরবাড়ির কাছেই....কী বললেন বসবেন না। তাড়া আছে। কী বলি বলুন তো আচ্ছা নমস্কার....আমি আর দাঁড়াইনি। এরপর দাঁড়ানো উচিত নয়। আমি রাস্তার মাথায় গিয়ে থামি। ধূর্ত মামাটা কোন কাজের নয়। লোকে যখন সব কিছু অধিগ্রহণ করছে এখন, গোদাবাংলায় যাকে বলে দখল, মামাটা তখন কিনা এক ছেলে হয়েও বাপের তৈরি বাড়িটা ভোগে লাগাতে পারল না?

এদিকে মামারই আর এক ভাগ্নে কেমন খেলল চুণী গোস্বামীর ড্রিবলিং। সবাই কেটে মুখ থুবড়ে বেরিয়ে গেল। আমি আনমনে গালে হাত বোলাই। বাবার কষ্টের তৈরি বাড়িটা একটা ডিভোর্সের জুজু দেখিয়ে দেখিয়ে কেমন হাত করে নিল।

বাবা চলে যাওয়ার কদিন আগে থেকেই সেই ফোনটা গণ্ডগোল করছিল। বাবাকে চাইলে ফোন রেখে দেয়া হ'ত অথবা কেমন ভৌতিক স্বর বলত উনি এখন ব্যস্ত, পরে করুন। পরে ঘন্টার পর ঘন্টা টেলিফোন উত্তরহীন থাকত।

বাবা চলে যাবার পর মাও কার্যত নজরবন্দী। ফোনটা তখন আর রা-ই কাড়ে না। আমিও কিছু করতে পারলাম না। মামলাবাজদের ভয়ই পেয়েছিলাম।

মা একদিন বললেন—তোর বাবার মত আমিও চলে যাব। তারা বলল, যাও। বাবার সময় তবু একটু খোঁজ খবর করেছিলাম....এবার তাও করব না। তোমার, বাবা চলে যেতে সব হিসেব বুঝে নিতে, যতটা দরকার ছিল—তা তো আর নেই। ডিভোর্সের জুজু দ্যাখানো, সেকশন ফোর নাইন এইট এর খুড়োর কল হাতে— সেই মহিলা তখন হাসছেন।

অটোয় উঠি। মেট্রোয় নামব। পীর এর দরগার কাছে দেখি লম্বা লাইন। অটো আস্তে হয়ে গেল। ভিড়। এনামেল এর থালা হাতে নিয়ে ফুটপাথে কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে। অন্ধ, অথর্ব বৃদ্ধ বৃদ্ধার লাইনে আবার ক্ষুধার্ত মা রুগ্ন সন্তান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আটো থেমে গেছে। বড় কড়াই-এ কালচে রঙের ওটা কি? হালুয়া। একটা রুটি এবং এক হাতা হালুয়া। হঠাৎ আমার হৃৎপিণ্ড লাফাতে শুরু করে। রুটির লাইনে মায়ের সঙ্গে বসা লাল জামা পরা ছেলেটার, মুখটা....আমার ছেলের মত কেন? জোর করে বাবাকে দিয়ে উইল করিয়ে আমাকে এই লাইনেই আনতে চাইছিলি। ভাই? বিভ্রান্ত আমি অটো থেকে নামতে চাই। অটোআলা থামায় না....মেট্রো স্টেশন যাবেন বললেন তো।

পাশের লোকটি বলল—কাল সবে বরাত। দানের রুটি হালুয়া। লাল রঙের জামা পরা ছেলেটির মুখে....আমার হৃদপিণ্ড আটকে আছে। না ভাই আমি নামব...... রোকো ভাই....

ধ্বস্ত আমি ঘরে ঢুকতেই দেখি বউ ছেলে, বহুক্ষণ ঘরে ফিরেছে। ছেলে তার বন্ধুর সঙ্গে খেলছে। ঘর এখন জমজমাট। বৌ বলল—কোথায় গিয়েছিলে।

আমি বল্লাম—মামা বাড়িতে

ছেলেটা হাসছে...লাল জামা...আমি বললাম বাবা জামাটা খুলে অন্য একটা পর না...

জামাটা কি দোষ করেছে—বৌ বলল।

ছেলেটা হাসছেই...মা বাবা এমন বলে না।

তুমি মামা বাড়ি গেলে আর মামা দাদু এখানে ফোন করছে তোমাকে কী যে বল না। বলতে বলতেই ফোনটা বাজল....

রিসিভার তুলতে ওপারের কণ্ঠ বলল—সনাতন?

—হ্যাঁ বলুন।

—মামার গলা চিনতে পারছ না। আপনিআজ্ঞে করছ।

—বল কী বলবে?

—তুমি নাকি তোমার মামা বাড়িতে গেছিলে? (হাসি)

—কে বলল।

—আমাদের বিক্রি হয়ে যাওয়া বাড়ির নতুন মালিক শ্রীঘনশ্যাম মোদক আমায় ফোনে বললেন।

—আমার নাম বলল?

—নাম তো তুমি বলনি, আমি ভাবলাম সব জেনেও এমন পাগলামি তোমার পক্ষেই সম্ভব।

—জানতাম? আমি বলি মামা আমায় বলে বাড়ি বেচেছিলে নাকি?

—দিদি জানত তো— তোমার দিদিও বলেনি?

—নাগো মামা তোমার দিদি আমায় কখনও বলেননি। ধরে নাও মাথাটা কেমন করছিল, মিঃ মোদকের কাছে একটু মোদক চাইতে গেছিলাম।

—কী যে বল না তুমি মাঝে মাঝে....

আমি বলি মামা এসব তুমি বুঝবে না। যারা বাপের সম্পত্তি বেচে দেয় কিম্বা অন্যকে বঞ্চিত করে বাপের সম্পত্তির দখল নেয়—তাদের এই সূক্ষ্মবোধ থাকে না।

—তোমার ভাই এর কথা বলছ বুঝি?

হ্যাঁ মামা আমি সব রামভাইদের কথাই বলছি। যারা বৃদ্ধা মাকে বাবা ওখানে এসেছেন শুনেছি বলে ট্রেনের টিকিট হাতে ধরিয়ে হারা উদ্দেশ্যে পার করে দেয়—যারা অতীত অস্বীকার করে তাদের অনুভূতি বলে কিছু থাকে না মামা। তারা জানে না নষ্টালজিয়া কী? অস্তিকর্ষ কাকে বলে।

মামার গলা এবার ভারী হয়ে উঠেছে।—এভাবে বোল না সনাতন...অতবড় বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করা কী চাট্টিখানি কথা। তুমি বুঝবে না। আমার বোন, তোমার মাসিদের খাঁই খাঁই। আমি ফোনটা কেটে দিলাম। আমার মাথায় এখন পোকা কিলবিল করছে। হতাশার। অপমানের....বোনটাকে ফোনে ধমকাব। বাবা কিছু টাকা বোনটার জন্য রেখে গেছে। ভাগ্যিস রেখে গেছেন। সে টাকা আনতে ওকে বাবার ফেলে যাওয়া রঙ্গালয়ে যেতে হয়—দখলদার পল্লীপদ দাদার মুখ ঝামটাও খেতে হয়।

থাক। কাদায় পড়া কাউকে আঘাত করা অপরাধ।

বৌ বলল অত বেলচুরিয়াস মুখ করে আছ কেন.....?

মনখারাপ হয়ে গেছে....রুটির লাইনে....না থাক।

বৌ ছেলে দু'জনেই আমাকে দেখল।

রুটির লাইনে কী বাবা.....

মামা ফোনে কী বলছিলেন—বৌ জিজ্ঞেস করল।

উত্তর দেওয়ার আগেই আবার ফোনটা বাজতে শুরু করল।

ফোনটা অন্যরকম বাজছে। ছেলে বলল—ধর প্লিজ। বোধহয় বাইরের ফোন—বৌ বলল।

ফোনটা ধরতেই সারাশরীরে বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল—ওপারে পরিষ্কার বাবার গলা সনু তোরা ভালো আছিস?

আমার হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছে—বাবা বল কেমন আছ। কতদিন বাদে.....তোমার গলার স্বর শুনলাম....কতদিন..আহা ক.....তোর রাগ কমেছে বাবা?

—কিসের রাগ বাবা তোমার ওপর। আমি জানি তোমার কিছু করার ছিল না.... দাদুভাই কেমন আছে? বৌমা।

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে বৌ এসে সামনে দাঁড়াল এ সময়।

ছেলে ছুটে এল—ফোনটা দাও তো প্লিজ দাদাকে একটা কথা বলব।

বাবা ওপাশ থেকে বলছেন মন দিয়ে শোন। তোর জন্য কিছুই রইল না, উইলটা আমি নির্বোধের মত করেছি.....আমি বুঝতে পারিনি....ব্যাড ব্রিড

—তুমি যা ভালো বুঝেছ করেছ।

—বাবা তোর জন্য আমার দুটো উপদেশ আছে।

—বলো বাবা বলো।

—আমার ফেলে আসা বাড়ির ত্রিসীমানায় তুমি যাবে না আর। তোমার ক্ষতি হতে পারে।

যাই না...মা চলে যাবার পর থেকে....

—হ্যাঁরে তোদের মাকে মিথ্যে মিথ্যে ট্রেনে তুলে দিল। তুই কোথায় ছিলি?

মা কোথায় এখন বাবা?—আমি বলি।

আর কোথায় যাবে। আমার সঙ্গেই আছে। এক বছরও তোদের সঙ্গে থাকতে পারল না।

ছেলে পাশ থেকে চেঁচিয়ে বলল, দাদাকে বল ঠামুর কথায় রাগ না করতে।

আমার মেয়েটাকে একটু দেখিস, বাবার গলায় অনুনয়। আমার কি ক্ষমতা বাবা। তাকে তো তারা খেলাচ্ছে।

—সব খেলাই একদিন শেষ হয় বাবা। যা বলছিলাম আমার একটা বিধিসম্মত সতর্কীকরণ আছে।

—বলো।

—অ্যাডভোকেট প্রদীপবাবু বা তোদের সোসাইটির প্রেসিডেন্টকে বলে এটা একটু প্রচার করে দিস। যাতে আমার আর তোর মায়ের হাল যেন অন্য কোন হতভাগ্যের মত না হয়। ফোনের ও প্রান্তে বাবা হাঁপাচ্ছেন।

—তুমি তো হাঁপাচ্ছ বাবা। আস্তে আস্তে বলো...।

তাই তো বলছি পাত্রের বাবাদের বলবি বিয়ের বিজ্ঞাপন যেন বক্স নাম্বারে হয়। সেখানে ভুলেও যেন পাত্রের বাবার বাড়ির ঠিকানা না থাকে। তা হলেই পাশের ব্লক থেকে পরদিনই কোন লুঙ্গি পরা মর্কট এসে পাত্রের বাবাকে বলবে না আমি কৃষ্ণনগর কলেজে আপনার সহপাঠী ছিলাম...হেঃ হেঃ। আর পাত্রের বাবারও এসব শুনে গলে জল হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকবে না...

মেয়ের বাড়ি কাছাকাছি হলে কখনও যেন পাত্রের বাবা সে বিয়েতে সম্মতি না দেন। সেকশন কোর নাইনটি এইট তবে কপালে ঝুলছে জানবে...

আমার গলাও ধরে এসেছে, কোনক্রমে বললাম বাবা। এসব থাক....তোমার....তোমার কথা বল.......

......আমার এত স্বেদরক্তের বাড়িটা সামান্য ভুলে অন্যের দখলদারিতে চলে গেল রে...বাবার গলা আটকে আসে।

আমি বলি, বাবা তোমার নাতি পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, একটু কথা বলতে চায়।

বাবাও ওপাশে আকুল গলায় কাঁদছেন তখন, কী কথা বলবরে....ওদের জন্য কিছুই তো আর...শুধু একজনের জন্য....বাবা আমি আজ....

রিসিভারের ওধারে হঠাৎ সমুদ্রগর্জন.... শো শো ঝোড়ো বাতাসের শব্দ।

ছেলেটা কাঁদছে, দাদাকে একটা কথা বলতাম। কী...কী বলতে আমাকে বল....ছেলেকে আমি বলি।

দাদা বিদ্যাসাগরের গল্প বলেছিলেন। বিদ্যাসাগর কোন কোন দিন নাকি শুধু নুন ভাত খেতেন....যদি আবার কোন দিন দারিদ্র আসে....তাই আমরা আজ...দাদা খুশি হতেন। তাই না মা?

মা আজ অনেককে একটাকা করে দিয়েছে আর আমি লাইনে দাঁড়িয়ে হাত পেতে রুটি...আমি বলি সত্যি?

হাত পেতে নিয়েছে...খায় নি—বৌ বলল।

আমি বাবার কপালে চন্দন লেপা ছবিটার দিকে তাকাই। সুস্মিত হাসিটি নিয়ে বাবা আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন।

ফোনের রিসিভারটা তুলে আমি হাত বুলোই। ওপারে ঝড়ের আওয়াজ থেমে টেলিফোনটি এখন মৃতবৎ। নিশ্চুপ। তরঙ্গহীন।

আমি আমার বৌয়ের দিকে ফিরি। তার চোখেও জল। তার হাতে ধরা হরিদ্বারের সেবাশ্রম সংঘের বহুদিন আগের টেলিগ্রাম—যেটায় বাবার মৃত্যুর খবর এসেছিল।

# সোজা পথের ধাঁধায়

## অনিল ঘোষ

খেলাটা কখন কীভাবে শুরু হয়েছিল, কিছুতেই মনে করতে পারছেন না প্রাণকিশোর। পারছেন না বলে একদিকে কেমন চাপা উল্লাস অনুভব করছেন, অন্যদিকে আশঙ্কার কালো মেঘ গুড় গুড় করে ডেকে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। উল্লাস কেন? না যাক, এতদিনে খেলাটা সত্যিকারের খেলার রূপ পেল। আর শঙ্কা, এবার তবে কী করবেন? খেলাটা তো শেষ করতে হবে। সেটা করবেন কীভাবে?

শেষের ব্যাপার ভাবতে গেলে উৎসে পৌঁছনো জরুরি। প্রাণকিশোর মনে করার চেষ্টা করলেন ঠিক কখন তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। কোন্ সময় পথ বেভুল হল! প্রাণকিশোর নিশ্চিত, এটা জানতে পারলে তিনি পৌঁছতে পারবেন ফিনিশিং পয়েন্টে। অর্থাৎ খেলা শেষ হবে ঠিকমতো। তিনি পাবেন নিজের ঠিকানা।

প্রাণকিশোর এখন খেলার চরম মুহূর্তে দাঁড়িয়ে।

প্রতিদিন ফিনিশিং পয়েন্টে এসে হতাশ হতেন। ঠিকঠাক হত না কিছুতেই। শুরুটা জানতেন। মানে জানতে হত। কারণ খেলাটা শুরু করতেন তিনি। শেষ করার ব্যাপারটা ছেড়ে দিতে হত অন্যকিছুর উপর। অন্য কিছু মানে বেভুল, আনমনা—এসবের উপর। নিজেকে হারাতে গেলে সচেতন হওয়া চলে না। আর তাই, প্রতিদিন নিজেকে গাল পাড়তেন, ধুস শালা, খেলতে নেমেছ, খেলার নিয়ম জানো না!

এ খেলার আবিষ্কর্তা প্রয়োগকর্তা প্রাণকিশোর স্বয়ং। এতে কোনও প্রতিপক্ষ দরকার হয় না। এ খেলা নিজের সঙ্গে নিজেরই। মানে নিজেই নিজের প্রতিপক্ষ। প্রাণকিশোরের মাথায় একটা অদ্ভুতুড়ে পোকা আছে। পথে নামলেই নড়েচড়ে। গুনগুন করে। সে গুনগুনানি ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে। গানটা বড় প্রিয়। বোধহয় আইপিটিএ যুগের। হেমন্তর গলায় সলিল চৌধুরীর গান—'পথ হারাব বলেই এবার পথে নেমেছি/ সোজা পথের ধাঁধায় আমি অনেক ধেঁধেছি'। গানটা মাথা থেকে নেমে পড়ে গলায়। কখনও চাপা, নিচু স্বরে। কখনও বেসুরো, হেঁড়ে গলায়। ভালো লাগে। বেশ ভালো লাগে। নিজেকে তখন উড়ু উড়ু মনে হয়। বেপরোয়া হতে সাধ জাগে। এই গানই কি ওঁকে খেলার দিকে টেনেছে? হয়তো। যখনই গুনগুনানি শুরু হয়, মনে হয়, পথ হারাবার খেলাটা খেললে কেমন হয়। দেখাই যাক না, নিজেকে হারাতে কেমন লাগে। তাহলে রোজ এই একঘেয়েমি সময় কাটানো, এই দিনগত পাপক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচা যায়। তাহলে বৈকালিক ভ্রমণে বেশ একটা থ্রিল আসে।

কিন্তু খেলতে নেমে বোঝা গেল খেলাটা কঠিন। শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব। অবাস্তবও বটে। এত জানা চেনা জায়গায় হারানোর ভাবনাই হাস্যকর। তিনি তো বাচ্চা ছেলে নন। কলকাতা শহর হলে না হয় কথা ছিল। এই ছোট্ট মহকুমা শহর। এই শহরে জন্ম, বেড়ে

ওঠা। তিনি এখানকার বিশিষ্ট বাসিন্দা। গণ্যমান্য ডাক্তার। এখন প্রায় বৃদ্ধ—এখানে হারানো সহজ। অথচ মন মানে না। মাথায় গুনগুন গান—'পথ হারাব বলেই'—। রোজই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন আজ নিজেকে হারাবই প্রতিজ্ঞা নিয়ে। প্রতিবারই ব্যর্থ হন। বাড়ি ফিরে যান নির্দিষ্ট সময়ে। কোনও ভুলচুক নেই। একেবারে নিয়ম মেনে, ছক বেঁধে পথ চলা।

এটা সত্যি, এতদিন ব্যাপারটা আয়ত্তে আসেনি। আজ, এই প্রথম তিনি সফল। প্রাণকিশোর আজও হাঁটতে শুরু করেছিলেন। মাথায় সেই অদ্ভুতুড়ে পোকার গুনগুনানি। তারপর কীভাবে, কত সময় পার হয়েছে, তিনি কোন পথ ধরেছেন, কোন অলিগলি বেয়ে হেঁটেছেন, কীভাবে ঘোর লাগল, কখন আনমনা হলেন, কখন পথ ভুল হল—নাহ্ কিছুই মনে নেই। এক সময় নিজেকে আবিষ্কার করলেন এই তিন রাস্তার মোড়ে।

প্রাণকিশোর দেখার চেষ্টা করছেন, এটা কোন পাড়া, কোন রাস্তা, কোন অঞ্চল। চারপাশে নতুন নতুন বাড়ি। হাল ফ্যাশানের। পাঁচিল ঘেরা। উঁচু গেট। ফুলগাছ। মনে হচ্ছে নতুন কোনও জায়গা। শহরটা বড় হচ্ছে। লোকজনও বেড়েছে। জমির দাম চড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। কত পাড়া তৈরি হয়ে গেল চোখের সামনে। এটাও বোধহয় তেমনই সবে পাড়া। বাড়িগুলো দেখলে বোঝা যায় সদ্য তৈরি। দু-চারটে ছাড়া বেশিরভাগ বাড়ি অন্ধকারে ডুবে আছে। তার মানে ওইসব বাড়িতে এখনও লোকজন আসেনি।

প্রাণকিশোর দেখতে পাচ্ছেন না ভালো। সন্ধে পার হয়ে গেছে। রাস্তায় আলো নেই। প্রাণকিশোর চোখ দুটো কচলে নিলেন। নাহ্ একই ফল। ঝাপসা। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, এবার ছানি অপারেশনটা করেই ফেলব। বন্ধু ডাক্তার সাধন ঘোষ কতবার বলেছে, ছানি অপারেশন আজকাল কোনও ব্যাপার নাকি। নিজে ডাক্তার হয়ে বোঝো না। সকালে যাবে, বিকেলে চলে আসবে। তারপর কাগজ পড়ো, টিভি দেখো, জীবনকে উপভোগ করো—।

সাধন ভুল বলেনি। জীবনের এখনও অনেক কিছু বাকি রয়ে গেছে দেখার, শোনার, জানার।

সিদ্ধান্তটা নিতে পেরে হাসলেন প্রাণকিশোর। হালকা লাগছে বেশ। ফুরফুরে হাওয়ার মতন। ছানি অপারেশনের কথা তুললে ছেলেমেয়েরা দেখছি দেখব বলে সময় কাটায়। পয়সা ওদের কারুও দিতে হবে না। সে যথেষ্ট আছে। শুধু একটু দেখাশোনা, একটু পাশে দাঁড়ানো। তাতেও ওদের সময়ের অভাব।

এ রকম সময়ে সুনন্দার অভাব অনুভব করেন প্রাণকিশোর। সে বেঁচে থাকলে ভাবতে হত না। সুনন্দা গিয়ে সব ওলোটপালোট হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরা চলে গেল দূরে। ওদের অবশ্য নিজস্ব জগৎ আছে। অফিস, ছেলেবউ, সংসার। তা ছাড়া ওদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কও মারাত্মক। কেউ কারও মুখ দেখে বলে তো মনে হয় না। দিনরাত ফোন তুলে বাবার কাছে পরস্পরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ। ওদের কাছে থাকবেন বলে বাড়ি করেছিলেন লেক টাউনে। শেষ বয়েসটা ছেলে বউ নাতি নাতনি নিয়ে কাটাতে মন

চেয়েছিল। সেই বাড়ি নিয়ে দুই ছেলেতে এখন আকচা-আকচি। মেয়েও ছাড়বে না। সে ভাড়াবাড়িতে থাকে। ফ্ল্যাট কিনবে। টাকার দরকার। কেন বাবা টাকা দিচ্ছে না। সে কি ফ্যালনা ইত্যাদি দাবি আবদার বায়না এমনকী কান্নাকাটিও চলছে। এখন সব অভিযোগ অনুযোগের একমাত্র লক্ষ্য প্রাণকিশোর। ক্রমশ উপলব্ধি করছেন ওদের কাছে তিনি একরকম অনাহুত অতিথি। শেষ যে বার গেলেন, দ্বিতীয় স্ট্রোকের পর। পেয়েছিলেন নিদারুণ অভ্যর্থনা। বড় ছেলে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। আর ছোটছেলে হাত ধরে সিঁড়িতে বসিয়ে দিয়েছিল। অপমানিত প্রাণকিশোর আর যাননি। তিনি ওদের কাছে একরকম মৃত।

প্রাণকিশোর ঠিক করলেন, কারও উপরে আর নির্ভর করবেন না। শরীর বলো, জীবন বলো—এ তো আমার। আমি চালাব আমার মতো করে।

হালকা মনে পা ফেলতে গিয়েও থমকে গেলেন প্রাণকিশোর। ঝাপসা চোখে সংশয়। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভালো কথা, তার আগে ফিরতে হবে। নিজের ঘরে, নিজের ঠিকানায়। আশেপাশে তাকালেন। এতদিন মনে মনে গর্ব ছিল, শহরের সবকিছু চেনেন, জানেন। আজ সেই গর্বের বেলুনে পিন ঢুকে গেল।

প্রাণকিশোর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। বুঝতে পারছেন না কোনদিকে যাওয়া উচিত। রাস্তা দিয়ে ভ্যান-রিকশা, সাইকেল যাচ্ছে। পায়ে হাঁটা লোক কদাচিৎ। পরিষ্কার নয় অন্ধকারে।

কাউকে জিজ্ঞেস করব? দু-চারজন লোক যারা হেঁটে যাচ্ছে, ওদের কাউকে জিজ্ঞেস করা যায়। এটা সহজ ব্যাপার। শহরটা এমন কিছু বড় নয়, বললে নিশ্চয়ই হদিশ পাওয়া যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ধমকালেন প্রাণকিশোর। এটা তো খেলার নিয়ম নয়। এ খেলা নিজেকেই খেলতে হবে এবং একা। খেলাটা হারাবার। পথ হারাবার। নিজেকে হারাবার। সেখান থেকে ফিরে আসার। আজ যখন ব্যাপারটা সফল হয়েছে, তখন বাকিটাও দেখা যাক।

প্রাণকিশোর নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলেন। উত্তেজনা ভয় সংশয়—এসব ক্ষতিকারক। মনের একাগ্রতা কেড়ে নেয়। বিভ্রান্তি ছড়ায়। নাহ্, সহজে হার মানতে রাজি নন প্রাণকিশোর। তিনি এখন খেলোয়াড়। কৈশোর যৌবনে চুটিয়ে খেলতেন। ফুটবল ক্রিকেট। স্কুল থেকে স্থানীয় লিগ। কখনও হারবেন বলে তো মাঠে নামেননি। আজ তবে হারার আগে হার মানবেন। নো, নেভার। শরীর এখন ধসে গেছে। গতি কমেছে। রিফ্লেক্সও। সব সত্যি। কিন্তু খেলার ইচ্ছে, রোখ—এগুলো তো মরে যায়নি। টিভিতে খেলা দেখতে বসে এখনও উত্তেজনা আসে শরীরে। সচিন সৌরভ শূন্য রানে আউট হলে গালাগাল দিয়ে বসেন চিৎকার করে। ইংলিশ প্রিমিয়র লিগ, সিরি আ, লা লিগা নিয়ম করে দেখেন। দেখে উত্তেজনা বোধ করেন। মারাদোনা ওঁর প্রিয় খেলোয়াড়। বাঁ পায়ের দুর্ধর্ষ ড্রিবলিং দেখতে দেখতে তিনি এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, প্রায় স্ট্রোক হওয়ার অবস্থা হয়েছিল।

আজ মাঠ বদলে গেছে, তবে তিনি যে আদতে খেলোয়াড়, এ প্রমাণ দিতেই হবে। বয়সে শরীর রোগভোগ—সব ঠিক আছে। তাই বলে ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। ধুৎ, শরীরকে খেলতে দিতে হবে। ছেড়ে দিতে হবে মাঠে, প্রান্তরে, নিদেনপক্ষে রাস্তায়, খোলা হাওয়ায়। তবেই না শরীরের কলকব্জা ঠিক থাকবে।

প্রাণকিশোর এদিক-ওদিক দেখছেন। ঝাপসা চোখে যতটুকু দেখা যায়। চেনা মুখ, চেনা কণ্ঠস্বর—নাহ্ কিছুই আসছে না। এ একদিক দিয়ে ভালো। চেনা পরিচিত লোকের চোখে পড়লে তো মুশকিল।—কী ডাক্তারবাবু, এদিকে কী ব্যাপার, কোথায় যাবেন ইত্যাদি শতেক প্রশ্ন, কৌতূহল। খেলার মজা মাটি। এতে মন দুর্বল হতে পারে, নির্ভরতা চাইতে পারে। সবকিছু সহজে পাওয়া গেলে কষ্ট করার কোনও মানে হয় না।

প্রাণকিশোর হাঁটতে শুরু করলেন। ডান দিকের রাস্তা ধরে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে এটাই সহজ। তা ছাড়া অচেনা অজানা জায়গা, কত ধরনের মানুষ, তাদের মনের গতি প্রকৃতি কেমন বোঝা মুশকিল। কেউ যদি সন্দেহ করে। আজকাল আকছার এমন ঘটছে। চোর ডাকাত জঙ্গি—কিছু একটা লেবেল লাগিয়ে দিলেই হল। তখন কি বয়স্ক বলে রেহাই পাবেন। তা ছাড়া দাঁড়িয়ে থাকাও ঠিক নয়। দাঁড়িয়ে থাকলে পথ পাবেন না। দেখা যাক, চলতে চলতে নিজের পথ পাওয়া যায় কিনা।

রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে হাঁটছেন প্রাণকিশোর। নির্লিপ্ত ভঙ্গি। যেমন বৈকালিক ভ্রমণে করেন। অন্ধকার অনেকটা চোখ সহ্য। প্রাণকিশোর দেখতে পাচ্ছেন, মাকড়সার জালের মতো।

হাঁটতে হাঁটতে প্রাণকিশোর টের পেলেন কেমন একটা শিহরণ বয়ে যাচ্ছে শিরায় শিরায়। হাঁটার গতি বেড়ে গেল হঠাৎ। ভালোই হল। এক জায়গায় জরদ্গব পাথর হয়ে থাকার চেয়ে এই যে চলেছেন, এতে একটা লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যে-কোনও একটা জায়গায় তো পৌঁছবেন। সেখান থেকে আবার নতুন পথ। আবার চলা। আবারও কোনও পথ। পৃথিবী তো পথের সমাহার। পথ চললে পথ পাওয়া যায়। না চললে তুমি বুড়ো, তুমি হেরো।

অথচ ময়না বলে, রোজ রোজ এই সর্বনাশা খেলাটা না খেললেই নয় বড়বাবু? কী মজা পাও বলো তো।

প্রাণকিশোর দাঁড়িয়ে পড়লেন। আহ্, ময়নারে তুই যে কেন পিছু টানিস?

চোখ বুজে ময়নার মুখ ভাবার চেষ্টা করলেন প্রাণকিশোর। মধ্য চল্লিশের মাঝারি চেহারা, মাজা রং, কাঁচা পাকা চুল। তীব্র দুশ্চিন্তা আর উৎকণ্ঠা ভরা মুখ। কণ্ঠস্বরে আকুলতা—এসব ছাড়া ময়নাকে যেন ভাবা যায় না। কেউ কেউ বোধহয় এমন থাকে, পরের জন্য ভেবে ভেবে সারা হওয়াই তাদের ধ্যান জ্ঞান।

হেসে ফেললেন প্রাণকিশোর। পাগলি মেয়ে। হয়তো ঘরবার শুরু করে দিয়েছে এতক্ষণে। হয়তো সাধন ঘোষের কাছে ছুটে গেছে, কিংবা ঘন ঘন রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে আর চোখের জল ফেলছে।

প্রাণকিশোরের খারাপ লাগল। ওকে কষ্ট দেবার মানে হয় না। ও তো আমারই আশ্রিত। সুনন্দা অসুস্থ হওয়ার সময় সাধন ঘোষ ওকে এনে দিয়েছিল। সুনন্দার দেখাশোনা, সংসার সামলানো। ছেলেমেয়েরা আহা উঁহু করেছে, কিন্তু কাছে আসার সময় নেই তাদের। সাধন বলেছিল, মেয়েটা আমাদের ঘরের মতো। ভাগ্য বিপর্যয়ে আজ স্বামী পুত্রহীন। দেখো, অসুবিধে হবে না।

না, অসুবিধে হয়নি। সুনন্দা ওর হাতে সব ভার তুলে দিয়েছিল। বলেছিল, তোর হাতে সব দিয়ে গেলাম।

সুনন্দা চলে গেছে আজ কত বছর। সাত বছর পার হয়ে গেছে। এতগুলো দিন ময়না থেকে গেল ওর কাছে, বুঝতে না দিয়ে, অলক্ষে সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ রেখে। এ জন্য ছেলেমেয়েদের কটুকথা, আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, বাঁকা চোখ, সন্দেহ বিবদৃষ্টি—সব সহ্য করেও ময়না সরে যায়নি। ছেড়ে যায়নি ওঁকে।

প্রাণকিশোর বুকের ভিতর কষ্টের চাপ অনুভব করলেন। আর কিছু না হোক ময়নার জন্য ফিরতে হবে। সুস্থ থাকতে হবে। দু-দু-বার হৃদয়ে নাড়া খেয়েছেন। রক্তচাপ উর্ধ্বগামী, রক্তে চিনির বাড়বাড়ন্ত, ফলে প্র্যাকটিশ বন্ধ। এখন সাবধান থাকতে হবে। নিজের জন্য না হলেও ময়নার জন্য। আমি না থাকলে ওর কী হবে। লাথি মেরে তাড়াবে না ওকে। ময়না যাবে কোথায়। তিন কুলে কেউ তো নেই। বাড়িটাকে বৃদ্ধাশ্রম করবেন ভেবেছিলেন। ময়নার কথা ভেবে। এটা পৈত্রিক বাড়ি। প্রায় এক বিঘে জমির উপর। এখন তো ঝাড়া হাত পা। বাড়িটা বৃদ্ধাশ্রম করলে সবদিক দিয়ে সুবিধা। শেষ জীবনে কথা বলার মানুষ পাওয়া যাবে। টুকটাক চিকিৎসা তিনিই করতে পারবেন। এভাবে বাড়িটাও কাজে লাগল, ময়নারও হিল্লে হল। কিন্তু বাদ সাধল ছেলেমেয়েরা। বেরিয়ে পড়ল ওদের দাঁত নখ। মেয়ে তো আগেই বলেছে, ওখানে পড়ে আছ কেন? বাড়ি বিক্রি করে লেক টাউনে চলে এসো। বৃদ্ধাশ্রমের কথায় তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে ওরা। বড়ছেলে বলে, কেন আশ্রম না করলে বুঝি রাসলীলা জমছে না। বলে সে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল। আর ছোট ছেলে বলে, আশ্রম করে বুঝি ওই মেয়েটার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করবে। তাই করোগে বলে সে হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল সিঁড়িতে। ওরা এখন বোধহয় অপেক্ষা করছে, কবে প্রাণকিশোর মরবে।

প্রাণকিশোর মাথা নাড়লেন, উঁহু ওটি হচ্ছে না। আমি বেঁচে থাকতে নয়। সাধন ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। এবার একটা ব্যবস্থা করবেনই। তিনি কারও কাছে দায়বদ্ধ নন। শুধু বাধা দেয় ময়না, অমন কোরো না বড়বাবু, ওরা তোমার ছেলেমেয়ে। ওরা ভুল করতে পারে, তাই বলে তুমিও—।

প্রাণকিশোর দাঁড়িয়ে পড়লেন। একটু সময় ভাবলেন। তারপর ফেরার পথ ধরলেন। ফেরার পথ মানে যে পথে এসেছেন, সেখানেই ফেরা। খেলার শর্ত ভাঙা হল। এ খেলার নিয়ম হল, এক রাস্তায় দু-বার যাবেন না। একটা রাস্তা ধরে যেতে হবে। সেখান থেকে আবার নতুন কোনও পথ। সেই পথ থেকে আবারও কোনও পথ। এভাবে পথ জুড়ে জুড়ে চলা।

শর্তটা ভাঙতে হল ময়নার জন্য। মেয়েটা আজ আসতে দিতে চায়নি। বারবার বলেছিল, আকাশের অবস্থা ভালো নয়, আজ আর নাই-বা গেলে বড়বাবু।

প্রাণকিশোর হেসে ফেলেছিলেন, ওর গাল টিপে বলেছিলেন, ওরে পাগলি আমি এত সহজে মরছি না রে। আমি হলুম যমের অরুচি।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে পড়েছিলেন ছড়িটা হাতে নিয়ে। ময়না মোটে বোঝে না, বৈকালিক ভ্রমণ ওঁর শরীর মনের পক্ষে কত জরুরি। এতে শরীর ঠিক থাকে, মনও হয় তাজা, ফুরফুরে। ওষুধে কতটুকু কাজ হয়! শরীর যত ওষুধবিহীন হবে, ততই ঠিকমতো নড়বে চড়বে এগোবে। ময়না এসব বোঝে না। বুঝতে চায় না। চায় হাত দিয়ে বাধা দিতে আসে। আকুল হয়ে বলে, তুমি এই সর্বনাশা খেলায় নেমো না বড়বাবু। শরীর তোমার ভালো না। এটা অন্তত মানো।

প্রাণকিশোর হাসেন, শরীর খারাপ বলে ঘরে বন্দি থাকতে হবে নাকি! কী পাগলের মতো কথা বলিস!

ময়না তবু মাথা নাড়ে, পাগলামি তুমি করছ বড়বাবু। বোঝো না কেন, যা গেছে তা আর ফিরবে না। তুমি চাইলেও নয়। বয়সের কথা ভুলে যাও কেন!

প্রাণকিশোর হেসে বলেন, বয়েস হয়েছে তো কী হয়েছে। সব ফুরিয়ে গেল। এ বয়েসেও কত কিছু করার আছে। তুই কেন লেখাপড়াটা শিখলি না বল তো? পৃথিবীতে কত কিছু জানার আছে। কিছুই জানলি না, বুঝলি না—ঘরে বসে শুধু দুঃখ পাস, ভয়ে কাঁপিস আর চোখের জল ফেলিস—।

ময়না হাত জোড় করে বলে, আমার বুঝে কাজ নেই। হেসে ফেলে ময়না। হাসিতে দুই বয়স্ক মানুষের তর্ক বিতর্কের আপাত সমাপন।

কিন্তু, কথা হল ঠিক কখন পথ বেভুল হল? নিজেকে হারালেন কখন?

প্রাণকিশোর আবার তিন রাস্তার মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রশ্নটা নিজের, লক্ষ্য নিজেই। হ্যাঁ, এটা জানা জরুরি। ভীষণ জরুরি। সমস্ত গণ্ডগোলের সূত্রপাত যেন ওইখানে। ওই বিভ্রান্তির উৎসে। ওটা জানা গেলে বিভ্রান্তির মেঘ কেটে যাবে নিশ্চয়ই। তারপর পথ পাওয়ার ব্যাপার। নইলে গোলোকধাঁধায় ঘুরে বেড়াতে হবে।

প্রাণকিশোর চোখ বন্ধ করলেন। মনে মনে পা ফেলছেন পিছন দিকে। এক পা দু-পা করে হাঁটছেন। তিন রাস্তার এই মোড় থেকে একটু একটু করে পিছিয়ে যাচ্ছেন। ঠিক কখন বিভ্রান্ত হয়েছেন। কখন ঘোর লেগেছে চোখে। কখন পথ হারিয়েছেন।

শেষ বিকেলে বাড়ি থেকে বেরোলেন, পথে নামলেন—এটা স্পষ্ট। দেখতেও পাচ্ছেন। ওই তো ময়না বারান্দায় গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বিষণ্ণ মুখ। চোখ জুড়ে মিনতি, যেও না বড়বাবু, যেও না—। আর তিনি ছড়ি দুলিয়ে পথে নামলেন। হাসতে হাসতে। কিন্তু তারপর, তারপর?

সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এ যেন সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক। একটা ধাপ ভুল হলে বাকি সব গোলমাল। মেলে না উত্তর। প্রাণকিশোর অন্ধকার গহ্বরে আলো খোঁজার মতো

বিভ্রান্তির উৎসে পৌঁছতে চাইছেন নিজের অন্ধকারে, নিজেরই মধ্যে। দিশাহারা পথিকের মতো পথ খুঁজে চলেছেন। থামবেন কি? থামবেন? খেলাটা বন্ধ করে দিলেই তো হয়। এ খেলা কি এতই সহজ!

না, খেলা ছাড়লে চলবে না। প্রাণকিশোর শাসন করলেন নিজেকে। একবার ব্যর্থ হয়েছি তো কী, থেমে পড়তে হবে। তবে আর খেলতে নেমেছ কেন? খেলা যখন শুরু করেছ, খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের পরিচয় দাও। নইলে যাও, রাস্তার লোক ধরে জিজ্ঞেস করো, সহজে ফিরতে পারবে। আর কোনওদিন খেলার নাম মুখে এনো না।

সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে আসছে। অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। প্রাণকিশোর আকাশে মুখ তুললেন। মেঘ জমাট বাঁধছে। বাতাসও বইছে। তার মানে বৃষ্টি পড়তে পারে।

প্রাণকিশোর অস্থির হয়ে উঠলেন। নাহ্ পথ পেতেই হবে। পথ হারাবার খেলায় নেমে বৃষ্টিতে ভেজার কোনও মানে হয় না।

চারদিক সচকিত করে হঠাৎ আলোর ঝলকানি, সঙ্গে আনন্দের উল্লাস। আলো এসেছে। ঝলমলিয়ে উঠছে চারদিক। তার মানে এতক্ষণ লোডশেডিং ছিল। তাই বোধহয় অন্ধকার এত ঘন লাগছিল। প্রাণকিশোর স্বস্তি পেলেন মনে মনে। আর তখনই চকিতে মনে পড়ল, তখন লোডশেডিং ছিল না। হ্যাঁ, তাইতো। তিনি একটা সরু গলিপথে ঢুকছিলেন, তখনই ঝুপ করে—।

এই তো। স্পষ্ট মনে পড়ছে। প্রাণকিশোর খুশি হলেন। যাক একটা ধাপ পেরোলেন। হ্যাঁ তখন লোডশেডিং ছিল আর তিনি হাঁটছিলেন, দৃশ্যটা ভেসে উঠল চকিতে। তারপর। প্রাণকিশোর দেখার চেষ্টা করলেন। ওই যাহ্, আর দেখা গেল না।

তিনি দমলেন না। একটা ধাপ যখন পেরোতে পেরেছেন, বাকিটাও পেরনো যাবে। আবার বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলেন। কোন রাস্তা জানেন না। জানার দরকার কী। একটা রাস্তায় চলতে হবে তাই চলছেন। মন হাঁটছে পিছনে। হ্যাঁ, তখন লোডশেডিং শুরু হল। তারপর? অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছিল না। হাঁটছিলেন প্রায় অন্ধের মতো। মনে পড়ছে, তখন কেন কী একটা ভাবছিলেন। কী ভাবছিলেন? ময়নার কথা? নিজের কথা? নাকি অপু তপু রাই, নাকি...।

প্রাণকিশোর নিজের মাথায় টোকা মারলেন। বেশ জোরে। স্মৃতি ফোটোগ্রাফের মতো। ধুলোবালি পড়ে ঠিকই। দরকার একটু টুসকি মারার। এটা ঠিকঠাক করতে পারলে মনে পড়বে। এমন কিছু দূরের ব্যাপারও তো নয়। মাত্র এক-দু ঘন্টা আগের ব্যাপার। মনে পড়বে না কেন।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল এইভাবে। প্রাণকিশোর চুপচাপ দাঁড়িয়ে। নড়ছেন না। চোখের পর্দায় রং আসছে। কখনও ফিকে। হঠাৎ হঠাৎ গাঢ়। লাল নীল সাদা কালো। ওরা নাচছে। ঘুরছে। চক্রাকারে। তার মধ্যেই চকিতে ভেসে উঠছে কিছু দৃশ্য, মুখ। মুখের কথা। চমকে চমকে উঠছেন প্রাণকিশোর। আহা তাই তো, এটাও তো ছিল, এমনই তো ঘটেছিল। ভাবছেন প্রাণকিশোর। ভাবনার ডানা ক্রমে খুলে যাচ্ছে। ছড়াচ্ছে। ভাসছে।

ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে। এই সন্ধে থেকে বিকেলে। বিকেল থেকে দুপুরে। দুপুর থেকে সটান সকালে। নাহ্ সকালেও থাকতে পারলেন না। পৌঁছলেন গত রাতে। রাত গভীরে। ডানা এখানেই ঘুরছে। চক্রাকারে। এখানেই কি সেই উৎসমুখ? প্রাণকিশোর ভাবছেন। এখান থেকেই কি শুরু হয়েছে বিভ্রান্তি? এখানেই।

প্রাণকিশোর স্পষ্ট শুনতে পেলেন, টেলিফোন বাজছে। কর্কশ শব্দ। প্রাণকিশোর শুনেও শুনছেন না।

চুপ করে শুয়ে আছেন বিছানায়। বধির হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময় ময়না ছুটে এল ঘরে, ও বড়বাবু, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি। ফোন বাজছে যে—!

চোখের পর্দায় রঙের নাচন স্থির হয়ে আছে। আর দুলছে না। নড়াচড়াও করছে না। প্রাণকিশোর মাথা ঝাঁকালেন। চোখ খুলে দেখলেন চারপাশ। সেই একই আলো আঁধার পারিপার্শ্বিক। ঝাপসা-ঝাপসা। তবে চোখ সয়ে এসেছে। প্রাণকিশোর এবার স্পষ্ট মনে করতে পারলেন, একটু আগে কোন পথে গিয়েছিলেন। ওই তো সেই পথ।

প্রাণকিশোর সেই পথ বাদ দিয়ে অন্য পথ ধরলেন। দেখা যাক এই পথ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে কিনা।

প্রাণকিশোর হাঁটছেন, আর মন চলে যাচ্ছে গতরাতের টেলিফোনের শব্দে। প্রাণকিশোরের ইচ্ছে করছিল না উঠতে। ফোনের ওপারে কে আছে সে তো জানা। কী বলবে তা-ও জানা। এতেই যত বিরক্তি। কিন্তু ময়না কি তা শুনবে। ক্রমাগত ঠেলা দেয়, ও বড়বাবু ওঠো, ফোন ধরো—। ময়না নিজে ফোন ধরবে না। প্রাণকিশোর অনেক চেষ্টা করেও ওকে দিয়ে ফোন ধরাতে পারেননি। অবশ্য এই ফোনটা ওর ধরা উচিত নয়।

ময়নার ক্রমাগত ঠেলায় অবশেষে উঠতেই হয়েছিল প্রাণকিশোরকে। ফোন ধরলেন। ওপারে রাই। ওর গলায় অসহিষ্ণুতা, বিরক্তি। ধমকের সুরে জানতে চাইছে, বাবা কেমন আছে, খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, ওষুধ খাচ্ছে কিনা ইত্যাদি। শুনতে শুনতে প্রাণকিশোর হেসে ফেললেন, তুই কি এই বলবি বলে ফোন করেছিস?

রাই তখনই ফেটে পড়ল, তুমি কী শুরু করেছ বলো তো?

প্রাণকিশোর বললেন, কী?

কী তুমি জানো না! তোমার জন্য তো শ্বশুরবাড়িতে মুখ দেখানো যাচ্ছে না।

আমি কী করলাম!

ন্যাকা সেজো না। তুমি ভালো করে জানো কী করছ, ছি-ছি বুড়ো হয়ে গেলে তবু—!

কী হয়েছে খুলে বলবি?

দ্যাখো বাবা, আমি স্পষ্ট জানতে চাই, তুমি ওকে তাড়াবে কিনা?

ময়নার কথা বলছিস?

তবে আর কার কথা বলব!

ময়নাকে তোরা সবাই মিলে রেখেছিলি।

হ্যাঁ আমরাই রেখেছিলাম, এখন আমরাই বলছি ওকে তাড়াও।

তবে কে থাকবে, তুই?

আমি কী করে থাকব, কী যে বলো না!

তাহলে আমাকে তোর কাছে নিয়ে চল্।

তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গেছে বাবা, আমার শ্বশুরবাড়ি এসে থাকবে! তোমার লজ্জা করবে না!

সে তো করবে, কিন্তু কী করব!

তুমি ভেবো না, তোমার দেখাশোনার জন্য আমি অন্য ব্যবস্থা করছি।

ব্যাস তাতেই হয়ে গেল!

আবার কী চাও?

আমি একা থাকলে তুই শ্বশুরবাড়িতে মুখ দেখাতে পারবি।

কী বলছ মাথামুণ্ডু বুঝছি না। আমার সাফ কথা শোনো, ও থাকবে না, ব্যাস।

ও থাকবে না, তুই আসবি না, আমিও যেতে পারব না, তোর দাদাদের কাছে গেলে তাড়িয়ে দেবে, আমি একা একা কী করে থাকি বল তো।

একা থাকবে কেন, তুমি বাড়ি বিক্রি করে দাদাদের কাছে চলে এসো। ওই মহিলাকে ত্যাগ করলে দাদারা তোমায় মাথায় করে রাখবে।

কী বলছিস, ময়না কী করেছে, খামোখা ওকে ত্যাগ করতে যাব কেন?

মান-সম্মানের ব্যাপারটা ভাববে না। তোমাকে নিয়ে ঢি-ঢি পড়ে যাচ্ছে—।

এই তো পালাচ্ছিস।

পালাব কেন!

তবে আমাকে একটা জায়গা করে দে, যেখানে ভালোভাবে সবার সঙ্গে মিশে, কথা বলে থাকতে পারি। বাড়িটা বৃদ্ধাশ্রম করতে গেলাম, তোরা বাধা দিলি। ওই দুঃখী মেয়েটা আমার দেখভাল করছে, ওর সঙ্গে দুটো কথা বলছি—তাতেও তোদের আপত্তি। ডাক্তারি করব, হার্ট বাধা দিল, তোরাও বন্ধ করে দিলি। এবার আমি কী করব বল্—?

কী আবার করবে। তোমার বয়েস হয়েছে খাবে দাবে ঘুরবে।

না।

তবে কী করবে?

জীবনটা যখন আমার, তখন আমার মতো চালাব। তোরা যা খুশি ভাবগে যা। যদি এতেও তোদের সমস্যা হয়, তবে বলে দিস, তোদের বাবা মরে গেছে।

রাই আর কথা বলেনি। ঝড়াং করে ফোন নামিয়ে রেখেছিল। প্রাণকিশোর হো হো করে হেসে উঠেছিলেন। ময়না ছুটে এসেছিল ঘরে, কী হল?

প্রাণকিশোর হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ময়না আমি পেরেছি রে।

কী পেরেছ, ও বড়বাবু?

যা আমার পারা উচিত।

কী যে বলো কিছুই বুঝি না তোমার মাথামুণ্ড কথা।

বলে ময়না মেঝেতে পান সাজতে বসল। শুয়ে শুয়ে দেখছিলেন প্রাণকিশোর। ময়নার গালে পান। রসে টইটুম্বুর ঠোঁট। চোখ দুটো আনত। তবু কী এক অপার্থিব আলো ওর মুখে।

দেখতে দেখতে কেমন একটা কষ্ট অনুভব করছিলেন প্রাণকিশোর। কিছুই তো নেই ওর। না আশ্রয়, না সংস্থান। কিছুই না। পিছনটা ঘোরতর অন্ধকার। সামনে শুধু প্রাণকিশোর। অথচ ওর কোনও দাবি নেই। চাহিদা আবদার কিছুই না। নীরবে কর্তব্য পালন করে যাওয়া। বিনিময়ে সামান্য একটু আশ্রয়ের আশ্বাস। একটু নিরাপত্তা। এর বেশি কিছু দিতে পারেননি তিনি। দেওয়া সম্ভব নয় বলে। অথচ অনেক কিছু ইচ্ছে ছিল। ভেবেছেন। কিন্তু ওই পর্যন্ত। মনের কথা মুখ পর্যন্ত আসেনি। কেন আসেনি? কেন বলতে পারছেন না? বাধা, কোথায় বাধা? কোথায় দ্বিধা? কেন এত লজ্জা, সংকোচই বা কীসের? কেন, কেন?

থমকে গেলেন প্রাণকিশোর। সামনে একটা গলিপথ। সরু, অন্ধকারে ঢাকা। তবু পথ। এক পথ থেকে আরেক পথের আহ্বান। এই তো খেলার নিয়ম।

ঢুকব। প্রাণকিশোর দ্বিধাগ্রস্ত। পথ ঘুরিয়ে মারবে না তো। প্রশ্ন মনে। পর মুহূর্তেই শক্ত হলেন। শরীরটাকে সোজা করলেন। পথ যখন একটা পাওয়া গেছে, দেখাই যাক না কী আছে, কোথায় নিয়ে যাবে। যেতে যখন হবেই, তখন দ্বিধা কীসের।

প্রাণকিশোর গলিপথে ঢুকলেন। অন্ধকার চোখে মুখে ঝাপটা মারছে। মারুক। থামব না। এগোব। খেলতে যখন নেমেছি, শেষ দেখেই ছাড়ব। মনে মনে নিজেকে সাহস দিচ্ছেন প্রাণকিশোর, চলো ভাই, চলো। থেমো না। অন্ধকার থেকে আলোয়। বিভ্রান্তি থেকে সত্যে। হয়তো এই পথেই পাওয়া যাবে সেই উৎসমুখ।

প্রাণকিশোর পা ফেলছেন। তবে মন যত দ্রুত, পদক্ষেপ তত নয়। কেমন জড়গ্রস্ত, থেমে থেমে চলা। তবু চলা। পা পা হলেও এগোচ্ছেন তো। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে হলেও হাঁটছেন তো। কোথায় সেই উৎসমুখ? কোথায়?

প্রাণকিশোর দেখতে পাচ্ছেন অন্ধকারে আলোর আভাস আছে। আরে, এ আলো কোথায়। স্পষ্ট দেখছেন মৃদু বালবের আলো ঝুলছে মাথায়। আর তিনি বসে আছেন দোতলার সিঁড়িতে। একলা। অপমানে দুঃখে পাথর। জড়বৎ। দুই ছেলে যে যার ঘরে। আর নিজের পয়সায় তৈরি করা বাড়িতে তিনি এরকম বহিষ্কৃত। প্রথমে রাগ হচ্ছিল। অপমানের আগুনে পুড়ছিলেন। মাঝরাতে কান্না আসছিল। কাঁদছিলেন। আর শেষ রাতে সমস্ত অপমান রাগ দুঃখ কান্না অভিমান উধাও। কেমন বোধহীন হয়ে বসেছিলেন। নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলছিলেন। থেমে থেমে। এরা আমার কে? এরা সন্তান? সন্তান কাকে বলে? নিজের শরীরের বীজ নিয়ে যে আসে, সেই সন্তান? এরা তো সব দূর সমুদ্রের নাবিক। প্রয়োজনে ডাঙায় আসে। প্রয়োজন মিটে গেলে আবার ভেসে পড়ে। পিছুটান নাকি মিছুটান। নাহ্, কোনও টানই আর অনুভব করছেন না প্রাণকিশোর। শরীর মন

আত্মা-কোনও কিছুই না। ভোররাতে তিনি রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। তখন মাথার পোকা তারস্বরে গেয়ে উঠেছিল 'পথ হারাব বলেই' গানটা। কিন্তু তিনি হারাতে পারেননি। হাঁটতে হাঁটতে অনেক পথ ঘুরে, এক সময় ক্লান্ত হয়ে বাসস্ট্যান্ড, তারপর অনেক রাতে নিজের বাড়ি। টের পাচ্ছিলেন চোখ দুটো জ্বালা করছে, মাথা ভার, শরীর জুড়ে নেমে আসছে অকাল শীত।

ময়না ওঁকে দেখেই আঁতকে উঠেছিল। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছিল, কী হয়েছে, ও বড়বাবু, ইশ জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে—।

আর তিনি সেই প্রথম বাঁধ ভাঙা বন্যার জলের মতো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছিলেন, ময়না, আমার কেউ নেই, আই এ্যাম অ্যালোন, অ্যালোন—।

ময়না ওঁকে দু-হাতে ধরে বিছানায় শোয়াতে শোয়াতে আকুল হয়ে ডেকেছিল, বড়বাবু ও বড়বাবু—। বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল।

তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। সমস্ত আক্রোশ দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা কান্না নিয়ে ময়নার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ওর ছোটখাটো শরীরটাকে বুকের তলায় পিষতে পিষতে বলেছিলেন, ময়নারে, আমি বড় অভাগা, তুই আমায় ছেড়ে যাস না।

ময়না দু-হাতে প্রাণকিশোরের আবেগ উত্তেজনা রোধ করার চেষ্টা করছিল, ও বড়বাবু অমন কোরো না, শান্ত হও—।

প্রাণকিশোর কান্নায় ভেসে বললেন, তুই আমায় ছেড়ে যাবি না তো?

না বড়বাবু, তুমি স্থির হও।

তুই আমায় বিশ্বাস করিস?

হ্যাঁ বড়বাবু।

তবে আমায় বাধা দিস না।

বড়বাবু, আমার কথা শোনো, তোমার শরীর খারাপ, তুমি পারবে না।

পারব ময়না, তুই দয়া কর—।

বড়বাবু তোমার পায়ে পড়ি, অমন কোরো না।

ময়নারে, আমায় শক্ত করে ধর। আমাকে পারতেই হবে।

বড়বাবু আমার খুব ভয় করছে।

কীসের ভয়?

তোমাকে হারাবার ভয়। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই বড়বাবু—।

দুজনেই কান্নার সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছিলেন। দুই মানুষ যেন প্রবল বন্যার স্রোতে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছিলেন, ভরসা চাইছিলেন। তখনই প্রাণকিশোর টের পেলেন, মনের উত্তেজনায় শরীর সাড়হীন। যেন নিস্তরঙ্গ পানা-পুকুর। একটু পরে প্রাণকিশোরের অশক্ত শরীরটা শিথিল হয়ে গেল। হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল ময়নার উপর। হু হু কান্নার জল উপচে আসে দু-চোখে। ময়নার শুকনো বুকে মুখ ঘসতে ঘসতে প্রলাপের মতো বলে চলেন, ময়নারে—।

ময়না তখনও প্রাণকিশোরকে বুকের মধ্যে চেপে ধরেছিল, সন্তানকে মা যেমন আঁকড়ে ধরে। বিড় বিড় করে বলছিল, শান্ত হও বড়বাবু, ঘুমোও-ঘুমোও—।

ময়নার বুকেই মাথা রেখে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন প্রাণকিশোর।

দৃশ্যগুলো টিভি সিরিয়ালের মতো ভেসে চলেছে ঝাপসা চোখের উপর দিয়ে। কোনও সমস্যা হল না। ঠিক মনে পড়ল তো। একটা দুটো করে যখন মনে পড়ছে, তখন বাকিগুলোও মনে পড়বে। তখন নিশ্চয়ই সেই উৎসে পৌঁছনো যাবে, যেখান থেকে বিভ্রান্তির শুরু।

গলিপথ আর একটা গলিপথে পৌঁছেছে। অন্ধকার। আলো নেই এখানেও। উঁচু উঁচু বাড়ি। তার আঁধারে ছেয়ে আছে গোটা পথটা।

প্রাণকিশোর দাঁড়িয়ে পড়লেন। আর এগনো ঠিক হবে। এই পথ যদি আবার ঘুরিয়ে মারে, তবে তো মুশকিল। অনেক হেঁটেছেন আজ। শরীর কি এতটা ধকল নিতে পারবে। শরীর আর যাই হোক, মনের বশ নয়। তার একটা সীমা আছে। অতএব শরীরকে ক্ষান্তি দিতে হবে।

তবু দেখাই যাক, প্রাণকিশোর পা বাড়ালেন গলিপথে। হাঁটছেন ধীর লয়ে। হাঁটার একটা ছন্দ আছে। অনেক কষ্টে আয়ত্ত করেছেন প্রাণকিশোর। দ্রুত নয়, আবার খুব ধীর লয়ে, তা-ও নয়। দুলকি চাল বোধহয় একেই বলে। এটাই শরীরকে তাজা রাখে। ময়না বারবার বলে, বড়বাবু যাই করো, শরীরের দিকে লক্ষ রেখো।

আহ্ ময়না। প্রাণকিশোর হাসলেন। মেয়েটা বড় মায়ায় জড়ানো। নিরক্ষর, অকাল বিধবা মেয়েটা কোনও ভাবনায় আসার কথা নয়। ওর দিকে তাকাবার মতো বিশেষত্বও নেই কিছু। তবু। হ্যাঁ, এই তবু শব্দটাই বড় গোলমেলে। এটাই সব সরল অঙ্ক জটিল করে দেয়। যুক্তি বুদ্ধি কারণ বিশ্বাস—সবকিছু তালগোল পাকিয়ে বলতে বাধ্য করে, তবু ওই মেয়েটার মধ্যেই পেয়েছি মনের সজতাকে। যা সুনন্দার মধ্যে কখনও পাইনি। সুনন্দা ছিল পাশে, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে, দায়িত্ব কর্তব্যে—সেটাই বোধহয় দাম্পত্য প্রেম। আর ওই দূরের মেয়েটা। ও যেন অনেক না বলা কথা, না শোনা কথা। আর সেটা কখন।

প্রাণকিশোর টের পাচ্ছেন, এও যেন বিভ্রান্তি। তাহলে ওখানেই কি আছে সেই উৎসমুখ? না। প্রাণকিশোর স্পষ্টই মনে করতে পারছেন তিনি অসুস্থ হওয়ার পর ময়না ওর সেবা যত্নের ভার নিয়েছিল। ছেলেমেয়েরা আসত। দেখেশুনে চলে যেত। কিন্তু মন চাইত ওদের। ওরা আসুক। থাকুক। কিংবা ওঁকে নিয়ে যাক। কিন্তু ওরা এড়িয়ে যেত।

মনে বোধহয় তখন মৃত্যুভয় ঢুকেছিল। যখন তখন অন্ধকার নেমে আসত চোখে। আর তার হাত থেকে বাঁচতে তিনি কথা শুরু করেছিলেন। কত কথা। সে কথা শোনার মানুষ কই, এক ময়না ছাড়া। ময়না বুঝত কী বুঝত না ঠিক নেই, কিন্তু মন দিয়ে শুনত। ময়না যেন অন্ধের যষ্টি হয়ে উঠল। ওকে ছাড়া তিনি চলতেই পারেন না। সবখানে সব তাতে ওর শরীরী অশরীরী অস্তিত্ব অনুভব করতে লাগলেন। এভাবেই, কবে থেকে যেন ওর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। আগে তিনি কখনও বাজার করতেন না। হঠাৎ

বাজার করা শুরু করলেন। বাজার মানে কত লোক। কত কথা। দেশের অর্থনীতি যেন চোখে ধরা দেয়। এভাবে রাজনীতিতে ঝোঁক বাড়ে। কাগজ পড়েন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বন্ধু সাধন ঘোষের সঙ্গে তর্কে মাতেন শিল্পায়ন নিয়ে। শিল্পায়ন হওয়া উচিত, অবশ্যই উচিত। কিন্তু যেভাবে, যে পদ্ধতিতে হচ্ছে, তা নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে, প্রশ্ন আছে। আবার নন্দীগ্রামের ঘটনা টিভিতে দেখে তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন। এ কী! এ তো জঘন্য ব্যাপার! তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন সরবে, সোচ্চারে। এভাবে তিনি টের পেলেন, বেঁচে থাকার মধ্যে বেশ একটা থ্রিল আছে।

কই এখানে তো কোনও বিভ্রান্তি নেই। পরিষ্কার। প্রাণকিশোর দাঁড়িয়ে পড়লেন। টের পেলেন যে গলিপথ ধরে হেঁটেছেন, সেটা আবার আগের রাস্তায় এনে ফেলল। সেই তিন রাস্তার মোড় থেকে একটু দূরে। মানে যেখান থেকে শুরু করেছিলেন, প্রায় সেখানেই।

প্রাণকিশোরের বুকের ভিতর ধস ধরা ভয় নেমে এল। তবে কি এখানেই ঘুরতে হবে নাকি! শরীরে ক্লান্তি নেমে আসছে। আহ্, এ সময় তিনি শুয়ে শুয়ে টিভি দেখেন। ময়নার সিরিয়াল দেখার অভ্যাস। তিনিও দেখেন। খুব খারাপ লাগে না।

ময়না এখন কী করছে! ভাবতে ভাবতে প্রাণকিশোরের শরীরে নেমে এল ভয়। সত্যি, অনেক সময় চলে গেছে। আর খেলা চালানোর মানে হয় না। এবার ফিরতেই হবে। আর ফেরার সবচেয়ে সহজ উপায় হল, রাস্তার কোনও লোককে জিজ্ঞেস করা।

মন সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ করে উঠল। না, এতদূর এসে হাল ছেড়ে দেব! খেলা যখন চলছে, তখন শেষ না দেখে ছাড়ার মানে হয় না। দেখা যাক, কতটা ঘুরতে হয়! কোন পথের শেষে আছে সেই ঠিকানা! কোথায় গেলে পাওয়া যাবে নিজস্ব পথ।

প্রাণকিশোর বুক ভরে বাতাস টেনে নিলেন। তারপর হাঁটতে শুরু করলেন সোজা। প্রায় চোখ বুজে। পথ যেদিকে যায় যাক, তিনি আর ফিরবেন না। যেদিকে ইচ্ছে চলুক পা। এগোতে হবে। অঙ্ক কষে পা ফেলার কোনও মানে হয় না।

প্রাণকিশোরের চোখ ধাঁধিয়ে গেল হঠাৎ। তীব্র হেডলাইটের আলো জ্বালিয়ে একটা প্রাইভেট গাড়ি এসে পড়ল। প্রাণকিশোরের হাত দশেক দূরে এসে থামল গাড়িটা। মুহূর্তের জন্য অন্ধকার নেমে এসেছে চোখে।

গাড়ি থেকে লোকজন নামছে। মহিলা পুরুষ, আর কল কল করতে করতে দুটো বাচ্চা। সামনের বাড়িতে আলো জ্বলল। আর ওরা কথা বলতে বলতে বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে।

প্রাণকিশোর একটু দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলেন। পেরিয়ে গেলেন ওদের। আর তখনই চোখটা হঠাৎ যেন পৌঁছে গেল তীব্র আলোর ছটায়। সকাল। হ্যাঁ সকালই তো। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি বসে আছেন বাড়ির চেম্বারে। ডাক্তারি আর করেন না। তবু মানুষ শোনে না। আসে। বেশির ভাগ গরিব। বলে, ডাক্তারবাবু আপনি ছাড়া আমাদের আর কে আছে? তিনি হাসেন। ওদের সঙ্গে কথা বলেন। লিখে দেন ওষুধ।

তাই সকালে চেম্বারে বসা অভ্যাস হয়ে গেছে। কেউ আসুক না আসুক। আজ সকালেও বসেছিলেন। মনে পড়ছিল গত রাতের কথা।

গতরাতে শুয়ে শুয়ে খুব হাসছিলেন প্রাণকিশোর। ময়না অবাক হয়ে বলল, কী হল হাসছ কেন?

প্রাণকিশোর বললেন, হাসছি কেন জানিস! আজ আমি সত্যি কথাটা বলতে পেরেছি।

কী সত্যি কথা বড়বাবু!

ওরা তোকে তাড়াবে জানিস?

জানি তো। আমি পা বাড়িয়েই আছি।

ইস, পা বাড়ালেই হল আর কী। আমাকে ছেড়ে যাবি তুই!

না।

তবে বাড়ে থাকিস, অধিকার নিয়ে থাকিস—সেই ব্যবস্থা করব। ওরা যাই করুক, আমি মরছি না সহজে।

ময়না অবাক হয়ে দেখছিল ওঁকে। ওর বিষণ্ণ চোখদুটোতে আঁধার ঘনিয়ে এসেছিল।

সকালে চেম্বারে বসে এইসব ভাবছিলেন তিনি। মনে পড়ছিল, ময়নাকে কাছে রাখার একমাত্র উপায় ওকে বিয়ে করা। সকালে সেটা মনে পড়তে হেসে ফেললেন। তাই আবার হয় নাকি! তিনি কি পারবেন ময়নাকে এ কথা বলতে! ময়না কি রাজি হবে! বাধা। কোথায় বাধা! না, কোথাও তো বাধা নেই। ইচ্ছে করলেই পারেন। তবে কি ভয়! কোথায় ভয়? সোজা কথা বলতে ভয়! সোজা পথে চলতে ভয়! ভয়টা কীসের!

উত্তর খোঁজার আগেই বাইরে 'মেসোমশাই' ডাক শুনলেন। পরিচিত গলা। প্রাণকিশোর উঁকি দিয়ে দেখলেন। অচিন সরকার। বড়ছেলে অপুর বন্ধু। এখন পার্টির লোকাল লিডার। আগে খুব আসত। এখন কমেছে।

অচিন ঘরে ঢুকে বলল, ভালো আছেন মেসোমশাই?

প্রাণকিশোর হেসে বললেন, কী ব্যাপার, সাত-সকালে নেতার আগমন আমার কাছে! কী অপরাধ করলাম আমি?

ছি-ছি কী যে বলেন। অনেকদিন আপনার খোঁজ নেওয়া হয়নি, তাই ভাবলাম, এ পাড়া দিয়ে যাচ্ছি যখন, একবার খোঁজ নিয়ে যাই।

প্রাণকিশোর হেসে উঠলেন, দেখো বাবা অচিন, আমি বুড়ো মানুষ, সব বুঝি না, তবে একটা বুঝি—এত সরল কথা বলতে তুমি আসোনি।

অচিনও হাসল, মেসোমশাই বিশ্বাস করুন, এখন আর আগের মতো সময় পাই না।

আমি ভালো আছি অচিন। প্রাণকিশোর প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য বললেন।

অচিনের তবু ওঠবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। হেসে বলল, আপনি ভালো আছেন সে তো দেখতে পাচ্ছি।

তবে—।

না-মানে, আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি—।

কী?

শিল্পায়ন নিয়ে আমরা একটা সেমিনার করছি রবীন্দ্র ভবনে। কলকাতা থেকে কিছু লোকজন আসবেন। তাঁরা চাইছেন শহরের বিশিষ্ট মানুষজন আসুন, যাঁর যা প্রশ্ন আছে, খোলামনে করুন। বিষয়টা পরিষ্কার হোক। এই জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।

এটা আদেশ না অনুরোধ?

কী যে বলেন, আপনি তো আমাদের লোক।

আমাদের তোমাদের বুঝি না। তোমাদের সমর্থন করি ঠিকই, তার মানে এই নয় যে আমি তোমাদের লোক। আমার যা মনে হবে, বলব। কিন্তু তোমরা কি তা বলতে দেবে? নাকি তোমাদের সাজানো কথা বলতে হবে?

প্লিজ মেসোমশাই এভাবে বলবেন না। আমরা তো চাইছি বিষয়টা নিয়ে সোজাসুজি আলোচনা হোক।

এই তো অচিন মুশকিলে ফেললে। সোজা কথা কি সহজে বলা যায়।

অনেক কিছু এখনও পরিষ্কার নয়। আপনি বলুন, আপনার যা মন চায়। কোনও বাধা নেই।

আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ভেবে দেখি।

অচিন তবু ওঠে না। বসে আছে। প্রাণকিশোর বললেন, আর কিছু বলবে?

অচিন মাথা চুলকোচ্ছে। বলবে কী বলবে না ভাব। প্রাণকিশোর অপেক্ষা করছেন।

অচিন বলল, মেসোমশাই, কথাটা আপনাকে বলা উচিত কিনা বুঝতে পারছি না।

কী ব্যাপার বলো তো। প্রাণকিশোর কৌতূহলী হলেন।

অচিন মাথা চুলকে বলল, না মানে আপনি এই শহরের বিশিষ্ট ডাক্তার, অপুর বাবা, আমাদের মেসোমশাই, আপনার সম্পর্কে কোনও কটূক্তি কি আমাদের শোনা উচিত?

কী বলতে চাইছ স্পষ্ট করে বলো তো। প্রাণকিশোর অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন অচিন বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে।

অচিন বলল, মেসোমশাই লোকের চোখ ভালো না। নানা জনে নানা কিছু দেখে, তাই নিয়ে চর্চা করে, আর সেগুলো যখন কানে আসে তখন খুব খারাপ লাগে।

আমাকে নিয়ে কী শুনছ।

না-না সরাসরি আপনাকে নিয়ে নয়।

তবে?

থাক না।

আহা থাকবে কেন। কথা যখন বলতে এসেছ, তখন ওটা আর বাকি থাকে কেন। সোজাসুজি বলো।

বিশ্বাস করুন মেসোমশাই, আপনার কোনও ক্ষতি হোক চাই না। আপনি এই শহরের বিশিষ্ট নাগরিক। একসময় আমাদের পার্টিকে কত সাহায্য করেছেন। সে-সব আমরা ভুলিনি। তাই তো বলতে এলাম—।

কী বলতে এলে?

না মানে, ওই মহিলা সম্পর্কে—।

কার কথা বলছ?

ওই যে, আপনার এখানে আছেন।

ও ময়নার কথা বলছ।

হ্যাঁ।

ওকে নিয়ে কথা রটছে?

আহা রটবে কেন! নানা জনে নানা কথা বলছে।

বলছে যখন বলতে দাও। বললেই তো গা পচে যাবে না। ময়না কে, এখানে কী করতে আছে—সবই তো জানো। আমার শক্তি সামর্থ্য থাকলে দরকার হত না। তা যখন নেই, তখন বাধ্য হয়েই—। তা ছাড়া একজন কেউ থাকলে কথা বলা যাবে, সেবা যত্ন পাওয়া যাবে। আমি বুড়ো মানুষ, একা থাকতে পারি না। এতে যদি কারও চোখ টাটায় মুখ বাঁকায় তো কী হয়েছে।

অচিন দু-হাত তুলে বলল, মেসোমশাই আপনি উত্তেজিত হবেন না। আমি কিন্তু কারও পক্ষে বলছি না।

তুমি নিরপেক্ষ এটাও মনে করছি না।

আপনার প্রবলেম বুঝি। এই বয়সে সবাই সঙ্গী চায়। মাসিমা বেঁচে থাকলে যে সমস্যা ছিল না। কিন্তু অপু তপু কিছুতেই মানতে চাইছে না।

প্রাণকিশোর অবাক হয়ে অচিনের মুখের দিকে তাকালেন, অপু তপু তোমাকে বলেছে এ কথা?

শুধু অপু তপু কেন, আজ সকালে রাইও ফোন করেছিল আমাকে। আপনাকে নিয়ে এইসব রটনায় ওরা খুব বিচলিত।

প্রাণকিশোরের বুকের ভিতর থেকে বিরক্তির ঢেউ উঠে আসছিল। প্রসঙ্গের ইতি টানতে তিনি বললেন, অচিন, এই নিয়ে আমি আর কথা বলতে চাই না।

মেসোমশাই, আপনি রাগ করবেন না।

না, রাগ করছি না।

আপনি যদি বাড়ি বিক্রি করতে চান, বলুন—আমরা আপনাকে হেল্‌প্‌ করব।

অচিন প্লিজ, আমার ভালো লাগছে না।

আমার কথাটা শুনুন। ছেলেমেয়েরা যখন চাইছে না, তখন আপনি কেন ওই-মহিলাকে রেখেছেন। তা ছাড়া, এটা আমাদেরও সিদ্ধান্ত, আপনি এই শহরের সম্মানীয় মানুষ, আপনি যাতে ভালো ভাবে থাকতে পারেন—সেটা আমাদের দেখা। কথাগুলো একটু ভাববেন মেসোমশাই।

সকালটা অদ্ভুত ধাঁধায় পার হয়ে গিয়েছিল। অচিন চলে যাওয়ার পর তিনি অনুভব করেছিলেন মেরুদণ্ডে হিম শীতলতা। শিহরণের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল রোমকূপে। অচিন কি

প্রকারান্তরে হুমকি দিয়ে গেল। ও কি বোঝাতে চাইল, প্রাণকিশোর ব্যাভিচারে লিপ্ত? ছি-ছি।

প্রাণকিশোর টের পাচ্ছিলেন তিনি কাঁপছেন। উঠতে গিয়েও পারলেন না। ধপ করে বসে পড়লেন। গলায় যত জোর আছে, চিৎকার করে উঠেছিলেন, ময়না—। গলা দিয়ে একফোঁটা আওয়াজ বেরোল না। শরীরটাকে তুলে পৌঁছতে চাইছিলেন ময়নার কাছে। পারলেন না। টের পাচ্ছিলেন, ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গিয়েছে। চারদিকে যেন চক্রান্তের জটাজাল। তিনি একা কত দিক সামলাবেন। গলা ফাটিয়ে ডাকছিলেন, ময়না—ময়না, কোথায় গেলি তুই? এতগুলো কথা বলছেন, অথচ গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না কেন? জোর করে উঠতে গেলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ডালাচোরা গাছের মতো ভেঙে পড়লেন সোফার উপর।

আর ঠিক তখনই পথের আলো চোখে পড়ল। প্রাণকিশোর চমকে উঠলেন। চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আহ্ ওই তো রাস্তা। ওই তো বাস যাচ্ছে। ওই যে বেলগর্ভ মেডিক্যাল হল। ওখানেই তো ছিলেন শেষ বিকেলে।

প্রাণকিশোর উল্লাসে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলেন। অনেক কষ্টে সামলালেন নিজেকে। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেললেন। চোখের ছানি অপারেশন আর বৃদ্ধাশ্রমের পর এই সিদ্ধান্ত। আর সেটা নিতে পেরে হাঁটার গতি বেড়ে গেল। মনে মনে বলে চললেন, ময়নারে আমি পথ পেয়েছি। তুই আর বাধা দিস না। আমি তোর কাছেই যাচ্ছি। আমার খেলা শেষ করতে পেরেছি রে ময়না—।

প্রাণকিশোর এখন হাঁটছেন নতুন উদ্যমে। হাঁটতে হাঁটতে টের পাচ্ছেন মন যেন মারাদোনা হয়ে গেছে। বাঁ পায়ে দুর্ধর্ষ ড্রিবলের মতো একের পর এক বাধা পেরিয়ে চলেছেন অনিবার্য লক্ষ্যভূমির দিকে।

## সময়

সৌগত চট্টোপাধ্যায়

ঝরে পড়ে নির্জনতা আরণ্যক আঁধারের কোলে
কনে দেখা আলো ছিল, প্রেম ছিল চোখের আড়ালে
তারা ভরা আকাশেতে জেগেছিল জ্যোৎস্নার নদী
পরবাসে দীর্ণ হল শিকড়হীন জীবন অবধি।

স্তব্ধতার অন্তহীন হ্রেষাধ্বনি জঙ্গলে ভয়াল জন্তু যারা
জীবনের জয়গান বলিষ্ঠ প্রতিবাদ চূর্ণ বিচূর্ণ করে তারা
ফিরেছিল মৃত্যুর চেনা পথে চাইবাসা শপের কাছে
মহাকাশে ছায়াপথে জ্যোৎস্নায় বিস্তীর্ণ সময় ফুটে আছে।

ফুটেছিল এ-সময় গ্রাফিক্যালি নৈর্ব্যক্তিক ঘড়ির কাঁটা
তাই অবসাদ ভেদ করে কুয়াশা বিদীর্ণ করে শীতের জঙ্গলে পথ হাঁটা।

## দ্রাক্ষাফলের গান

সৌমনা দাশগুপ্ত

সারারাত সেলাই
রাত শুধু রিফু কারবার—
সবটুকু কাটাকাটা
মেঘের আঘাতে,
ক্ষয় লাগে আকাশের
উচ্চফলনশীল ত্বকে।
ভুল, শুধু-ই কি ভুল।
আমি হাঁচোড় পাঁচড় ক'রে
আকাশ উপড়ে ফেলি

অতিক্ষণে তুমি
এই মাটি থেকে
চেটে নাও রাগরক্ত,
শ্রাবণের প্রকট হরিৎ।

দ্রাক্ষাফলের গান
লোহিতে ছড়ায়
নিটোল আঙুর রবে
জমে ওঠে হাওয়া

## প্রাচ্যের দোভাষী

### কালোবরণ পাড়ুই

তথ্যের বিতরণে প্রযুক্তির বিবরণ। ভাষার বিবরণে স্বপ্নের আগমন। হ্রদ থেকে বহির্গত জলপ্রবাহ পরিস্রুত করে পান করি। উন্নতির অভিমুখে পৃথিবীর সম্মেলনে সোনালি ভাষার ডানায় প্রাচ্যের দোভাষী। আত্মসমর্পণের হাত মাথার ওপরে তোলা সকল মুদ্রায়। শৈত্যনের রুদ্ধ কক্ষে আলোচনায় ব্যবস্থাপত্রে দেওয়া-নেওয়ার টানাপোড়েন। মাটির ওপর দিয়ে টেনে মায়লা
করা শরীরগুলি একান্ত শিশুর; দূর থেকে দেখা যায় মায়ের হাতের কালো পোড়া দাগ। কল্পিত কুমিরের শাখায় উপকরণ সংগ্রহে উৎসোহিত ভাবনা ছবি টেনে লম্বা করি। গ্রামপথে বস্ত্র ব্যাপারীর সংক্ষিপ্ত বন্দনাগীতি অবেলায় সুর সৃষ্টি করে কত বন্দনীর আঁচলে স্নেহ ঝরে। গাছে মাছে মাছ রাঙা। ভাষায় ভাষায় ভাষার অনুরাগ। সংক্ষিপ্ত চরণের অনুবাদে শ্রোতা-অনুযায়ী সংবৃতে-বিবৃতে বর্ধিত হতে থাকে বাক্যনির্মাণ। প্রত্যয় উৎপাদনের জন্য পরিশ্রম, চেতনার পরিবেশন ও নৈপুণ্যে আসন্ন হওয়া অনেক যুদ্ধ থেমে গেছে
ভাষার মিলনে। কপট চিন্তার বিষম উল্কাপাত, দোভাষীগণ কবি। নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে
যেখানে একটি ভাষার শতেক প্রতিনিধি বিন্দুর উপভাষার টানে কিংবা স্রোতে, অস্থিরচিত্তের
রঙ্গমঞ্চে নাটকের চরিত্রসজ্জায় প্রয়োজন দু-একজন রূপসজ্জাকর। শোনা যায় করতালি শোনা
যায় মুক্ত হাসিরাশি, টেনে ও রসিয়ে বলা বিস্তারিত বিষম দোভাষী। মৌলিকের অর্থপূর্ণ অল্পকথা, রূপান্তরে নদীর সঙ্গে শাখা নদী, গ্রাম উপগ্রাম। নাটক, গল্প, ছড়া। সমাধান যোগ্যতায় বিশ্লেষণ। ছায়া ও রেখার সাহায্য অঙ্কিত ছবিমালা প্রাকৃতিক;
পাতা ফোটে পাতা ঝরে ফুল ঝরে। আধোছায়ায় স্বপ্ন সমাগত।
ড্রেজারে কাটা পলির নদে রণতরি ঢোকে না। পৃথক স্থানে তুলে রেখে ত্রাস কিংবা ত্রাস সৃষ্টিকারী কিছু শব্দ একই অর্থে আপাত কোমল ও শ্রুতিমধুর শব্দের ব্যবহারে বাক্যকে সার্থক করে তোলা যায়। তাসের সাহেব দাবার রাজা।
মাননীয় দোভাষীরা প্রাচ্যের শান্তিবাদীগণ।

## এপিটাফ সনেটগুচ্ছ : ১

ঋজুরেখ চক্রবর্তী

নির্মাণই নিজস্ব নিরাপত্তা। মুখ্যত শরীরী
কাগজে মেলেছে ডানা—যেরকম প্রতিটি বন্দিরই
ডানা থাকে স্বপ্নে, ঘুমে, অগোচরে, গোষ্ঠীচেতনায়—
মেলেছে আত্মশি ডানা আত্মরতি মৃত্যুর ভাষায়।

মৃত্যু নির্মাণ, তাই। নশ্বরতা তেমনই উপমা
কাগজে আড়াল করা শূন্যতার। চির পরিক্রমা
যেখানে যখন থামে, ব্যক্তিগত ঈশ্বরের কাছে
তোমারও মুহূর্ত কিছু সেইখানে মূর্ত হয়ে আছে।

তোমার মুহূর্ত কিছু—তোমারও সে চোরা অন্ত্যমিল—
ক্ষণিক আলস্য ভেঙে চষে ফেলা শব্দের নিখিল—
তোমারই, নির্জন, সব—তোমারই সে ভুবনভোলানো
হা হা কান্না। নিরাপত্তা—সেও, দেখো, তোমারই শেখানো।

তোমারই শেখানো ভাষা। যতিপাত, প্রবহমানতা—
মুখ্যত শরীরী সবই—তোমারই এ যাদু তঞ্চকতা।

## ছিল, আছে

মোনালিসা চট্টোপাধ্যায়

দলে বিরোধ ছিল
জলে গুগলি সাঁতার ও জলযান
ভুল শুধু উভচর, হায়রে আমার ঢেউ
আঁধার ভাবছে, ওই দ্যাখো
দূরচক্রবালে মেঘ সরে যায়,
পাখিদের কলরবে ভাঙে স্বরধ্বনি
দলে দলে মুখহীন বিচারের ঢাল
মৃদু রোদ আগামীর আয়োজন কেন
ঠিকানা পাবে?

আমার দু'হাতে স্তব্ধ প্রবাসের প্রাণ
বাস্তবের আলোচনা ডালপালাহীন
জল জমেছে বরফে, নীচে শিশু কুয়াশায়
তুমি আছো, ধরো হাত সঙ্গে আছি।

## আবার অরণ্যে

রেণুকা পাত্র

আবার অরণ্য খুঁজে আমি
মধ্যযামে একা, নির্বাক নক্ষত্র-আলোয়
চরাচর ব্যাপ্ত—ভঙ্গিল পথ-রেখা
যতদূর সত্য মনে হয়

ততদূর অন্ধকারে
মনকালো মুখ ও মুখোশের বিভীষিকা
ঘূর্ণাবর্তে নিয়ে যায়
পৃথিবীর রাশিকৃত কঙ্কাল

কেন পড়ে মৃত উপলাকন্যা শিশুটি
স্নানঘরে
উত্তর জেনেছি, তবু কঠিন সংশয়ে
সভ্যতার আলো ও উল্লাসে
আবার অরণ্য খুঁজি।

## বনসাই

আবদুস সামাদ

ব্রিগেডের জিহ্বা আর ভাড়ার ট্রাকগুলি আর
হাওয়ার গরল কিংবা পদ্যের রিমেক ছাড়া
কোনো দিকে বাড়ছে না কিছুই।
স্তনের পোশাক, প্রশ্ন, প্রণয়, বিয়ের পরমায়ু
কলিগের মৃত্যুসভা, মানুষের বুকের বহর
ক্রমশই ছোট হয়ে আসে।

বুনো অন্ধ কালো ঘোড়া
পিঠে তার কে তুমি সওয়ার?
ছুটে যাচ্ছ আঁখি তুলে যেখানে রাস্তার শেষে আর
মাইল-ফলক জেগে নেই।

## এট ট্যু ব্রুট

দীপা বিশ্বাস

আশ্চর্য ওরাই টানছে মেয়ের চরিত্রের নকাব?
এরাই তো একটু ছুঁয়ে থাকতে দাও বলে
ওর শরীর স্পর্শ করত জোর করে
ক্রমাগত নরকের আগুনে পুড়তে পুড়তে
কখনও হয়ত মেয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে
তার স্তন কিংবা যোনির কিংখাব
অমনি ঝাঁপিয়ে পড়েছে যত নেকড়ের দল

আজ শুশ্রুষা করবে শেষ পর্যন্ত তুমিও?

## শাদা সতর্কীকরণ

অপূর্ব কর

পকেটে একটা শাদা রুমাল রাখতে বলি

পৃথিবী আমাদের নোংরা করার
গভীর ষড়যন্ত্র আঁটছে

শাদা রুমালে চোখ-মুখ নিলে
তা অনেকটা অন্তত আঁচ করা যায়

কোনো কিছুর আর গাঢ় পাকা রং থাকছে না

আলো আলোর মতো, মানুষ মানুষের মতো

নদী নদীর মতো, ভালো ভালোর মতো

শুদ্ধ, শাদা, পবিত্র, নির্মল, ভেজালো

পৃথিবীর সব কষ্টিপাথর, দাঁড়িপাল্লা ভেঙে দুখান
ওদিকে বাতাসে লুকানো যে কিসের থাবা

কেউ জানে না এখন হাওয়ার যে কী মৃগয়া
হৃদয়েও ঢুকে যাচ্ছে উড়ন্ত ধুলো

শাদা রুমাল সবটা না হলেও অনেকটা জানিয়ে দেয় সতর্কীকরণ।

## জ্যোৎস্নাভেজা প্রান্তর

কানাইলাল জানা

ফকির এবং খরগোশের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজতে খুঁজতে
আচমকা এসে পড়ি জ্যোৎস্নাভেজা প্রান্তরে। দেখি কী
কালস্রোতের হাতে এপ্রাজ, হরিণ শাবকের মুখে মহার্ঘ আপেল।
ক্রমশ মেধাবী হয়ে উঠছে গাঙচিল। শসাকুচিতে দুদানা
নুন ফেলতে ব্যস্ত ছায়াপথ। তিনটে শালিখ খুঁটে নিচ্ছে
পাখিদের ইতিহাস রচনার বীজ। সুপুরি কাঁদিতে
টলমল করছে স্বপ্ন। ষড়রিপু মগ্ন জ্যোতির্চর্চায়।
মূর্খ প্রতিভাকে পটাচ্ছে বয়ঃসন্ধি—

খুব ধীরে ধীরে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে রোদকণা,
কাটল থেকে আত্মজীবনী। নলকূপ টিপলে ঝরছে
পবিত্রতা, মর্মরধ্বনি থেকে চিত্রনাট্য। জ্যোৎস্নাভেজা
প্রান্তর আসলে একজন প্রকৃত ম্যাজিশিয়ান যে ফকির
এবং খরগোস মিলিয়ে বানায় নিশাচর, নৌকাচক্র এবং
টমেটোমিরিক ও তিরন্দাজি....

## খুব মনে পড়ে

নীরেন্দু হাজরা

খুব মনে পড়ে। ঘরে বাইরে পাথর চাপা কান্না
দুই চোখ জুড়ে
চোখের পলকে ঘোর, অন্ধকার, সর্বদা আতঙ্ক
ঘরে ঘরে
আমি ক্ষীণদৃষ্টি নিয়ে দেখি—
সোনার পাখিরা যাচ্ছে পশ্চিম-আকাশে
অথচ সেখানে
যেখানে মৃতকিশোরীর গোর দেওয়া হয়েছিলো—
গোরস্থান ফুঁড়ে
জেগে উঠেছে অপরাজিতা, জুঁই, মুখোযান
নির্বিকল্প...

এই তো দিব্যতা, শক্তি—প্রাণের সঞ্চয়
অন্ধকার জগতের কালো সাফ করে দিক
অমোঘ-মনীষা।

## অন্ধ তাই

অলোক সেন

অন্ধ তাই
বেশি দেখি উত্তরোল সন্ধ্যা
শুনি, সমুদ্র উত্তাল ঢেউ—
ছোট জীবনের দোলাচল : বন্ধ্যা।

সরে যাই
বন্ধুরে পথ, আঁকাবাঁকা;
ওদিকে পাহাড়, হাওয়া দোলা খায়
এদিকে শুধুই পথ পুঁথি ঢাকা—
তোলপাড় প্রয়োগে পন্থায়।

অন্ধ তাই
কোলে নিয়ে ছিন্ন সময়ের যত লেখা
একাকী নদীর কাছে বসে
ও মাঝি, দেখাও, যতটা তোমার দেখা।

## বেচে, বর্তে

নাসের হোসেন

চাঁদের আলো থেকে নেমে আসছে সার-সার মানুষ
এতদিন তারা চাঁদেই বসতি করে ছিল, বেঁচে ছিল,
বর্তে ছিল, তবুও কেন যে সেই ফিরে আসতে হল
ধরার বুকে, চাঁদ যে উপ-গ্রহ, তা যে উপ-পতি
বা উপ-পত্নীর মতোই উপাদেয় এবং কল্পনার
উপ-বন, কিন্তু কল্পনারও যুপকাষ্ঠ হয়, সব
কল্পনা শেষপর্যন্ত আরামদায়ক থাকে না, তখন
পিঠের উপর সপাং চাবুক পড়লেই খেয়াল হবে
এ কোন্ ছ্যাকড়া-গাড়ি টেনে চলেছি আজীবন

শেষ পর্যন্ত ধরার বুকে, ধরা মানে যাকে সত্যিই ধরা যায়

## চলো যাই

বিশ্বজিৎ রায়

প্রতিদিনের এই নাটক, এই ছল থেকে
বহুদূরে কোথাও—চলো, যাই
যেখানে বাতাসের সঙ্গে সন্ধি হবে অনায়াস
ধানের শীষে জেগে থাকবে প্রাণ রাতভোর,—
শুধু দুবেলা দুমুঠো
বিনিময়ে ভাসিয়ে দেব সব রিংটোন, উল্লাস,
সারাদিনের কার্বন...

হয়ত সাংঘাতিক ভুল হয়ে যাচ্ছে কোথাও,
নিজের বলে দাবি করছি যা
সব হয়ত অহেতুক—
এই রক্ত জীবন, এই মেগাশূন্যতা থেকে
দূরে কোথাও জলের কাছে বসি
চলো, যাই...

## ক্যাপ্টেন হান্টের সরাইখানা*

তাপস রায়

উদ্বাস্তু পথ থেকে এসে আরো কিছুদূর, বয়সে প্রবীণ
আমাদের পাগল বন্ধুরা এইখানে গেয়ে ওঠে গান, এইখানে
কী এক পাবার বলে উঠে আসে, পাহাড়ের পথও অপার

দৃশ্য পরিষ্কার, হুবহু টানিয়ে রাখা অন্য এক রঙিন পালক
ভূতগ্রস্ত আমাদের নাড়িভুঁড়ি খুব ঠিক চিনে নেয়, এখানেই শিলান্যাস
তরলতা উস্কে এখানেই পাথরের ঠাটবাট,প্রাণে প্রাণ, মগ্ন আলাপ

স্ফূর্তিবাজ সন্ধ্যা এসে কীভাবে বাজাত টুংটাং সীমানার গ্রাস
যেভাবে অভিমান দীর্ঘ চুমুকে নিঃশেষ করা যেত আর লিরিক কোলাজ
নির্জন অতিথিশালায় খুব ঢের বয়সের হেরফের ফেলে ফুটে ওঠা মৃদু নির্দেশিকা

এইখানে এতদিন পরে সেইসব প্রাকৃতিক মেঘ নামে, সেইসব শিলং বয়স
পানশালা ঘিরে স্বভাব অচেনা, দুপুরের রোদ ঠেলে উঠে এসে এইখানে স্মরণ
অভিমগ্ন কথাজাল ছিঁড়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত, ওইতো পমব্রাং** রূপকথা রেখেছে আশ্রয়

* শিলং-এর মফস্বল অন্তত ৮০-এর দশকের শেষ দিকেও ক্যাপ্টেন হান্ট-এর সরাইখানা খুব বিখ্যাত ছিল। ব্যবসা রমরম করে চলত ক্যাপ্টেন হান্ট-এর নিজস্ব পদ্ধতিতে তৈরী দেশী মদের জন্য। আজও জমত খুব।

** পমব্রাং মেঘালয়ের খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়ে কুমারী নাচ ও তার সাথে যুক্ত আচার অনুষ্ঠান।

## সান্ধ্য

সুমন গুণ

১
গ্রামের নামঃ সন্ধ্যাকাল।
গোটা চাঁদ
উপুড় হয়ে আছে এই
সধবা জনপদের বুকে

আজ ফিরতে অসময়, তাই এই চাঁদ, এই সন্ধ্যাকাল

২
তোমাকে চাঁদের মতো বললে ঠিক হয়। এইরকম। পুরো চাঁদের
মতো।

## আপাতত না

**ঋত্বিক ঠাকুর**

যাব।
তবে ঠিক করে বলা যাচ্ছে না

প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা এখনও পায়ে লেগে। রোমকূপে তার শব্দ
গন্ধ রঙ স্পষ্ট আনন্দের মানে মেঘের ভাষায় কী দারুণ কথা
বলছে।
তাকে ফেলে কে যেতে চায়, বল?

রোজরোজ নিয়ম করে দুরন্ত রোদ্দুর এসে কড়া নাড়ে দরজায়। ওর
সঙ্গে এখনও অনেক খেলা বাকি আছে। আরও একটা কাশফুলের
দিগন্ত আকাশের সঙ্গে বাজি রাখতে চাইছে এই রাখাল চোখ।
তারপর ভাবা যাবে যাওয়া যায় কিনা।

হলুদ স্বপ্নে আবার স্নান করার আমার বেনে বৌ-কে। মেঠো খুশিতে
শিস দেবে ঝিঙেফুল। রাধাচূড়ার হাত ধরে গোধূলি পেরিয়ে
পৌঁছে যাব চাঁদের ভাটিতে। সন্ধেতারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে
ভোর পর্যন্ত পান করব স্বচ্ছ কাচ অন্ধকার। আদ্যন্ত লক্ষ রাখব
শুকতারার গর্ভে কিভাবে আলোর জন্মান্তর হয়। চাঁদের ফুসফুসে
পথভ্রষ্টা জ্যোৎস্না সূর্যকে আড়াল করে কিভাবে ঘুমোয় তা-ও
দ্যাখা বাকি রয়ে গেছে।

তবে বল, এখনই কেমন করে বলি, কবে যাব।

## প্রচ্ছদ

**অজিত বাইরী**

শুধু ভাঙার কথা বোলো না। পাশাপাশি
নির্মাণের কথাও বোলো। শুধু ধ্বংসের
কথা বোলো না, ধ্বংসের উপর প্রদীপ জ্বালাবার
কথাও বোলো।

শুধু আশাভঙ্গের কথা বোলো না। স্বপ্ন
দেখার কথাও বোলো। মানুষই স্বপ্ন দেখে।
মানুষই মানুষকে স্বপ্ন দেখতে শেখায়।

মৃত্যুপুরীতে শুধু জমাট অন্ধকার নয়। যেন
চুঁইয়ে আসে আলো। নিশ্ছিদ্র নীরবতার
ভেতর থেকে জীবন যেন পাঠায় সংকেত।
আর তাতেই বদলে যায় পৃথিবীর প্রচ্ছদ।

## দূর সাগরতটে নারী

**শঙ্কর বসু**

আমি সৈকতে পান করেছি দূর সাগরের আত্মা
সেখানে দিগন্তের সাথে সাগরের নিবিড় সঙ্গম
আইফেল টাওয়ারে মন্থন আর ফরাসি সুরার ঘ্রাণ
সব মিলেমিশে একাকার—
হঠাৎ কোনো আদিম আকাঙ্ক্ষায় রে রে করে ছুটে আসা
তাতার বাতাস তার বিশাল উরুসন্ধির
দরোজায় এসে থমকে গেল—
চেয়ে দেখি, এ কী!
এ তো সে নয়! তিরিশ বছরে
এঁকেছি যাকে একমুঠো জ্যোৎস্নায়!
ভ্রষ্ট আশায় ঘুরে দাঁড়ালাম
যদি, চমকে উঠে ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে আসে নারী
যদি, তার উজানী স্তনে দুলে ওঠে কামজর্জর ঢেউ!
তখন সমর্পণের নেশায় মগ্ন হয়ে আছি
শুধু স্বপ্ন দেখি, কবে আমার মুক্তি হবে হৃদয়ের কাছাকাছি।

# জীর্ণ পৃথিবীর কথা

রমেন আচার্য

কতদিন মেরামত হয়নি বলে জীর্ণ ও বিবর্ণ এই পৃথিবী। যেন
শরিকি সম্পত্তি বলে দায় অন্যের দিকে ঠেলে দেওয়া।
প্লাস্টার খসে ইটের লাল দগদগে ঘা চোখে পড়ছে। ওই সামান্য ক্ষত
একই ভাবে দীর্ঘদিন পড়ে থাকলে ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে যাবে।
যে অশ্বত্থ শিকড় তার ছদ্মবেশী শাবলে চূর্ণ করছে গর্বিত স্থাপত্য
ধর্মের দোহাই দিয়ে সে গাছ উপড়ে না ফেলে
সজ্ঞানে বিনাশের দিকে চলেছি সবাই।
নিজস্ব সংসারের গণ্ডির বাইরে তাকাই না বলে
শেষের সে দিনের দুরন্ত আমাদের ভাবিত করে না।

গত রাত্রে নবজাতকের মাথার পাশেই ভেঙে পড়েছে একটা প্রকাণ্ড চাঙড়।
ফলে সিদ্ধান্ত হলো—সিমেন্ট ও বালির প্রতি অনাস্থার কারণে
আমরা ইটগুলি গাঁথব ভালোবাসা দিয়ে। আর
আমাদের যার যে রঙ পছন্দ, তা দিয়েই রঙ করতে পারবো
নিজের অংশটুকু। কিন্তু তার আগেই দরকার ওই ক্ষতকে
জীবাণুমুক্ত করা। যৌথ শুশ্রূষায় একদিন নিশ্চয়ই ভরাট হবে ক্ষত, আর
প্লাস্টার ও চুনকামের পরে সুদৃশ্য হয়ে উঠবে বাসস্থান।

মধ্যরাত্রে বেড়া সরিয়ে সরিয়ে প্রতিবেশীর জমিতে যদি থাবা না বসাই,
তোমার লাজুক ইচ্ছের উপর আমার উগ্র রঙ যদি চেপে না বসে, যদি চাই
পৃথিবীর একটা মাত্র আকাশই থাকুক তার নীলাভ স্বকীয় প্রশান্তি নিয়ে,
তাহলে ওই উর্বরতায় আমরা নক্ষত্র বপন করবো—
এক একজনের এক একরকম স্বপ্নের নক্ষত্রে
বর্ণময় হয়ে উঠবে প্রাচীন আকাশ।

ওই নক্ষত্রজ্যোৎস্না পৃথিবীতে নেমে এলে, তার সেই মায়াবী আলোয়
অপরিচিত কোনো মুখের মধ্যে ক্রমশ ফুটে উঠতে দেখবো—নিজেকে।
আর তখনই প্রথম, পরস্পরকে
আলিঙ্গন করতে শিখবো আমরা।

## আরতির মনোরথ

রমা চট্টোপাধ্যায়

কদাচিৎ কোনো ভিড়ের পথের মাঝে
হয়তো উপোসি চোখ দুটো তুলে দেখা
জনারণ্যের মিছিলে হারানো অকাজে
প্রশ্ন রয়েছে এখনো কি আছ একা?

বহুদিন ধরে অনেক সময় পেরিয়ে
দু হাতে ঠেলেছি বাধাবন্ধের দ্বার
সীমাহীনতার কঠিন নজর এড়িয়ে
এসেছি দু চোখে শপথ অঙ্গীকার।

নিকটে যেতেই হারিয়ে কখন অজানা
খুঁজে খুঁজে ফিরি অনন্ত সেই পথ
অভিমন্যুর শরজাল ঘেরা সীমানা
দীপ্ত প্রদীপে আরতির মনোরথ।

## কবিতা সম্ভবা

এণাক্ষী আচার্য

শয্যার দুপাশে চাঁদ
রূপ নিয়ে গড়াগড়ি যায়,
ভেঙে খানখান সংযমের বাঁধ
রাস্তার মুকুটে লজ্জা
এতকাল ভুলের প্রবাসে।
ঘুম আসে ঘুম যায়
এলোমেলো উথাল পাতাল
সকালে বিষণ্ণ চাঁদ—
আর সমুদ্রজলের উচ্ছ্বাসে বুঝি
আমি এখন কবিতা সম্ভবা।

## যদি তুমি হতে

**লীলা দাশগুপ্ত**

যদি তুমি ফুল হতে
তোমার সুবাস ভরে নিতাম।
যদি তুমি পাখি হতে
নরম স্পর্শে শিহরণ জাগাতাম।
যদি তুমি সবুজ হতে
তোমার রঙে রঙিন হতাম
যদি তুমি পথ হতে
পথের ঠিকানা খুঁজে নিতাম
যদি তুমি ঝরনা হতে
উচ্ছ্বাসে আবেগে ভেসে যেতাম
যদি তুমি মন হতে
গভীর রেখাপাত করে দিতাম
যদি তুমি ভালোবাসা হতে
নিবিড় বিশ্বাসে ভরে দিতাম
যদি তুমি দৃষ্টির বাইরে দৃষ্টি হতে
তবে আমি সারাদিন সারারাত শুধু
দেখা অদেখার সাদরে ডুব দিতাম।

## মানুষের মেলা

**শামীমুল হক শামীম**

মানুষ দেখার খুব শখ তোমার
বিচিত্র রকম মানুষ
প্রতিটি মানুষের থাকে নিজস্ব জগৎ
প্রতিটি মানুষের ভেতর আরেক মানুষ
মানুষকে পাঠ করা মানেই অনন্ত রহস্যকে উন্মোচন করা

চলো যাই মানুষ দেখে আসি—
কোথায়?
হাওড়া।

এতো এতো মানুষ কী করে, কোথায় থাকে?।
এ-তো মনে হচ্ছে হাশরের ময়দান
শেষ বিচারের দিন কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর জন্য
পিলপিল করে আসছে—
একটি ট্রেন প্লাটফর্মে ঢোকা মানেই
ট্রেনটি যে যে স্টপেজ ধরে আসছে
ঐ অঞ্চল খালি করে উঠিয়ে আনছে
তা-না হলে এতো মহামানবের মহাসমাবেশ হবে কোত্থেকে?
আবার বিচার শেষে ভাগ্য ফেরি করে চলে যাচ্ছে অজানা গন্তব্যে...

মানুষ দেখতে হলে চলে এসো হাশরের ময়দান
এই হাওড়া স্টেশন।

## অন্য বর্ণ

### জয়ন্তী রায়

তোমার বর্ণ অন্য, অন্য আকাশের দিকে
তোমার খোঁজ, তাই বার বার
হাত ছাড়িয়ে যেতে চাও নদীর ওপার,
নদীকে ছাড়িয়ে আরও বনভূমি নয়,
শুধু মরুভূমি, বালির বিস্তার।
নদী মানে প্রবহমানতা, ঐখানে
নদী নেই, বর্ণমালা নেই,
শব্দহীন কথার আড়ালে তোমার অপরিচয়
শুধু টেনে আনে, অচেনা মাস্তুল
সে জাহাজে, যে জাহাজ কোনোদিন
পৌঁছবে না স্থির ঠিকানায়।

অসহায় অস্তিত্বের আর্তি উঠে আসে
নিবিড় জ্যোৎস্নায়,
দেবদারু গাছের শিহর কান্না মনে হয়,
বাতাসের সূক্ষ্মতর ছড়ায় প্রশ্নের মতো
অচেনা কুহক। তবে এই শান্ত হাত
কোন পাথরের গায়ে করবে স্থাপন

ভাষার বন্ধনছাড়া আর কোনো রেখার দ্যোতক
ছড়াবে স্বপ্নিল সমুদ্রের স্রোত উচ্চারণ?

বৃন্তে এসো, পাপড়িহীন ফুলের দোসর হতে চেয়ে
ছড়াবে আমূল শুধু গ্রন্থিহীন ছিন্ন শতদলে,
দেখো হাঁসেরাও সারি বেঁধে উড়ে যায় সুনীল আকাশে।

## মেয়েটি

ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

মেয়েটি হারিয়ে গেছে
গ্রাম থেকে সহরে এসেছিল
কাজের তাগিদে
একটা বাড়িতে কাজও জোটে।

স্বামী-স্ত্রীর সংসার
দুজনেই চাকুরীজীবী
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ঘেরা।

সুখে ছিল মেয়েটিও
দিন গড়িয়ে যায়—
গড়িয়ে, গড়িয়ে যায়
মেয়েটি এখন ষোড়শী

একদিন বাড়ির কর্তা
নষ্ট করে তাকে
ভয়ে ভয়ে একথা জানায়নি কাউকে-ই
অথচ তার শরীর-ই জানিয়ে দেয়
সে নষ্ট মেয়ে।

গিন্নী গালাগালি মারধোর দিয়ে
বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়
কর্তা, গিন্নীর পাশে দাঁড়িয়ে
নেড়িকুত্তার মতো জুলজুলে চোখে

সব দেখতে থাকে।

মেয়েটি মুখ খোলেনি
নিঃসাড়ে পথে নামে
অজানা সহরে, অন্ধকারে
হারিয়ে যায়।

## জননী যন্ত্রণা
অমিতাভ চক্রবর্তী

মা যেমনি জননী সন্তানের
নদী তেমনি জাগতিক জীবনের।

শিরা উপশিরায় বয়ে
সেই কবে পাহাড়ের করুণাধারা
রুক্ষ প্রান্তরে করেছিল প্রাণসঞ্চার,
আমাদের খোল কলা সাধ মেটাতে
নদীকে মায়ের মতো গড়েছিল
অদৃশ্যের সুনিপুণ কোনো কারিগর।

আবেগের সেই জাদুর ছোঁয়ায়
বিন্দু বিন্দু জলের সাগরের মতো
তিল থেকে বাড়া তাল
একক মানুষ থেকে সমাজ
আর সমাজবদ্ধতার চষা ফসলে
থরে থরে সেজে ওঠা
এক থেকে শতধা
নানা পর্বে পল্লবিত
আমাদের লালিত অহংকারে
সভ্যতা ভাণ্ডার—যা নদীরই তো দান।

ভাবা যায় এমন কোনো সভ্যতা
যাতে নদীর অংশ নেই
এমন কোনো তালেবর নগর

যাতে নদীর স্পর্শ নেই
নদী ও মানুষের
আবহমানের নাড়ীর টানে
ইতিহাসের অমোঘ চাকার ঘূর্ণনে
না থামা কালের সময়ের রথে
আমরা অফুরান ভাবে চলেছি।

নদীর উজাড় করা স্নেহসিঞ্চনে
আমাদের অস্তিত্ব হিরন্ময়
আর সে একটু বিগড়োলেই
কীর্তিময়ী কীর্তিনাশা হয়ে
আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে।

আমাদের চৈতন্যের শিথিলতায়
অপদার্থ সন্তানের ব্যর্থতার দায়ে
যুগ যুগ ধরে বওয়া
প্রবাহিণীর নিরন্তর অনাবিল স্রোত
জোয়ার-ভাঁটার অমলিন রূপ
ক্রমান্বয়ে কলঙ্কিত হলে
কারো সাধ্য নেই
সীতার পাতালপ্রাপ্তি রোখে
ইট, কাঠ ইস্পাত কংক্রীট নিয়ে
তখন নীরব নিষ্প্রাণ পৃথিবী
খালি নিজের আবর্তে পাক খাবে।

## বয়স

**কালিদাস সমাজদার**

পৃথিবীটা আনন্দের নয় আর তত
বয়স বাড়ার জন্য তাই ইদানীং
জীবনটা ঘিরে হলুদ রেলিঙ
মনোরম টুকিটাকি কাজ শত শত
একে একে দূরে গেছে আপনজনেরা
এখন যদিও রম্য আরও অধিক

পুরাতন পরিচিতি বুঝি বা অলীক
তবু গন্ধ আছে তার যৌবনের বেড়া
ভেঙে ফেলে নির্বাসনে একবার শুধু
পিছনে তাকানো চলে মাত্র একবার
মলিন ফোটার বুকে ফুলের সৌরভ
বাসি তবে কত বাসি মন ছোটে ধু ধু
ফুলে ঢাকা শয্যা ও প্রান্তর তার
নূতন কিশোরী এক যুবার গৌরব।

## আমার নিহত ঢেউ

আরণ্যক বসু

নীলতারা, তুমি ছিলে মেঘভাঙা জলের বিভ্রমে
শেষ নৌকা ডাকছিল, ক্লান্ত মাঝি, শুনতে পাওনি?
জল থেকে তোলা হলে সারারাত মানুষে ও যমে
শীর্ণ হাত তুলেছিলে? নাকি ভুল? সাড়া তো দাওনি।

কাকে দেখে ছুটে গেলে? কোন স্রোতে তরঙ্গ তোমার।
কী এমন নিশিডাক, ফুটে ওঠা পাপড়ি বয়সে,
কোন লুপ্ত সভ্যতায়, পাতালের হাতছানি যার
বিষাদের রেখা আঁকে শোনিত গড়িয়ে নামা কষে।

দূরস্মৃতি হয়ে যাবে নিভৃতের সমর্পণে থেকে
এইসব রেখাচিত্র, হতমান শালবনভূমি
একদিন ছায়াদেহ বিষণ্ণ তিতির যাবে ডেকে
আমার নিহত ঢেউ, দূর গ্রহে বয়ে যাবে তুমি

আবার আঁকবো সেই নদী, বন, সাঁওতাল পাড়া,
পরিপূর্ণ শূন্যতায় মহাকাশ, কয়েকটি তারা

## বৃত্ত
শিলাদিত্য রায়

সে জালে নেমে আসে মৃতের কণিকা,
ধুলোয় ভিজে যায় জলের শরীর,
মাছরাঙা চাঁদ সবুজ আঁধারে দোল খায় একা একা।
তার শরীরে আখর জাগে সাবধান রাতে।
সে রাত সফল হয় জলের গভীরে।

## সন্ন্যাসী
তমোনাশ ভট্টাচার্য

টইটম্বুর নেশাও যেমন তলানিতে এসে ঠেকে
যখন-তখন তোমার কান্না অভিসন্ধিমূলক
এস্ এম্ এস্-এর গোপন কথা লুকোবে কোন্ বাঁকে—
অবেলার কি পা টলছে উড়িয়ে খোলা চুল-ও?

এভাবেই কি ঘরে ফেরা আসলে দূরে যাওয়া?
ঘুম মানে কি রাতের বেলা অ্যাল্‌প্রোজোলাম্ বড়ি?
হঠাৎ কোন্ খবর দিলো বদ্ধ ঘরে হাওয়া
বাইরে, তার চিঠি-ই জানে : ঠিকানা নেই বাড়ির।

স্মৃতি যেমন ইঁদুর হয়ে কেটে ফেলেছে সব
জেগে থাকার ইচ্ছে; যার কোথাও যাবার নেই
এমন এক মানুষ তার ছেড়েছে বৈভব
এবং আড়ি করেছে—শেষে ছাড়বে নিজেকেই

## জননীকে রক্তলিপি : ২

মৃণাল দত্ত

সংক্ষুব্ধ পৃথিবীর বুকে কল্যাণময়ী তুমি জাগো মা
অসুরবিনাশে পুরাণকথায় আবির্ভূতা দুর্গতিনাশিনী দশপ্রহরণে
তেমনি এসো মা, রক্ত অম্বরে এসো,
লাল পতাকা হাতে এসো।
ব্যথিগ্রস্ত ধরণীর বুকে তোমার প্রজ্ঞার প্রদীপ্ত শিখা
সর্ব হিংসা বিমুক্ত পৃথিবীর জাগরণে এসো মা
মজুরের বুকে কৃষকের বুকে আমাদের বুকে এসো মা
তুমি মা
পাভেলের মা
আমাদের মা জাগো।

## হিরণ্ময় গান

সুশান্ত বসু

দূরের দুঃখের কাছে গিয়েছিলে তুমি?
হাত পেতেছিলে ম্লান ছিন্ন অভিমানে?
ঘরের চৌকাঠে ছিল প্রব্রজ্যার ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি।
তুমি কি দ্যাখোনি চেয়ে
হেসে উঠেছিল দিন তোমারই কথার গূঢ় ওমে?

নিদুটির মন্ত্র ছিঁড়ে জেগে উঠেছিল শিশু
সাজানো শব্দের সংঘারামে;
তুমি কি শোনোনি তার গম্ভীর নতুন ডাক
তোমাদের গোঠের গোকুলে?

দূরের দুঃখের কাছে গিয়েছিলে তুমি
অভিমানস্ফুরিত উজানে?
নাকি সন্ধ্যাভাবা সেই নতুন প্রদীপখানি
জ্বেলেছিল তোমার উঠানে?
নাকি সন্ধ্যাতারা তার আলোর ভাষায়
গেয়ে উঠেছিল এক হিরণ্ময় গান?

## জবা

শিশির সামন্ত

সব দোকান এখনো খোলেনি, এখন জবার মতো
ফুটে ওঠে আবছা আবছা ভোর।
বাজার সাজানো হবে, মাংস কিনবে সকলে,
যেমন রক্তাক্ত জবা পছন্দ এখন সকলের, দুপুরটা
গনগনে আঁচের মতো, লাল এই জবাটির মতো।

দোকানদারির সাথে লক্ষ করে এখন দোকানি
সকলেই ক্রেতা, দরজায় দরজায় দাঁড়িয়ে সকল ক্রেতা
এরা সকলেই চায় পছন্দ মতোন সব, শুধু জবাটিই
প্রকৃত জবাটিই নেই, রক্তিম উল্লাস শুধু আছে।

## জন্মান্তর ঘৃণা করে

তৈমুর খান

অস্ত যাবার কথা সাজাও
ছড়িয়ে দাও মেহগনি দ্বীপে
আজ আমি খেলতে এসে
নিজেকে কুড়াচ্ছি নিভৃতে

মেঘের সিঁড়ি নামিয়ে আনো
জলশহরে জলীয় সব আয়ু
বনের পাশে অরণ্য-পরি
ডানা খুলে খেলছে কানামাছি

দেখতে দেখতে আঁধার নামছে
নিশান তোলো, নিশান তোলো
ওহো জগৎপতি,
বুদ্ধদেবের বোধির ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়বো
জাগবো না আর, জাগবো না আর, জাগবো না আর

## বিমূর্ত শিল্প

সুনন্দ অধিকারী

খবর, তা সে যত বড়ই হোক
এক না এক সময়
হারিয়ে যায় হেডলাইন থেকে

রিয়ালিজম, এক্সপ্রেশনিজম, সুররিয়ালিজম
এমনকি ওই ভুবনখ্যাত কিউবিজমেও, আমি
ছবি আঁকতে পারি
কিন্তু কোনোদিন যদি সত্যি,
তুলি ধরতে হয়
তবে কখনোই অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট বা বিমূর্ত শিল্পে
মন রাঙাব না আমি

কেননা জীবনের মতো মূর্তিহীনতা
আর চোখে পড়ে না কোথাও

## অভিশাপ

বিধান দত্ত

শূন্য হাতে ছিলেম বহুকাল
আর কটা দিন হয়'ত আমি থাকব
দুয়ার খুলে হয়'ত দেবে ধন
কোথায় আমি লুকিয়ে তারে রাখব।
সব কিছুতে বোঝা ভীষণ লাগে
সব কিছু তো হয় না মানান সই
রাজার ঘরে পা দিলে মন কাঁদে
রাজার ঘরে রাজার রাজা কৈ?
যতই থাকুক ধনদৌলত রাজার প্রাসাদে
কাঁদতে হবে আপন মনে ব'সে
বঞ্চিত ধন পাহাড় প্রমাণ করে
কাঁদছে রাজা নিজের পাপের দোষে।

আছি ভালো রাজার থেকে আমি
শূন্য হাতে আর কটা দিন থাকব
অভাব যদি হয় কোন দিন বোলো
তোমার জন্য খাদ্য কিছু রাখব।
পাপের ভারে সময় গেল অনেক
সামনে আছে একটুখানি বেলা
কি হবে আর পাপের খেলা খেলে
ভালোবেসে যায় না কিছু ফেলা।

## শান্তির গান

**দীপঙ্কর পাল**

পরিব্রাজক আউল বাউল
সবাই এসে উচ্চরোলে বলে গেল :
আমরা সবাই শান্তির দূত;
হানাহানি, ধ্বংসবিমুখ।
স্তব্ধতাকে দীর্ণ-করা মাইক্রোফোনের উদারতায়
সমাজসেবী, মন্ত্রীমশাই, সকলেই
সভায় এসে গেয়ে গেল শান্তির গান;
হিংসা নয়, ধ্বংস নয়,
শান্তির হয়ে, সৃষ্টির হয়ে ঐকতান।
গাছের মগডালে বসা শান্তিপ্রিয় পাখিটা
শান্ত হয়ে ঘাড় হেলিয়ে দেখছিল সব;
মিষ্টি সুরে শিস দিয়ে সে-ও জানিয়েছিল সম্মতি।
জঙ্গল সাফ করতে আসা
শান্তিকামী, সৃষ্টিকামী, শিল্পকামী
নির্মম কুঠারের এক ঘায়েই
মুখ থুবড়ে টলে পড়ল গাছটা।
আচম্বিতে স্তব্ধ হ'ল কণ্ঠ তার।
তারপর ককিয়ে উঠে,
ডানার ঝাপটা দিয়ে হৃদয়-বিদীর্ণ-করা আর্তনাদে
ভিটে ছেড়ে আকাশপানে উড়ে গেল—
শান্তিপ্রিয় পাখিটা।

## অন্য ভোরে
অগ্নি ভৌমিক

দু-চোখ বুঁজে থাকলে কি আর
যায় এড়ানো যা ঘটবার?
বিশ্ব এমন ক্ষুদ্র অনেক
খবর ছোটে আলোর আগে,
বিশ্বায়নের 'নাফার ফাঁদে
ধন জুটেছে কার কি ভাগে
সব জানা যায়,
সব জানা যায়
কেউ জুটেছে কাদের পিছু
মানুষ বোঝে সবই কিছু।
নিস্তি মেপে ভালই থাকি
যা দেখি তার ছবি আঁকি,
সবার সাথে একইভাবে বেঁচে থাকার
স্বপ্নটাকে নীল রেশমে জড়িয়ে রাখি
যত্ন করে—
খুলব বলে অন্য ভোরে।

PARICHAYA August-October 2007 Reg. No. 13273 WB/EC—265





সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭

মূল্য : ৭০ টাকা